তামিম আনসারী

ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড

ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাস

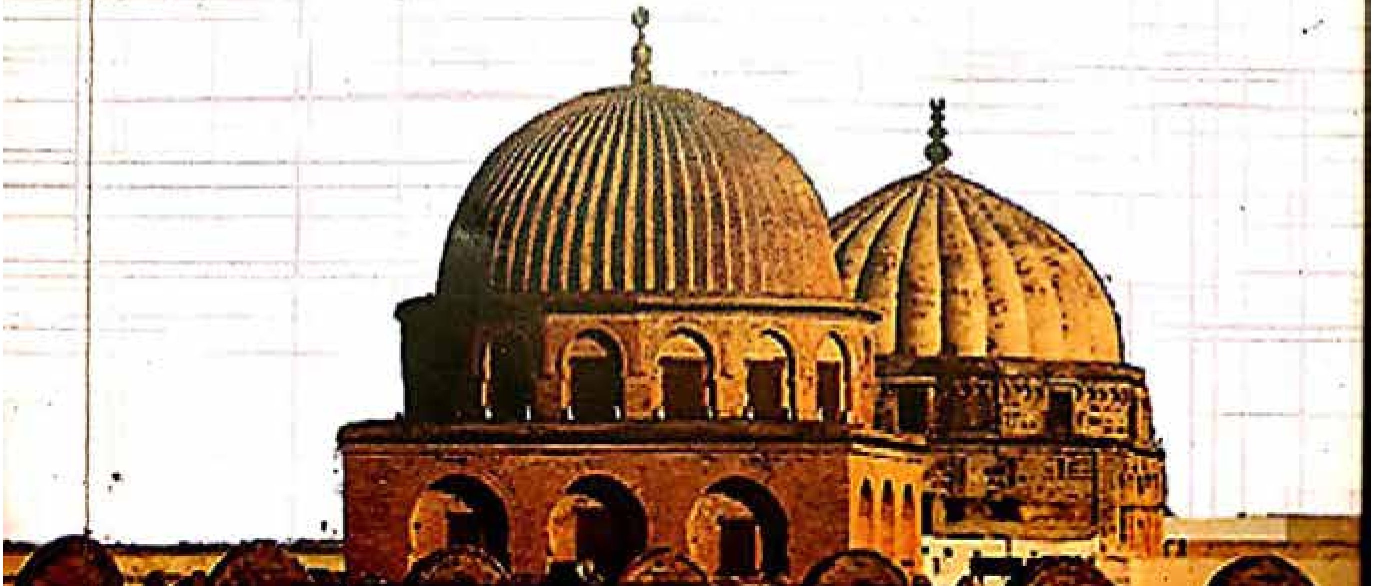

অনুবাদ

আলী আহমাদ মাবরুর

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

লেখক পরিচিতি

লেখক তামিম আনসারী একজন আফগান বংশোদ্ভূত আমেরিকান লেখক। তিনি ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন পাবলিক স্পিকার হিসেবে বর্তমানে খুব জনপ্রিয়। ইতিহাসের একজন আপাদমস্তক ছাত্র হিসেবে তাঁর লেখায় বরাবরই ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। কাবুলে হাইস্কুল পর্যন্ত পড়াশোনা করে ১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। তার মা ছিলেন প্রথম মার্কিন মহিলা, যিনি একজন আফগান পুরুষকে বিয়ে করেছিলেন।

২০০১ সালে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার পর তিনি বেশ কিছু বই লিখে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। যার মধ্যে অন্যতম হলো 'ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড', 'ইস্ট অব কাবুল: ওয়েস্ট অব নিউইয়র্ক'। টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনাটি আসলে তাঁর জীবনদর্শনকে পুরোপুরি পাল্টে দেয়। এর আগে তিনি যে পেশায় ছিলেন, সেখান থেকে সরে এসে ইতিহাসের চর্চা করতে শুরু করেন এবং মুসলমানদের প্রকৃত ইতিহাস বিশ্ববাসীকে জানানোর উদ্যোগ নেন। তিনি তাঁর জন্মভূমি আফগানিস্তানকেও কোণঠাসা করে রাখার পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেন। বিগত দুই দশক ধরে তিনি সানফ্রান্সিসকোতে নতুন লেখক তৈরির উদ্দেশ্যে ওয়ার্কশপ পরিচালনা করছেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড

মূল : তামিম আনসারী

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

www.islamicboipdf.blogspot.com
www.islamicboipdf.blogspot.com

ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড

মূল : তামিম আনসারী

অনুবাদ : আলী আহ্‌মাদ মাবরুর

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

✆ ০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮

০২-৫৭১৬৫৫১৭

guardianpubs@gmail.com

www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com

www.boibajar.com

প্রথম প্রকাশ : ১৬ এপ্রিল, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

শব্দ বিন্যাস: মো: জহিরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ : অর্ণব হাসান রিফাত

মুদ্রণ: মো: আমিনুল ইসলাম

হার্ডকভার মূল্য	: ৫০০.০০
পেপারব্যাক মূল্য	: ৪৫০.০০

ISBN-978-984-8254-11-0

Distiny Disrupted by Ali Ahmad Mabrur, Published by Guardian Publication, Price Tk. 500 (HC)/Tk. 450 (PB) Only.

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্রকাশকের কথা

একজন পাঠক হিসেবে মুসলমানদের ইতিহাসের বই পড়তে গিয়ে কিছু ব্যাপারে অতৃপ্তি অনুভব করেছি। আমাদের ইতিহাসের বইগুলো তারিখ, সাল, নাম, স্থান-কালসহ বেশ তথ্যে ভরপুর, কিন্তু সেখানে সাহিত্যমানের নিদারুণ অনুপস্থিতি। ইতিহাসের পাঠ সত্যিকারার্থেই নিরস বর্ণনানির্ভর। পাঠকদের কাছে ইতিহাসের বয়ান মজাদার করে উপস্থাপন করাটা তাই খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ। এমন একটা সাহিত্যমানে উত্তীর্ণ ইতিহাসের বই খুঁজেছি, যা পড়ে একজন পাঠক পরিতৃপ্ত হবেন, প্রতিটি পৃষ্ঠায় একটা আলাদা আকর্ষণ অনুভব করতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের ইতিহাসের বইগুলোতে বর্ণনার ধারাবাহিকতার অভাব দেখেছি। একাধিক ঘটনার বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে আজকের দিন পর্যন্ত ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনা নেই। আবার এমন কিছু গ্রন্থ আছে, যেখানে অনেক তথ্য ও বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে থাকলেও আকারে অনেক বড় কিংবা কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এমন একটি গ্রন্থ খুঁজেছি, যেখানে মুসলমানদের পুরো ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার আছে। মাত্র একটি বইয়েই আমাদের প্রয়োজনীয় ইতিহাস সংকলিত আকারে দেখতে চেয়েছি।

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এক দিন জিয়া হাসান ভাইয়ের 'ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড' বইয়ের ওপর ভিডিও রিভিউ দেখছিলাম। সেখান থেকে উৎসুক হয়ে বইটির পিডিএফ পড়েই পুলকিত হয়ে ওঠেছিলাম। এমন একটা বই-ই তো আমি খুঁজছি! জিয়া হাসান ভাইকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই, উনি বইটা নিয়ে ভিডিও রিভিউ না করলে সম্ভবত দারুণ এই বইটি আমার নজরে আসত না। আলী আহমাদ মাবরুর ভাইকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মন্ত্রীপুত্র এতটা সাধারণ আর বিনয়ী হতে পারে, মাবরুর ভাইকে না দেখলে তা উপলব্ধি করতে পারতাম না। মাত্র পাঁচ মাসেই এত বড় বইটির প্রাঞ্জল অনুবাদ করে দিয়ে আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। অনুবাকের প্রথম অনূদিত বই হলেও পুরো বই জুড়ে পাঠক বেশ প্রাঞ্জলতা পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আলোচিত এই বইটি বইমেলা-২০১৮ তে প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও সর্বোচ্চ ত্রুটিহীন করার স্বার্থে এবং সম্পাদনার সময়ক্ষেপণের কারণে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। সম্মানিত পাঠকদের কাছে বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বইটির সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

'*ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড:* ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাস' বইটি একটা ছোটমানের ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া। রাসুল ﷺ-এর হিজরত থেকে শুরু করে ২০০১ সালে আমেরিকায় টুইন টাওয়ারে হামলা পর্যন্ত সময়ের এক ধারাবাহিক আলোচনা থাকছে। তামিম আনসারীর এই বইটা পড়ে ইসলামের চোখ দিয়ে পুরো দুনিয়াকে দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। বইটি পড়ার পর ইতিহাসের খুঁটিনাটি আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে আপনার আগ্রহ জন্মাবে নিশ্চয়।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
৬ মে, ২০১৮ ইং
বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে অনেক বড় একটি কাজ সম্পন্ন করতে পারলাম। 'ডেসটিনি ডিজরাপটেড: দ্য হিস্টোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড থ্রু ইসলামিক আইস' বইটি তামিম আনসারীর একটি অনবদ্য ইতিহাস গ্রন্থ। মুসলমানদের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাই বইটির মূল উপজীব্য। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও ২০০৯ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর বইটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা পশ্চিমা বিশ্বে আলোড়ন তুলে, বেস্ট সেলিং বই হয় এর অন্যন্য সাধারণ তথ্যসূচি এবং সুনিপুণ ভাষায় লেখা ইতিহাস গাঁথার জন্য। বিশাল এই বইটি নিয়ে কাজ করার মতো যোগ্য আমি নই, তথাপি আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও অফুরন্ত নেয়ামত পেয়েছি বলেই কাজটা শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

বইটি সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতে, আমার তেমন একটা ধারণা ছিল না। গার্ডিয়ান প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী নূর মোহাম্মাদ ভাইয়ের চয়েজ এই বইটি। আমাকে বললেন কাজ করতে। নিমরাজি হয়েই কাজটা ধরেছিলাম। তবে যত দিন গেছে, যত কাজ আমি এগিয়েছি, বইটিকে যতটা জানার সুযোগ পেয়েছি, ততই যেন বইটির প্রতি ভালোবাসা বেড়েছে আমার। এই কাজটি করার জন্য আমার ওপর আস্থা রাখায় প্রিয় ভাই নূর মোহাম্মাদ এবং গার্ডিয়ান প্রকাশনীর সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কোনো রকমের চাপ না দিয়ে বরং সর্বোচ্চ রকমের বিনয় প্রদর্শন করে যেভাবে আমার মতো মানুষের কাছ থেকে তারা এই বড় কাজটি আদায় করে নিলেন, সেই জন্য গার্ডিয়ানের গোটা টিম বড় আকারে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

এই বইটিকে ইসলামি ইতিহাসের একটি বড় এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াতে আসারও আগে যেই সভ্যতাগুলো পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেখান থেকে শুরু করে আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলা এবং তার পরবর্তী সময়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধাভিযান (ওয়ার অন টেরর) পর্যন্ত গোটা সময়টাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম দ্য মিডল ওয়ার্ল্ড। লেখক এই অধ্যায়ে মধ্যপ্রাচ্যকে মধ্য পৃথিবী হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই অধ্যায়ে ইসলামের ছোঁয়া পাওয়ার পূর্বের মধ্য পৃথিবীর চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে সুনিপুণভাবে। বিশেষ করে সুমের সভ্যতা, মেসোপোটামিয়ান সভ্যতা, চালডিয়ান সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, জরথুষ্ট ধর্ম চর্চা ও এর প্রভাব, ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, পারথিয়ানসদের উত্থান, রোমান সাম্রাজ্য, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য এবং এই যুগগুলোতে ধর্মচর্চার ধরন আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম দ্য হিজরা। এই অধ্যায়ে মানবতার মুক্তিদূত হযরত মোহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাবের ঠিক আগ মুহূর্তে মক্কার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কাঠামো কেমন ছিল, নবিজির জন্ম ও নবুওয়াত লাভ, মক্কার প্রভাবশালী নেতৃত্বের সাথে তার দ্বন্দ্ব, হিজরত, হিজরি সালের শুরু, ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের প্রভাব ও গুরুত্ব, রাসূলের ﷺ মদিনার জীবনের বিভিন্ন যুদ্ধ, চ্যালেঞ্জসমূহ, ইসলামের সামাজিক ও মানবিক চেতনার বিকাশ, মক্কা বিজয়, বিদায় হজ এবং রাসূলের ﷺ ওফাতের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'খেলাফতের জন্ম'। রাসূলের ﷺ ওফাতের পর খেলাফত কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রথম খলিফা নির্বাচন কীভাবে সম্পন্ন হয়, এই প্রক্রিয়ায় কী কী সংকট দেখা দেয়, নতুন খলিফা কীভাবে কাজ করতেন, তার রাষ্ট্রপরিচালনা সম্পর্কিত নীতিসমূহ, প্রথম খলিফার ইন্তেকাল, ২য় খলিফার নিয়োগ, খলিফা উমরের (রা.) রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা, ইসলামের বিকাশ ও ব্যাপ্তি, ২য় খলিফার আমলে সামাজিক ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, সাদাসিধে জীবনযাপন এবং উত্তরাধিকার নির্বাচনে ইসলামের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শুরা বা পরামর্শ সভা গঠনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের নাম বিভেদ বিভাজন। এই অধ্যায়ের শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে কেন উসমান (রা.) তৃতীয় খলিফা হওয়ার জন্য বিবেচিত হলেন। হযরত উসমানের (রা.) নানা মানবিক গুণাবলী, তার খেলাফতের শেষ সময়ে সৃষ্ট সংকট, হযরত উসমানের (রা.) শাহাদাত, ৪র্থ খলিফা হিসেবে হযরত আলির (রা.) নিয়োগ, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত আলির (রা.) মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি, হযরত আয়েশার (রা.) এই ইস্যুতে ভূমিকা, উটের যুদ্ধের দুঃখজনক ইতিহাস, খেলাফতের মধ্যে প্রথম বিভাজন এবং হযরত আলির (রা.) শাহাদাত পর্যন্ত ঘটনাগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম উমাইয়াদ যুগ। এই অধ্যায়ে কারবালায় ইমাম হোসেনের (রা.) মর্মান্তিক শাহাদাত, শহিদী চেতনার উদ্ভব, ইয়াজিদের শাসন, খেলাফতের উত্তরাধিকার বিতর্ক, শিয়া জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি ও বিকাশ, উমাইয়াদ যুগের সূচনা, সাম্রাজ্যের বিকাশ, উমাইয়াদ শাসকদের বিলাসিতা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোর উন্নয়ন, আরবি ভাষার ব্যাপকভিত্তিক প্রচলনের ইতিহাস প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম আব্বাসিদ যুগ। এই অধ্যায়ে উমাইয়াদ যুগে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্য, মানুষের অসন্তোষ, একই উম্মতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ, খারিজিদের ইতিহাস, আবু আল আব্বাসের মাধ্যমে রাসূলের ﷺ বংশের হাতে নেতৃত্বকে ফিরিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা, উমাইয়াদের পতন, বাগদাদে মুসলামান সভ্যতার নতুন প্রাণকেন্দ্র স্থাপন, জ্ঞানচর্চার প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে।

৭ম অধ্যায়ের শিরোনাম 'জ্ঞানী, দার্শনিক ও সুফি সাধকদের যুগ।' কীভাবে ইসলামের ভেতরে দার্শনিক চিন্তার প্রয়োজন দেখা দিল, কীভাবে এই ভাবনাগুলো এগুলো, রাসূল ﷺ যেহেতু নেই। তাহলে কুরআনের কোনো আয়াতের বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন হলে কীভাবে তার সুরাহা হবে, হাদিসের উৎপত্তি ও সংরক্ষণ, হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাই প্রক্রিয়া, ইসলামি শরিয়তের উৎস হিসেবে ইজমা ও কিয়াসের ব্যবহার, মাজহাব সৃষ্টি, শিয়া ও সুন্নিদের চিন্তার মধ্যকার পার্থক্যসমূহ, গ্রিক ও অন্যান্য দার্শনিকদের সাথে ইসলামি দার্শনিকদের পার্থক্য, আব্বাসিদ যুগের মুসলিম মনীষী ও দার্শনিকদের কাজের ধরন, সুন্নিদের চার মাজহাবের চার ইমাম নিয়ে আলোচনা, সুফিবাদের উত্থানের কারণ ও ইতিহাস, রাবেয়া বসরি ও ইমাম গাজ্জালির আবির্ভাব, দর্শনশাস্ত্রে ইমাম গাজ্জালির অবদান প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৮ম অধ্যায়ের শিরোনাম 'তুর্কিদের আবির্ভাব ও উত্থান।' এই অধ্যায়ে আগের অধ্যায়ের ধারাবাহিকতায় বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের বিকাশ, উমাইয়াদ বংশের জীবিত প্রতিনিধির হাত দিয়ে আবারও উমাইয়াদ শাসনের প্রতিষ্ঠা, মিসরে ফাতিমাইদদের খেলাফত প্রতিষ্ঠা, ইসলামিক সাম্রাজ্যে একাধিক খেলাফতের কার্যক্রম, একেক খেলাফতের শাসকদের কাজের ধরনের ভিন্নতা, ইসলামিক স্পেন তথা আন্দালুসিয়ার ইতিহাস, মামলুক শ্রেণির উত্থান, সুলতান মাহমুদ গজনভির বিজয়াভিযান, মহাকবি ফেরদৌসি ও শাহনামা, সেলজুকদের আবির্ভাব ও উত্থান, নিজাম-উল-মুলকের আমল, তার কাজের ধরন ও উন্নয়নের চিত্র, হাসান সাবাহ এবং তার আততায়ী গ্রুপের আবির্ভাব ও গুপ্ত হত্যার প্রচলন, শিয়াদের ৫ম ও ৭ম ইমাম নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি ইস্যু আলোচিত হয়েছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

৯ম অধ্যায়ের নাম 'ব্যপক বিপর্যয় ও নৈরাজ্য'। এই অধ্যায়ে অনগ্রসর অবস্থান থেকে ইউরোপিয়ানদের ধারাবাহিক উন্নয়ন, ফিলিস্তিন সংকটের সূচনা ইতিহাস, পোপ আরবানের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের ঘোষণা, মুসলমানদের কিছু রাজ্যের দখল হয়ে যাওয়া, জেরুজালেম দখল এবং খ্রিষ্টান বাহিনীর পৈশাচিকতা, নুরুদ্দিন জঙ্গির আবির্ভাব, সালাহউদ্দিন আইউবীর জেরুজালেম বিজয়, ভেতরে ভেতরে অ্যাসাসিন বা আততায়ী গ্রুপের কার্যক্রম চলমান থাকা, খ্রিষ্টানদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রুসেডের ব্যর্থতা, মঙ্গল হোলকাস্ট, চেঙ্গিজ খানের বাগদাদ দখল ও অমানবিক বর্বরতা, মঙ্গল নেতা হালাকুর বর্বরতা, অ্যাসাসিন গ্রুপের বিনাশ এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

১০ম অধ্যায়ের নাম পুনরুত্থান। তৈমুর লং এর আগ্রাসন, ইবনে তাইমিয়ার আগমন ও ইসলামের পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে অবদান, সুফিবাদের ক্রমাগত বিকাশের মধ্য দিয়ে অসংখ্য শায়খের আবির্ভাব, অন্য ধর্মের সন্ন্যাসতন্ত্রের সাথে ইসলামী সুফিবাদের পার্থক্য, জালাল উদ্দিন রুমি ও শামস-ই-তাবরেজের কর্মকাণ্ড, অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, প্রথম বায়জিদের শাসনকাল, সুলতান মেহমেত ফাতিহ'র ঐতিহাসিক কন্সট্যানটিপোল বিজয়, অটোম্যান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সহাবস্থান, অটোম্যান সাম্রাজ্যের জটিল শাসন পদ্ধতি, অটোম্যানদের দেভশ্রিমে প্রকল্প, সুলতান সুলেমানের অবদান, সাফাভিদ গোষ্ঠীর উত্থান, শিয়াদের গুপ্ত তথা ১২ নং ইমামের ইস্যু, ঐতিহাসিক চালদিরান যুদ্ধ এবং এর প্রভাব, পারস্য সাম্রাজ্যে শিল্পকলার প্রভাব ও অসাধারণ স্থাপত্য শিল্প, জহিরউদ্দিন বাবরের মাধ্যমে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, মোঘলদের ২০০ বছরের সফল শাসন, সম্রাট আকবর ও তার দ্বীন-ই-ইলাহী, সম্রাট শাহজাহান ও তার তাজমহল, সম্রাট আওরঙ্গজেব ও তার সফল রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসসহ বিভিন্ন ইস্যু এই বিশাল অধ্যায়টিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ের নাম ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা। এই অধ্যায়ে পাঠকদের দৃষ্টি নেয়া হয়েছে তৎকালীন ইউরোপের দিকে। মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতি ইউরোপিয়ানদের তীব্র লোভ, ভাংকিংস তথা নৌ অভিযাত্রীদের অভিযান, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজা-রানিরা যেভাবে সমুদ্র অভিযানকে স্পন্সর করতেন, ইতালীয়দের প্রাথমিক সাফল্য, মুসলমান দার্শনিকদের কাজ দিয়ে ইউরোপিয়ানদের শিক্ষিত হয়ে ওঠা, খ্রিষ্টান চার্চগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রোস্টেস্ট্যান্টদের উত্থান ও বিকাশ, মুসলমানদের বহু বছর পর অনেক কিছু আবিষ্কার করেও কেন খ্রিষ্টানেরা মুসলমানদের থেকে এগিয়ে গেল, জাতিরাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভব, ইউরোপিয়ানদের মুদ্রা ও বাণিজ্য কৌশল প্রভৃতি বিষয় এই অধ্যায়ের আলোচনায় ঠাঁই পেয়েছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম পাশ্চাত্যের প্রাচ্যমুখী অভিযান। রাজনীতিবীদ বা যোদ্ধা নয় বরং ব্যবসায়ী হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যে ইউরোপিয়ানদের আগমন, ভাস্কো দা গামার ভারত অভিযান, ভারতের গোয়া নগরীর সৃষ্টি ইতিহাস, অটোম্যানদের লেপান্তো যুদ্ধে পরাজয়, সুলতান সুলেমানের ভিয়েনা বিজয় না করার করুণ পরিণতি, কেন অটোম্যানরা সাম্রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল, অটোম্যান অর্থনীতি ও প্রশাসন কীভাবে ইউরোপিয়ানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল, অটোম্যান সুলতানদের হারেমখানা ও সমাজে নারীদের অবস্থান, সাফাভিদ নামক শিয়া রাষ্ট্র যেভাবে সংকটে পড়ল, মোঘল শাসকদের সংকট, ব্রিটিশদের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশদের উপমহাদেশ শাসনের কৌশল, ইউরোপে ব্রিটিশ ও রাশিয়ার মধ্যকার গ্রেট গেম, উপমহাদেশের সিপাহী বিপ্লব, এ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ইতিহাস, মিসরে মোহাম্মাদ আলির শাসনকাল এবং মিশসর ও আলজেরিয়ার সম্পদগুলোর ফায়দা কীভাবে ইউরোপিয়ানরা ভোগ করল এই বিষয়গুলো এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শিরোনাম সংস্কার আন্দোলন। এই অধ্যায়ে মুসলমান সমাজে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা কীভাবে সৃষ্টি হলো, খ্রিষ্টানদের প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের সাথে মুসলমানদের সংস্কার আন্দোলনের পার্থক্য, ওয়াহাবি মতবাদের জন্ম ও বিস্তৃতি, সৌদি আরবের শাসকগোষ্ঠীর সাথে ওয়াহাবিদের সম্পর্কের সূচনা ইতিহাস, স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, জামালউদ্দিন আফগানির ইসলামি আধুনিকতা তত্ত্বের সূচনা ও বিস্তৃতি, তার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ ও কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুদর্শ অধ্যায়টি হলো শিল্প, সংবিধানতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ। মুসলমান সাম্রাজ্যের উপর ইউরোপিয়ান শিল্প বিপ্লবের প্রভাব, ইউরোপীয় মডেলে বিভিন্ন মুসলিম দেশে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর ইতিহাস, দেশে দেশে সংবিধান তৈরির হিড়িক, জাতীয়তাবাদের প্রভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভাঙ্গন, আমেরিকা রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস, ইহুদিবাদের উত্থান, ফিলিস্তিনের মুসলমান ভূখণ্ডকে ইহুদিদের কব্জা করে নেয়ার ইতিহাস, ইউরোপিয়ানদেরকে অটোম্যানদের একের পর এক ছাড় দেয়ার ঘটনা, আর্মেনিয়ানদের গণহত্যা, তুরস্কে কীভাবে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের চিন্তা খেলাফতের ধারণার বাইরে একটি তুর্কি রাষ্ট্র গঠনের প্রেক্ষাপট তৈরি করল, ব্রিটিশদের পাল্লায় পড়ে মক্কার নেতা শরিফ হোসেইন যেভাবে অটোম্যান সালাতানাতের সাথে বেইমানি করল- এই সবই পাওয়া যাবে এই অধ্যায়ে ।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পঞ্চদশ অধ্যায়ের নাম ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকপন্থিদের উত্থান। এখানে মুসলিম খেলাফতের আনুষ্ঠানিক পতন, তুরস্কে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের ইতিহাস, তার হাত দিয়ে একের পর এক ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলাম বিদ্বেষী পদক্ষেপগ্রহণ, মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষ অনুশীলনের জোয়ার, দেওবন্দিদের প্রতিষ্ঠা, আফগানিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, হাসান আল বান্না কর্তৃক ইখওয়ানুল মুসলিমীন প্রতিষ্ঠা, লিগ অব নেশনস এর প্রতিষ্ঠা, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে বিভক্ত হওয়ার ইতিহাস, মুসলমান দেশগুলোর তেল ও অন্যান্য খণিজ্য সম্পদের নিয়ন্ত্রণ যেভাবে পশ্চিমারা নিয়ে নিল, সুয়েজ খালের কর যেভাবে ইউরোপিয়ানরা ভোগ করল এই সব গুলো বিষয়ই এই অধ্যায়ে আলোচনায় এসেছে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়ের শিরোনাম আধুনিকতার সংকট। এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মুসলমান দেশগুলোর উপর এই যুদ্ধের প্রভাব, দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত, ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম, ইসরাইল নামক ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, মিসরে জামাল আব্দুল নাসের এবং আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান, ইখওয়ান এবং সাইয়্যেদ কুতুবের ওপর নাসের সরকারের দমন পীড়ন প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে।

১৭ তম তথা সর্বশেষ অধ্যায়ের নাম স্রোতের বিপরীতমুখে যাত্রা। এই অধ্যায়ে ইতিহাসের নতুন খেলোয়াড় হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব, জামাল আব্দুল নাসেরের পতন, দেশে দেশে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের সাথে শাসকপক্ষের সংঘাত, ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের সাথে ওয়াহাবিদের বিবাদ, পিএলও ও বাথ পার্টির জন্ম, ইরানে শাহ'র পতন, কোল্ড ওয়ারের কৌশল, তেল রাজনীতির প্রভাব, তেলরাষ্ট্রগুলোর শাসকদের বিলাসিতা, সমাজে বৈষম্য বৃদ্ধি, ইরানে ইমাম খোমিনের বিপ্লব, ধর্মনিরপেক্ষ শাসকমহলের পতন, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, রাশিয়ার আফগান দখলের চেষ্টা, সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত দখল এবং সর্বশেষ আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলায় এসে ইতিহাসের বিবরণী আপাতত সমাপ্ত হয়েছে।

বইটি সংক্রান্তে আলোচনার পর এবার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পালা। আমি এই বইটি লেখার ব্যাপারে আমার অন্তরের কাছের মানুষদের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও উৎসাহ পেয়েছি। তাদের উৎসাহ না পেলে হয়তো এত বড় কাজটা করার মতো সাহস বা ধৈর্য আমার হতো না। বিশেষ করে বলতে হয় আমার স্ত্রী ফারজানা জেরিন এবং আমাদের একমাত্র ছেলে জুহাইর মিহরানের কথা। বইটি অনুবাদের কাজ আমি ৫ মাসে সম্পন্ন করেছি। বইটির সাইজ দেখলে যে কেউ বুঝবেন এই অল্প সময়ে এত বড় বই অনুবাদ করা সহজ নয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তবে আমি এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি কারণ আমার স্ত্রী আমাকে নিরন্তর সমর্থন দিয়ে গেছেন। এই ৫ মাসে সবচেয়ে বেশি আমি বঞ্চিত করেছি আমার স্ত্রী ও সন্তানকে। আশা করি, বইটি হাতে পেলে তারাও সন্তুষ্ট হবেন।

আমার এই কাজটি দেখে সবচেয়ে খুশি হতেন আমার পিতা। তার কথা খুব মনে পড়ছে এখন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে চাইতেন আমি লেখালেখি করি। তারই পরামর্শে আমি একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসেবে চাকরিতে যোগদান করি। পরবর্তী সময়ে আমার সাংবাদিকতার প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আমার অনুপ্রেরণা। আমার কোনো লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে তার উচ্ছ্বাস আমার চোখে এখনো ভাসে। তার জীবনের সর্বশেষ ব্যক্তিগত প্রকল্প ছিল একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা চালু করা। সেই কাজেও তিনি আমাকে সব সময় তার পাশে রেখেছেন। স্বপ্ন দেখতেন সেই কাজটি আমি টেনে নিয়ে যাব। জানি না কতটুকু কি পারব। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন সৎ থাকতে, বলিষ্ঠ থাকতে, ভীতু মানসিকতা নিয়ে না বাঁচতে, অন্যায়ের সাথে আপোষ না করতে, সর্বোপরি সকল ভালো ও মন্দ অবস্থায় আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস রাখতে। আমার এই আমি হয়ে উঠার পেছনে তার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি- এটা আমি অনুভব করি প্রতি মুহূর্তে।

আমার আম্মা, আমার দেখা একজন সরল মানুষ। আমার সকল ভালো কাজে উৎসাহ দেন স বসময়। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমার ভাই-বোন, পরিবার, আমার শ্বশুড়, শাশুড়ি, আমার নানিসহ জীবিত সকল মুরুব্বি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০১৩ সাল থেকে বেকার। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সেই সব শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি যারা এই কয়েক বছর আমাকে অনিয়মিত ধরনের ছোটোখাটো কাজ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে সহযোগিতা করেছেন। হয়তো বেকারত্বের এই দুঃসহ অভিজ্ঞতাটি না হলে আমার কখনো লেখালেখি বা অনুবাদের জগতে আসাই হতো না। আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত এই ফায়সালা আমি সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একমাত্র রিজিকদাতা- যিনি আমার ৫ বছরের বেকার জীবনে একটি বেলাও আমাকে, আমার পরিবারকে না খাইয়ে রাখেননি।

এটা আমার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। মূল বইটিতে কোনো সমস্যা নেই। তারপরও যদি পাঠকের চোখে কোনো অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে সেটা একান্তই আমার ব্যর্থতা। আমি সেই দায় নিতেও রাজি আছি। আমি জানতাম পাঠকেরা সহজ সরল ভাষায় লেখনী আশা করেন। আমি চেষ্টা করেছি। তবে ইতিহাসের বিবরণ,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

চাইলেও খুব সহজ করার সুযোগটা কম। আমার ভালো লাগবে, পাঠকেরা যদি তাদের পরামর্শ বা কোন সংশোধনীর ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশ্যই সেগুলো আমরা পরবর্তী সময়ে সংশোধন করে নেয়ার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ।

পরিশেষে বলতে চাই, কাজটা আমার কিন্তু যেই বইটি বের হচ্ছে তা পাঠকের। এই বইটি পাঠকদেরকে, বিশেষ করে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করতে, চিন্তা করতে পছন্দ করেন- এমন মানুষদের জন্য বিরাট একটি তথ্যের ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে। এই বইয়ের পাতায় পাতায় যেই তথ্য আছে সেগুলো দিয়েই নতুন করে আরও বই লেখা যাবে, অসংখ্য বক্তৃতা দেয়া যাবে, রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এই বইটি আমাদের পাঠকদেরকে পরিণত করবে, সমৃদ্ধ করবে এটা আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি। সেই মানসিকতা নিয়েই বইটি লেখা। আল্লাহ যেন আমাদের সকলের সম্মিলিত এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমিন।

আলী আহমাদ মাবরুর
৬ জানুয়ারি, ২০১৮
amabrur@yahoo.com

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ভূমিকা

আমার জীবনের বড় একটি অংশ কেটেছে আফগানিস্তানে, যেখানে অধিকাংশ মানুষই মুসলমান। তাই ইউরোপ বা আমেরিকার মানুষ ইতিহাসকে যেভাবে চেনে, সেখান থেকে আমি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ইতিহাসকে জানার ও বুঝার সুযোগ পেয়েছি। যদিও আফগানিস্তানের সেই স্মৃতিগুলো আসলে আমার জীবনের একেবারের গোড়ার দিকের কথা। তখন আমার নিজের ভাবনাগুলোই খুব ,একটা পূর্ণতা পায়নি। সেই সময়গুলোতে আমি ইতিহাস পড়তাম মূলত আনন্দ পাওয়ার জন্যই। আফগানিস্তানে তখন স্থানীয়ভাবে ফার্সি ভাষার প্রচলন ছিল বেশি। আর ফার্সি ভাষায় কিছু নির্দিষ্ট পাঠ্যবই ছাড়া তেমন কোনো মানসম্মত ইতিহাসের বই পাওয়াও যেত না। তখনো পর্যন্ত আমি ভালো বই বলতে যা পড়েছি, সেগুলো আসলে ইংরেজিতে লেখা।

ছোটবেলায় আমি ইতিহাসের ওপর যেসব বই পড়েছিলাম, তার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় বই ছিল ভি ভি হিলয়্যারের লেখা 'চাইল্ডস হিস্টোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড'। তবে বড় হয়ে যখন বইটি আমি পুনরায় পড়তে শুরু করি, তখন আর তেমন ভালো লাগেনি। আমার চিন্তাগুলো তখন আগের তুলনায় বেশ পরিণত হওয়ায় বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলাম, ছোটবেলার ইতিহাসের সেই প্রিয় বইটি আসলে ইউরোপীয় মানসিকতায় লেখা। বইটির পাতায় পাতায় বর্ণবাদের কুৎসিত প্রভাবও আমি তখন অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। ছোটবেলায় বইটি পড়ার সময় এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পারিনি। আমার চিন্তা তখন খুব একটা পরিপক্ব ছিল না। তা ছাড়া হিলয়্যারের গল্প বলার ধরনটাও ছিল খুবই হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয়; যা আমাকে খুব অল্পতেই আকর্ষণ করেছিল।

তখন আমার বয়স নয় কি দশ। ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি আমাদের ছোট্ট গ্রামটিতে এসেছিলেন। গ্রামের নাম ছিল লস্করগাঁও। সম্ভবত গ্রামেরই কেউ তখন তাঁকে আমার কথা বলেছিল। কেউ হয়তো বলেছিল এই গ্রামে একটি ছোট্ট ছেলে আছে, যার ইতিহাস নিয়ে বেশ আগ্রহ আছে। এই কথা শুনে টয়েনবি আমাকে তাঁর সাথে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। আমি সানন্দে আমন্ত্রণ কবুল করে তার কাছে যাই এবং মুগ্ধ নয়নে ব্রিটিশ সেই বৃদ্ধের সাথে কিছুটা সময় কাটাই। তিনি আমাকে ছোটখাটো কিছু প্রশ্ন করছিলেন, আর আমিও দিব্যি আমার মতো করে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাঁর একটি অভ্যাসের কথা এখনো আমার মনে পড়ে। তিনি কথা বলার সময় রুমাল কাঁধের ওপর রেখে বসতেন।

বিদায়বেলায় টয়েনবি আমাকে একটি বই উপহার দিয়েছিলেন। বইটি হেনড্রিক উইলেম ভ্যান লুনের লেখা 'দ্যা স্টোরি অফ ম্যানকাইন্ড'। বইটির নামই আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছিল। যেহেতু বইটির নাম ছিল ম্যানকাইন্ড

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

(মানুষ বা মানবতা), তাই আমি ধরেই নিয়েছিলাম বইটিতে নিশ্চয় আমার মতো অনেক মানুষের ইতিহাস থাকবে। হয়তো আমি নিজেকে বইয়ের মাঝে কোনো না কোনোভাবে খুঁজে পাব। আমি গোগ্রাসে বইটি গিলছিলাম। বইটি যে শুধু পড়তে ভালো লেগেছিল এমন নয়; বরং ইতিহাসের গল্পকে পশ্চিমা ঢংয়ে বর্ণনা করার টেকনিকটাও বেশ ভালো লেগেছিল। পশ্চিমা আদলে ইতিহাসকে বর্ণনা করার ব্যাপারটা সেখান থেকেই আমার ভেতরে গেঁথে যায়।

এরপর থেকে আমি ইতিহাসের যত বই পড়েছি, তার সবই আসলে এই কাঠামোর নতুন নির্যাস মাত্র। আমি ফার্সি ভাষায় লেখা ইতিহাসের পাঠ্যবইও পড়েছি। তবে তা ছিল শুধুই পরীক্ষায় পাস করার জন্য। এগুলো স্রেফ একাডেমিক কারণে পড়তাম। পরীক্ষার পরে আবার ভুলে যেতাম।

সেই ভালো লাগার ঢংয়ের বাইরে গিয়ে অন্য কোনোভাবে ইতিহাসের বর্ণনা আমাকে টানত না। নিজের পছন্দের বাইরের অন্য ধরনের ইতিহাসের বই আমার ওপর খুব একটা কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারেনি। এজন্য জীবনের পরবর্তী সময়ে আমাকে বেশকিছু ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। এমন একটি অভিজ্ঞতা এখানে শেয়ার করাটা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করছি।

টয়েনবির সাথে আমার সাক্ষাতের ৪০ বছর পরে ২০০০ সালের কথা। তখন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেক্সট বুক এডিটর হিসেবে পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনার কাজ করতাম। তখন আবার সেই পুরাতন ইতিহাস অধ্যয়নের প্রভাব আমার ভেতর নতুন করে জেগে ওঠেছিল। টেক্সাসের একজন প্রকাশক সেই সময়ে আমাকে তার স্কুলের জন্য বিশ্ব ইতিহাসের নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। উনার প্রত্যাশা ছিল আমি একেবারে মানব ইতিহাসের সূচনা থেকেই ইতিহাস বর্ণনা শুরু করব। প্রাথমিকভাবে আমার কাজ ছিল একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করা, যার ওপর ভিত্তি করে আসলে গোটা মানব ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া সম্ভব। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য ঐ প্রকাশক আমাকে বইটি ১০টি ভাগে ভাগ করার পরামর্শ দিয়েছিল, যার প্রতিটি ভাগে তিনটি করে অধ্যায় থাকবে।

কিন্তু মানব ইতিহাসের গোটা সময়টাকে কি আদৌ ১০টি ভাগে বর্ণনা করা সম্ভব? বিশ্ব ইতিহাস মানে কেবল আজ-অবধি ঘটে যাওয়া সকল ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণই নয়; একইসাথে সেসব ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা, যেগুলো আসলে ইতিহাসের টার্নিং পয়েন্টের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

আমি বেশ উৎসাহ নিয়েই কাজে নেমে পড়েছিলাম। তবে আমার যেকোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অনেকজন উপদেষ্টা, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, ইতিহাসের শিক্ষক, বিপণন কর্মকর্তা, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা কর্মকর্তা, পেশাদার বুদ্ধিজীবীর অনুমোদনের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দরকার হতো। আর প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শ্রেণির বই রচনার ক্ষেত্রে এই বাছাই ও অনুমোদনের প্রক্রিয়াকে আমার কাছে বেশ স্বাভাবিকই মনে হয়। কারণ, এই বইগুলো আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বইগুলোর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এমন ইতিহাস পৌঁছে দেয়া হয়, যেগুলোর ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই। তাই বইগুলোর প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের ঐকমত্যে আসাটা জরুরি ছিল।

কাজটা নিয়ে আরও কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর লক্ষ্য করলাম নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে আমার দ্বিমত হচ্ছে। আমরা ইতিহাসের অনেক বিষয়েই একমত হতাম; কেবল একটি বিষয় ছাড়া। আমি সব সময়ই চাইতাম, বিশ্ব ইতিহাসের মধ্যে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাবলিকে বেশি ফোকাস করতে। আর তারা চাইত, ইসলামি বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য কোনো ঘটনাবলি নিয়ে কাজ করতে। আমরা তখন যারা একসাথে কাজ করেছি, তাদের কেউই আসলে নিজেদের স্বজাতীয় ইতিহাস ও সভ্যতাকে নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতাম না। এমন না আমি ইসলামকে পশ্চিমাদের ইতিহাসের থেকে বড় করে দেখাতে চাইতাম বা বিপরীতে তারা ইসলামকে ছোট করে দেখাত। আমাদের ব্যবধান বা দ্বিমতটি ছিল আসলে মানসিকতায় ও চেতনায়। যেহেতু আমরা সবাই বিশ্ব ইতিহাস রচনার কাজে নিয়োজিত ছিলাম, তাই আমরা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করতাম, যার যার পছন্দের আদর্শ মানব ইতিহাসের সাথে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে জড়িত।

আমি মুসলমান হওয়ায় সেখানে ছিলাম সংখ্যালঘু। তাই আমি যা বলতাম সেটা শেষ পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হিসেবেই প্রমাণ হতো। সে কারণেই শেষ পর্যন্ত আমরা যে পাঠ্যসূচিটি দাঁড় করাতে সক্ষম হলাম, সেখানে অন্য বিশেষজ্ঞদের চিন্তাই বেশি প্রতিফলিত হলো। দেখা গেল বইটিতে যে ৩০টি অধ্যায় রয়েছে, তার মাত্র দুটিতে ইসলাম মুখ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। দুটো অধ্যায়ের নাম ছিল 'প্রি কলোম্বিয়ান সিভিলাইজেশনস অব দ্য অ্যামেরিকাস' এবং 'অ্যানশাইন্ট এমপায়ার্স অব আফ্রিকা।'

যদিও সে সময়ের আলোকে ইসলামের এতটুকু কভারেজ পাওয়াও বিরাট ব্যাপার ছিল। এর আগে টেক্সাসের স্কুলগুলোতে বিশ্ব ইতিহাসের ওপর যে বইটি ছিল, সেটা ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তার মানে আমার কাজটার ৩ বছর আগে। বইটির নাম 'পার্সপেক্টিভ অন দ্য পাস্ট'। যেখানে ৩৭টি অধ্যায়ের মধ্যে ইসলাম আলোচিত হয়েছিল মাত্র একটি অধ্যায়ে; তাও পুরো অধ্যায় জুড়ে ইসলাম ছিল না। অর্ধেক ছিল ইসলাম সম্পর্কিত আর বাকি অর্ধেক ছিল মধ্যযুগ সম্পর্কিত।

সেপ্টেম্বর ২০০১ এর বছর খানেক আগে সেই বইটি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে বুঝতে পারলাম, তাদের কাছে ইসলাম খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু, যার আবেদন রেনেসাঁ বা শিল্প

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিপ্লবের বহু আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাদের প্রকাশিত বইটির তথ্যসূচি দেখলে আপনার মনেই হবে না যে, পৃথিবীতে ইসলাম বলতে আদৌ কিছু অবশিষ্ট আছে।

একটা পর্যায়ে মানসিকভাবে ধরে নিলাম আমার ইতিহাসের ধারণায় কিছুটা ঘাটতি আছে। ঘাটতি থাকা খুব অস্বাভাবিকও নয়। একেবারে ব্যক্তিগত সত্তা তথা পরিচয়ের জায়গা থেকেই ইসলামের সাথে আমি সম্পৃক্ত। তাই ইসলামের প্রতি একটু বাড়তি আনুকূল্য থাকায়, সার্বিক ইতিহাস মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমি নিরপেক্ষ থাকতে পারি না।

আমি একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে জন্ম নিয়েছি বলেই ইসলামের প্রতি আমার এই টান-বিষয়টা এমন ছিল না। পারিবারিকভাবেও বিষয়টার আলাদা কিছু তাৎপর্য আছে। আফগানিস্তানে আমার পরিবারের একটু আলাদা সম্মান আছে। এই সম্মানের মূল কারণ, ধর্ম সম্পর্কে আমাদের পরিবারের পূর্বসূরিদের অগাধ জানাশোনা। আমার নামের শেষাংশ হলো 'আনসারি'। এই শব্দটি এসেছে 'আনসার' থেকে। এই আনসার হলো মদিনার সেই আনসার, যারা প্রিয় নবি ﷺ-কে মক্কার কাফের-মুশরিকদের চতুর্মুখি ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়ে মদিনায় আবাসন গড়তে সাহায্য করেছিলেন। আনসারদের সেই সহযোগিতার মাধ্যমেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন।

আমার দাদার প্রপিতামহ ছিলেন একজন মুসলিম দরবেশ। তাঁর ওফাতের পর সেখানে একটি দরগা শরিফ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে শুরু করে আজ অবধি অসংখ্য মানুষ ভিড় করে সেখানে। তবে আমার পূর্বসূরিদের সেই গৌরবোজ্জ্বল কর্মধারা আমার পিতার সময় থেকে কমতে শুরু করে। আর আমার বেলায় এসে তা একেবারেই ম্লান হয়ে যায়। বড় হতে হতে আমি মুসলমানদের যেসব গল্প, কাহিনি ও নিরীক্ষা শুনতে পেলাম, তা আমার মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করে এবং একটা পর্যায়ে আমি মানসিকভাবে অনেকটা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার পরও আমার ভেতরের এই ধর্মনিরপেক্ষতা বিদ্যমান থাকে। তবে মজার ব্যাপার হলো, মুসলিম দেশে থাকার পরও আমার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ যতটা না ছিল, আমেরিকায় আসার পর তা অনেকটা বেড়ে যায়। বিশেষ করে ১৯৭৯ সালের পর ইসলাম সম্পর্কে আমি গভীরভাবে জানার তাগিদ অনুভব করি। কারণ, সে বছরই আমার এক ভাই চরমপন্থার সাথে যুক্ত হয়। আমি বিভিন্ন মুসলিম দার্শনিকের লেখনীর মাধ্যমে ইসলামকে বুঝতে শুরু করি। বিশেষ করে ফজলুর রহমান এবং সাইদ হুসেইন নাসেরের বই ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন শুরু করি। একই সঙ্গে আমি আর্নেস্ট গ্রুনেবাম এবং আলবার্ট হোরানির মতো ইতিহাসবেত্তাদের বইও পড়া আরম্ভ করি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সেই সময়ের ব্যাপক পড়াশোনার কারণ ছিল আমার সেই ভাই। আমি আসলে জানতে চেয়েছিলাম, আমি বা আমার ভাইয়ের অতীত ইতিহাসটি আসলে কী? আমরা কোথা থেকে আজকের এই অবস্থানে এলাম? কিংবা এমন কী হয়ে গেল যে, আমার ভাই হঠাৎ করে উগ্রপন্থায় আগ্রহী হয়ে ওঠল?

আমার এই মানসিকতায় ও বক্তব্যে কারও মনে হতে পারে, আমি হয়তো ইসলামকে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছি। তবে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি কি মূলত অবজেকটিভ ভিত্তিক? ওপরে দেয়া এই ৬টি ম্যাপ দেখুন। ৬টি পৃথক সময়ে মুসলিম বিশ্বকে দেখানো হয়েছে।

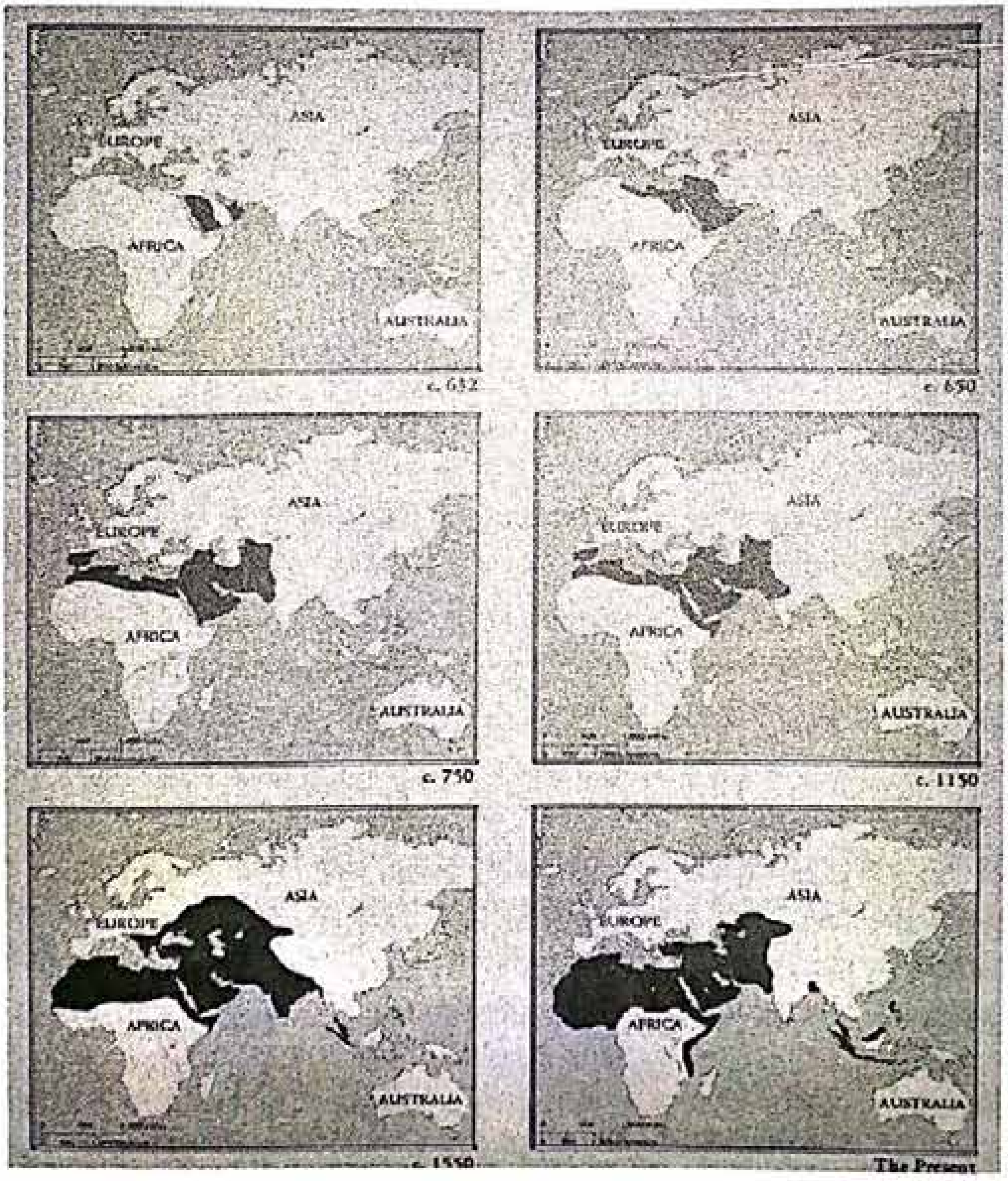

ইসলামের প্রসার

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

'মুসলিম বিশ্ব' শব্দ দুটির মাধ্যমে এমন জায়গাগুলোকে বুঝাতে চাচ্ছি, যেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা যে দেশগুলোর শাসক মুসলমান। অবশ্যই ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের কমবেশি সব জায়গাতেই মুসলমানরা বসবাস করছেন। তাই বলে এসব দেশকে 'মুসলিম বিশ্ব' দাবি করা মোটেই উচিত হবে না।

তবে আমি মুসলিম বিশ্ব বলে যা দাবি করছি, তা নিয়েও কিছু প্রশ্ন আসতে পারে। যেমন, এই মুসলিম বিশ্বটি কি ভৌগোলিকভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একই রকম ছিল? মুসলিম বিশ্ব ইতঃপূর্বে এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। আবার ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ার একটি বড় অংশ সেই আওতার বাইরেও ছিল। যদিও ইউরোপ আর আমেরিকাকে যুক্ত করলেও যত বড় অঞ্চল হবে, এক সময় তার চেয়েও অনেক বড় অঞ্চল মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

অতীতে মুসলিম বিশ্বের এই গোটা এলাকাটি একটি একক রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় ছিল। অনেক মুসলমানের চোখে মুখে এখনো সেই দৃশ্যপটই ভাসে। আবারও ওপরের ম্যাপগুলো দেখুন। কেউ কি এই ম্যাপগুলো দেখলে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে অস্বীকার করতে পারবেন? এমনকি ৯/১১-এর মতো ঘটনা ঘটার পরে ইসলামের ওপর সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বজুড়ে যে দমন নিপীড়ন চলছে, এরপরও কি কেউ ইসলামের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে স্বীকার না করে পারবেন?

৯/১১-এর পর অনেক কিছুই আসলে পাল্টে গেছে। পশ্চিমা বিশ্বের অমুসলিম নাগরিকরাও এখন ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেছে। বিশেষ করে ইসলাম আসলে কেমন, মুসলমানদের আগের প্রজন্মের ইতিহাস, অতীতের সেই বিশাল মুসলিম বিশ্ব কেমন ছিল- এসব নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে। একই ধরনের কৌতূহল আমাকেও তখন গ্রাস করে। ৩৮ বছর পর সে বছরই আমি প্রথম আফগানিস্তান ও পাকিস্তান ভ্রমণ করি। সেই সফরে আমি সাথে নিয়েছিলাম 'ইসলাম ইন মডার্ন হিস্টোরি' নামক একটি বই। বইটি আমি লন্ডনের একটি লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। বইটি লিখেছিলেন উইলফ্রেড ক্যান্ডওয়েল স্মিথ নামে এক ভদ্রলোক, যিনি ম্যাকগিল এবং হার্ভাডে ধর্ম বিভাগের অধ্যাপক। স্মিথ এই বইটি লিখেছিলেন ১৯৫৭ সালে। মডার্ন হিস্টোরি বলতে তিনি বইটিতে যা বলেছেন, তাও প্রায় ৪০ বছর আগের ব্যাপার। তারপরও তার পর্যবেক্ষণগুলো আমাকে বেশ আকৃষ্ট করে। আমাকে বেশ আলোড়িত করে। ২০০২ সাল থেকে আমি আবার ইতিহাসের সেই অধ্যায়গুলোকে নতুনভাবে উন্মোচন করার চেষ্টা শুরু করি।

স্মিথের সেই বইটি আমার সামনে নতুন এক পৃথিবীর দুয়ার খুলে দিল। আমি শৈশব থেকে ইতিহাসের ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ করতাম; বই পড়ার যে স্টাইলটা ফলো করতাম, স্মিথের বইটি তাতেও বেশ পরিবর্তন নিয়ে এল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কাবুলে আমি যখন স্কুলে পড়তাম, একজন মানুষের কথা খুব শুনতাম। তার নাম সাইয়্যেদ জামালুদ্দিন আফগানি। অনেকের মতো আমিও তখন মনে করতাম, তিনি ইসলামের আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম শীর্ষ ও সফল ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সত্যি কথা কি, আমি কখনো এটা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করিনি কীভাবে তিনি এত বড় একজন মানবে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি তার জীবনে ইসলামের একটি সাদামাটা রূপ নিয়েই কাজ করেছেন, যাকে প্যান-ইসলামিজম হিসেবে অভিহিত করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে ইসলাম সম্পর্কে তার ব্যাখ্যাটি ইসলামের মলিন একটি চেহারা বলেই মনে হয়। কারণ, তার ব্যাখ্যা করা ইসলাম অনেক বেশি জাতীয়তাবাদকে ধারণ করে। স্মিথের বইটি পড়ার পরে আমি 'ইসলামিজম' তথা ইসলামের রাজনৈতিক রূপটি সম্পর্কে জানতে পারি। আর আমি যখন এই 'ইসলামিজম' শব্দটির সাথে পরিচিত হলাম ২০০১ সালে। ঘটনাচক্রে এই 'ইসলামিজম' শব্দটিই তখন বিশ্বজুড়েই প্রবলভাবে আলোচিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ মজার ব্যাপার হলো, এরও প্রায় ১০০ বছর আগে কাল মার্কস এই 'ইসলামিজম' সম্পর্কে বলে গেছেন। মুসলমান হওয়ার পরও আমার কাছে অপরিচিত থাকলেও 'ইসলামিজম' শব্দটি অমুসলিমদের কাছে খুব একটা অজানা ছিল না।

এহেন পরিস্থিতিতে আমি মুসলমানদের ইতিহাসকে আরও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করি। এখন আর শুধু নিজের অতীত পরিচয়কে অনুসন্ধান করাই আমার উদ্দেশ্য নয়। চারপাশের মুসলমানদের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে বিশাল পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছিলাম। এই পরিবর্তনের কারণ ও শেকড় অনুসন্ধান করাই আমার ইতিহাস অধ্যয়নের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। বিশেষ করে আফগানিস্তানের ভয়ংকর ঘটনাগুলো, ইরানের ঘটনাপ্রবাহ, আলেজেরিয়ার বিদ্রোহ, মধ্যপ্রাচ্যে হামলা ও আত্মঘাতি বোমা হামলার ঘটনা আর সর্বশেষ তালেবানদের উত্থান- এসব ঘটনা আমাকে ব্যাপকভাবে ভাবিয়ে তোলে। আমি অনুভব করি, আমাদের মুসলমানদের ইতিহাসের সেই পাঠ উদ্ধার করতে হবে, যার মাধ্যমে বুঝা যায় কোথা থেকে শুরু হয়ে ইসলাম ও মুসলমানরা আজকের এই জায়গায় এসে পৌছাল।

ধীরে ধীরে চলমান বিশ্বের নানা ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করতে শুরু করলাম। আমেরিকা বা ফ্রান্সের মতো পৃথিবীব্যাপী মুসলিম জগতের ইতিহাসগুলো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। আর মুসলমানদের কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উপাখ্যানও নেই। অথচ মুসলমানদের ইতিহাস এতটাই বিস্তৃত ও ব্যাপক যে, শুধু এটা দিয়েই পৃথক একটি বিশ্ব ইতিহাস দাঁড় করানো যায়। আমি বেশ অনুধাবন করতে পারছিলাম, বছর কয়েক আগে ট্রেক্সাসের ঐ প্রকাশক আমাকে যে কাজটি করতে বলেছিলেন কিংবা ম্যাকডোগাল লিটেল যে বইটি প্রকাশ করেছিলেন, তা আসলে ইসলামের সেই ইতিহাস, যা আমি আমার অবচেতন মনে এতগুলো বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আসলে 'বিশ্ব ইতিহাস' বা 'ইসলামের ইতিহাস' যে নামেই এদেরকে আলাদা করি না কেন, তার সূত্রপাত কিন্তু একই জায়গায়; প্রাচীন ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর দুই প্রান্তে। সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমা জগৎ ও মুসলিম জগৎ বর্তমানের এই কঠিন সময়ে এসে দাঁড়িয়ে এখনো নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। এই লড়াইয়ের জায়গার বাইরে আবার উভয়ের মধ্যে কাঠামোগত কিছু অদ্ভুত সাদৃশ্য বা মিলও আমাদের চোখে ধরা পড়ে। পশ্চিমা বিশ্বের ঐতিহাসিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই অন্যসব কিছুকে ছাপিয়ে একটি রাষ্ট্র কাঠামোই তাদের কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। আর সে রাষ্ট্র কাঠামো হলো রোমান সাম্রাজ্য; যেখান থেকে আসলে বিশ্বজনীন রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো ধারণার সূত্রপাত ঘটে। অন্যদিকে, মুসলিম বিশ্বকেও আপনি যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেন না কেন, সেখানেও একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর তীব্র প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য সেটি রোমান সাম্রাজ্য নয়, বরং সেটি হলো খেলাফত।

পশ্চিমা এবং মুসলিম জগতের এই প্রাথমিক রাষ্ট্র কাঠামোটি গোটা ইতিহাসের বিচারে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই দুটো রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য আসলে বেশ দ্রুততম সময়ে অনেক বড় হয়ে ওঠেছিল। উত্তরের যাযাবর বর্বর সম্প্রদায়ের কারণে রোমানদের সাম্রাজ্য হুমকির মুখে পড়ে। আর ইসলামি রাষ্ট্রেও উত্তরের হুমকি ছিল, তবে সেই হুমকি আসলে এশিয়ার মধ্যাঞ্চল থেকেই সৃষ্টি হয়। রোমান সাম্রাজ্য জার্মান জাতির কারণে পতনের মুখে পড়লেও ইসলামি রাষ্ট্রের সেই আদি কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয় তুর্কিদের আগ্রাসনের কারণে। উভয় সাম্রাজ্যই বহিঃশত্রুদের আঘাতে ভেঙে যায় এবং তার মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অন্যদিকে, এই ভাঙন বা বিভাজনের ফলে নতুন করে ধর্মীয় একটি মেরুকরণও হয়। পশ্চিমাতে ছড়িয়ে পড়ে ক্যাথলিক মতাদর্শ আর অন্যদিকে মুসলিম জগতের পূর্বাঞ্চলের কোলে সুন্নি মতাদর্শ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়।

বিশ্ব ইতিহাস মানেই হলো, কীভাবে আমরা এখানে আজকের এই অবস্থানে এলাম-সেই আলোচনার একটি গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ। তাই আপনি 'আমরা' বলতে কাকে বুঝাচ্ছেন বা 'বর্তমান অবস্থান' বলতেইবা কী বুঝানো হচ্ছে- তা নিরুপণ করা অত্যন্ত জরুরি। পশ্চিমা বিশ্ব 'আজকের এই অবস্থান' কথাটি দিয়ে মূলত মোটাদাগে শিল্প বিপ্লব পরবর্তী গণতন্ত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থাকেই বুঝিয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'বর্তমান পরিস্থিতি' বলতে আরেকটু ব্যাপক কিছু বুঝানো হয়। আমেরিকায় 'সাম্প্রতিক পরিস্থিতি' বলতে শিল্প বিপ্লব তো বটেই, তার পাশাপাশি তার নিজেদের স্বাধীনতা, জাতি হিসেবে আমেরিকানদের প্রতিষ্ঠা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মূল দুই ভিত্তি তথা স্বাধীনতা ও সাম্যকেও বুঝানো হয়। সেই সাথে কীভাবে সাধারণ একটি জাতিরাষ্ট্র থেকে আমেরিকা বিশ্বের অন্যতম সুপার পাওয়ারে পরিণত হলো, সেই আলোচনাটিও ইতিহাসের পর্যালোচনায় তারা সামনে নিয়ে আসতে চায়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আমরা এসব আলোচনা থেকে আরও বুঝতে পারি, বেশিরভাগ জাতি একই লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও সবাই একই গন্তব্যে পৌছতে পারে না। কেউ হয়তো দেরিতে শুরু করে বলে পিছিয়ে যায়, কেউ বা খুব ধীরগতিতে আগানোর জন্য পিছিয়ে পড়ে। আর এই ধরনের পিছিয়ে পড়া জাতিগুলোকেই আমরা 'উন্নয়নশীল রাষ্ট্র' হিসেবে অভিহিত করে থাকি।

আমরা যদি পশ্চিমা জগতের শিল্প বিপ্লব পরবর্তী গণতন্ত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ইতিহাসকে এখনো পর্যন্ত যাত্রাপথের শেষ পয়েন্ট হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে সেই ইতিহাস বর্ণনার কিছু ধাপ আমাদের সামনে আসবে। সেগুলো হলো :

১. সভ্যতার জন্ম (মিসর ও মেসোপটেমিয়া সভ্যতা)
২. ক্ল্যাসিক্যাল এইজ বা চিরায়ত যুগ (গ্রিস এবং রোম)
৩. দ্যা ডার্ক এইজ বা অন্ধকার যুগ (খ্রিষ্টানতত্ত্বের উত্থান)
৪. দ্যা রিবার্থ বা পুনর্জন্ম: রেনেসাঁ এবং রিফর্মেশন (সংস্কার)
৫. দ্যা অ্যানলাইটমেন্ট (নতুন নতুন আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রা)
৬. দ্যা রিভোলিউশনস বা বিপ্লব (গণতান্ত্রিক, শিল্প ও বিজ্ঞান ভিত্তিক)
৭. রাইজ অফ নেশন স্টেটস বা জাতিরাষ্ট্রের উত্থান
৮. প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
৯. দ্যা কোল্ড ওয়ার
১০. গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের জয়জয়কার

যদি আমরা ইসলামের আলোকে বিশ্ব ইতিহাসকে পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা কী দেখব? আমরা ইসলামের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে যদি পশ্চিমাদের মতোই উপরোক্ত পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করে তাদের দেখানো পথেই শেষ করি, তাহলে তা মোটেও সঠিক ইতিহাস হবে না। কারণ, আমাদের শুরু আর শেষের সংজ্ঞা তাদের থেকে পুরোই আলাদা। ইসলামের দৃষ্টিতে শুরুর পয়েন্ট পশ্চিমাদের দেখানো শুরু থেকে আলাদা। ইসলামের পাঠে 'জিরো (০)' শুরু হয় প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিজরতের সময় থেকে। এসময় তিনি মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসেন। সেদিন থেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের নতুন (অতীতেও ছিল) অভিযাত্রা শুরু হয়।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে এসে দেখা যাচ্ছে, অনেক কিছুই আর আগের মতো করে হচ্ছে না। খ্রিষ্টান বা মুসলমান সম্প্রদায় অতীতে যেভাবে সাম্রাজ্য বিস্তার করত, এখন আর সেভাবে সাম্রাজ্য প্রসারণের কাজটিও হচ্ছে না। বরং এই সম্প্রদায়গুলোর নিজেদের মধ্যেই নানা ধরনের টানাপোড়েন বা সংশয়ের জন্ম হয়েছে। আমাদেরকে মুসলমানদের ইতিহাস এমনভাবে চেনানো হয়েছে, যেখানে আমরা বিজয়ের নয়;

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বরং বারবার পরাজয়ের গল্পই শুনেছি। আমরা এখনো একটা বড় সংশয়ের মধ্যে ডুবে আছি। আমরা কি ইতিহাসের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য 'সভ্যতা' সম্পর্কে আমাদের ধারণাটিকেই পাল্টে ফেলব, নাকি ইতিহাসের প্রচলিত গতিপথের সাথে লড়াই করে নিজেদের মতো করে সভ্যতার একটি নতুন সংজ্ঞা দাঁড় করাব?

বর্তমানের এই দোদুল্যমনতাকে যদি আমরা মুসলমানদের সর্বশেষ সাম্প্রতিক অবস্থান মনে করে মুসলিম ইতিহাসের আদ্যোপ্রান্ত রচনা করতে শুরু করি, তাহলে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো আমাদের সামনে আসবে।

১. প্রাচীন সময় (মেসোপটেমিয়া ও পার্সিয়া)
২. ইসলামের প্রাথমিক যুগ
৩. খেলাফত : বিশ্বজনীন একক সাম্রাজ্যের সন্ধান
৪. বিভক্তি : সুলতানি আমল
৫. বিপর্যয় : ক্রুসেডার্স এবং মঙ্গল
৬. পুনর্জন্ম : তিনটি বড় সাম্রাজ্য
৭. পশ্চিমাদের প্রাচ্য আগ্রাসন
৮. সংস্কার আন্দোলন
৯. আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষবাদের উত্থান
১০. ইসলামপন্থীদের প্রতিক্রিয়া

বিশ্বখ্যাত সাহিত্য সমালোচক এডওয়ার্ড সাইদ দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, পশ্চিমারা ইসলাম সম্বন্ধে 'প্রাচ্য' নামের একটি কল্পিত জগৎ সৃষ্টি করেছে। যেখানে ইসলাপন্থীদের ভিন্নতাকে প্রতিহিংসা বা পরশ্রীকাতরতার মোড়কে দেখানো হয়েছে। ইসলামের সমৃদ্ধ অতীতকে ক্ষয়িষ্ণু হিসেবেও পরিচিত করা হয়েছে।

একথা ঠিক যে, ইসলামকে একটি ভিন্ন ও কল্পিত আকারে পশ্চিমাদের সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল, যার মধ্যে অনেক কিছুই সত্যের তুলনায় কম বা বেশি ছিল। পশ্চিমারা কী করল কিংবা তারা ইসলামকে কীভাবে সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে দেখালো তার তুলনায় আমার কাছে যেটা বড় প্রশ্ন সেটা হলো, আমরা নিজেরাই কি আজ পর্যন্ত ইসলামের সঠিক ও সত্য কোনো ইমেজ দাঁড় করাতে পেরেছি? ছোট্ট একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতায়নের ব্যাপারটি ঘটেছিল ইসলামের ৩টি সাম্রাজ্যে। কিন্তু মুসলমানরা সেই গৌরবময় ইতিহাসের কতটুকুইবা জানে!

আমাদের দুটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা বুঝতে হবে। পশ্চিমা এবং ইসলামিক যুগের ইতিহাস। এই দুইটি যুগ আসলে একে অন্যকে কতটা স্বীকৃতি দেয় বা কতটা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে, এটা পর্যালোচনা করাটাও জরুরি। ইতিহাস পর্যালোচনা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

করলে দেখা যায়, পশ্চিমা বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্ব সব সময়ই যেন দুটো ভিন্ন পৃথিবী ছিল। তাদের প্রত্যেকের ইতিহাসেই নিজেদের মতো করে কিছু বিষয় ছিল। এরা উভয়ই মানব ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার চেষ্টাও করেছে। ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত এই দুটি ধারার গতি প্রকৃতিও ভিন্ন ছিল। ১৭শ শতাব্দীতে এসে যখন পশ্চিমারা শক্তিশালী হয়ে মুসলমানদের অর্জনগুলোকে গায়ের জোড়ে কেড়ে নিতে চেষ্টা করে, তখন থেকেই আসলে ইতিহাসের নতুন সংকটের সূত্রপাত হয়।

ইতিহাসকে আসলে কখনোই দমিয়ে রাখা যায় না। এটা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবেই। আপনি যখন ঝঞ্ঝামুখর বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকাবেন, বিশেষ করে যখন কাশ্মীর, ইরাক, চেচনিয়া, বলকান, ইসরাইল বা ফিলিস্তিন নিয়ে ভাববেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন প্রাচীরের ওপার থেকে আবার নতুন কিছু একটা বের হয়ে আসতে চাইছে। আপনি বুঝে যাবেন, এই জায়গাগুলোকে আসলে কৌশলে বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে ফেলা হলেও তা এখনো মরেনি বরং ক্ষণে ক্ষণে মাথা বের করে বাঁচার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

আর ইতিহাসের সেই কম চর্চিত গল্পগুলোই আমি এই বইটির পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে বলব। 'ডেসটিনি ডিজরাপটেড' নামের এই বইটি কোনো পাঠ্যবই নয়, আবার কোনো গবেষণা গ্রন্থও নয়। এটা অনেকটা গল্পের মতো। ধরুন, আপনি একটি কফি শপে আমার কাছে প্রচলিত বিশ্ব ইতিহাসের সমান্তরাল আরেকটি ইতিহাস জানতে চাইলেন। তখন আমি যা বলব, তা হয়তো অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সারিসারি সাজানো বইতে ঠিকই লুকানো আছে। যদি আপনি একাডেমিক ভাষায় বা ফুটনোট দিয়ে তথ্যাদি জানতে চান, তাহলে সেই বইগুলোই পড়তে পারেন। আর যদি গল্প আকারে পড়তে চান, তাহলে আমার এই বইটি পড়তে পারেন। আমি কোনো স্কলার বা প্রচলিত ধারার শিক্ষাবিদ নই। আমি এই বইটিতে তাই সন্নিবেশিত করেছি যা অসংখ্য স্কলাররা ইতিহাসের নানা উপকরণ থেকে হেঁটে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেছেন। আবার একই সঙ্গে আমি এখানে অসংখ্য গবেষকের গবেষণালব্ধ তথ্যাবলিও সংযোজন করার চেষ্টা করেছি।

ইতিহাস এমন একটি বিষয়, যা কয়েক হাজার বছরের উপাখ্যানকে বিবৃত করে। তবে সব ঘটনা বা সব যুগকে সমানভাবে আলোচনায় নিয়ে আসা সম্ভবও নয়। আমি মূলত প্রিয়নবি ﷺ এবং তাঁর পরবর্তী চার খলিফার যুগকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছি। কারণ, ইসলামের একটি মৌলিক বিবরণ এখান থেকেই দাঁড় করানো সম্ভব। আমি সেই সময়ের ঘটনাবলিকে মানুষের স্বাভাবিক নাটকীয় দৃশ্যপট হিসেবেই দেখাতে চেয়েছি। কারণ, মুসলমানরাও সেই সময়ের ঘটনাগুলোকে সেভাবেই জানে। এই সময়গুলোতে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা অমুসলিমরাও বর্ণনা করেছেন। তবে মুসলমানরা সাধারণত মুসলমান ঐতিহাসিকদের বর্ণনাকেই বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন। আমি মূলত এই বইটিতে মুসলমানরা যা ধারণা করে,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তা-ই উপস্থাপন করতে চেয়েছি। কারণ, মুসলমান সমাজে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই ধারণাগুলোই বারবার মুসলমানদেরকে আলোড়িত করেছে এবং বিশ্ব ইতিহাসে তাদের ভূমিকাও সেভাবেই আবর্তিত হয়েছে।

এইখানে আরেকটি বিষয়কে আমি গুরুত্ব দিতে চাই। তা হলো ইসলামের যেকোনো বিষয়ের মূল বা শিকড়ের বিশ্বাসযোগ্যতা। অন্যান্য ধর্ম, যেমন ইহুদিবাদ, বৌদ্ধ, হিন্দু এমনকি খ্রিষ্টানদের মতো করে ইসলামের তথ্যগুলো আসেনি। মুসলমানরা যেকোনো ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই তা সংগ্রহ করত, মুখস্থ করত, আবৃত্তি করত এবং সংরক্ষণ করত। তারা যে শুধু মুখে মুখে এসব ঘটনাবলি সংরক্ষণ করত তাই নয়; বরং প্রতিটি ঘটনার তথ্যসূত্র, সাক্ষীর নামও লিখে রাখত। কিংবা একটি ঘটনা কেউ একজন কারও কাছ থেকে শুনল এবং পরবর্তীকালে সেই শ্রোতার কাছ থেকে অন্য কেউ আবার তা সময়ে শুনত, সেইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তথ্যগুলো যেভাবে আসত, তা একেবারে নাম ও সাক্ষীসহ ইসলামে সংরক্ষণ করার বিধান আছে, যা আর কোনো ধর্মে নেই।

এতদসত্ত্বেও আমরা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত গল্পকেই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ গ্রহণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করছি না। গ্রহণযোগ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে কোনো কিছুকে মানতে হলে, আমরা তার স্বপক্ষে প্রমাণ দেখতে চাই। মুসলিম ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা যেই নীতি অনুসরণ করেছি, তা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। যে কাহিনিগুলো মুসলমানদের মধ্যে থেকে পেয়েছি, তা সত্য কিনা আমরা তা যতটা না যাচাই করেছি, তার থেকে আমরা সেই ঘটনার থেকে পাওয়া শিক্ষাটাকে নিয়ে বেশি কাজ করতে চেয়েছি। সেই শিক্ষাটা কতটা সত্য বা বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতটা বাস্তব তাই নিয়েই বরং আমরা বেশি উৎসাহী ছিলাম। মুসলিম ইতিহাসের সকল গল্পের চরিত্রগুলো আদর্শ মুসলমান বা আদর্শ মানুষ- এমন দাবি আমরা করছি না। তবে তারা তাদের চলার পথে যে ধরনের সংকটে পড়েছিলেন, তা ইতিহাসকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে বা কীভাবে আমরা সেসব বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের সময়গুলোতে চলতে পারি, এটা উদঘাটন করাই আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি।

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, মুসলিম ইতিহাসের নানা গল্পও রূপকভাবে আমাদের সামনে এসেছে। এর কিছু কিছু নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে, আবার কিছু গল্প আছে যা কিছু সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা বা ব্যক্তিকে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার জন্য গল্পের বর্ণনাকারী কিছুটা নিজের মতো করে এদিক-সেদিকও করেছেন। তারপরও আমরা দেখেছি; প্রাচীন রোমে সুল্লা এবং মারিয়াস যেভাবে ইতিহাসের বর্ণনা করে গেছেন, মুসলমানরাও ঠিক একইভাবে তাদের নিত্যদিনের ঘটনাগুলো ইতিহাসের মোড়কে সেভাবেই আমাদের সামনে বর্ণনা করে গেছেন। আমিও একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এই বইটিতে ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। চলুন শুরু করি ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাসের পাঠ।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সূচিপত্র

১. মধ্য পৃথিবী (দ্য মিডল ওয়ার্ল্ড) ২৯

২. দ্য হিজরা (শূন্য বছর বা ইয়ার জিরো) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ ৪৮

৩. খেলাফতের জন্ম ৬৭
হিজরি ১১-২৪ বা ৬৩২-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

৪. বিভেদ-বিভাজন (২৪-৪০ হিজরি) ৬৪৪-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ ৯৪
তৃতীয় খলিফা (২২-৩৬ হিজরি, ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)

৫. উমাইয়া সাম্রাজ্য ১১২
(৪০-১২০ হিজরি) ৬৬১-৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দ

৬. আব্বাসি যুগ ১২৭
(১২০-৩৫০ হিজরি) ৭৩৭-৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ

৭. জ্ঞানী, দার্শনিক ও সুফি সাধকদের যুগ ১৩৯
(১০-৫০৫ হিজরি) ৬৩২-১১১১ খ্রিষ্টাব্দ

৮. তুর্কিদের আবির্ভাব ও উত্থান ১৬৯
(১২০-৪৮৭ হিজরি) ৭৩৭-১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

৯. ব্যাপক বিপর্যয় ও নৈরাজ্য ১৮৮
(৪৭৪-৭৮৩ হিজরি) ১০৮১-১৩৮১ খ্রিষ্টাব্দ

১০. পুনরুত্থান ১১১
(৬৬১-১০০৮ হিজরি) ১২৬৩-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১১. ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা
(৬৮৯-১০০৮ হিজরি) ১২৯১-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ ২৭০

১২. পাশ্চাত্যর প্রাচ্যমুখী অভিযান
(৯০৫-১২৬৬ হিজরি) ১৫০০-১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ ২৯২

১৩. সংস্কার আন্দোলন
(১১৫০-১৩৩৬ হিজরি) ১৭৩৭-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ ৩২৯

১৪. শিল্প, সংবিধান এবং জাতীয়তাবাদ
(১১৬৩-১৩৩৬ হিজরি) ১৭৫০-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ ৩৫৫

১৫. ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকপন্থীদের উত্থান
(১৩৩৬-১৩৫৭ হিজরি) ১৯১৮-১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ ৩৯১

১৬. আধুনিকতার সংকট
(১৩৫৭-১৩৮৫ হিজরি) ১৯৩৯-১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ ৪১১

পরিশিষ্ট ৪২৬

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১. মধ্য পৃথিবী (দ্য মিডল ওয়ার্ল্ড)

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ রিসালাতের বার্তা নিয়ে এই পৃথিবীতে আসার বহু আগেই তৎকালীন পৃথিবীতে দুটি ভিন্ন ধরনের জগৎ (দুটো বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য- যা কাঠামোগত ও চেতনাগত দিক থেকে এতটাই আলাদা যেন দুটো দুই ভিন্ন পৃথিবী) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ছিল আটলান্টিক মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী অববাহিকায়। এই দুটি ভিন্ন ধারার পৃথিবীর ভ্রমণ ও বাণিজ্য পথগুলো ছিল ভিন্ন ভিন্ন। এর মধ্যে একটি জগতে যোগাযোগের মাধ্যমগুলো ছিল মূলত সমুদ্রপথ আর অন্যটির ছিল স্থলপথ।

যদি আপনি প্রাচীন সময়ের সমুদ্র পথটি পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে দেখবেন, বাস্তবিক অর্থে বিশ্ব ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র ছিল ভূমধ্যসাগর। কারণ ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করেই অতীতের মাইসেনাইয়ান, ক্রিটান, ফোয়েনিসিয়ান, লিডিয়ান, গ্রিক বা রোমানের মতো প্রসিদ্ধ জাতিগুলো আর তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়েছিল। সেই সময়ে যারা ভূমাধ্যসাগরের আশপাশে থাকত, তারা খুব সহজেই এই অঞ্চলে থাকা অন্যান্য জাতি-উপজাতির সাথে যোগাযোগ স্থাপন বা তথ্য বিনিময় করতে পারত। তাই বিশাল সমুদ্র উপত্যকা ক্রমান্বয়ে বৈচিত্র্যময় মানুষের মিলনস্থলে পরিণত হয়। সেইসাথে তারা তাদের নিজেদের মতো করে কাহিনি রচনা ও প্রচার করার কারণে একটি ঘটনাবহুল এবং বৈচিত্র্যময় ঐতিহাসিক উপাখ্যানও রচিত হয়। আজকের পশ্চিমা সভ্যতা মূলত সেই ইতিহাসেরই একটি পরিণতি।

এবার আপনি আরেকটি ধারার দিকে তাকান। স্থল পথই ছিল সে ধারার যোগাযোগ মাধ্যম। ভারতীয় উপমহাদেশ, মধ্য এশিয়া, ইরানের সুউচ্চ ভূমি, মেসোপটেমিয়া এবং মিসরের এলাকাগুলোর সাথে সংযুক্ত সড়কগুলো এ যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এই এলাকায় অনেক নদী আর সাগরেরও অবস্থান ছিল। যেমন: এখানে ছিল পারস্য উপসাগর, ইন্দু ও অক্সাস নদী, দ্য আরাল,

www.islamicboipdf.blogspot.com
www.islamicboipdf.blogspot.com

কাস্পিয়ান, ব্ল্যাক সি, ভূমধ্যসাগর, নীল নদ এবং লোহিত সাগর। মূলত এই অঞ্চলকে ঘিরেই মুসলিম বিশ্বটি প্রতিষ্ঠিত হয়। (এখানে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বা সাম্রাজ্য বলতে আজকের ইউরোপ এবং মধ্যপৃথিবী বলতে আজকের মুসলিম বিশ্বকে বুঝানো হয়েছে)

তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, মুসলিম বিশ্বের এই এলাকাগুলোকে আলাদা করে কোনো নামকরণ করা হয়নি।

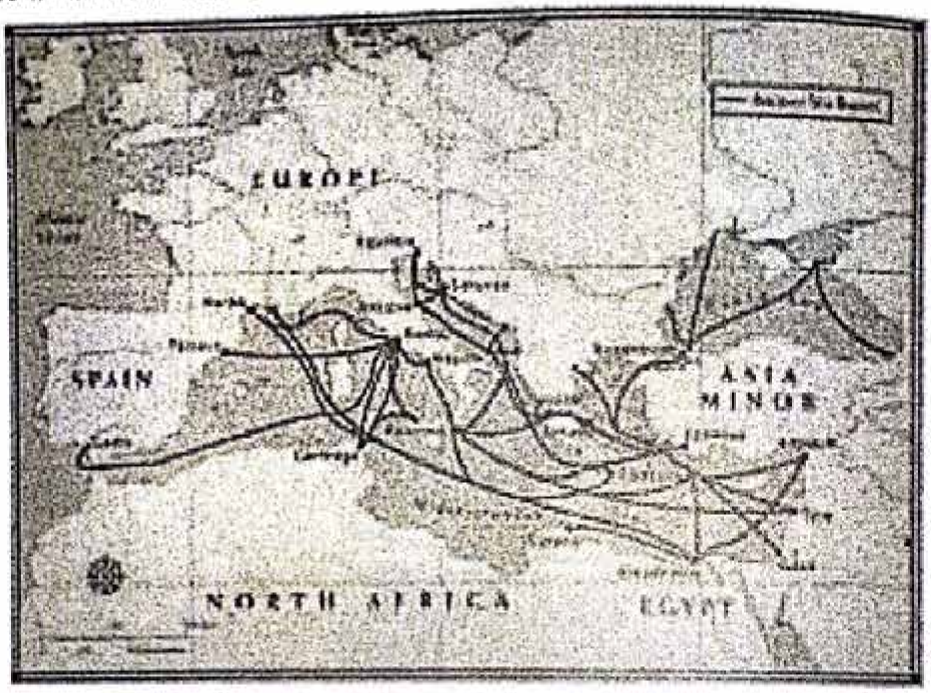

ভূমধ্য সাগর অঞ্চল মেডিটেরিয়ান অঞ্চল)

ভূমধ্য সাগর অঞ্চল মেডিটেরিয়ান অঞ্চল)

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উপরোক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি অংশকে মধ্যপ্রাচ্য হিসেবে অভিহিত করা হলেও তার নামকরণের কারণটি বেশ দুর্বোধ্য। ধরুন, মধ্য প্রাচ্য বা প্রাচ্যের মাঝখানে শুনলে সাধারণভাবে মনে হয় আপনি পশ্চিম ইউরোপের বিপরীতে কোনো স্থানে আছেন। ধরুন, আপনি পারস্য উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি এখন কোথায় আছেন? তাহলে বিশ্বের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী আপনি আসলে মধ্য পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছেন। অথচ মজার ব্যাপার হলো জায়গাটির নাম আসলে মধ্যপ্রাচ্য। নাম নিয়ে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে আমি মধ্যপ্রাচ্য না বলে ইন্দুস বা ইন্দু নদী থেকে শুরু করে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত গোটা এলাকাটিকে 'মধ্য পৃথিবী' হিসেবে অভিহিত করেছি। আমার এই নামটি দেয়ার পেছনে যুক্তি হলো, আসলে এই এলাকাটি ভূমধ্যসাগরীয় সাম্রাজ্য এবং চৈনিক সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি একটি জায়গায় অবস্থিত। তাই একে মধ্য পৃথিবী বললেই বেশি মানায়।

চৈনিক পৃথিবীর একটি আলাদা জগৎ ছিল, যা উপরোক্ত বড় দুই জগতের তুলনায় পুরাই আলাদা। চীন ভৌগোলিকভাবে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার হিসেব থেকে দূরত্বের কারণে বাদ পড়ে গেল। আর মধ্য পৃথিবী থেকে চীন আলাদা হয়ে পড়লো হিমালয়, গোবি মরুভূমি এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ঘন বনাঞ্চলের কারণে। এসব প্রাকৃতিক সীমানা প্রাচীরের কারণেই চীন এবং তার নিকটস্থ বন্ধু বা বিদ্রোহীরা একটু দূরে দূরে থাকত। ঠিক সে কারণেই মধ্য পৃথিবীর ইতিহাসে খুব একটা চৈনিক উপাদানের প্রভাব পাওয়া যায় না। তাই আমার এই বইতেও চাইনিজদের নিয়ে কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই কম এসেছে। একইভাবে কম এসেছে সাব-সাহারা আফ্রিকানদের কথাও। সাহারা মরুভূমির কারণে এই গোটা সাব-সাহারা অঞ্চলটিও ইউরোপ বা এশিয়া থেকে মোটামুটি বিচ্ছিন্ন হয়েই থেকেছে। আবার ভৌগোলিকভাবে ভিন্নতার কারণে আমেরিকাও মোটামুটি ইউরোপ বা এশিয়ার বলয়ের বাইরে থেকে নিজেদের মতো করে একটি পৃথিবী বানিয়ে নিয়েছে। একইসঙ্গে তারা নিজেদের মতো করে নিজস্ব একটি ইতিহাসও তৈরি করেছে।

ভৌগোলিক অবস্থানগত এই ভিন্নতা চীন বা আমেরিকাকে যতই বিচ্ছিন্ন করুক না কেন, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বা মধ্য পৃথিবীর মধ্যে তেমন কোনো বিচ্ছিন্নতা কখনোই সৃষ্টি করতে পারেনি। এই দুটি অঞ্চল তাদের মতো করে যে দুটি পৃথক পৃথিবী বানিয়ে নিয়েছিল, তার কারণ বলতে গিয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ফিলিপ ডি কার্টিন বলেছেন, এই দুই অঞ্চলের এই ভিন্নতার মূল কারণটি ছিল আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা। এই দুই অঞ্চল একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করার চেয়ে নিজেদের এলাকার ভেতরে যোগাযোগ রক্ষা করাটাকেই বেশি গুরুত্ব দিত। কারণ, সেটাই সহজ ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় কোনো উপকূল থেকে ভূমধ্যসাগরের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অন্য কোনো উপকূলের নিকটবর্তী এলাকায় যাওয়া খুবই সহজ ছিল। কিন্তু সেই তুলনায় ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে পার্সেপলিস বা ইন্দুস নদী তীরবর্তী এলাকায় যাওয়া ছিল বেশ কঠিন। অন্যদিকে, সেই প্রাচীনকাল থেকে মধ্য পৃথিবীতে যেই বণিকেরা আসা যাওয়া করত, বিশেষ করে ক্যারাভান নিয়ে যারা যাতায়াত করতেন, তারা যেকোনো সময় যেকোনো দিকে বাঁক নিতে পারতেন। তাদের কাছে এই এলাকাটি খুবই পরিচিত ছিল। তারা সব সময় পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতেন। এই পথে যেতে যেতে যখন তারা এশিয়া মাইনর অঞ্চলের (আজকের তুরস্ক) কাছাকাছি আসতেন, তখন একটা পর্যায়ে বসফরাস প্রণালির নিকটে এসে পথটা খুব সরু হয়ে যেত। আর এরও পরে বিশাল সাগর থাকায় তারা আর অগ্রসর না হয়ে আবার কেন্দ্রের দিকে ফিরে আসতেন অথবা দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় এলাকা ধরে অগ্রসর হতেন।

সে সময়ে মানুষের জীবনযাত্রাটা এমন ছিল যে, কেবল ব্যবসায়ী বা পর্যটকদের মাধ্যমেই নতুন কিছু মানুষের নজরে আসত। এক একটি বণিক দল শুধু যে ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে ঘুরত তা নয়, বরং তারা তাদের সাথে নানা ধরনের গাল-গপ্পো, চমকপ্রদ কাহিনি, কৌতুক, গুজব, ঐতিহাসিক বর্ণনা, ধর্মীয় পুরাকীর্তি গাঁথা এবং সাংস্কৃতিক অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে চলতেন। যেন এক একটি বাণিজ্য দল এক একটি নতুন সভ্যতার বীজ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তারা যে চিন্তা-চেতনা নিয়ে একটি জনপদে প্রবেশ করতেন, দেখা যেত তাদের প্রস্থানের পর সেসব চিন্তা-চেতনার অনেক কিছুই সেই জনপদের মানুষের স্বভাবে বা আচরণে ঢুকে গেছে। এভাবে একটি লোকালয়ের সংস্কৃতি আরেকটি লোকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করত। সাংস্কৃতিক চেতনা বিনিময়ের কাজটিও আসলে এভাবেই সম্পন্ন হতো।

এভাবেই ভূমধ্যসাগরীয় এবং মধ্য পৃথিবীর ইতিহাসগুলো রচনা হয়েছে। যারা ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় বসবাস করতেন, তাদের এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, তারাই আসলে মানব ইতিহাসের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছিলেন। অন্যদিকে, যারা মধ্য পৃথিবীর অধিবাসী তারাও যৌক্তিকভাবেই ভেবে নিতে পারেন যে, তারা একেবারে পৃথিবীর মূল কেন্দ্রেই থাকতে পেরেছেন।

এই দুই ভিন্ন পৃথিবীর ইতিহাস বারবার একটি অন্যটির মধ্যে ঢুকে গেছে, কখনো অতিক্রম করে গেছে বেশ কিছু জায়গায় । মজার ব্যাপার হলো, আজ এত বছর পরে এসেও আমরা সেই জায়গাগুলোকেই সবচেয়ে অস্থির অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। এক্ষেত্রে ইসরাইল, লেবানন, সিরিয়া, জর্দান প্রভৃতি উদকৃষ্ট উদাহরণ। এই স্থানগুলোকে যদি আমরা একটু আগে বর্ণিত দুই পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে মিলিয়ে দেখি, তাহলে দেখব এর কিছু অংশ পড়েছে সাগর প্রধান এলাকার

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পূর্ব প্রান্ত জুড়ে, আর কিছু অংশ পড়েছে স্থলযোগাযোগ নেটওয়ার্ক নির্ভর পৃথিবীর পশ্চিমাংশ জুড়ে। তাই ভূমধ্যসাগরীয় ইতিহাসের আঙ্গিক থেকে বিচার করলে এই জায়গাগুলো সব সময়ই তাদের একেবারে মূল শিকড়ের অংশ। আর মধ্য পৃথিবীর ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখলে এই অঞ্চলগুলো তাদের; কারণ মেসোপটেমিয়া এবং পার্সিয়ান অঞ্চলকে মধ্য পৃথিবী ঐতিহ্যগতভাবে তার নিজস্ব বলে মনে করে। আর সেই কারণেই এই অঞ্চলগুলোর কর্তৃত্ব নিয়ে আজ অবধি এই দুই পৃথিবীর কর্তা ব্যক্তিরা লড়াই করে যাচ্ছেন।

ইসলামের ছোঁয়া পাওয়ার পূর্বে মধ্য পৃথিবীর চিত্র

আদিকাল থেকে যে মানব সভ্যতাগুলো গড়ে ওঠেছিল, তা মূলত সৃষ্টি হয়েছিল বড় বড় নদী বা প্লাবনকে কেন্দ্র করে। যেমন ধরা যাক, চীনের হুয়াং হো উপত্যকা, ভারতের ইন্দু নদী উপত্যকা কিংবা আফ্রিকার নীল উপত্যকা। এসব স্থানগুলোতেই আজ থেকে ৬ হাজার বছর বা তারও আগে থেকে যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা বসতি স্থাপন করেছিল, বাড়িঘর নির্মাণ করেছিল এবং এলোপাতাড়ি ঘুরাফেরা বন্ধ করে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেছিল। সভ্যতার গোড়াপত্তন কিন্তু সেখানেই।

মানব ইতিহাসে নদীকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতাগুলো গড়ে ওঠেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো ও সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা সভ্যতা- যাকে ইতিহাসে মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মেসোপটেমিয়া মানে 'নদীর মাঝখানে'। এই দুই নদীর তীরঘেঁষে যে বসতি গড়ে ওঠে, তাই আজকের ইরাক। সে কারণেই আমরা যখন সভ্যতার সূত্রপাত খুঁজতে যাব, তখন আমাদেরকে ইরাকের কাছে ফিরে যেতে হবে।

মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা অন্য সভ্যতাগুলো থেকে একটু এগিয়ে থাকার কারণ ছিল, এর দুই পাশে দুটি নদী ছিল। অন্য সভ্যতাগুলো সাধারণত একটি নদীকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার আরেকটি সুবিধাজনক দিক ছিল, এর নদীগুলোর তীর ছিল সমতল। তাই মানুষ এখানে আরামে ও সহজে বসত গড়তে পারত এবং যেকোনো দিক থেকে এই জায়গাগুলোতে যাতায়াত করতে পারত। আরেকটি ভালো দিক হলো, প্রকৃতি এখানকার মানুষের জন্য আলাদা করে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেনি। নীল নদের কথা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। নীল নদের চারপাশে জলাভূমি বেশি ছিল। আবার এর পশ্চিমে সাহারার মতো বিশাল একটি মরুভূমিও ছিল; ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে খাড়া বাঁধের মতো ছিল। ফলে নীল নদকে কেন্দ্র করে মিসরীয়রা সভ্যতা গড়ে তুলেছিল ঠিকই,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিন্তু প্রাকৃতিক এসব প্রতিবন্ধকতার কারণে অন্য জায়গার মানুষ সেখানে কম আসতে পারত। ফলে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের দিক থেকে বিচার করলে মেসোপটেমিয়ার তুলনায় মিসরীয় সভ্যতা অনেকখানি পিছিয়ে ছিল।

মেসোপটেমিয়ার আরেকটি দিক হলো, এই সভ্যতাটি অনেক চড়াই-উৎড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। নানা ধরনের উত্থান পতন তাকে প্রভাবিত করেছে। প্রায় কয়েক সহস্র বছর এভাবে পার করার কারণে ভেতর থেকে কাঠামোগতভাবে মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী । এর পাশাপাশি যাযাবরদের সাথে স্থানীয় কৃষক শ্রেণির ক্ষমতার দ্বন্দ্বটিও বৃহৎ মেসোপটেমিয়ান সাম্রাজ্যের ভিত গড়ে দেয়।

এই সভ্যতাটি কীভাবে এগিয়েছে তা ইতিহাসের আলোকে খুঁজতে গেলে যে তথ্যগুলো আমাদের সামনে আসে, সেগুলো হলো প্রথমে কৃষকেরা প্রাকৃতিক জলাধার ও নদীগুলোকে সেচ কাজের জন্য ব্যবহার করে ভালো পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে। সমাজ যখন একটু একটু করে স্থিতিশীল হয়, তখন সেখানে বেশ ভালো মানের ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার জন্ম হয়। পরে আবার এসব শ্রেণির লোককে একটি একক ক্ষমতার আওতায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এভাবেই সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক দলের, সেখান থেকে রাষ্ট্রের, পরিশেষে যা একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এ রকম বড় রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি হওয়ার পর যারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকে, তারা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করে। সেই সুযোগে আশেপাশের নতুন কোনো যাযাবর জাতি এসে ক্ষমতা দখল করে নেয়। তারা আবার তাদের মতো সাম্রাজ্য বিস্তারও করে। কয়েক বছর পরে এই যাযাবর নেতারাও আগের শাসকদের মতো আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ে যায়। আবার নতুন কোনো জাতি এসে সেই সুযোগে শাসনভার দখল করে নেয়। এভাবেই চলতে থাকে বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মুসলিম ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের গবেষণা থেকে জানা যায়, সে সময় সভ্যতাগুলোর বারবার ভাঙন ও গড়ে উঠার প্রক্রিয়াটি অনেকটা এ রকম- শুরু হতো বিজয় দিয়ে, সেখান থেকে একত্রিতকরণ, তারপর বিস্তৃতি, এরপর ভাঙন এবং শেষমেশ আবার বিজয়। ইবনে খালদুন সভ্যতা গড়ে উঠার সূত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে ইতিহাসের একটি অন্তর্নিহিত শক্তি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইতিহাস অনুসন্ধানে আরও দেখা যায়, সাম্রাজ্য গঠন ও পতনের এই চক্রটি একই সময়ে একাধিক সাম্রাজ্যেও ঘটেছে। ধরা যাক, একটি সাম্রাজ্য নতুন করে যখন গড়ে ওঠেছিল, তখনই হয়তো আরেকটি সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আবার দুটি সাম্রাজ্যই হয়তো ঠিক মতো চলছিল,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিন্তু পরস্পরের সাথে বিবাদে জড়িয়ে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় চলে গিয়েছিল। কিংবা একটি সাম্রাজ্য একটির পর একটি জায়গা দখল করে হয়তো অনেক বড় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, এমন ঘটনাও ইতিহাসে অসংখ্যবার পাওয়া যায়।

প্রায় ৫ হাজার ৫শ বছর আগে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে থাকা সভ্যতাও একইভাবে একটি একক বৃহৎ সাম্রাজ্যের আওতায় এসেছিল। সে সময়ের ঐ শাসনের নাম ছিল সুমের। সেই আমলেই প্রথম লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এ ছাড়া প্রথমবারের মতো চাকা, মালবাহী গাড়ি এবং সংখ্যার ধারণাও সে সময়েই পাওয়া যায়। এরপর আসে আক্কাদিয়ানের যুগ। তারা সুমের জয় করে। আক্কাদিয়ানদের নেতার নাম ছিল সার্গন। ইতিহাসে সভ্যতার আদি বিজয়ী নায়ক হিসেবে তার নামটাই উল্লেখযোগ্যভাবে পাওয়া যায়। সার্গন ছিল খুবই হিংস্র প্রকৃতির- যে কিনা নিজের ভালো ছাড়া আর কিছুই বুঝত না। সে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে এবং সভ্যতার অনেক নিদর্শনকে ধ্বংস করে ফেলে। শুধু হত্যা বা ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হতো না। সে যে অন্যায়গুলো করত, সেগুলো আবার শক্ত মাটির ওপর খোদাই করে লিখে রাখত। তার একটি নীতি যা বহু বছর পর খোদাই করা অবস্থাতেই পাওয়া যায়, তাতে লেখা ছিল, 'এই ব্যক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেছিল, আমি তাকে হত্যা করে ফেলেছি। আমার বিপরীতে যে-ই দাঁড়াবে, আমি তাকেই হত্যা করব'।

সার্গন তার সেনাবাহিনীকে এতটা দক্ষিণে প্রেরণ করেছিল যাতে তারা সাগরের দেখা পায় এবং সেই সাগরের পানিতেই তারা নিজেদের রক্ত মাখা তরবারি ধুয়ে ফেলতে পারে। সেই পর্যন্ত পৌঁছে তিনি লিখেছিলেন, 'যে রাজা এরপরও আমার সমকক্ষ হিসেবে দাবি করবে, তাকে এই সাগরেই যেতে হবে। তিনি আরও দাবি করেছিলেন, আমি যতটা এলাকা জয় করেছি, এখন পর্যন্ত কেউ এত বেশি এলাকা জয় করতে বা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। আজকের বাস্তবতায় অবশ্য তার এলাকা খুব বড় ছিল না। হয়তো পরিমাপ করলে এখনকার নিউ জার্সির তুলনায় ক্ষুদ্রই হবে।

সে সময়ই নতুন আরেক জাতি এসে আক্কাদদের জয় করে। এরপর আরেক জাতি, তারপর আরেকটা। এভাবেই গুটিয়ান, ক্যাসিটেস, হুরিয়ানস এবং তারও পরে অ্যামোরিটেস। এই ধারা যেন চলতেই থাকে। একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, যতই নতুন শাসকের আবির্ভাব ঘটুক না কেন, আসলে তারা একই এলাকায় মূলত শাসন চালাচ্ছিল। হয়তো আগের শাসকের তুলনায় এলাকার পরিধি একটু বাড়িয়েছে, এর বেশি কিছু নয়।

অ্যামোরিটেসরা অন্যদের তুলনায় একটু আলাদাভাবে স্বীকৃতি পায়। কারণ, তারা ব্যাবিলনের প্রসিদ্ধ শহরটি নির্মাণ করেছিল এবং সেই শহর থেকেই তারা প্রথম ব্যাবিলনিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যাবিলনিয়ানদের থেকে ক্ষমতা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

চলে যায় আসিরিয়ানদের হাতে, যারা আরও বড় এলাকায় নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং নিনেভেহ্ এর মতো বড় একটি শহরও বিনির্মাণ করেছিল। তাদের সাম্রাজ্য ছিল ইরাক থেকে শুরু করে মিসর পর্যন্ত। আর সেই আমলের কথা বিবেচনা করলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, কত বড় ছিল সেই সাম্রাজ্য। কারণ, তখনো পর্যন্ত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার মতো একমাত্র যানবাহন ছিল ঘোড়া। আসিরিয়ানরা অবশ্য ইতিহাসের পাতায় খুবই নির্মম ও স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এটা বলা কঠিন যে, সেই আমলে তারাই সবচেয়ে নির্মম জাতি ছিল কিনা। তবে তারা কৌশল হিসেবে যে বর্বর নীতি গ্রহণ করেছিল তারই ছায়া আমরা আবার দেখতে পাই বিংশ শতাব্দীতে, জোসেফ স্ট্যালিনের মাধ্যমে। আসিরিয়ানরা একটি গোটা জনগোষ্ঠীকে তাদের আবাসভূমি থেকে উৎখাত করে তাদেরকে নতুন একটি জায়গায় স্থাপন করেছিল। এই উৎখাতের পেছনে যুক্তি ছিল, যদি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে তাদের ভিটেমাটি ও পরিচিত জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা যায়, তাহলে তারা অসহায়, নেতৃত্বশূন্য ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ফলে তারা শাসকদের শত অত্যাচারের পরও তাদের বিরুদ্ধে আর বিদ্রোহ করতে পারবে না।

এই কৌশলটা সাময়িক কাজ করলেও দীর্ঘমেয়াদে সফল হয়নি। আসিরিয়ানরা একটা সময়ে তাদেরই অধীনস্থ চালডিয়ানদের হাতে ধরাশায়ী হয়। তারা ব্যাবিলনকে নতুন করে নির্মাণ করে এবং এই স্থানকে ইতিহাসের একটি অনন্য সাধারণ স্থানে পরিণত করে। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে মহাকাশ বিদ্যা, মেডিসিন এবং গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিতা ছিল। আমরা যেমন এখন ১০টি সংখ্যা বা ডিজিট দিয়ে সকল হিসেব গণনা করি, তারা তখন ১২টি ডিজিট দিয়ে করত। তারা পরিমাপ ও সময় নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিল। তাদের অবদানের কারণেই আমরা বছরে মাসগুলোকে ১২টিতে বিভক্ত করতে পেরেছি। এক ঘন্টায় ৬০ মিনিট (যা ১২ এর ৫ গুণ) এবং এক মিনিটে ৬০ সেকেন্ড-এসব তাদেরই অবদান। তারা নগর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য নির্মাণে খুবই যোগ্য ছিল। চালডিয়ানদের রাজাদের হাতেই ব্যবিলনের শূন্য উদ্যান নির্মিত হয়, যা আজও বিশ্বের ৭ম আশ্চর্যের একটি হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

তবে এতসব গুণের বাইরে, দমন-নিপীড়নের ব্যাপারে চালডিয়ানরাও তাদের পূর্বসূরি আসিরিয়ানের মতোই বর্বর নীতি অবলম্বন করেছিল। তাদের একজন রাজার নাম ছিল নেবুচাদনেজার। তিনিই প্রথম জেরুজালেম নগরীকে ধ্বংস করে হিব্রু গোষ্ঠীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিলেন। ব্যাবিলনের আরেকজন চালডিয়ান রাজা বালশাজার- যিনি কিনা একদিন নিজের প্রাসাদে খাবার খাওয়া অবস্থায় প্রাসাদের দেয়ালে আগুনের হরফে অশরীরি হাতে একটি লেখা দেখেছিলেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সেখানে আদি হিব্রু ভাষায় লেখা ছিল 'মেনে মেনে টেকেল আপহারিসিন' যার অনুবাদ করলে অর্থ দাঁড়ায় 'ঈশ্বর নিজ হাতে বালশাজারের রাজ্য ধ্বংস করেছেন।' ওল্ড টেস্টামেন্টে এই লেখাকে নিয়তির অখণ্ডনীয় লিখন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বালশাজারের চাটুকারেরা যারা সব সময় তাকে ঘিরে রাখত, তারা অবশ্য এই কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝেনি। খুব সম্ভবত এর কারণ, তারা মারাত্মকভাবে মাতাল ও অন্ধবিশ্বাসী ছিল। কথাটি যে ঢং এ লেখা, তারা সাধারণত ঐ স্টাইলে কথা বলত না। তাই তারা এই কথাটির অর্থ বের করার জন্য সে সময়ের কারাগারে বন্দি হিব্রু ভাষা বিশেষজ্ঞ ডানিয়েলের শরণাপন্ন হলো। ড্যানিয়েল অর্থ বের করে জানালেন, 'তোমার দিন শেষ। তোমার অন্যায় পরিমাপ করা হয়ে গেছে এবং তোমার দোষ প্রমাণিত হয়েছে। অতি শীঘ্রই তোমার রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়বে'। ড্যানিয়েলের ওল্ড টেস্টামেন্ট গল্পে এভাবেই বিষয়টা উঠে এসেছে।

বালশাজারের অবশ্য এসব ভবিষ্যৎবাণী বা সতর্কবার্তা নিয়ে পড়ে থাকার সময় বা সুযোগ কোনোটাই ছিল না। সে এগুলোকে পাত্তাই দেয়নি। যার ফলে কিছুদিন পরই ব্যাবিলনের ওপর দিয়ে রক্ত বন্যা বয়ে যায়। এবার পার্সিয়ান ও মেডেসদের সমন্বয়ে গঠিত নতুন একটি জাতিগোষ্ঠী ব্যাবিলনকে দখল করে নেয়। এই নতুন করে ওঠে আসা জাতিটি ভারতীয় ও ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বংশোদ্ভূত। তারা দ্বিতীয়বারের মতো ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে পার্সিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

এই পর্যায়ে এসে মধ্য পৃথিবীতে সাম্রাজ্য দখল বা প্রতিষ্ঠার লড়াই কিছুটা স্তিমিত হয়। যেন এক সাময়িক বিরতি। এর একটা কারণ এমন হতে পারে, পারস্য সাম্রাজ্যের আর কোনো নতুন জাতিগোষ্ঠী জয় করার বাকি ছিল না। আবার পারস্য সাম্রাজ্যকে জয়ের মতো এতটা শক্তিও কারও ছিল না। মিসর ও মেসোপটেমিয়া দুটো বৃহৎ সভ্যতাই পারস্যদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এর পাশাপাশি তাদের সাম্রাজ্য পশ্চিমে এশিয়া মাইনর, দক্ষিণে নীল নদ এবং পূর্বে ইরানিয়ান পর্বতশৃঙ্গ, আফগানিস্তান এবং ইন্দুস নদী পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। সুসভ্য এবং অভিজাত পারস্য সম্প্রদায় আর কোনো নতুন অঞ্চল জয় করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেনি। কারণ, ইন্দুস নদীর দক্ষিণে ঘন কালো জঙ্গল ছাড়া আর কোনো এলাকা বাকি ছিল না। আফগানিস্তানের উত্তরের আবহাওয়া ছিল খুবই বৈরী। সেখানে মানুষ বলতে তুর্কি কিছু যাযাবর ছিল, যারা চিন্তা-চেতনায় ছিল খুবই আদিম ও পশ্চাৎপদ। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কোনো খায়েশ পারস্যদের মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই নতুন কোনো সীমানা না বাড়িয়ে পারস্যরা নিজেদের সাম্রাজ্য মজবুত ও নিরাপদ করার দিকে মনোযোগ দেয়। তারা নতুন করে অনেকগুলো দুর্গ বানায়, যাতে অন্য কোনো বর্বর জাতি সহজে তাদের এলাকায় আক্রমণ করতে না পারে। তারা নগরীর সভ্য মানুষগুলোর নিরাপত্তা এবং উন্নত জীবন নিশ্চিত করতে অধিক মনযোগী ছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পারসিয়ানদের মধ্যে চেতনাগত এই পরিবর্তনগুলো আসে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ শতাব্দীর দিকে। আসলে এরই মধ্যে অধিকাংশ সাম্রাজ্যগুলো একীভূত ও পরস্পর সংযুক্ত হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে ইলাম, উর, নিনেভেহ ও ব্যাবিলনের মতো বড় সাম্রাজ্যগুলো একটি একক রাজধানী করে পৃথক পৃথক রাজ্য তৈরি করে ফেলেছিল এবং আশেপাশের অন্য সকল উপজাতি বা নৃগোষ্ঠীকে একটি একক শাসন পদ্ধতির আওতায় নিয়ে এসেছিল। বলা বাহুল্য, পারস্যরা তাদের পূর্বসূরিদের রক্তপাত, বর্বরতা ও জবর দখলের সংস্কৃতি থেকেও যথেষ্ট শিক্ষা নিয়েছিল। তাই তারা পুরোনো সেই কৌশল প্রয়োগ করতে আর তেমন একটা আগ্রহী হয়নি।

এর পাশাপাশি পারস্য সাম্রাজ্যটি টিকে যাওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণও ছিল। প্রথমত পারস্যরা চিন্তা চেতনায় আসিরিয়ানদের পুরোই বিপরীত ছিল। তারা শাসন কাজ পরিচালনায় আসিরিয়ানদের তুলনায় ভিন্ন একটি কৌশল অবলম্বন করেছিল। একটি ভিন্ন মতাবলম্বী জাতিগোষ্ঠীকে সমূলে উচ্ছেদ করার পুরোনো কৌশলে না গিয়ে, পারস্যরা বরং তাদের নতুন করে পুনর্বাসিত করেছিল। তারা হিব্রুদেরকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রকাশ্য জনপদে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। পারসিয়ান শাসকেরা মূলত বহু সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে পৃষ্টপোষকতা করে। অর্থাৎ বিভিন্ন স্বভাব ও সংস্কৃতির মানুষেরা যাতে একই সাথে একটি রাষ্ট্রে থাকতে পারে তারা সেই ব্যবস্থা করেছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকলেও তারা তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও আচারাদি পারস্যদের শাসনামলে নির্বিঘ্নে পালন করতে পারত। এভাবে বিশাল একটি এলাকা পারস্যরা সফলতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। প্রতি জনপদে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার শাসক ছিল এবং যত ধরনের রাজস্ব ছিল, সব তারা স্থানীয় জনপদেই প্রদান করত। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল থেকে তাদের কাছে যে চাহিদা দেয়া হতো, তা অতীতের তুলনায় ছিল খুবই সামান্য। পরবর্তী সময়ে ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলমান শাসকেরা পারস্যদের এসব নীতির অনেকগুলোই গ্রহণ করেছিল, যা অটোমান সাম্রাজ্যের সময় পর্যন্ত নানাভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পারস্যরা বুঝতে পেরেছিল তাদের রাষ্ট্রকে যদি সঠিকভাবে চালাতে হয়, সকল জনগোষ্ঠীকে যদি ভালোমতো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, একত্রে রাখতে হয়, তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো করতে হবে। তারা রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়াকে আমূল সংস্কার করে এবং একক মুদ্রা চালু করে। তারা উপলব্ধি করেছিল মুদ্রাই হলো বাণিজ্যিক যোগাযোগের মূল হাতিয়ার। তারা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল উন্নয়ন করে এবং সড়কের পাশে থাকার হোটেল নির্মাণ করে, যাতে ভ্রমণগুলো সহজ ও আনন্দদায়ক হয়। তারা ডাক যোগাযোগের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন করে। তাদের ডাক যোগাযোগের নীতি ছিল, আজকের মার্কিন পোস্টাল সার্ভিসের মতোই কর্মতৎপর ও সেবা নির্ভর। যত রাতই হোক, যত খারাপ আবহাওয়া হোক না কেন, সময়মতো গ্রাহককে তার জিনিস পৌছে দেয়াটাই ছিল ডাক কর্তৃপক্ষের মূল চ্যালেঞ্জ।

পারস্য কর্তৃপক্ষ অসংখ্য অনুবাদককেও নিয়োগ দিয়েছিল। এমন অবস্থা তারা তৈরি করেছিল, যাতে একজন আগন্তুকও তাদের রাজ্যে এসে পারস্য ভাষা না জানার কারণে সমস্যায় না পড়ে। যেহেতু পারস্য সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ভাষার বহু লোক বসবাস করত, তাই এসব অনুবাদকেরা পারস্য শাসনামলের নানা সাফল্যগাঁথাও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করত; যাতে অধীনস্থ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের শাসকদের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড জানতে পারে। যেমন পারস্য শাসক মহান দারিয়াসের কথা বলা যায়। তিনি বেহিস্তুন নামক একটি পাহাড়ে নিজের জীবনালেখ্য পুরোনো পারসিয়ান, এলামিটে এবং ব্যবিলনিয়ান ভাষায় খোদাই করে লিখে রেখেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি তার বিরুদ্ধে করা বিদ্রোহীদের দেয়া শাস্তির কথাও সেখানে লিখেছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিদ্রোহীরা বুঝতে পারে শাসকের সাথে অন্যায় করলে তাদের কি শাস্তি পেতে হতে পারে। তবে সার্বিকভাবে নাগরিকেরা পারস্য শাসকদের দয়ালু ও মানবতাবাদী মনে করত। কারণ, তাদের শাসকেরা তাদেরকে শান্তিতে রেখেছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষ তো বটেই, অনেক যাযাবর ও বখাটেরাও আজেবাজে কাজ ছেড়ে সংসার পেতে ছিলেন এবং কৃষিকাজের মতো উৎপাদনমুখী কাজে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।

বেহিস্তুনে রাজা দারিয়াস যা লিখে গেছেন, তা পুরোনো পারসিয়ান ভাষায় লেখা। বর্তমান পারসিয়ান ভাষা দিয়েও তার অর্থ বের করা যায়। ১৯ শতাব্দীতে এগুলো আবিষ্কার হওয়ার পর পারসিয়ান ভাষা ব্যবহার করেই অন্য দুই প্রাচীন ভাষার (এলামিটে এবং ব্যাবিলনিয়ান) অর্থ বের করা সম্ভব হয়। এই দুই ভাষার অর্থ জানার সাথে সাথে পুরোনো মেসোপটেমিয়ান সাম্রাজ্যের একটি অজানা ভান্ডার আমাদের সামনে খুলে যায়। ঐ সময়ে দিনলিপি আকারে সব সংরক্ষণ রাখার বিধান ও পদ্ধতি ছিল। তাই প্রাচীন ঐ ভাষাদ্বয় জানতে পারার পর থেকে আমরা এখন ইউরোপ-আমেরিকার ১২শ বছর আগের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে পারছি, ঠিক তেমনিভাবে ৩০০০ বছর পূর্বের মেসোপটেমিয়ান সভ্যতার কাহিনি ততটাই ভালো ভাবে জানতে পেরেছি।

একটা সময়ে এসে ধর্ম পারস্য সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। তবে তা হাজার হাজার দেবতাকে পূজা করা হিন্দু ধর্ম নয়। মিসরীয়দের অর্ধ-মানব আর অর্ধ-পশু আকৃতির পূজনীয় দেবতারও ধর্ম নয়। গ্রিকদের প্রচলিত অগ্নিপূজাও নয়। পারস্য সাম্রাজ্যে যে ধর্মচর্চা প্রবেশ করে, তা হলো জরথুষ্ট। এই জরথুষ্ট এসেছিলেন

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যীশুখ্রিষ্টের জন্মেরও প্রায় হাজার বছর পূর্বে। তার সম্পর্কে খুব নিশ্চিত করে জানা যায় না। তিনি খুব সম্ভবত উত্তর ইরান বা উত্তর আফগানিস্তান কিংবা তারও পূর্বদিকে কোনো স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জরথুস্ট্র নিজেকে কখনো নবি বা স্বর্গীয় শক্তির ধারক বাহক হিসেবে দাবি করেননি। দেবতা দাবি করার তো প্রশ্নই আসে না। তিনি মূলত নিজেকে একজন দার্শনিক ও সত্যসন্ধানী দাবি করতেন। কিন্তু তার অনুসারীরা বরাবরই তাকে একজন পবিত্র মানুষ হিসেবে গণ্য করতেন।

জরথুস্ট্র প্রচার করতেন, এই মহাবিশ্ব মূলত সর্বক্ষেত্রেই দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হলো অন্ধকার আর একটি আলো। একটি ভালো আর একটি মন্দ। একটি সত্য আরেকটি মিথ্যা কিংবা একটি জীবন আরেকটি মৃত্যু। সৃষ্টির একেবারে শুরুতেই এই মহাবিশ্বকে এভাবে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে এবং তখন থেকেই এই দুটি ধারা একে অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। আর এই দুয়ের মধ্যে চলমান সংঘাত চলবে একেবারে মহাবিশ্বের শেষ দিন পর্যন্ত।

জরথুস্ট্র আরও বলেন, মানুষের মধ্যেও এই দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। কোন পথে সে হাঁটবে তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন। ভালোর দিকে এগিয়ে গেলে মানুষ আলো ও জীবনের পথে হাঁটতে শুরু করে। আর খারাপ পথে এগুলে অন্ধকার ও মৃত্যুর পক্ষশক্তি আরও মজবুত হয়। জরথুস্ট্রের মতে কোনো কিছুই আগে থেকে নির্ধারণ করা থাকে না। অর্থাৎ নিয়তি বলে কিছু আছে, এটা তিনি মনে করতেন না। আর ভালো-মন্দের লড়াইয়ের চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে, তা নিয়ে তিনি সংশয়ে ছিলেন। তিনি মনে করতেন, মানুষের শুধু পথ বাছাই করার স্বাধীনতা আছে তাই নয়, বরং প্রতিটি সিদ্ধান্তের সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াও রয়েছে।

জরথুস্ট্র দাবি করেন, এই বিশ্ব নাটকের মূল চরিত্র দুটি। আহুরা মাজেদা নামের একটি চরিত্র আছে যা আসলে ভালোর প্রতিবিম্ব আর আহরিমান হলো খারাপের প্রতিচ্ছবি। আগুন হলো আহুরা মাজেদার একটি রূপায়ণ। তাই আগুনকে তিনি ভিন্নভাবে বিবেচনা করতেন। এ কারণেই অনেকেই জরথুস্ট্রকে অগ্নিপূজারী মনে করেন। আসলে তারা আগুনকে পূজা করত না। আগুনকে সামনে রেখে তারা পূজা করত আহুরা মাজেদাকে। জরথুস্ট্র অবশ্য একটি পরকালের কথাও বলতেন। তিনি বলতেন, কেবল ভালো মানষগুলোই সেখানে যাবে; তবে পুরস্কার হিসেবে নয় বরং তারা যে সঠিক পথটি বেছে নিয়েছে, তার সফল পরিণতি হিসেবেই তারা সেখানে পৌছবে। অর্থাৎ, ভালো পথ বেছে নেয়ার কারণে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে স্বর্গে উন্নীত করবে। পারস্য জরথুস্ট্রবাদীরা সব ধরনের ধর্মীয় মূর্তি, প্রতীকী ছবি বা প্রতীককে প্রত্যাখ্যান করে। এই একই ধরনের চেতনা ইসলামিক দর্শনেও আমরা দেখতে পাই।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অনেক সময় জরথুস্ট্র এবং তার কিছু কিছু অনুসারীদের কাছ থেকে আমরা এমনও শুনতে পাই, তারা আহুরা মাজেদাকে 'জ্ঞানী প্রভু' হিসেবে সম্বোধন করছেন। তারা আহুরা মাজেদাকে গোটা মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। তাদের মতে মহাবিশ্বের সৃষ্টির অল্প কিছু সময় পরে আহুরা মাজেদা সব কিছুকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই জায়গায় এসে কখনো কখনো জরথুস্ট্রের দুই খোদার কনসেপ্ট একেশ্বরবাদীদের মতো হয়ে যায়; তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপরও থাকতে পারে। বলা যায়, পুরোনো পারস্য সাম্রাজ্যের জরথুস্ট্র মতবাদ অনুযায়ী দুটো দেবতা সমান ধরনের শক্তি নিয়ে এই মহাবিশ্বে বিরাজ করছেন। অন্যদিকে, মানুষ তাদের হাতে থাকা সুতোয় আটকে থাকে আর জীবনভর এই দুই সত্তার মধ্যে কার দিকে ঝুঁকবে- এটা নিয়েই লড়াই চালিয়ে যায়।

জরথুস্ট্র যুগে পারস্যে একজন ধর্মযাজক ছিলেন, যার নাম মাগুস। খ্রিষ্টান ধর্ম অনুযায়ী শিশু যীশু যখন একাকী ঘোড়ার আস্তাবলে পড়েছিলেন, তখন পূর্ব থেকে আসা তিন জন জ্ঞানী লোক যীশুর জন্য লকান ও গন্ধরস নিয়ে আসেন। আসলে ঐ তিনজন ছিলেন জরথুস্ট্র ধর্মযাজক। বর্তমানে আমরা যে জাদুকর বা ম্যাজিশিয়ান শব্দটি ব্যবহার করি তাও এসেছে ঐ মাগুস (বহুবচন হলো ম্যাজাই) থেকে। অনেকেই মনে করেন, ঐ তিন ধর্মযাজকের আলৌকিক ক্ষমতাও ছিল।

পারস্য সাম্রাজ্যকালের শেষ দিকে তারা কিছু কর্মকাণ্ড করে যার উল্লেখ পশ্চিমা বিশ্ব ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যায়। পারসিয়ান রাজা দারিয়াস একসময় গ্রিকদেরকে শাস্তি দিতে চাইলেন। লক্ষ্য করবেন, আমি 'শাস্তি দেওয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছি; অভিযান বা দখল এসব শব্দ নয়। কারণ, পারস্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা ভিন্ন কোনো জাতি বা সভ্যতার সাথে গতানুগতিক সংঘাতে বিশ্বাস করতেন না। পারসিয়ানরা মনে করত, গ্রিকরা হলো পশ্চিমের ছোট ছোট শহরের আদিম বাসিন্দা; যারা অল্প হলেও সভ্যতার ঘ্রাণ পেয়েছে। পারসিয়ানরা এটাও মনে করত, ঐ শহরগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। যদিও এতটা দূর থেকে ঐ এলাকাগুলো সরাসরি শাসন করার কোনো উপায় ছিল না। যাহোক, পারস্য রাজা দারিয়াস একবার গ্রিকদের বশে আনার জন্য তাদের কাছে বার্তাবাহককে দিয়ে এক জার পানি এবং এক বাক্স মাটি পাঠালেন। এটা ছিল প্রতীকী উপহার যা গ্রহণ করলে বুঝা যাবে যে গ্রিকরাও পারস্যদের অধীনে থাকতে রাজি আছে। কিন্তু গ্রিকরা সেই প্রতীকী উপহার প্রত্যাখ্যান করল। এতে দারিয়াস প্রচণ্ড ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলেন এবং তিনি বিরাট সেনাদল যোগাড় করলেন। উদ্দেশ্য গ্রিকদেরকে এমন শিক্ষা দেয়া, যেন ওরা কোনোদিন আর না ভোলে। কিন্তু বিশাল সাইজের সেই সেনাদল আসলে দারিয়াসের জন্য যতটা না সম্পদ ছিল, তার থেকে বেশি ছিল বোঝা। কীভাবে আপনি এত বিশাল সংখ্যক একটি বাহিনীকে এত দূরে নিয়ে যাবেন বা পরিচালনা করবেন? কীভাবে তাদেরকে রসদ সরবরাহ করবেন?

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আগের পারস্যদের যুদ্ধনীতি ছিল, ইউরোপে কখনোই স্থল বাহিনী দিয়ে আক্রমণ করা যাবে না। দারিয়াস সেই নীতিও অগ্রাহ্য করলেন। পরিণতিতে যা হওয়ার তাই হলো। পারস্যরা গ্রিকদের কি শিক্ষা দেবে; উল্টো গ্রিকরাই পারস্যদের এমন শিক্ষা দিল, যা তাদের আজীবন মনে থাকার কথা। যদিও পারস্যরা খুব বেশি দিন তাও মনে রাখেনি। এক প্রজন্ম পরেই দারিয়াসের নির্বোধ সন্তান জার্জিস আবারও বাবার মতো ভুল কৌশল অবলম্বন করে বাবার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে গ্রিসে অভিযান চালায়। কিন্তু সেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে আর এভাবেই পারস্যদের ইউরোপ জয়ের স্বপ্নময় অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তবে এরপরও বিষয়টার চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটেনি। ১৫০ বছর পর আলেকজান্ডার দি গ্রেট ভিন্নভাবে এই যুদ্ধের সমাপ্তি টানেন। আমরা প্রায়শই শুনতে পাই যে, মহাবীর আলেকজান্ডার বিশ্বজয় করেছিলেন। আসলে তিনি জয় করেছিলেন শুধু পারস্য সাম্রাজ্য আর তখন পারস্য সাম্রাজ্যকেই বিশ্ব মনে করা হতো। কারণ, পারস্যের নিয়ন্ত্রণেই চিরচেনা বিশ্বের অধিকাংশ এলাকা সেই সময়ে পরিচালিত হতো।

আলেকজান্ডারের কারণেই ভূমধ্যসাগরীয় ইতিহাসের সবটুকুই যেন মধ্য পৃথিবীর ঘাড়ে চলে আসে। আলেকজান্ডার স্বপ্ন দেখতেন ইউরোপ ও এশিয়া- এই দুই বৃহৎ এলাকাকে এক করে ফেলার। তিনি ব্যাবিলনকে তার বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী করতে চেয়েছিলেন। তার স্বপ্নের অনেকটুকুই তিনি বেশ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পারস্যের অনেক গল্প আর রূপকথাতে তাই আলেকজান্ডারের নাম পাওয়া যায়। সব সময় যে তার নাম ইতিবাচকভাবেই এসেছে তা নয়, আবার খুব যে নেতিবাচকভাবে এসেছে তাও নয়। এমনকি পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্বের অনেক শহরের নাম রাখা হয় আলেকজান্ডারের নামে। মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া হলো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আরেকটি ছোট উদাহরণ হলো কান্দাহার শহর, যেটিও আলেকজান্ডারের নামানুসারে নামকরণ করা হয়। তালেবানরা আফগান দখল করার পর এই কান্দাহার বিশ্ববাসীর সামনে পরিচিত হয়ে ওঠে। কান্দাহারকে আসলে ডাকা হতো ইসকান্দার বলে। ইসকান্দার হলো আলেকজান্ডার। উল্লেখ্য, প্রাচ্যের দেশগুলোতে আলেকজান্ডারকে ইসকান্দারই বলা হয়। কালানুক্রমে ইসকান্দার থেকে 'ইস'টা বাদ পড়ে যায়। আর কান্দারকে আরেকটু পরিশীলিত ভাষায় নামকরণ করা হয়, কান্দাহার ।

কিন্তু এত কিছুর পরও শেষ রক্ষা হয়নি। এশিয়াকে নিয়ে গ্রেট আলেকজান্ডার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা মাত্র ১১ বছরের মাথায় এসে শেষ হয়ে যায়। হঠাৎ করেই একরাতে তিনি ব্যাবিলন নগরীতে থাকা অবস্থায় মারা যান। তার কি কোনো ফ্লু হয়েছিল, নাকি ম্যালেরিয়া, নাকি অতিরিক্ত মদ্যপান করেছিলেন নাকি কেউ বিষ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

খাইয়েছিল-এগুলো নিয়ে কোনো সঠিক তথ্য জানা যায় না। আলেকজান্ডার যেসব এলাকা জয় করেছিলেন, তিনি তার সব কয়টা এলাকাই পরিচালনা করার জন্য জেনারেল নিয়োগ দিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর সাথে সাথে এসব এলাকায় অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এল। এমনকি তাদের বোধ ও ধর্ম বিশ্বাসেও বিস্ময়কর পরিবর্তন এল। পাশাপাশি তাদের চিত্রকলা, শিল্পকর্ম এবং নান্দনিক কাজকর্মেও ব্যাপক বিবর্তন ঘটলো। অনেকেই আবার চেতনার জায়গা থেকে অনেকটা গ্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে চলে গেল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরপরই তার অধীনস্ত বাকট্রিয়া রাজ্যে (আজকের উত্তর আফগানিস্তান) স্থানীয় শিল্পীরা গ্রিক দেবীর আদলে মূর্তি বানাতে শুরু করেন। আরও কিছুকাল পরে উত্তরের ভারতীয় অঞ্চল থেকে সেখানে যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব আসতে শুরু করে, তখন গ্রিক আর বৌদ্ধ উভয় চেতনাকে মিশ্রণ করে নতুন ধারার এক শিল্পকর্ম উদ্ভাবন করা হয়। যাকে এখন গ্রিসো-বুদ্ধিস্ট আর্ট হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ধীরে ধীরে এই শাসনটিও দুর্বল হয়ে যায়। গ্রিকদের প্রভাব কমতে শুরু করে। তাদের আধিপত্য কমে যায় এবং পারসিয়ান ভাষা আবার সামনে চলে আসে। এরপর আরেকটি জাতিগোষ্ঠী প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যটি ফের দখল করে। নতুন এই জাতিগোষ্ঠীর নাম ছিল পারথিয়ানস। এরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধার জাত। এই পারথিয়ানরা রোমকে পর্যন্ত স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে এই পারথিয়ানদের কারণে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের গতিটিও এক রকম থেমে গিয়েছিল । পারথিয়ান সেনারা বিশ্ব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ক্যাটাফ্রাক্ট ব্যবহার করে। ক্যাটাফ্রাক্ট হলো সেসব নাইটরা (বিশেষ সম্মানীত ব্যক্তি) যারা সম্পূর্ণ মেটাল নির্মিত বর্ম পরিধান করত আর তাদের ঘোড়াগুলোকেও একই ধরনের লোহার বর্ম পরানো হতো। ইউরোপের সামন্ত যুগে নাইটদের আমরা এই ধরনের পোশাক পরিধান করতে দেখি। পারথিয়ান সেই নাইটরা ছিলেন চলমান দুর্গের মতো। তাদের পরাজিত করা দুর্গ জয়ের মতো কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু ওজনে বেশি ভারী হওয়ায় পাথারিয়ানরা যুদ্ধের ময়দানে হালকা ওজনের বর্মবিহীন অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে যেত। যুদ্ধের ডামাডোলে কৌশল হিসেবে হালকা ওজনের এই ঘোড়াগুলো নিয়ে অশ্বারোহীরা পালিয়ে যেত। প্রতিপক্ষের সৈন্যরা ভাবত বোধহয় পারথিয়ানরা পরাজিত হয়ে গিয়েছে, তারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। ফলে তারা তাদের ধাওয়া করত এবং চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দেয়ার নেশায় নিজেরাই দিগবিদিক ছুটোছুটি করত। তখনই পারথিয়ানরা ঘোড়ার চাকা আবার ঘুরিয়ে দিত শত্রুপক্ষের দিকেই। সঙ্গে যোগ হতো শক্তিশালী প্রতিরক্ষাব্যূহ ক্যাটাফ্রাক্ট। ফলে খুব সহজেই প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারত এই পারথিয়ান যোদ্ধারা। এই কৌশলটি ইতিহাসে 'পারথিয়ান শট' হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পারথিয়ানরা মূলত পারস্যের উত্তর প্রান্ত থেকে আসা সম্প্রদায়; যারা উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় শিকারের কাজে পারদর্শি ছিল। কিন্তু যখন তারা পারস্য সাম্রাজ্যটা জয় করে নিতে সক্ষম হলো, তখন তারা নিজেদেরকে পারথিয়ান নামে নামকরণ করল। সম্ভবত পারথিয়ান হলো পারসিয়ান নামেরই আরেকটি রূপায়ণ। পারথিয়ানদের সাম্রাজ্য খুব সম্ভবত এক শতাব্দী টিকে ছিল। তবে তাদের কীর্তিকর্ম খুব একটা জানা যায় না। কারণ, শিল্প ও সংস্কৃতির বিষয়ে তাদের তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। ফলে তাদের কোনো ইতিহাসও সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। আর মেটাল ঘোড়ার ভেতর যারা থাকত, তারা সাধারণত সেখান থেকে তেমন একটা বের হতো না। ফলে ধাতুর প্রতিক্রিয়ায় তাদের শরীরেও নানা রোগব্যাধি হতো, যার কারণে অনেকেই খুব বেশি দীর্ঘ আয়ু পায়নি।

যত দিন তারা ক্ষমতায় ছিল, পারথিয়ানরা ব্যবসায় খুব মনোযোগ দিয়েছিল। তারা তাদের বাণিজ্যিক ক্যারাভানগুলোকে নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে তারা তাদের সাম্রাজ্যের ভেতরে নিরাপদে ও অবাধে যাতায়াত করতে পারত। পারথিয়ানদের রাজধানীর নাম ছিল হেকাটোমপিলস। যা মূলত একটি গ্রিক শব্দ যার নাম 'শত দরজা'। এই নাম দেয়ার কারণ ছিল পারথিয়ানদের রাজধানীটি আসলে এমন জায়গায় এবং এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল, যেখানে অসংখ্য সড়ক একসাথে এসে মিশেছিল। পারথিয়ানদের বাজারে গেলে সম্ভবত আশেপাশের অন্যসব সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের খবরও পাওয়া যেত। এই পারথিয়ান সাম্রাজ্যের পূর্বে ছিল গ্রিসো-বুদ্ধিস্ট রাজ্য, হিন্দু রাজ্য ছিল দক্ষিণে, চীন ছিল একেবারে পূর্বে, পশ্চিমে ছিল গ্রিক (সেলুসিড) রাজ্য আর উত্তরে ছিল আর্মেনিয়ানরা। যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া পারথিয়ানদের সাথে রোমানদের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। পারস্য থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে তারা সভ্যতার যে ধারাবাহিকতা পেয়েছিল, তা তারা সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। ফলে আবারও ভূমধ্যসাগরীয় আর মধ্য পৃথিবী যেটা আলেকজান্ডারের সময় এক হয়েছিল, তা পারথিয়ানদের সময়ে এসে আবার বিভক্ত হয়ে যায়।

অন্যদিকে, পারথিয়ানদের উত্থানের সময়ই মূলত চীনারা প্রথমবারের মতো একীভূত হয়। চীনের গৌরবময় ও বর্ণাঢ্য হান রাজবংশের সোনালি সময় আর পারথিয়ানদের যুগ মূলত একই সময়ে ইতিহাসে আবির্ভূত হয়। তা ছাড়া পারথিয়ান যুগের একেবারে গোড়ার দিকেই পশ্চিমে থাকা রোমানরাও তাদের সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম হয়। রোমানরা যখন প্রথমবারের মতো কার্থেজকে জয় করে, পারথিয়ানরাও তখনই ব্যবিলন নগরী জয় করে। অর্থাৎ জুলিয়াস সিজার যখন গলকে পরাভূত করে, ঠিক সেই সময়গুলোতেই পারথিয়ানরাও মধ্য পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ পায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩ শতকে পারথিয়ানরা রোমানদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যুদ্ধে বিজয়ের ফলে তারা সাড়ে ৩৪ হাজার সেনার বিশাল সেনাদলের নিয়ন্ত্রণ পায়। একই সঙ্গে তারা রোমান বীর ক্রসাসকেও হত্যা করে। এই ক্রসাস এক সময় জুলিয়াস সিজার ও পম্পেই এর সাথে মিলে রোমকে শাসন করেছিলেন।

৩০ বছর পরে পারথিয়ানরা মার্ক এন্টনি নামে একজন বীর যোদ্ধার কাছে মর্মান্তিকভাবে পরাজিত হয়। এরপর বাধ্য হয়ে তারা ইউফ্রেটিস নদীকে কেন্দ্র করে একটি সীমানা তৈরি করে যা মূলত দুইটি সাম্রাজ্যকে (রোমান ও পারথিয়ান) পৃথক করে। যীশু খ্রিষ্ট যখন জন্ম নেন তখনো পারথিয়ানরা পূর্বে তাদের রাজ্য সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখে। খ্রিষ্টানদের ব্যাপক জনপ্রিয়তাকে পারথিয়ানরা খুব একটা পাত্তা দেয়নি কারণ, তারা আবার জরথুষ্ট্র মতাদর্শে বিশ্বাস করত। যখন খ্রিষ্টানরা পূর্ব দিকে তাদের সমর্থন বাড়াচ্ছিল পারথিয়ানরা তাতেও কোনো বাধা দেয়নি। আসলে পারথিয়ানদের এহেন আচরণের কারণ ছিল এই যে, বাস্তবিক অর্থে তারা ধর্মে কর্মে খুব একটা গুরুত্ব দিত না।

পারথিয়ানরা সব সময় সামন্ত প্রথায় বিশ্বাস করত। তাদের ব্যবস্থাপনা কৌশলে বেশ কয়েক স্তরের সামন্ত জমিদারের অস্তিত্ব ছিল। এক সময় রাজকীয় শক্তি এই সামন্ত প্রথাকে গ্রাস করতে ঢুকে পড়ে। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে একটি প্রাদেশিক বিদ্রোহী দল পারথিয়ানদের শেষ শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং সাসানিদ রাজতন্ত্র নামে নতুন একটি যুগের সূচনা করে। খুব দ্রুত এই সাসানিদরা গোটা পারথিয়ান রাজ্যকে কব্জা করে নেয়। সাসানিদরা সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে খুব একটা হাত দেয়নি। তারা মূলত রাষ্ট্রকে আরেকটু কার্যকরভাবে পরিচালনা করার চেষ্টা করে। তারা গ্রিসের হেলেনিক প্রভাবকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে পারসিয়ান চেতনাকে আবারও প্রতিষ্ঠিত করে। তারা অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ, বড় বড় দালান এবং নতুন নতুন শহর তৈরি করে। জরথুষ্ট্ররা যেন আবার প্রাণ ফিরে পায়। আবারও সেই আগুন, ছাই, সূর্যের আলো, অন্ধকার, আহুরা মাজদা এবং আহরিমানের উপাসনা শুরু হয়। এবার জরথুষ্ট্রকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের সম্মান দেয়া হয়। অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু মিশনারী মানসিকতা নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে আফগানিস্তান থেকে সেখানে এসেছিল। কিন্তু তারা জরথুষ্ট্রের অতিরিক্ত প্রভাবসমৃদ্ধ এই এলাকায় খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। তারা পূর্বের দিকে সরে যায়, আর সে কারণেই বৌদ্ধ ধর্ম ইউরোপে না গিয়ে চীনের দিকে বেশি প্রসারিত হয়।

পারস্য ভাষায় অসংখ্য রূপকথা ও কল্পকাহিনি আছে, যা এই সাসানিদ যুগকে নিয়ে রচিত হয়েছে। সাসানিদদের বিখ্যাত রাজা ছিলেন খুসরো আনুসেরভান। পারসিয়ানদের গল্পে একমাত্র রাজা হিসেবে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই ইরানের পুরোনো কীর্তিগাথাতে তাদের প্রথম রাজতন্ত্রের তৃতীয় রাজার নামও এই খুসরোর নামানুসারেই এসেছে; যিনি ইতিহাসে 'কায় খসরু' হিসেবে পরিচিত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এদিকে রোমান সাম্রাজ্যও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। ২৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট ডিওক্লিটিয়ান প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে তার রাজ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করেন। সাম্রাজ্যটি এতটাই বড় হয়ে গিয়েছিল যে, একটি একক কেন্দ্রস্থল থেকে শাসনকাজ পরিচালনা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ডিওক্লিটিয়ানের সেই সংস্কার উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত গোটা সাম্রাজ্যকেই দুটি পৃথক রাজ্যে বিভক্ত করে দেয়। রোমান সাম্রাজ্যের যা সম্পদ ছিল, ভাগ করার পর তার বেশিরভাগ পূর্বে পড়ে যায়। ফলে পশ্চিমাংশটি দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, জার্মান যোদ্ধারা সেই সুযোগে রাজ্যে ঢুকে পড়ায় গোটা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে পড়ে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ে এবং বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেয়। বিদ্যালয়গুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে। পশ্চিম ইউরোপিয়ানরা সেভাবে লেখা পড়ার সুযোগ আর পায় না। ফলে ইউরোপ অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে। জার্মানি, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনে রোমান সাম্রাজ্যের যে অংশগুলো পড়েছিল, তা ধ্বংস হয়ে যায়। সমাজও তখন তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়; যোদ্ধা, যাজক আর ক্রীতদাস কৃষক। কেবল খ্রিষ্টবাদ মানুষকে একত্রে বেঁধে রেখেছিল, যা নিয়ন্ত্রণ করতেন রোমের বিশপ। পরবর্তী সময়ে তাকে পোপ হিসেবে সম্বোধন করা হয়।

অন্যদিকে, রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ তখনো টিকে ছিল। তাদের কেন্দ্রস্থল ছিল কন্সট্যানটিপোল। স্থানীয় জনগণ তখনো এই রাজ্যকে রোমান রাজ্য বলেই ডাকত। কিন্তু ইতিহাসবেত্তারা এই রাজ্যকে নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন। তারা এর নাম দেন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য।

এখানে মূলত আদি খ্রিষ্টবাদের প্রভাব বেশি ছিল। পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের মতো এখানে কোনো পোপসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন না। প্রত্যেক শহর, যেখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খ্রিষ্টান ছিল, সেগুলোকে মেট্রোপলিটান বলা হতো এবং সেখানে তাদের নিজস্ব বিশপ ছিল। প্রত্যেকটি মেট্রোপলিটান ছিল সমান মর্যাদার। যদিও কন্সট্যানটিপোলের শীর্ষ বিশপ ছিলেন ভিন্ন মর্যাদার। আর সবার ওপর ছিলেন রাজা নিজে। সকল ধরনের শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো এই বাইজেন্টাইনকে কেন্দ্র করে। এখানে লেখক ও শিল্পীরা নিয়মিত বই লিখতে থাকেন, ছবি আঁকতে থাকেন এবং অন্যান্য সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন। তবে এই যে পূর্ব রোম যা কিনা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত, পশ্চিমা বিশ্ব ইতিহাসে এই সাম্রাজ্যও কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায়নি।

অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেন, বাইজেন্টাইন আদৌ কোনো খ্রিষ্টান রাষ্ট্র ছিল কিনা। পশ্চিমারা সবাই গ্রিক দার্শনিকদের সম্বন্ধে জানেন। বিশেষ করে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল কিংবা সপোকলেস, ভার্জিল, টেসিটাস, পেরিক্লেস, মেসেডনের আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজার, অগাস্টাস এর নাম জানেন। কিন্তু দেখা যায় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর দখল আছে এমন ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সেভাবে তিনজন বাইজেন্টাইন দার্শনিকের নাম বা দুজন বাইজেন্টাইন কবির নাম কিংবা জাস্টিনিয়ান ছাড়া আর কোনো শাসকের নামও বলতে পারে না। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য টিকে ছিল প্রায় এক হাজার বছর। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটেছে এমন পাঁচটি ঘটনার কথাও কেউ বলতে পারে না।

প্রাচীন রোমের তুলনায় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য তেমন আলোচিত না হলেও সেই অঞ্চলে তারা আসলে সুপার পাওয়ারই ছিল। এর কারণ ছিল তাদের কোনো শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তাদের রাজধানী ছিল কনস্ট্যানটিপোল, যা আজ অবধি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দুর্ভেদ্য ও অজেয় শহর হিসেবে স্বীকৃত। ষষ্ট শতকের মাঝামাঝি এসে বাইজেন্টাইনরা এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ এলাকা এবং পূর্ব ইউরোপের বড় একটি অংশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারা একসময়ে তৎকালীন আরেকটি পরাশক্তি সাসানিদদের বিরুদ্ধেও গর্জে ওঠে। সাসানিদরা হিমালয়ের পাদদেশ অবধি বিরাট একটি এলাকা শাসন করত। এই দুই সাম্রাজ্যের মাঝে একটি উপত্যকা ছিল, যা নিয়ে উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ চলছিল। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলঘেঁষা এই উপত্যকায় দুই পৃথিবীর ইতিহাস একটি পর্যায়ে এসে মিলেও যায়। ফলে মাঝের এই জায়গাটি নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যকার যে দ্বন্দ্ব, তা মূলত অমীমাংসীতই থেকে যায়। অন্যদিকে, দক্ষিণে এই দুই সাম্রাজ্যের চোখের সামনেই ছিল আরব উপদ্বীপ, যেখানে স্বায়ত্বশাসিত অসংখ্য উপজাতি বসবাস করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে ঠিক এটাই ছিল মধ্য পৃথিবীর রাজনৈতিক কাঠামো।

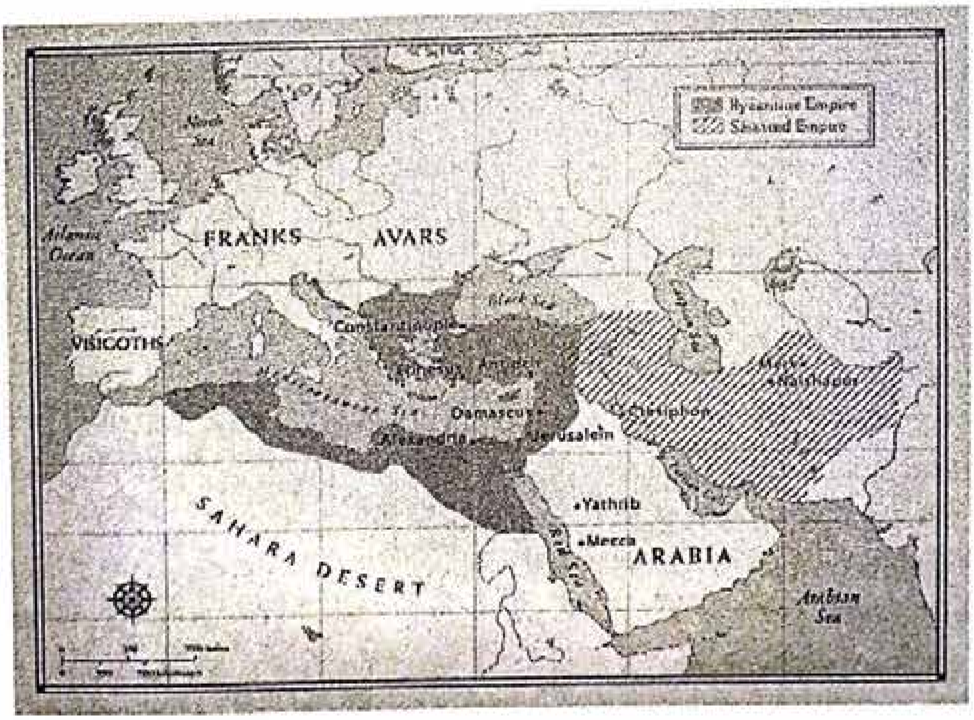

ইসলামে আগমনের প্রাক্কালে : বাইজান্টাইন ও সাসানিদ সাম্রাজ্য

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

২. দ্য হিজরা (শূন্য বছর বা ইয়ার জিরো) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ

খ্রিষ্টীয় ৬ শতকের শেষের কথা। আরব উপকূল সংলগ্ন বেশ কয়েকটি শহর তখন বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে ব্যাপক সাফল্য পায়। সেই সময়ের আরবীয় ব্যবসায়ীরা লোহিত সাগরের বন্দরগুলো থেকে নানা ধরনের পণ্য বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের মশলা, কাপড় এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্যাদি সংগ্রহ করত। তারপর মরুভূমির তপ্ত পথ পাড়ি দিয়ে সেসব পণ্য সিরিয়া, ফিলিস্তিনসহ নানা জায়গায় পৌঁছে দিত। এসব বণিকেরা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ অর্থাৎ সকল দিকেই নিয়মিত যাতায়াত করত। ফলে তারা বিভিন্ন সাম্রাজ্যে গড়ে উঠা খ্রিষ্টীয় মতবাদ বা জরথুষ্ট্র মতবাদ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখত। আরবদের নানা গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাথে বেশ কিছু ইহুদি গোত্রও বসবাস করত। ফিলিস্তিন থেকে রোমানরা ইহুদিদের উচ্ছেদ করার পর তারা এসে এসব আরব্য এলাকায় বসতি গড়ে। আরব ও ইহুদিদের মধ্যে ভাষাগত মিল ছিল আর তাদের উভয়ের পূর্বপুরুষ একই ব্যক্তি। তিনি হলেন ইবরাহিম (আ.) এবং তারও আগে হযরত আদম (আ.)। আরবরা মনে করত, আরব জাতি হযরত ইবরাহিমের (আ.) সন্তান হযরত ইসমাইল (আ.) এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেররা বংশধর। আর সেই সময়গুলোকে কেন্দ্র করে যেসব উপাখ্যান রয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই পুরোনো বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্টের অ্যাডাম এবং ইভ (আদম ও হাওয়া), কেইন এন্ড আবেল, নোয়াহ এন্ড হিস আর্ক (নুহ আ. এবং তার বিখ্যাত জাহাজ), জোসেফ এন্ড ইজিপ্ট (হযরত ইউসুফ আ. এবং মিসর), মোসেস এন্ড দ্য ফারাও (হযরত মুসা আ. এবং ফেরাউন) উপাখ্যানে পাওয়া যায়। সবগুলোই আরবীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথেও সম্পৃক্ত। যদিও সে সময়ে অধিকাংশ আরবই ছিলেন অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী এবং বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী। অন্যদিকে, ইহুদিরা ছিল মূলত একেশ্বরবাদী। এই বিশ্বাসের জায়গাটি ছাড়া বাকি সব বিষয়েই কমবেশি আরবদের সাথে ইহুদিদের মিল ছিল। বিশেষ করে জীবনযাপন ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যগুলো ছিল ব্যাপক।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই আরব এলাকায় যেসব ইহুদিরা বসবাস করত, তারা আরবি ভাষায় কথা বলত আর তাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলোও ছিল আরবদের মতন। কিছু আরব আবার ছিল বেদুইন গোত্রের যারা মূলত মরুভূমিতে বসবাস করত। তারা ছাড়া আর সব আরবই ছিল শহুরে। শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সে রকমই একটি শহুরে পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন ও বড় হয়েছিলেন। তিনি জন্মেছিলেন আরব উপত্যকার মধ্যে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন চেতনাসমৃদ্ধ শহর মক্কায়।

মক্কার অধিকাংশ মানুষ মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথেই যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাদের জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক ও লাভজনক ব্যবসা ছিল ধর্ম কেন্দ্রিক ব্যবসা। মক্কায় সে সময় এমন অনেক উপাসনালয় ছিল, যেখানে শত শত প্রসিদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল হুবাল, মানাত, লাত, উজ্জা ও ফালস। আশেপাশের সকল জায়গা থেকে প্রতিদিন শত শত মূর্তিপূজারী এসব দেবদেবীর মূর্তি দেখার জন্য এবং ধর্মীয় আচারাদি পালন করার জন্য মক্কায় আসতেন। একই সঙ্গে তারা মক্কায় কিছুটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়েও আসতেন। অর্থাৎ উপাসনাও হলো আবার সঙ্গে যদি কিছু বেচা-কেনা করে লাভ করা যায়- তাদের এমনই উদ্দেশ্য ছিল । অন্যদিকে, এই ধর্মীয় বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মক্কার লোকেরাও যথেষ্ট ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করত। মক্কা ছিল মূলত সেই সময়ের ব্যস্ততম পর্যটন ও বাণিজ্যিক শহর। আর মক্কার বাসিন্দারা নানা ধরনের সরাইখানা, দোকান ও আগত তীর্থযাত্রীদের সেবা সংক্রান্ত বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করত।

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে। তার জন্মের সঠিক ইংরেজি তারিখ জানা যায় না। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মারা যান। তিনি খুব একটা স্বচ্ছল অবস্থায় পরিবারকে রেখে যেতে পারেননি। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর মা মারা যান। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ জন্মেছিলেন তৎকালীন মক্কার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশে। কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র গোত্র ছিল বনু হাশিম। এই গোত্রেই অনেকটা ইয়াতিমের পরিচয় নিয়েই মুহাম্মাদ ﷺ বড় হতে থাকেন। তবে তিনি একেবারে পরিত্যক্ত ছিলেন না। তার পিতামাতা না থাকলেও পরিবারের অন্যান্য নিকটাত্মীয় তাকে আন্তরিকভাবে দেখভাল করতে থাকেন। প্রথমে তিনি বড় হন দাদার কাছে, দাদার ইন্তেকালের পর চাচা আবু তালিবের কাছে। আবু তালিব তাঁকে নিজের সন্তানের মতোই আদর করতেন। বাইরের সমাজে তাঁর খুব একটা চলাফেরার সুযোগ ছিল না। আবু তালিবের ঘরের চৌহদ্দির বাইরে তাঁকে সবাই ইয়াতিম হিসেবেই অবহেলা করত। এই কারণেই ছোট বেলা থেকেই তার ভেতরে ইয়াতিম এবং বিধবাদের জন্য একটু ভিন্ন ধরনের সহানুভূতি ও দরদ তৈরি হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ যখন পঁচিশ বছরে পৌছলেন, তখন খাদিজা নামে তৎকালীন সময়ের একজন অর্থশালী বিধবা তার ব্যবসা দেখাশোনা এবং বাণিজ্য যাত্রা সমন্বয়ের জন্য তাঁকে নিয়োগ করেন। সে সময়ে আরব সমাজে নারীদের কোনো সম্মানজনক অবস্থানে রাখা হতো না। মহিলাদের কোনো নেতৃত্বসুলভ কাজ করার সুযোগও দেয়া হতো না। কিন্তু খাদিজা তাঁর এই বিশাল সম্পদ পেয়েছিলেন তাঁর স্বামীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে। আর সেই নারী প্রতিকূল সমাজেও খুব কর্তৃত্বের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। এর থেকে সহজেই বুঝা যায়, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল খুবই উঁচু মানের। আর সেই কারণেই একজন নারী হয়েও গোটা একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকে তিনি নিজের কাজগুলো ঠিকমতোই চালিয়ে নিতে পারতেন। কাজ করতে করতে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আর বিবি খাদিজার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও অটুট বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। ফলে এক পর্যায়ে গিয়ে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক এতটাই ভালো ছিল, এরপর যে পঁচিশ বছর বিবি খাদিজা জীবিত ছিলেন, পুরোটা সময়ই তাদের মধ্যে এই অসাধারণ হৃদ্যতা বজায় ছিল। যদিও তৎকালীন আরব সমাজ একটি বহুগামী সমাজ ব্যবস্থা ছিল এবং সেই সময়ে কারও পক্ষেই আসলে একটি স্ত্রী নিয়ে জীবন কাটানো বেশ অসম্ভব বিষয় ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আর বিবি খাদীজার মধ্যে আত্মিক ও ভালোবাসার বন্ধন এতটাই দৃঢ় ছিল যে, যত দিন খাদিজা জীবিত ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ আর দ্বিতীয় কোনো বিয়ে করেননি।

পরিণত হওয়ার পর হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ব্যবসায়ী হিসেবে সাফল্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন খুবই বিশ্বস্ত এবং তাঁর আচার-ব্যবহার ও মানুষের সাথে সম্পর্ক এত টাই ভালো ছিল যে, তিনি সর্বমহলেই ব্যাপক প্রশংসা ও সম্মান লাভ করতেন। যখনই কোথাও কোনো দ্বন্দ্ব-বিবাদ হতো, তার মীমাংসা করার জন্য সবাই তাঁকেই ডাকত। এত কিছুর পরও যখন তিনি ৪০ বছরে পৌছান, তাঁর মধ্যে জীবন ও জীবনবোধ নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি হয়। যেগুলোকে আমরা এখন ইংরেজিতে 'মিডলাইফ ক্রাইসিস' বলে থাকি। তিনি সেই সময়ে খুবই অস্থির হয়ে জীবনের এল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন। তিনি ভাবতেন, কেন মানুষে মানুষে এত হানাহানি ও যুদ্ধ, কেন সমাজব্যবস্থায় এত অন্ধকার? কেন অপরের ক্ষতি করে নিজে বড় হওয়ার লিপ্সা? কেন মেয়েদের নিয়ে এত নোংরামি? কেন এতিমের অধিকার নেই? কেন মানুষ ইনসাফ পাচ্ছে না?·কেন এতিমের হক নষ্ট হচ্ছে? গরিব লোকদের মুখে খাবার নেই কেন? এগুলো নিয়ে তিনি সব সময়ই ভাবতেন।

এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাবতে এবং মনকে প্রশান্ত রাখতে তিনি পাহাড়ের চূড়ায় হেরা গুহার ভেতরে ধ্যান করার একটি অভ্যাস তৈরি করেন। তারপর একদিন তাঁর এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো। কীভাবে কী হলো, পুরো ব্যাপারটা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

খুবই রহস্যময়। তা ছাড়া ঘটনার বর্ণনাও যা পাওয়া যায়, তাও বেশ কয়েক ধরনের। তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে বর্ণনাটি জানা যায় তা হলো, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে জিবরাইল (আ.) নামক ফেরেশতা আগমন করেন। এক বর্ণনায় হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ঘটনা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেন, তিনি যখন গভীর ঘুমে ছিলেন, তখন জিবরাইল (আ.) একটি রেশম কাপড় নিয়ে তাঁর সামনে হাজির হন। কাপড়ের ওপর কিছু লেখা ছিল। নবি মুহাম্মাদ ﷺ তখন অন্ধকার গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ তিনি অনুভব করেন, তিনি ছাড়াও গুহাতে অন্য কেউ উপস্থিত আছে। হঠাৎ করেই তাঁকে কেউ পেছন থেকে জাপটে ধরে। এতটাই শক্ত করে ধরে যে তিনি নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছিলেন না। এরপর একটি আওয়াজ ভেসে আছে। সেই আওয়াজ নবি ﷺ-কে বলে, আপনি পড়ুন।

মুহাম্মাদ ﷺ কোনো রকম শক্ত বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেন এবং বলেন, আমি তো পড়তে জানি না।

তারপর আবার আওয়াজ আসে, ‘পড়ুন’।

আবারও মুহাম্মাদ ﷺ জানান যে তিনি পড়তে পারেন না। আর কী পড়তে হবে, তাও তিনি জানেন না।

কিন্তু আবারও একই আওয়াজ, একই আদেশ, ‘পড়ুন’।

তারপর নবি মুহাম্মাদ ﷺ অনুভব করলেন তার বুকের ভেতরে, বিশেষ করে তার হৃদয়ে ব্যাপক আলোড়ন হচ্ছে এবং এর কিছু সময় পরেই তিনি পড়তে শুরু করলেন-

> ‘পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।
> সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।
> পড়ুন, আপনার রব অনেক বেশি দয়ালু।
> যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।
> শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন কিছু, যা সে জানত না।’

এই ঘটনার পর মুহাম্মাদ ﷺ যখন পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এলেন, তখন তিনি প্রচণ্ড অসুস্থতা অনুভব করছিলেন। গায়ে জ্বর ছিল, ভয়ে উত্তেজনায় তিনি রীতিমতো কাঁপছিলেন। তাঁর কাছে চিরচেনা পৃথিবী যেন অন্যরকম লাগছিল। বাড়ি ফিরে তিনি বিবি খাদিজাকে সব খুলে বললেন। খাদিজা (রা.) তাঁকে ভরসা দিলেন, সাহস দিলেন। তিনি আল্লাহর নবিকে ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই আপনার কাছে আগত সেই সত্তাটি একজন ফেরেশতা। আর সেই ফেরেশতা আপনাকে আল্লাহর পথে কাজ করার বার্তা নিয়েই এসেছেন। আমি আপনার সব কথা বিশ্বাস করে ইমান আনলাম।’ এভাবেই বিবি খাদিজা (রা.) হয়ে গেলেন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রথম অনুসারী, প্রথম মুসলমান।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই দাওয়াতি কাজ পরিচালনা করতেন। এরপর একটা সময় পর্যন্ত তাঁর কাছে আর কোনো ওহির বার্তা এল না। ফলে তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু দিন কয়েক পরে আবারও তাঁর কাছে ওহি আসা শুরু হলো। আস্তে আস্তে তিনি তাঁর দাওয়াতি কাজের পরিধি বাড়ালেন। তিনি মক্কাবাসীকে আহবান করলেন, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর প্রতি তোমাদেরকে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে। অন্যথায় তোমরা সবাই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।' আর আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ মানে তোমাদেরকে যিনা, মদ্যপান, বর্বরতা এবং স্বৈরাচারী মানসিকতা ছাড়তে হবে। আর গরিব-দুঃখীর প্রতি সদয় হতে হবে। তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে সামষ্টিক কল্যাণকে গুরুত্ব বেশি দিতে হবে।

মক্কায় অনেকগুলো উপাসনালয় থাকলেও একটি বিশেষ বর্গাকৃতির উপাসনালয় ছিল, যাকে সবাই অন্য যেকোনো উপাসনালয়ের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা দিত। সেই উপাসনালয়ের কোণায় একটি মসৃণ কালো পাথর ছিল- যা অনেক কাল আগে আকাশ থেকে পড়েছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এই উপাসনালয়ের নাম কাবা। জানা যায়, ইবরাহিম (আ.) তার সন্তান ইসমাইল (আ.) -এর সহযোগিতা নিয়ে এই ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন। মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন এই ইবরাহিম নবির (আ.) বংশধর এবং তিনি ছোটবেলা থেকেই হযরত ইবরাহিমের (আ.) একেশ্বরবাদ সম্পর্কে জানতেন। মহানবি ﷺ তাই অনুধাবন করতেন, তিনি যে ধর্মের বাণী সবাইকে জানাচ্ছেন, তা নতুন কোনো ধর্ম নয়। বরং আদি পুরুষ ইবরাহিম (আ.)সহ হাজারো নবি যে এক আল্লাহর পথে মানুষকে ডেকে গেছেন, তিনি তার পরম্পরায় নিয়োজিত আছেন। তাই তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, কাবাই হলো আল্লাহর ঘর আর এটাই মক্কার একমাত্র উপাসনালয়।

'আল' আরবি শব্দ, যার ইংরেজি মানে হলো 'The' আর বাংলায় খুব নির্দিষ্ট করে কাউকে বোঝানোর জন্য এই শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। ইলাহ্ মানে প্রভু আর আল্লাহ মানে হলো একমাত্র রব। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ প্রচার করলেন, আল্লাহই সর্বশক্তিমান এই মহাবিশ্বের একমাত্র অধিপতি। তাঁকে মানবিক কোনো আকৃতিতে বা নির্দিষ্ট কোনো পরিধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সব তাঁরই সৃষ্টি।

মক্কার তৎকালীন ব্যবসায়ী নেতারা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর এসব কথাবার্তাকে নিজেদের ব্যবসার জন্য হুমকি হিসেবে মনে করলেন। কারণ, তারা এত দিন পুরোনো মূর্তিপূজার ধর্ম ও তাকে কেন্দ্র করে যে পর্যটন ব্যবসা বেশ ভালোই চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা ভাবল, এই এক আল্লাহর বিধান যদি এখানে চালু হয়

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বা এক আল্লাহর অস্তিত্ব যদি তারা স্বীকার করে নেয়, তাহলে আরও যে অসংখ্য দেবদেবী আছে, যাদেরকে দেখার জন্য প্রতি বছর হাজারো লোক মক্কায় আসে, তারা তখন আর আসবে না। ফলে ব্যক্তিগতভাবে তারা দেউলিয়া হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, প্রতি বছর প্রায় এক মিলিয়নেরও (১০ লাখ) বেশি লোক মক্কায় আসত, কাবাকে কেন্দ্র করে উপাসনা কার্যক্রম করার জন্য। সেই সময়ের হিসেবে বিশ্বে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় গণজমায়েত।

শুধু ইবাদত বা উপাসনার জন্য নয়, যেসব পর্যটক মক্কায় আসতেন, তাদের একটা বড় আগ্রহের জায়গা ছিল বিনোদন। আর সেই বিনোদন মানে হলো মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি। বিভিন্ন গোত্রের ক্ষমতাধর সর্দাররা এসব বিনোদন ব্যবসা পরিচালনা করে অনেক টাকা পয়সার মালিকও হয়ে গিয়েছিল। তাই তারাও মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাদের আর্থিক প্রসারের জন্য হুমকি মনে করত। আবার যে যার মতো থাকার যে স্বাধীনতা, মুহাম্মাদ ﷺ -কে মানতে গেলে এক নেতার আওতায় চলে যেতে হবে-এটাও তারা মানতে পারছিল না।

যদিও হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথায় প্রথম দিকে যারা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন দাস ও আর্থিকভাবে দুর্বল। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উসমানের (রা.) মতো বড়লোকরাও মুসলমান হয়ে যাওয়ায় কুরাইশরা একটু উদ্বিগ্ন ছিল। আর এর পরপরই হযরত উমর (রা.) ইমান গ্রহণ করলেন। তিনি মক্কার প্রচণ্ড সাহসী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন এবং একসময় হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রচণ্ড শত্রু ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর মক্কার লোকেরা অনেক বেশি দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যায়।

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যতই সমালোচনা বা বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, প্রথম বারো বছর নবিজির চাচা আবু তালেব তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। যদিও আবু তালিব নিজে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি বলেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় পাওয়া যায়। তথাপি তিনি আসলে তার ভ্রাতৃষ্পুত্রকে পরম মমতা ও স্নেহ দিয়ে রক্ষা করেছেন। আর তার কথাকে মক্কার লোকেরা গুরুত্বও দিত। বিবি খাদিজাও যত দিন জীবিত ছিলেন, তার স্বামীকে সর্বোচ্চ পরিমাণ নিরাপত্তা ও সহযোগিতা করে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে একই বছর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এই দুইজন শুভাকাঙ্ক্ষী মারা যান। ফলে শত্রুরা এখন অনেক বেশি বেপরোয়া ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বেশ কিছু ঘটনা পরিক্রমার পর একবার কুরাইশদের প্রধান সাতটি গোত্রের প্রধান ব্যক্তিরা রাতের আঁধারে মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা করেন। যদিও এই গোত্রগুলোর সবাই হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে চিনত ও ভালো জানত। তারপরও তারা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সৌভাগ্যবশত তাদের এই পরিকল্পনার কথাটি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ জেনে যান এবং কীভাবে এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তা নিয়ে তার অতি বিশ্বস্ত দুই সঙ্গীর সাথে শলা-পরামর্শ করেন। এই দুই বিশ্বস্ত ব্যক্তির একজন ছিল আলি ইবনে আবু তালিব (রা.), যিনি ছিলেন বুদ্ধিমান একজন যুবক। এই আলি (রা.) পরবর্তী সময়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর একমাত্র মেয়ে ফাতিমা (রা.)-কে বিয়ে করে আল্লাহর রাসূলের জামাই হওয়ার মর্যাদা পান। আর অন্য আরেক বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহচর হযরত আবু বকর (রা.), যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিজ পরিবারের বাইরে থেকে ইসলাম গ্রহণ করা প্রথম ব্যক্তি। হযরত আবু বকর (রা.) পরবর্তী সময়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উপদেষ্টা ও শ্বশুর হওয়ার সম্মান লাভ করেন।

ইতোমধ্যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে লোহিত সাগরের উপকূলঘেঁষা শহর ইয়াসরিবের লোকদের যোগাযোগ হয়। ইয়াসরিব (পরে এই শহরটির নামকরণ হয় মদিনা) মক্কা থেকে ২৫০ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। এই শহরের মানুষেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের তুলনায় কৃষিকাজের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিল। তবে তারাও সে সময় খুব শান্তিতে ছিল না। কারণ, ইয়াসরিবেও অনেকগুলো গোত্র ছিল এবং তারা হরহামেশাই নিজেদের মধ্যে মারামারি আর বিবাদে ব্যস্ত থাকত। ইয়াসরিবের লোকদের প্রত্যাশা ছিল বাইরে থেকে বিশুদ্ধ মনের একজন আগন্তুক আসলে, তারা তাকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করবেন এবং এর বিনিময়ে তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার করে সকল গোত্রের মাঝে বিরাজমান বিবাদগুলো নিরসন করে দিতে পারবেন। একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুখ্যাতি অনেক আগে থেকেই তারা জানত। আর মক্কায়ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যকার বিবাদ ইতঃপূর্বে মুহাম্মাদ ﷺ চমৎকারভাবে সমাধান করেছিলেন। তাই ইয়াসরিবের মানুষেরা মনে করছিল, এই মুহাম্মাদই ﷺ হবেন তাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি, যিনি তাদের শহরে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন।

এরপরও তাদের পক্ষ থেকে অনেকেই মক্কায় এসে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেখেন এবং তাঁর সহানুভূতিশীল আচরণ দেখে তাঁর প্রতি তাদের আস্থা আরও বেড়ে যায়। ফলে তারা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান এবং আল্লাহর রাসূলকে ﷺ মদিনায় যাওয়ার দাওয়াত দেন। রাসূল ﷺ সেই দাওয়াত কবুলও করেন।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের এক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনা করে মক্কার অধিপতিরা। সেই রাতেই হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রিয় বন্ধু আবু বকরকে (রা.) সাথে নিয়ে মরুভূমির পথে পাড়ি জমান। আলি (রা.) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূল ﷺ-এর বিছানায় শুয়ে পড়েন, যেন বাইরে থেকে কেউ এসে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তাঁকে দেখে মনে করে যে মুহাম্মাদ ﷺ শুয়ে আছে। আততায়ীরা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করতে এসে তাঁকে না পেয়ে এবং সেই বিছানায় আলিকে (রা.) দেখে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কিন্তু তারা আলির (রা.) বয়স কম দেখে তাকে ছেড়ে দেয় এবং নবি মোহাম্মাদ ﷺ কে খোঁজার জন্য মরুভূমিতে অনুসন্ধানী দল পাঠায়। সেই রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং হযরত আবু বকর (রা.) মক্কার নিকটেই একটি গুহায় আশ্রয় নেন। অলৌকিকভাবে সেই গুহার মুখে মাকড়শা জাল ফেলে। রাসূল ﷺ-কে খুঁজতে আসা একটি দল সেই গুহার কাছে আসে ঠিকই; কিন্তু গর্তের মুখে মাকড়শার জাল দেখে তারা মনে করে, অনেক দিন এই গুহায় কেউ ঢোকেনি। এই ভেবে তারা ফিরে যায়। অবশেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর বন্ধু আবু বকরকে (রা.) নিয়ে নিরাপদেই ইয়াসরিবে পৌছান। সেখানে আগে থেকেই আরও বেশ কিছু মুসলমান হিজরত করেছিলেন এবং এরপর আরও অনেকেই এসে পৌছান।

মক্কা থেকে যারা এভাবে মদিনায় আসলেন, তারা সকলেই নিজ বাড়ি ও সম্পত্তি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেকেই নিজেদের পরিবারের সদস্য ও আপনজন যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদেরকেও ছেড়ে আসেন। কিন্তু তারপরও তারা নিজ শহর ছেড়ে আসেন। কারণ, ইয়াসরিবে তারা নিরাপদে থাকতে পারবেন আর এখানে তাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে কর্তৃত্ব করার সুযোগও দেয়া হয়েছিল। তাই জীবনের সম্মান ও মর্যাদাও এখানে তারা বেশি পাবেন।

ইয়াসরিববাসী তাদের কথা রেখেছিল এবং তারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিরাজমান বিবাদ মীমাংসা করার ক্ষমতাও দিয়েছিল। আল্লাহর রাসূলও ﷺ তার দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন। তিনি মদিনা সনদ নামে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করাতে সক্ষম হন, ফলে ইয়াসরিবে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি গোত্র তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিল। কারণ, নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর এই ভারসাম্যপূর্ণ চুক্তির কারণে প্রতিটি গোত্র স্বাধীনভাবে তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচারাদি মানতে পারত। এর মাধ্যমে প্রতিটি গোত্রের স্বাধীনতা ও সম্মান ছিল। তাই এক গোত্র আরেক গোত্রের ওপর অন্যায়ভাবে চড়াও হতে পারত না। কোনো গোত্রের ভেতরে কোনো সমস্যা হলে নিজেরাই তা সমাধান করতে পারত। আর সবচেয়ে বড় কথা এই চুক্তিটি মদিনাকে আরও সুরক্ষিত করে। চুক্তি অনুযায়ী মদিনা যদি কখনো বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকার হয়, তাহলে মুসলমান বা অমুসলমান সবাই মিলে একসাথে এই শহরকে রক্ষা করবে। উল্লেখ্য, মদিনা সনদ বা চার্টার অব মদিনা নামে এই চুক্তিটি পরিচিত হলেও এটাকে বলা যায় মানব ইতিহাসের প্রথম লিখিত সংবিধান।

একই সঙ্গে নবি মুহাম্মাদ ﷺ আরেকটি অনন্য সাধারণ কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে আসা প্রতিটি পরিবারের জন্য একজন

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

করে ইয়াসরিবের স্থায়ী বাসিন্দা নিয়োগ করলেন, যাতে তারা নতুন এই মানুষগুলোকে নতুন শহরে স্থিতিশীল হতে এবং নব উদ্যমে জীবন শুরু করতে সাহায্য করতে পারেন। এই সময় থেকেই ইয়াসরিবের মুসলমানদেরকে আনসার বা সাহায্যকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়।

অন্যদিকে, ইয়াসরিবের নামটিও পাল্টে ফেলা হয়। নতুন করে এর নাম দেয়া হয় মদিনা যার অর্থ শহর। মূলত মদিনাতুন নবি বা নবির শহর হিসেবে নাম দেয়া হলেও পরে সংক্ষিপ্তভাবে মদিনা নামটিই বেশি প্রচলন হয়। আর মক্কা ছেড়ে মদিনায় আসার এই বিষয়টিকে অভিহিত করা হয় হিজরত হিসেবে। কয়েক বছর পরে যখন মুসলমানরা তাদের নিজেদের ক্যালেন্ডার বা দিনপঞ্জিকা তৈরি করে, তখন তারা এই হিজরতের দিন থেকেই দিন গণনা শুরু করে। আরবিতে যাকে বলা হয় হিজরি। হিজরতের দিনটিকে এতটা গুরুত্ব দেয়ার কারণ ছিল এই যে, মুসলমানরা মনে করত এই দিনটি আসলে নতুন একটি ইতিহাস শুরু করার দিন। এটা ইতিহাসের এমন এক মাহেন্দ্রক্ষণ, যেখান থেকে তাদের সৌভাগ্য শুরু হয়েছে। এই কারণে মুসলমানরা সময়ের দুটি হিসেব শুরু করে। একটি হলো হিজরতের পূর্বকালীন, আরেকটি হলো হিজরত পরবর্তী।

কোনো কোনো ধর্ম তাদের দিন গণনা শুরু করে তাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠাতার জন্মের দিন থেকে। আবার কোনো কোনো ধর্ম দিন গণনা শুরু করে, সেদিন থেকে যেদিন তাদের ধর্ম প্রচারক প্রথমবারের মতো স্বর্গীয় বার্তা পেয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বৌদ্ধ ধর্ম সেদিন থেকেই শুরু হয় যেদিন সিদ্ধার্থ গৌতম বধি গাছের নিচে বসে প্রথম ধর্মের ঐশী সন্ধান লাভ করেন। অন্যদিকে, খ্রিষ্টানেরা যীশুখ্রিষ্টের জন্ম, মৃত্যু এবং পুনরাবির্ভাবকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু মুসলমানরা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মদিনকে খুব যে গুরুত্ব দেন, তা নয়। যেমন একজন মুসলমান হিসেবে আমি ভালোমতো জানতামও না যে কবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। কারণ, শৈশবে যখন আফগানিস্তানে বড় হয়েছি, তখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমি সেখানে আলাদা কোনো আয়োজন করতে দেখিনি। মিসরের মতো কিছু দেশ রয়েছে, যারা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মদিনকে একটু বর্ণাঢ্যভাবে পালন করে। তবে যেটাই হোক না কেন, যীশুখ্রিষ্টের জন্মদিনকে যেমন ওরা ক্রিসমাস হিসেবে পালন করে, এ রকম কোনো 'মুহাম্মাদ মাস' পালনের বিধান ইসলামে নেই।

যে রাতে কুরআন প্রথম নাযিল হয়, সেটা অবশ্য মুসলমানদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই রাতটি মর্যাদার রাত্রি, শক্তি অর্জনের রাত্রি। এই রাতকে বলা হয় 'লায়লাতুল কদর' যা রমজান মাসের ২৭ বা কাছাকাছি কোনো বেজোড় রাতে পালন করা হয়। তবে এই ঘটনাটি ঘটেছে মুসলিম হিজরি গণনা শুরু হওয়ারও ১০ বছর আগে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

একটি জায়গা থেকে আরেকটি জায়গায় চলে যাওয়ার এই ঘটনাটি (হিজরত) কেন এতটা গুরুত্ব পেল? চিন্তা করলে দেখা যায়, মুসলিম ইতিহাসে হিজরতের এই ঘটনাটি খুবই গর্বের এবং প্রেরণার। কারণ, এই হিজরতের কারণেই মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিচয় লাভ করে। যাকে বলা হয় উম্মাহ্। হিজরতের আগে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নির্দিষ্ট কিছু অনুসারীর নেতা ছিলেন আর হিজরতের পর তিনি গোটা একটি জাতির নেতা হয়ে গেলেন। পুরো জাতি আইন প্রণয়ন, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং সামাজিক বিধি-বিধান আরোপের ক্ষেত্রে তাঁর ওপর নির্ভর করত। যারা মদিনায় রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বাধীন জাতির মধ্যে শামিল হতো, তারা তাদের পূর্বাপর নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর সম্পর্কের তুলনায় নতুন এই সম্প্রদায়ের মানুষগুলোর সাথে বেশি মজবুত সম্পর্ক বজায় রাখত। কারণ, মদিনা ছিল রাসূল ﷺ-এর শৈশবে দেখা জাহেল মক্কার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিত্র, যা অনেকটা স্বপ্নগাঁথা, একটি অসাধারণ মানবতাবাদী সমাজ প্রকল্প।

এই সামাজিক প্রকল্পটি হিজরতের পর মদিনায় বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে ইসলাম একটি ধর্ম, তবে একই সঙ্গে এর একটি রাজনৈতিক চেহারাও রয়েছে। অবশ্যই ইসলাম আমাদেরকে সঠিক ও সুন্দর পথের কথা বলে। প্রতিটি মুসলমান এই নির্দেশনা মেনে জান্নাতেও যেতে চায়। তবে ইসলাম কখনো একক একজন ব্যক্তির ধার্মিক বা মানবিক উন্নয়নের কথা বলে না। বরং ইসলাম এমন একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করে যার মাধ্যমে গোটা একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজও প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পাওে, যদি তারা এই উম্মাহ্র অংশ হতে পারে এবং যদি তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন ধরনের ইসলামি সামাজিক প্রকল্পে শরিক করতে পারে। কারণ, প্রকৃত বাস্তবতা হলো ইসলাম এমন একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে, যেখানে কোনো এতিম পরিত্যক্ত অবস্থায় বড় হবে না, কোনো বিধবা বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হবে না, কেউ না খেয়ে থাকবে না আর কেউ ভয়ে দিন কাটাবে না।

যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ মদিনার নেতা হয়ে গেলেন, মানুষ তখন দলে দলে তাদের জীবনের নিত্য-নৈমত্তিক বিষয়ে উত্থিত প্রশ্নে জবাব পাওয়ার জন্য তাঁর নিকট আসতে লাগল। সেটা ছোট প্রশ্ন হোক, কী বড়। যেমন: বাচ্চাদের কীভাবে মানুষ করব? কীভাবে হাত ধোঁয়া যায়, চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত, চোরের সাথে আমরা কেমন আচরণ করব ইত্যাদি। অন্য সম্প্রদায়ে এসব প্রশ্ন হয়তো বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছে করা হতো। ধরা যাক, আইন বিষয়ক প্রশ্ন হলে বিচারকদের কাছে বা আইন প্রণেতাদের কাছে, কিছু প্রশ্ন রাজনীতিবিদদের কাছে, কিছু প্রশ্ন চিকিৎসক আবার কিছু প্রশ্ন শিক্ষকদের কাছে। কিন্তু মদিনা রাষ্ট্রে সকল বিষয়েই প্রশ্ন করা হতো কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মক্কায় থাকা কালে কুরআনের যেসব সূরা নাযিল হয়েছিল তার ভাষা ছিল অনেকটা এ রকম :

> 'যখন পৃথিবী তার চূড়ান্ত কম্পনে প্রকম্পিত হবে। যখন পৃথিবী তার বোঝা বের করে দেবে। এবং মানুষ বলবে এর কী হলো? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে সে রকমই আদেশ করবেন। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে আবির্ভূত হবে, যাতে তারা তাদের কৃতকর্ম দেখতে পারে। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলেও তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে। সূরা যিলযাল

যদি আপনি মদিনায় নাযিল হওয়া আয়াতগুলোকে দেখেন, তাহলে সেখানেও আপনি একই ধরনের আবেগতাড়িত ও ছন্দময় ভাষা পাবেন। তবে তার পাশাপাশি এমন আয়াতও পাবেন-

> 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুয়ের অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবচেয়ে ভালো জানেন। নিসা: ১১

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এসব সূরাতে বিভিন্ন বিষয়ে আইন বা বিধান প্রদান করা হয়েছে। কারণ, মুসলমানরা এই সময়ে এসে উম্মাহ্ হিসেবে নানাভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছিল তাই তাদের এই ধরনের নির্দেশনারও প্রয়োজন বোধ হচ্ছিল।

হিজরতের পর মদিনার সকল বাসিন্দাই ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করছিল। কিন্তু শহরের বড় বড় ৩টি ইহুদি গোত্র ছিল, যারা কোনোভাবেই ইসলাম গ্রহণে রাজি হচ্ছিল না। একটা সময়ের পরে, তাদের সাথে মুসলমানদের বেশ ব্যবধানও তৈরি হয়। আবার আরবদের মধ্যে যারা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর এসব বিধিবিধানে এবং নবি হিসেবে ক্রমাগত গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, তাদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অন্যদিকে, যদিও মুহাম্মাদ ﷺ মক্কা থেকে ২৫০ মাইল দূরে গিয়ে বসবাস করছিলেন, তথাপি মক্কার কুরাইশরাও তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র তখনো চালিয়ে যাচ্ছিল। কুরাইশরা তার মাথার জন্য ১০০ উট পুরস্কার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা গোটা মুসলমান জাতিকে নির্মূল করার চেষ্টায় ছিল। মদিনায় যাতে ভালোভাবে আক্রমণ করা যায় এবং সেজন্য যেনকোনো অর্থের সংকট না হয় সে কারণে মক্কার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যও আরও বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, মদিনায় থাকা মুহাজিররা সুযোগ পেলে মক্কার এসব বাণিজ্যিক অভিযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করত। ফলে একদিকে যেমন মক্কার ব্যবসায়ীরা সংকটে পড়ে আর অন্যদিকে মক্কায় রমরমা ব্যবসা ফেলে আসা এসব মুহাজিরদেরও আর্থিক সংকটের কিছুটা লাঘব হয়।

এভাবে কয়েক দফা চলার পর মক্কার লোকেরা বেশ শক্তি সঞ্চয় করে। তারা সহস্রাধিক সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে, মুসলমানরা তাদের প্রতিরোধে মাত্র ৩০০ জন সৈন্য নিয়ে বদরের ময়দানে যুদ্ধে মিলিত হয় এবং যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজিত করে। পবিত্র কুরআন বদরের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বার বার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই যুদ্ধ হলো আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতার উত্তম নিদর্শন। আল্লাহর ওপর যদি কেউ ভরসা করে, তাহলে যেকোনো যুদ্ধে আল্লাহ তার সৈনিকদের বিজয় দান করেন। তাতে শত্রু সংখ্যা যত বেশি হোক না কেন বা অন্য যত প্রতিবন্ধকতাই আসুক না কেন।

বদর যুদ্ধের পূর্বে কিছু বেদুইন চুক্তিতে মক্কার বণিকদের জন্য দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করত। কিন্তু বদরের যুদ্ধের পর তারা পক্ষ বদল করে মুসলমানদের দিকে আসতে থাকে। মদিনায় মুসলমানদের এই ক্রমবর্ধমান সাফল্য প্রতিপক্ষ ইহুদিদের আরও আতঙ্কিত করে তোলে। ৩টি ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায় পূর্বে সাক্ষরিত মদিনা চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। তারা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। যদিও তাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যসিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে এই সম্প্রদায়কে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সবকিছু দেখে কুরাইশরা আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে যায়। অবস্থা এমন হয়ে যাচ্ছিল যে, তারা যতই মুহাম্মাদ ﷺ-কে শেষ করার চেষ্টা করছিল, ততই যেন তারা নিজেরাই আরও বেশি করে অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিল। হিজরতের ৩য় বছরে তারা আরও বড় বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। তারা বদরের তুলনায় সৈন্য সংখ্যা ৩ গুণ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ ৩ হাজার সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে তারা মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। অন্যদিকে, মুসলমানদের সৈন্য

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৫০ জন। মানে তাদের প্রতি একজনকে তিনজন কুরাইশ কাফেরকে মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু বদরের পর মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। কোনো সংখ্যাধিক্যকেই তারা আর গুরুত্ব দিতে চায়নি। কারণ, তারা বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে আছেন।

ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় যে বড় যুদ্ধটি হয়, তার নাম উহুদ। যুদ্ধের প্রথমদিকে মুসলমানরা প্রায় জিতেই যাচ্ছিল। কিন্তু যখন মক্কার কুরাইশরা পিছু হটছিল, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রকাশ্য একটি নির্দেশকে ভুলে গিয়ে তাদের তাড়া করছিল। এতে মুসলিম সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ফলে কুরাইশরা প্রখ্যাত বীর যোদ্ধা খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে আবার মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল ﷺ-এর সাহাবি হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন এবং দীর্ঘকাল মুসলমানদের সেনাপতি হিসেবে অনেকগুলো যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সেই উহুদের যুদ্ধে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও আহত হন। সর্বমোট ৭০ জন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন এবং অনেকেই আহত হন। উম্মাহ্ টিকে থাকে, তবে উহুদ মুসলমানদের ইতিহাসে একটি বড় আকারের ট্রাজেডি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে আজও।

ইসলামের ইতিহাসে যেসব যুদ্ধ হয়েছে, আসলে তা ইতিহাসের অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় বেশ ছোট আকারের। তবে প্রতিটি যুদ্ধই ইসলামের ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রতিটিরই আলাদা আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। যেমন, বদরের যুদ্ধে প্রমাণ হয়েছে জাগতিক বিষয়াবলী বা প্রতিবন্ধকতার তুলনায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু উহুদের যুদ্ধে কী প্রমাণ হয়েছে? সেখানে আল্লাহর পথের সেনানীরা কেন পরাজিত হলেন?

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাখ্যামতে উহুদের যুদ্ধ থেকে আমরা অন্য ধরনের শিক্ষা নিতে পারি। প্রিয় নবির ﷺ মতে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যতটুকু বিপর্যয় দেখেছে, তা হয়েছে শিক্ষা নেয়ার জন্যই। মুসলমানরা এই পৃথিবীতে যাই করুক না কেন, এমনকি যুদ্ধও যদি করে, তা হতে হবে একটি ন্যায়নিষ্ঠ কারণ থেকে। কিন্তু উহুদের যুদ্ধ চলাকালীন সাময়িকভাবে হলেও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধপণ্য পাওয়ার লোভ এসেছিল। ফলে তারা রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করতেও দ্বিধা করেনি। আর সেই কারণেই তারা সে সময়ে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু মুসলমান হওয়ার কারণেই সকল ধরনের ঐশী নেয়ামত তার জন্য বরাদ্দ থাকবেই, তা নয়। বরং এই নেয়ামতটুকুও মুসলমানকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর দেয়া বিধান পালন করার মধ্য দিয়েই অর্জন করে নিতে হবে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই শিক্ষাটি মুসলমানদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় হলেও তারা এখান থেকে সরে এসেছে বারবার। আর তারা সেকারণেই অনেকবার বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে বলেও ইতিহাস থেকে জানা যায়। তেরো শতাব্দীতে হোলোকাস্টের পর মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলীয় সম্প্রদায় যখন তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বড় একটি অংশ কেড়ে নেয়, তখনো এর প্রয়োজন ছিল। আর ১৮ শতক থেকে শুরু হয়ে আজ অবধি মুসলমানদের ওপর পশ্চিমাদের যে আধিপত্য চলছে, তার মোকাবেলায়ও এই শিক্ষার প্রয়োজন অপরিসীম।

যাহোক, উহুদের পর মুসলমানদের ওপর পরবর্তী আঘাত হানার জন্য কুরাইশরা দুই বছর ধরে পরিকল্পনা করে। কুরাইশরা এবার শুধু নিজেরা নয় বরং আশেপাশের বিভিন্ন জাতি ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী থেকে লোক নিয়ে ১০ হাজার সৈন্যের বিরাট এক বাহিনী তৈরি করে। সেই সময়ের আলোকে এটা ছিল এক বিশাল বাহিনী। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন জানতে পারেন যে কুরাইশরা এই বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনার দিকে আসছে। তখন তিনিসহ তার সঙ্গীরা মিলে মদিনা শহরের চারপাশে পরিখা তৈরি করে এক ধরনের প্রতিরক্ষা বুহ্য নির্মাণ করেন। কুরাইশরা বিপুল সংখ্যক উট নিয়ে সেই যুদ্ধে এসেছিল কিন্তু তারা সেই পরিখা ভেদ করে সামনে এগুতে পারেনি। তাই তারা মদিনা শহরের চারপাশে অবস্থান নিয়ে এক ধরনের অবরোধ আরোপের মাধ্যমে মদিনাবাসীকে না খাইয়ে মারার ষড়যন্ত্র করে। পরিখা নির্মাণ করে এই যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করায় একে ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

এই অবরোধের পেছনে আসলে ভিন্ন একটা অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। উহুদের যুদ্ধের পর মদিনার ইসলাম বিরোধী আরেকটি ইহুদি গোত্রও কুরাইশদের সাথে যোগসাজশে মদিনার বিরুদ্ধে কাজ করছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই প্রথম ইহুদি গোত্রের মতো তাদেরও বিচার হয় এবং পরবর্তী সময়ে মদিনা থেকে বের করে দেয়া হয়। তৃতীয় ইহুদি গোত্রটি ছিল বনু কুরাইজা। তারা প্রথম দুই ইহুদি গোত্রের পরিণতি দেখে সতর্ক হয় এবং মদিনা চুক্তির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে সে যাত্রায় রক্ষা পায়। খন্দকের যুদ্ধের সময় এসে এই গোত্রের নেতারা গোপনে কুরাইশদের সাথে আঁতাত করে। তাদের গোপন সমঝোতা অনুযায়ী কুরাইশরা যখন সম্মুখ দিক থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করবে, তখন বনু কুরাইজাও পেছন দিক থেকে আক্রমণ করবে। এভাবে দুইদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের বিপর্যস্ত করে ফেলার পরিকল্পনা আঁটে তারা।

কিন্তু পরিখার কারণে কুরাইশরা সম্মুখদিক থেকে কোনো আক্রমণ চালাতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের গোপন সহযোগী বনু কুরাইজাও হতাশ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, কুরাইশদের এই বাহিনীটি যেহেতু বিভিন্ন গোত্রের মানুষের সম্মেলন ছিল,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তারাও ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা মূলত এসেছিল যুদ্ধ করতে কিন্তু যুদ্ধ না করে এভাবে দিনের পর দিন বসে থাকতে থাকতে থাকতে তারাও হতবিহবল হয়ে পড়ে। এরপর এক রাত্রিতে বালুঝড় শুরু হলে তারা সম্পূর্ণরূপে কুপোকাত হয়ে যায়। ফলে তারা অবরোধ বাদ দিয়ে নিজেরাই কেটে পড়ে আর কুরাইশরাও ব্যর্থ মন নিয়ে আবারও মক্কায় ফিরে যায়।

তবে পুরো এই ঘটনাটি নেতিবাচক ফল দেয়ায় সবচেয়ে বিপদে পড়ে যায় বনু কুরাইজা গোত্র। এই ঘটনার পর তাদের গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায় এবং তাদের সকল সহযোগীও তাদের ছেড়ে চলে যায়। মদিনা সনদ লঙ্ঘনের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়। বিচারকের আসনে ছিলেন তাদেরই আস্থাভাজন এবং মদিনায় এক সময়ে তাদের সহযোগী একজন ব্যক্তি। বিচারে বনু কুরাইজা গোত্রের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ প্রমাণ হয় এবং পুরুষদের শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড আর নারী ও শিশুদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই বিচারের রায় কার্যকর করা হয়।

এই বিচারিক প্রক্রিয়াটি গোটা আরব জাহানে একটা ভিন্ন ধরনের বার্তা পৌঁছে দেয়। মদিনায় আইনের শাসন কতটা শক্তিশালী সেই সম্পর্কেও সবাই ধারণা পায়। যদিও কুরাইশরা খন্দকের যুদ্ধে বিশাল পরিমাণ সেনা সমাবেত করেও বিজয়ী হতে পারেনি বরং এক ধরনের হতাশাজনক পরাজয়বরণ করে মক্কায় ফিরে এসেছিল। কিন্তু যেভাবে তারা নাস্তানাবুদ হলো, তা তৎকালীন বিশ্বে অপরাজেয় মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে। পৃথিবীর অন্য সকলে তখন বুঝতে পারে, মুসলমানরা কেবল আর অন্য দশটা জাতি গোষ্ঠীর মতো সাধারণ কোনো জাতিগোষ্ঠী নয়। বরং তারা চিন্তা, চেতনা ও কর্মে অনেকটাই ভিন্ন। মুসলমানরা অন্য সকলের চেয়ে ভিন্ন ধরনের জীবনযাপন করে। তারা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আচারাদি পালন করে। আর তাদের এমন একজন ভিন্ন প্রকৃতির নেতা ছিল, যার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে গেলেই তিনি ধ্যানে বসে যেতেন এবং কিছুক্ষণ পর খুবই কার্যকর একটি সমাধান দিয়ে দিতেন। এত সুন্দর সমাধান তিনি কীভাবে দেন, এটা জানতে চাইলে মুসলমানদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বলতেন ঐশী বার্তা তাকে সাহায্য করে। আর সেই কারণেই মুসলমানরা কোনো কিছুতেই ভয় পেত না। এমনকি তাদের সংখ্যার তুলনায় তিন গুণ বেশি বড় সেনাবাহিনীকেও তারা অবলীলায় হারিয়ে দিতে পারত।

কোথা থেকে সেই ঐশী বার্তাগুলো আসত?

বাইরের জগতে সেই শক্তিমান খোদা নিয়ে অনেক রকম ভাবনা ছিল। অনেকেই মনে করত, মুহাম্মাদ ﷺ -এর কাছে তাদেরই মতো কোনো শক্তিশালী দেবতার

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সন্ধান আছে। কিন্তু মুসলমানরা পরে সেই বিভ্রান্তি দূর করে এবং বিশ্ববাসীকে জানায়, তারা কোনো দেব-দেবীর উপাসনা করে না। তারা ইবাদত করে সেই রাব্বুল আলামিনের যিনি সারা বিশ্বজাহানের একমাত্র মালিক। মুসলমানদের এই বিশ্বজগতের মালিক কথাটিও বেশ আলোচিত হয়। অমুসলমানরা ভাবে যদি আদৌ সে রকম কোনো মাবুদ থেকে থাকে, তাহলে পৃথিবীতে মুহাম্মাদই ﷺ একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে সেই সর্বশক্তিমানের যোগাযোগ আছে।

কারণ, দেখা গেল ক্রমশ মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করার মতো ব্যক্তি বা মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করার মতো বাহিনী কমে আসছে। কেউ আর মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার সাহস পাচ্ছে না। খন্দকের যুদ্ধের পর জোয়ারের বেগে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। অনেকেই ভাবতে পারে, এত বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে আসলে ব্যক্তি স্বার্থে; বিজয়ীদের সাথে থাকার লোভে। কিন্তু মুসলমানরা এটা বিশ্বাস করত না। তারা বিশ্বাস করত, মানুষ প্রতিনিয়ত ইসলামকে বুঝতে পারছে বলেই মুসলমান হচ্ছে। তা ছাড়া হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহচর্য ও ধর্মীয় অনুশাসন মানাও অদ্ভুত সুন্দর এক অভিজ্ঞতা। তাই নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে আসলে তাঁর যাদুময় সংস্পর্শেই অনেকেই সত্যের পথে ফিরে আসত।

প্রথাগতভাবে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কখনোই দাবি করেননি, তার আধ্যাত্মিক কোনো ক্ষমতা আছে। তিনি বলেননি মৃতকে জীবিত করতে পারেন বা পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারেন কিংবা অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারেন। তিনি বরাবরই একটা দাবি করেছেন, তা হলো তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকেই কথা বলছেন। এমনও নয় যে, তাঁর মুখ থেকে যাই নিঃসৃত হতো, তার সবটাই সরাসরি আল্লাহর বাণী। তিনি নিজে থেকেও অনেক কিছু বলতেন। তাহলে কখন তিনি ওহির বাণী বলতেন আর কখনইবা তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বলতেন?

ঐ সময় এটা নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। আজকের দিনে এসে মুসলমানরা কুরআন পড়া বা শোনার সুন্দর একটি পন্থা বের করেছে, যার নাম কিরাত। এর কথাগুলো মানুষ বললেও মানুষ যেভাবে সাধারণত কথা বলে, সেভাবে সাধারণত তারা কিরাত করে না। কুরআনের তেলাওয়াত সুরেলা কিন্তু এটা আবার কোনো গানও নয়। এর শব্দ বা কথাগুলো এমন ব্যক্তির হৃদয়েও আবেগ সৃষ্টি করে, যিনি হয়তো এর কোনো শব্দের অর্থই বোঝেননি। যারা কিরাত করেন, তাদের প্রত্যেকের পড়ার ধরন আলাদা থাকলেও তাদের সকলেরই মৌলিকত্ব সাদৃশ্যপূর্ণ। যখন মুহাম্মাদ ﷺ সাহাবিদের সামনে কুরআনের নতুন নাযিল হওয়া আয়াত পাঠ করতেন, হয়তো এমনই কোনো আবেগতাড়িত ও যাদুকরী কণ্ঠে তা বলতেন। সেই কারণেই যখন কেউ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছ থেকে কুরআনের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তেলাওয়াত শুনত, তারা যে শুধু সাদামাটাভাবে শুনত তা নয়; বরং শোনার সময় তারা এক ধরনের আলোড়নও অনুভব করত। খুব সম্ভবত কোনো ভাষার কুরআনের অনুবাদকেই প্রকৃত কুরআন হিসেবে মুসলমানরা স্বীকৃতি দেয় না। তারা মনে করে কুরআন অবিভাজ্য। এর প্রতিটি শব্দ, শব্দের অর্থ, এমনকি এর প্রতিটি উচ্চারণের তাৎপর্য রয়েছে। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি দিয়ে প্রকৃত কুরআনকে বুঝা যাবে না। মুসলমানরা আরও বিশ্বাস করে, এর একটি শব্দও হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিজের নয়। বরং তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে আর সেই কারণেই দলে দলে মানুষ কুরআনের অমিয় বাণী শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আরেকটি বিষয়ও ছিল, যা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের বাণী বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তা হলো, তৎকালীন বিশ্বের এই জায়গাটি বরাবরই খুব অশান্ত ছিল। তখনকার সময়টা এমন ছিল যে, লোকালয় মানেই হলো অনেকগুলো গোত্রের সমন্বয়, যাদের মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ বা নিধন করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করত আবার কিছু দিন পর হয়তো নতুন আরেক সম্প্রদায় নেতৃত্বে চলে আসত। বিশেষ করে আরব অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিষয়টা যেন স্থায়ী রূপ লাভ করেছিল।

যখনই হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নেতৃত্বে আসলেন, তিনি মানুষকে বললেন এ রকম হানাহানি বন্ধ করে শান্তিতে বসবাস করার জন্য। আর বিশ্বাসীরা তা পালনও করল। মুসলমানরা এরপরও লড়াই করেছে, আর তা অধিকাংশ সময়েই আত্মরক্ষা করার জন্যই। তারা একে অন্যের সাথে অহেতুক যুদ্ধে লিপ্ত হতো না। তাদের টিকে থাকার ক্ষেত্রে যেসব বহিঃশত্রুরা হুমকি ছিল, তারা শুধু তাদের সাথেই শক্তি ব্যয় করত। যারা ইসলাম গ্রহণ করে উম্মাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত হতো, তারা সাথে সাথেই প্রবেশ করত দার ইসলামে যার মানে 'আত্মসমর্পণের জগতে'। এরপর বিভিন্ন আচার-আচরণ ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট সমর্পিত করে দিতেন। 'দার ইসলাম'-কে শান্তির জগৎও বলা হতো। আর ইসলামের শান্তিময় গণ্ডির বাইরে যেই জগৎটি ছিল, তাকে বলা হতো দার-আল-হার্ব বা যুদ্ধের জগৎ।

ইসলাম গ্রহণ করা মানে শুধু মুসলমান হওয়া নয়; বরং একই সঙ্গে একটি অনুপ্রেরণামূলক সামাজিক প্রকল্পেও যুক্ত হওয়াকে বুঝানো হতো। এই সামাজিক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক সাম্যের ভিত্তিকে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। আপনার উম্মাহ্‌কে টিকিয়ে রাখতে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। কারণ এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ যারা গ্রহণ করবে তাদেরকে অনেক ধরণের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

শত্রুর মোকাবেলাও করতে হবে। জিহাদ মানে সহিংসতা নয়। জিহাদের ভালো অর্থ হতে পারে 'সংগ্রাম'। পশ্চিমারা সামাজিক ন্যায়বিচারের নামে যা করছে, এক অর্থে জিহাদ বলতে সেই সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেই বুঝায়। আর এই ধরনের সংগ্রাম হয় খুবই মহৎ। এই সংগ্রামটি চালানো হয় একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আর সেই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যদি কখনো সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন হয়, তাতেও কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয়।

পরবর্তী দুই বছরে আরব উপত্যকায় থাকা সকল নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় মুহাম্মাদ ﷺ -এর আনুগত্য মেনে নেয়। তারা ইসলাম গ্রহণ করে উম্মাহ্‌র অংশ হয়ে যায়। এক রাতে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ স্বপ্ন দেখেন যে তিনি মক্কায় ফিরে গেছেন এবং সেখানে সবাই আল্লাহর ইবাদত করছেন। সকালে তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়ত করেন। তিনি প্রায় ১৪০০ মুসলমান নিয়ে ২৫০ মাইল দূরের মক্কার পথে রওয়ানা দেন। সেই সময়ে অনেকগুলো সহিংস ঘটনা ঘটলেও তিনি ও তাঁর সাহাবিরা এই যাত্রাটি করেছিলেন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়। তাদেরকে কোনো যুদ্ধেও পড়তে হয়নি। তবে মক্কার দরজা তাদের জন্য খোলা হয়নি। কুরাইশরা তাদের সেখানে যেতে অনুমোদন দেয়নি। তবে কুরাইশদের নেতারা শহরের বাইরে এসে মুসলমানদের সাথে চুক্তি করে। ইতিহাসে যাকে হুদায়বিয়ার সন্ধি হিসেবে অভিহিত করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী মুসলমানরা এই বছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু তারা পরের বছর মক্কায় প্রবেশ করতে এবং সকল ধর্মীয় কার্যক্রম পালন করতে পারবে। কুরাইশরা এই চুক্তির সময়েই বুঝে গিয়েছিল, তাদের দিন শেষ।

ষষ্ঠ হিজরিতে মুসলমানরা পুনরায় মক্কায় আসে এবং কোনো রকম সহিংসতা ছাড়াই কাবা প্রদক্ষিণ করে। দুই বছর পরে মুসলমানরা মক্কা বিজয় করে নেন। মক্কা জয় করেই প্রিয় নবি ﷺ কাবার ভেতরে রাখা সকল মূর্তি ধ্বংস করেন এবং কাবাকে বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্র ধর্মীয় স্থান হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপরও কুরাইশদের কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা কেউ হালে পানি পায়নি। ক্রমান্বয়ে সকল আরব উপজাতি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নেতৃত্বে একীভূত হয় এবং ইতিহাসে প্রথম বারের মতো গোটা আরব অঞ্চল শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০ম হিজরিতে (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে) আল্লাহর রাসূল ﷺ আরেকবার মক্কার পথে বের হয়ে এক সমাবেশে মুসলমানদের উদ্দেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। সেই ভাষণে তিনি প্রত্যেক মুসলমানের জীবন ও সম্পত্তিকে অপরের জন্য আমানত ও পবিত্র সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি প্রতিটি মানুষ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এমনকি দাসদাসীকেও মানুষ হিসেবে পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন। তিনি বলেন পুরুষের যেমন নারীদের ওপর অধিকার রয়েছে, ঠিক তেমনি পুরুষের ওপরও নারীদের অধিকার রয়েছে। তিনি আরও ঘোষণা করেন মুসলমানদের মধ্যে সবাই সমান, কেউ ছোট বা বড় নয়। বড় যদি কাউকে হতেই হয়, তাহলে তিনি হবেন তার আখলাক বা উত্তম চরিত্রের কারণে। তিনি আরও বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবতার জন্য তিনি সর্বশেষ রাসূল ﷺ-এর পরে আর কোনো নবি আসবে না এবং কারও মাধ্যমে ঐশী ওহিও আর অবতীর্ণ হবে না।

এরপর তিনি মদিনায় ফিরে আসেন। মদিনায় ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় তিনি তাঁর সকল স্ত্রী ও ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সকলের কাছ থেকেই বিদায় নেন। সবশেষে তিনি আসেন তাঁর স্ত্রী হযরত আয়েশার (রা.) কাছে, যিনি আবার নবিজির ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু বকরের (রা.) মেয়ে। বিবি আয়েশার ঘরে থাকা অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন।

কেউ একজন প্রিয় নবির ﷺ ইন্তেকালের খবরটি পেয়েই তা উদ্বিগ্ন হয়ে থাকা জনগণকে জানিয়ে দেয়। এই খবরটি লোকমুখে শুনেই রাসূল ﷺ-এর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সাহাবি হযরত উমর (রা.) প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ব্যক্তিগতভাবে উমর (রা.) ছিলেন মেজাজি একজন মানুষ। তিনি ঘোষণা দেন, যে তার কাছে এসে বলবে নবি মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছেন, তিনি তাকে আক্রমণ করে বসবেন। মুহাম্মাদ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন, এটা অসম্ভব।

তারপর নবিজির ﷺ সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ সহচর হযরত আবু বকর (রা.) বিষয়টা সত্য কিনা তা জানার চেষ্টা করেন। এক মুহূর্ত পরেই তিনি তার মেয়ের (বিবি আয়েশা) ঘর থেকে বেরিয়ে সকলকে জানান, 'হে মুসলমানরা তোমরা যারা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপাসনা কর, তারা জেনে রাখো মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত কর, তারা জেনে রাখো আল্লাহ অমর ও চিরস্থায়ী।

আবু বকরের (রা.) এই তেজদীপ্ত ঘোষণা উমরের (রা.) উত্তেজনা অনেকটাই প্রশমিত করে দেয়। তাঁর মনে হচ্ছিল, তার পায়ের নিচ থেকে মাটি ক্রমশই সরে যাচ্ছে। তিনি প্রচণ্ড লজ্জিতও হন এবং কান্নায় ভেঙে পড়েন। কারণ, তিনি বুঝতে পারেন খবরটা সত্য, আল্লাহর নবি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সত্যি সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

৩. খেলাফতের জন্ম
হিজরি ১১-২৪ বা ৬৩২-৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ

খাঁটি মুসলমানরা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর গোটা জীবনকে একটি ধর্মীয় চেতনার প্রতিচ্ছবি মনে করে। এর মাধ্যমে আসলে জীবনের মানে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু নবির মৃত্যুর সাথে সাথেই কোনো ধর্মীয় চেতনা বা আদর্শের অবসান হতে পারে না। পরম্পরা চলতে থাকে উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে। যাকে ইসলাম 'রাশিদুন' হিসেবে উল্লেখ করেছে। রাশিদুন মানে হলো সঠিক পথের সন্ধানপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ইসলামে খুলাফায়ে রাশিদুন বলা হয় হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলি (রা.)-কে।

ইসলামের উত্থান ও বিকাশ প্রচলিত সাহিত্যে খুব ভালোভাবেই উঠে এসেছে। সেই সময়ের মানুষ নিয়মিত জার্নাল লিখত। ডায়েরি সংরক্ষণ করত। চিঠি লিখত এবং অন্যান্যভাবেও সংরক্ষণ করত। তাই ইসলামের এই সময়গুলোর ভালো পরিমাণ তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে। আর একই কারণে ইসলামের উৎপত্তি ও বিকাশ যতখানি না রূপকথা হিসেবে আছে, তার থেকে বেশি আছে সাংবাদিকতার আকারে। আর তাই এখনো পর্যন্ত আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চার খলিফা সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি, তা আসলে পেয়েছি মূলত ইবনে ইসহাকের লেখা থেকে। যিনি খেলাফতের কয়েক দশক পর এসব তথ্য সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করেছিলেন। ইবনে ইসহাক মারা যান হিজরি ১৫১ সালে (৭৬৮ খ্রিষ্টাব্দে)।

ইবনে ইসহাক মূলত তার লেখনীর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন অনেক পুরোনো ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র থেকে। বিশেষ করে সেসব মুখস্ত সংরক্ষণকারীদের কাছ থেকে, যাদের কাজ ছিল ইসলামের পুরোনো ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, স্মরণ রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিকে বর্ণনা করা। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি তৎকালীন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তার অধিকাংশ লেখাই পরবর্তী সময়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে সেগুলো পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার আগেই অন্য অনেক লেখক নিজেদের লেখায় তা উদ্ধৃত করেছেন। কেউ কেউ ইবনে ইসহাকের দেয়া তথ্যকে ব্যবহার করেছেন। কেউ ইবনে ইসহাকের লেখার নির্যাস নিজেদের মতো করে কাজে লাগিয়েছেন। কেউ আবার ইবনে ইসহাকের রচনাবলীর সারাংশ তৈরি করেছেন। কেউবা নতুন করে আবার লিখেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য কিছু কিছু শিক্ষাবিদ ইবনে ইসহাকের এসব খণ্ডাংশ লেখাগুলোকে একত্র করে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

যাহোক, ইবনে ইসহাককে পরবর্তী সময়ে যে ইতিহাসবিদ সবচেয়ে সুন্দর করে ব্যবহার করেছেন, তিনি হলেন ইবনে জারির আল তাবারি। তাবারি ইন্তেকাল করেন হিজরতের ৩০০ বছর পর। তিনি তার জীবদ্দশায় 'তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক' নামে ৩৯ খণ্ডের বিশাল একটি ইতিহাস রচনা করে যান। বইটির ঘটনাবলি শুরু হয়েছে আদম (আ.) এর কাহিনি দিয়ে আর শেষ হয়েছে ২৯২ হিজরি বা ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে এসে। তার এই বইটি এখনো বিদ্যমান। আর সত্যি কথা হলো হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আর উত্তরাধিকারী সম্পর্কে আমরা এখনো যেসব ঘটনা জানতে পারি তার অধিকাংশই এসেছে এই বইটির মাধ্যমে। আল তাবারি প্রথম আমাদেরকে জানান যে, সেই সময়ে আরবের লোকদের চুলের রং কেমন ছিল। তাদের প্রিয় খাবার কী ছিল বা তাদের মালিকানায় কতগুলো উট ছিল। আল তাবারি যেসব ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন, তার অধিকাংশই তিনি উদ্ধৃতকারীর নাম ও তথ্যসূত্রসহ উল্লেখ করেছেন। তাই তার লেখা ইতিহাস স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস গ্রন্থের মতো ততটা প্রাঞ্জল নয়। তার ঘটনার বর্ণনাগুলো শুরুই হয় একগুচ্ছ নাম দিয়ে। ধরা যাক, জনাব ক বলে গেছেন জনাব খ তাকে বলেছে যে তিনি জনাব গ থেকে শুনেছেন...। আর সেই কারণেই যেকোনো ঘটনার তথ্যসূত্র বা সত্যতা নিয়েও শঙ্কা তৈরি হয়। আল তাবারি অবশ্য নিজে কখনোই দাবি করেননি, তার বর্ণিত ঘটনার কোন অংশটি বেশি সত্য বা কোনটা একটু কম। তিনি এই সত্য-মিথ্যা বিচারের ভার পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিয়ে গেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন লেখকেরা এসব ঘটনাবলিকে তাদের মতো করে ব্যবহার করেছেন। এসব কাহিনির অনেকগুলোই পরবর্তী সময়ে বেশ জনপ্রিয়ও হয় এবং মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। আর এভাবেই ইসলামের ইতিহাসের নানা গল্পগাঁথা রচিত হয় যেগুলো বাড়ির মুরুব্বিরা আবার বাচ্চাদেরকে বলেন। যেমন, আমি আমাদের পরিবারের প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনেছি। আবার অনেক কাহিনি আছে যা শিশুরা বিভিন্ন ধর্মীয় স্কুলে বা মাদরাসায় শিক্ষকদের কাছ থেকেও জানার সুযোগ পায়।

আর ঠিক একইভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পরবর্তী ২৯ বছরের ইতিহাসও (খেলাফায়ে রাশেদার সময়) আমাদের কাছে এসে পৌঁছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সে মানুষগুলোর জীবনের একেকটি ঘটনা হয়তো অন্য অনেকের গোটা জীবনের চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। যাদের বিভিন্ন পরিণতি শুনে কখনো আমরা বিস্মিত হই, আবার কখনোবা আমাদের মন ভেঙে যায়। তাদের ইতিহাসগুলো গল্প হয়েই আমাদের মাঝে থেকে গেছে। আর সেই কারণেই এসব কাহিনি পড়ামাত্রই আমাদের মধ্যে সাধারণ প্রতিক্রিয়া হয়। আমরা কখনো কারও পক্ষে চলে যাই, আবার কখনো কার বিপক্ষে। তবে এই ঐতিহাসিক সময়ের ঘটনাবলি ইতিহাসের কাঠামোর চেয়ে গল্পগাঁথার কাঠামোতেই বেশি পাওয়া গেছে। তাই কোনো ঘটনার সত্যিকারের হেতু বা পেছনের ঘটনা বা কে কোন কারণে কী সিদ্ধান্ত নিল, তা সঠিকভাবে আমাদের পক্ষে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে, এসব ঘটনাবলি ক্রমান্বয়ে রূপক গল্পের আকার পায়। অনেক ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যা ইঙ্গিত করে, যার মাধ্যমে আবার ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় দর্শন অনুধাবন করা যায়। আমরা সাংবাদিকতার মতো বস্তুনিষ্ঠভাবে এসব ঘটনাবলিকে বিশ্লেষণ করতে পারি না। কারণ, কোনো ঘটনারই আর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী এখন নেই। আমাদের কাছে যা আছে তা হলো ইতিহাসের কিছু ঘটনা যা বারবার বলার কারণে ইতোমধ্যেই জনশ্রুতির আকার ধারণ করেছে। অবশ্য ঘটনাগুলো সনদসহ বর্ণিত হওয়ার কারণে বর্ণনাকারীদের জীবনী বিশ্লেষণ করে তা গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি চিহ্নিত করা যায়। প্রতি যুগে উলামায়ে কিরাম যেমনটা করে এসেছেন।

প্রথম খলিফা (১১-১৩ হিজরি)

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরপরই মুসলমানরা তাৎক্ষণিকভাবে বিরাট এক সংকটে পড়ে যায়। এটা অন্য কিছু নিয়ে নয়। নবির পরে তাঁর উত্তরাধিকারী কে হবে; এটা নিয়েই মূলত প্রশ্ন তৈরি হয়। যখন কোনো ধর্মীয় নেতা মারা যায়, তার পরবর্তী নেতার নাম সাধারণভাবে মানুষ ঠিক করতে পারে না। কারণ, ধর্মীয় নেতার বিষয়টি রাজনৈতিক নেতার মতো নয় যে, নির্বাচন বা নিয়োগের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাবে। ধর্মীয় উত্তরাধিকারী নেতারা প্রকৃতিগতভাবেই দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন। আর তেমন কিছু না হলেই বরং মানুষ হতাশ হয়ে যায়। আবার যখন কোনো রাজা মারা যায়, মানুষ পরবর্তী রাজার জন্য অনেককাল ধরে বসে থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার উত্তরাধিকারী পূর্বসূরির ইন্তেকালের সাথে সাথেই নিয়োগ হয়ে যান।

কিন্তু যখন নবি মুহাম্মাদ ﷺ ইন্তেকাল করলেন, এতে একদিকে যেমন মনে হলো কোনো ধর্মীয় নেতা ইন্তেকাল করেছেন, ঠিক আরেকদিকে মনে হলো বিরাট কোনো রাজ্যের অধিপতি মারা গিয়েছেন। অর্থাৎ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উভয়দিকেই একটি বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হলো। এটা এমন এক শূন্যতা, যা কাউকে দিয়ে কোনোভাবেই পূরণ করা যাবে না। কিন্তু তারপরও কাউকে না কাউকে তো তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব নিতেই হবে। কারণ, নেতা ছাড়া উম্মাহ্‌কে এক রাখা কঠিনও হয়ে যেতে পারত।

নতুন যিনি নেতৃত্বের পদে আসীন হবেন, তাকে শুধু নেতা হলেই চলবে না, অনেকটা সাম্রাজ্যের অধিপতির মতোও হতে হবে। কারণ, মুসলমানরা সাধারণ কোনো সম্প্রদায় ছিল না। মুসলমানরা আল্লাহর ওহির শক্তিতে বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে, যা কিছু হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছাতেই হচ্ছে এবং তাদেরকে এই পৃথিবীতে গুণগত পরিবর্তন আনার জন্যই পাঠানো হয়েছে। তাই এই সম্প্রদায়ের নেতাকে কেবল বুদ্ধিমান, সাহসী, শক্তিশালী হলেই চলবে না। তাকে কিছু ধর্মীয় জ্ঞান ও মান এবং কিছু আধ্যাত্মিক ক্ষমতাও অর্জন করতে হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উত্তরসূরি আল্লাহ কর্তৃক ওহি পাবেন না বা পথ নির্দেশনা পাবেন না। কারণ, রাসূল ﷺ নিজেই বলে গেছেন, তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবে না। তাই তাঁর ইন্তেকালের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগল, যদি নবির উত্তরাধিকারী আরেকজন নবিও না হন, আবার প্রচলিত ধারার কোনো রাজাও না হন, তাহলে আসলে কে হবেন সেই ব্যক্তি?

যদিও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তথাপি আল্লাহর রাসূল ﷺ যত দিন জীবিত ছিলেন, কেউ সেই প্রশ্ন কখনো উত্থাপন করেননি। এমনকি তার ওফাতের কয়েক ঘণ্টা পরও কারও মাথায় এই চিন্তা আসেনি। এতো জটিল একটা প্রসঙ্গ আলোচনা করার মতো অবস্থায় কেউ ছিলেন না। তবে রাসূল ﷺ-এর ওফাতের কিছু সময় পর যখন নবিজির ﷺ দেহ আস্তে আস্তে শীতল হয়ে আসছে, তখন হযরত আবু বকর (রা.) একটি খবর পেলেন। তিনি জানতে পারলেন যে, মদিনার আনসার সাহাবিদের বেশ কয়েকজন নেতা মিলে একটি বৈঠকে বসেছেন। সেখান থেকে তারা মুসলমানদের পরবর্তী নেতা নির্ধারণ করবেন। সেই আনসার সাহাবিদের প্রতিক্রিয়া এমন যেন মদিনার আনসার আর মক্কার মুহাজিররা ভিন্ন গোত্রের মুসলমান। তাহলে কি উম্মাহ্‌র সংহতি প্রশ্নের মধ্যে পড়ে গেল?

আবু বকর (রা.) এই বৈঠকের খবরটি পেয়েই রাসূল ﷺ-এর কিছু ঘনিষ্ঠ সাহাবির সাথে পরামর্শ করে আনসারদের সেই বৈঠকে হাজির হয়ে আনসারদেরকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, মুসলমানদের একক নেতা হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, আমাদের যিনি নেতা হবেন, তাকে কোনো নবি হতে হবে না, রাজা হবেন না। তিনি শুধু জরুরি প্রয়োজনে বৈঠক ডাকবেন, আলোচনা সমন্বয় করবেন

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এবং উম্মাহ্‌কে একত্রিত রাখবেন। হযরত আবু বকর (রা.) এই বলে তার সঙ্গে থাকা দুজন শীর্ষ সাহাবি হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আবু উবাইদা (রা.) দেখিয়ে তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করার আহবান জানান।

হযরত উমর (রা.) এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নার্ভাস হয়ে পড়েন। আবু বকর (রা.) থাকতে তিনি কীভাবে দায়িত্ব নেন? এটা যে ভাবা যায় না। তিনি হযরত আবু বকরের হাতটি ধরেন এবং উপস্থিত সকলকে বলেন, যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন তাই কেবল আবু বকর (রা.) একমাত্র ব্যক্তি, যিনি উম্মাহ্‌কে নেতৃত্ব দিতে পারেন। ক্রন্দনরত অবস্থায় তিনি সেখানেই হযরত আবু বকরের (রা.) কাছে বাইয়াত নেন। মুহূর্তেই গোটা বৈঠকের পরিবেশ পাল্টে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, উত্তরাধিকারী হওয়ার বিবেচনায় আবু বকর (রা.)-এর যেন কোনো বিকল্পও নেই। কারণ, আবু বকর (রা.) ছিলেন একজন কোমল আচরণের হৃদয়বান ব্যক্তি, যিনি তার গোটা জীবনের পরতে পরতে জ্ঞান, সাহস ও দরদের প্রদর্শন করেছেন। এক পর্যায়ে গোটা বৈঠক সর্বসম্মতভাবে আবু বকর (রা.)-কে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করে এবং তাকে খলিফা হিসেবে সম্বোধন করে। খলিফা আরবি শব্দ যার অর্থ উপপ্রধান, ইংরেজিতে এর অর্থ করলে হবে ডেপুটি।

আবুবকর (রা.) উত্তরাধিকারী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার আগ পর্যন্ত এই খলিফা উপাধিটি গোটা বিশ্বজাহানে আর কোথাও দেখা যায়নি। কোনো সম্প্রদায় তাদের নেতাকে খলিফা হিসেবে অভিহিত করেনি। কেউ জানতও না যে এই উপাধির মানে কী বা এই পদবিটি কতটা শক্তি ধারণ করে। প্রথম খলিফাকে দায়িত্ব নিয়েই এসব মৌলিক প্রশ্নেরও জবাব দিতে হয়েছিল।

এর পরপরই আবু বকর (রা.) মসজিদে গেলেন, সেখানে আগে থেকেই অসংখ্য লোক ভিড় করেছিল। সেখানে তার উত্তরাধিকারী নেতা হওয়ার বিষয়টা ঘোষণা দেয়া হয়। দায়িত্ব পেয়ে ঐতিহাসিক এক ভাষণে তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। যদি আমি ভালো কিছু করি, আপনারা আমাকে সমর্থন দিবেন। আর যদি আমি ভুল করি, তাহলেও আমাকে পরামর্শ দিতে দ্বিধা করবেন না। আর যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম অমান্য করি, তাহলে আপনারা আর আমার আনুগত্য করবেন না।' তার এই ভাষণে মসজিদে উপস্থিত সবাই উৎসাহী হয় এবং সকলেই তার প্রতি সমর্থন জানায়।

সেদিন অনেক মানুষ ঐ মসজিদে থাকলেও সবাই কিন্তু ছিলেন না। বিশেষ করে খলিফা পদে আসীন হওয়ার জন্য সম্ভাব্য একজন ব্যক্তি ছিলেন হযরত আলি (রা.)। তিনি জানতেনই না খলিফা কে হবে, এই নিয়ে আদৌ কোনো

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আলোচনা বাইরে হচ্ছে। যখন সিনিয়র সাহাবিরা খলিফা নির্ধারণ নিয়ে একের পর এক বৈঠক করছেন, তখন তিনি তাঁর শ্বশুর ও আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে গোসল দিচ্ছিলেন। তাই গোটা বিষয়টা নিয়ে পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলেন। পরে যখন খলিফা নির্ধারণ সম্পর্কিত ইস্যুটা তিনি জানতে পারলেন, ততক্ষণে হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়ে গেছে।

আশা করি, সেই সময়ের জটিলতাগুলো আপনারা অনুভব করতে পারছেন। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ জীবনের শেষ সময়গুলোতে যেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে অবধারিতভাবেই হযরত আলির (রা.) ধরে নেয়ার সুযোগ ছিল যে তিনি হবেন রাসূলের উত্তরাধিকারী নেতা। [১] কারণ, তিনি সকল দিক থেকেই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনেকগুলো চাচাতো ভাই ছিল। কিন্তু এদের সকলের মধ্যে আলি (রা.) ছিলেন আলাদা। কারণ, তিনি ছিলেন আবু তালিবের ছেলে যিনি রাসূল ﷺ-কে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছেন এবং অত্যন্ত কঠিন কিছু সময়ে সাপোর্ট দিয়ে গেছেন। আবু তালিবের এই পিতৃতুল্য আচরণের কারণেই হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও হযরত আলির (রা.) মধ্যে রীতিমতো ভ্রাতৃত্বসুলভ আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সন্তানসুলভ সম্পর্কই গড়ে ওঠে।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল এমন যে হযরত আলি (রা.) ছিলেন নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর চেয়ে ৩০ বছরের ছোট। আর তৎকালীন আরব সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে নিয়ম ছিল, যদি কারও অনেকগুলো ভাই থাকে, তাহলে বয়সে যে ভাই বড়, তিনি পিতৃত্বের দায়িত্বগুলো আগে পালন করবেন। অর্থাৎ অভিভাবক হওয়ার দৌড়ে তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। ছোট একটি ছেলে হিসেবে হযরত আলি (রা.) শৈশব থেকেই হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও বিবি খাদিজার (রা.) সংসারে যেতেন এবং সেখানে তাঁদের আদরে তাঁর জীবনের বড় একটা সময় কেটেছে। তাই সম্পর্কে নবি মুহাম্মাদ ﷺ হযরত আলির (রা.) চাচাতো ভাই হলেও এক্ষেত্রে আলিকে (রা.) তিনি যেন অনেকটা সন্তানের চোখে দেখতেন। এ ছাড়া বিবি খাদিজার (রা.) পর হযরত আলি (রা.) হলেন দ্বিতীয় মানুষ যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ পুরুষের মধ্যে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

১. আবু বকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং খলিফা হওয়ার অধিক হকদার হওয়ার ব্যাপারে আলি (রা.)-এর মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। কারণ, নবিজি ﷺ-এর জীবদ্দশায় আবু বকর (রা.) -কেই মসজিদে নববিতে নামাজের ইমামতির জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কিছুটা নাখোশ ছিলেন এই কারণে যে, খলিফা নির্বাচনের মজলিসে কেন তাকে ডাকা হলো না। পরবর্তী সময়ে এই অসন্তুষ্টি আর থাকেনি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উহুদের যুদ্ধে যখন মনে হয়েছিল যে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে, হতাশ হয়ে অনেকেই যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন হযরত আলি (রা.) ছিলেন সেই অল্প কয়েক সাহসী সাহাবির মধ্যে একজন, যিনি আহত নবি ﷺ উদ্ধার করে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

পরবর্তী সময়ে যখন দলে দলে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসতে শুরু করল এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নবুওয়াতের পাশাপাশি একটি সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন, তখন নবি মুহাম্মাদ ﷺ সব সময়ই আলি (রা.) তাঁর রাইট হ্যান্ড হিসেবে পাশে রাখতেন। এমনকি সর্বশেষ যেই ভাষণটি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ প্রদান করেছিলেন, সেখানে তিনি সরাসরি বলেছিলেন: 'তোমাদের মধ্যে যারা আমাকে নেতা মানো, তারা আলিকেও (রা.) একইভাবে তোমাদের নেতা হিসেবে মনে করবে। তার মানে আবার এটাও নয় যে, রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর সবাই আলিকেই (রা.) নেতা হিসেবে গণ্য করবে।

এটা বাস্তবতা যে, রাসূল ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ সকল সাহাবির মধ্যেই কিছু ব্যক্তিগত ক্যারিশমা ছিল। তবে আলির (রা.) গ্রহণযোগ্যতা কিছু মানুষের কাছে, বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু যেন বেশি ছিল। তাদের অনেকেই মনে করতেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে তারা নেতৃত্বের যে গুণাবলি দেখেছেন, তার অনেকটাই আলির (রা.) মধ্যেই বিদ্যমান পাওয়া যায়।

উপরোক্ত ব্যাপারগুলোর কারণে নিঃসন্দেহে হযরত আলিকে (রা.) অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়। কিন্তু এসবের বাইরেও আরও ভিন্ন একটা বিষয়ও ছিল। যা হযরত আলিকে (রা.) আরও বেশি উচ্চতায় নিয়ে যায়, আরও বেশি মর্যাদায় আসীন করে। যা পরবর্তী সময়ে এমনকি আজ অবধি মুসলমানদের একটি শ্রেণির মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ করে। তা হলো হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর কোনো ছেলে সন্তান ছিল না। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মেয়ে ফাতিমা (রা.), তাঁর বিয়ে হয়েছিল এই আলির (রা.) সাথে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সকল পরবর্তী প্রজন্ম, যা তাঁর নাতির মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছে, তা এসেছে এই হযরত আলির (রা.) মাধ্যমেই। তাই রাসূল ﷺ-এর নিজস্ব পরিবার বলতে যা বুঝায়, তা আসলে আলি (রা.) আর ফাতিমা (রা.)-এর পরিবার।

যাহোক, আবারও ফিরে যাই সেখানে যখন আলি (রা.) তখন হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে গোসল দিচ্ছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি তেমন একটি সময়কে পেলেন, যা হয়তো তার বাকি জীবনের জন্য বিরাট এক বাস্তবতা হয়েই থেকে গেছে। তিনি আবিষ্কার করলেন, তিনি যখন ভাঙা হৃদয় নিয়ে নবি মোহাম্মাদ ﷺ-কে গোসল দিয়ে দাফন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন সেই নবিরই ﷺ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সব সাহাবিরা ব্যস্ত ছিলেন রাসূল ﷺ-এর পরে তার উত্তরাধিকারী কে হবেন, তা নির্ধারণ করা নিয়ে। তারা আলি (রা.)-কে নয় বরং অন্য কাউকে এই পদে নির্বাচন করেছে বিষয়টা শুধু তেমন ছিল না। সবচেয়ে কঠিন সত্য ছিল এই যে, কেউ এই ব্যাপারে তার সাথে পরামর্শ করারও প্রয়োজন বোধ করেনি। এমনকি জানানো হয়নি যে, তারা এমন একটি বৈঠকে বসেছেন, যেখানে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করা নিয়ে আলোচনা হবে। অবশ্যই হযরত আলির (রা.) সাথে এমনটা না হলেই ভালো হতো।

অন্যদিকে, হযরত আলির (রা.) বিশেষ একজন ব্যক্তি হয়ে উঠার যে কারণগুলো এতক্ষণ বর্ণনা করলাম, সেগুলো আবার তার বিপক্ষেও দেখা যেতে পারে। হযরত আলি (রা.) প্রিয়নবি ﷺ-এর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর পরিবারেরই একজন ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ কি কোথাও কোনো পরিবারকে আলাদা করে কোনো বিশেষ মর্যাদা দেয়ার কথা বলেছেন বা সুযোগ দিয়েছেন? পরিবারতন্ত্র অনেক পুরোনো বিষয় হলেও ইসলাম কখনোই তা অনুমোদন করেনি।

আর আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেই বলে গেছেন যে, তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবেন না। যদি এটি সত্য হয়, তাহলে আলির (রা.) যেসব ক্যারিশমার কথা এতক্ষণ বললাম, তার কোনো ধর্মীয় গুরুত্ব দেয়ার সুযোগ থাকে না। তাহলে কি মুসলমানদের উচিত নয় নেতৃত্বের জায়গাটি থেকে রক্ত সম্পর্কীয় বিষয়টিকে আলাদা রাখার চেষ্টা করা? যদি একটি ব্যক্তির পরিবার বা তার রক্তের সাথে সম্বন্ধ থাকাটিকে বড় করে দেখা হয়, তাহলে ইসলাম বিশ্বের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য যে বার্তা নিয়ে এসেছে তা কি প্রশ্নের মুখে পড়বে না? আলির (রা.) ক্যারিশমাগুলোকে কেউ যদি তাকে অনেক বড় কিছু মনে করে বসে, তাহলে ইসলামের সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিটিও কি প্রশ্নের মুখে পড়বে না?

হযরত আবু বকরের (রা.) খলিফা হওয়ার প্রসঙ্গটি যদি বাদও দেই, তাহলে আসলে সেই কঠিন সময়ে মুসলমানদের জন্য যেটা প্রয়োজন ছিল, তা হলো একটি ধীর-স্থির বিবেচনাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি এবং পরিণত সিদ্ধান্ত। আবেগতাড়িত সিদ্ধান্ত ও মনোভাব তখন জরুরি ছিল না। সেই সময়ে আলি (রা.) ছিলেন মাত্র ৩০ বছরের যুবক আর আবু বকরের (রা.) বয়স ছিল প্রায় ৬০। এ রকম প্রবীণ ব্যক্তি থাকার পরও ৩০ বছরের কাউকে নেতা বানানোটি সেই সময়ের আরবিয় সমাজের বাস্তবতায় স্বাভাবিক ছিল না। আরবে 'শায়খ' শব্দটি ছিল, যার শাব্দিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় প্রবীণ ব্যক্তি বা মুরুব্বি।

অনেকেই বলেন যে, এই কঠিন বাস্তবতাটুকু মেনে নিতে হযরত আলির (রা.) ছয় মাস সময় লেগেছিল। এও শোনা যায়, এই সময়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিছু একপেশে ভক্ত তাকে বেশ হুমকি-ধমকি দিয়েছিল এবং তার পরিবারের সাথেও দুর্ব্যবহার করেছিল। এ রকমই এক ঘটনায়, একবার কোনো একজন তার বাসার দরজা বেশ জোরে বন্ধ করেছিল। সেই দরজাটি সোজা গিয়ে ধাক্কা লাগে, রাসূল ﷺ-এর মেয়ে ও হযরত আলির (রা.) স্ত্রী বিবি ফাতেমার (রা.) পেটে, যিনি তখন অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলেন। সেই আঘাতে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তা না হলে হয়তো আমরা ইতিহাসে রাসূল ﷺ-এর তৃতীয় দৌহিত্রকে দেখতে পেতাম।

অন্য আরেকটি বর্ণনায় ইতিহাসে পাওয়া যায়, হযরত আলি (রা.) খলিফা হিসেবে আবু বকরের (রা.) দায়িত্ব নেয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তার কাছে গিয়ে বাইয়াত নেন। এই বর্ণনাকারীরা বিবি ফাতেমার (রা.) গর্ভপাতের পেছনে কারও আঘাতের বিষয়টিকে অস্বীকার করেন এবং তারা সেই মিসক্যারিজ বা গর্ভপাতকে নিছকই একটা দুর্ঘটনা হিসেবেও বর্ণনা করেন। তবে ইতিহাসে এই দুই রকমের বর্ণনা আজও বিদ্যমান! কারণ, সঠিক যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আসলে কোনোটিকেই অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায়নি। ধর্মীয় নেতৃত্বের পদে আসীন হওয়া নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত আলির (রা.) মধ্যে যেই ব্যবধানটি প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, তা আসলে পরবর্তী সময়ে প্রজন্মগুলোর মধ্যেও স্থানান্তরিত হয়। যার ফলে ইসলামের অনুসারীরা আজ অবধি দুটি ভিন্নধারায় বিভাজিত। একটি শিয়া ও আরেকটি সুন্নি। আর এই প্রতি ধারার অনুসারীদের কাছে ইতিহাসের সেই সময়ের (খেলাফতের) ঘটনাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আলির (রা.) অনুসারীদেরকে শিয়া বলা হয়, যারা মনে করে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরে হযরত আলি (রা.) ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য উত্তরাধিকারী।

মোটামুটি ৬ মাসের মধ্যে এই বিবাদ কমে এল। কিন্তু সামনে আসলো নতুন এক সংকট, যা ইসলামের অস্তিত্বকে আবারও হুমকির মুখে ফেলে দিল। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বিভিন্ন গোত্রকে যেভাবে এক ছাতার নিচে আনতে পেরেছিলেন, তাতে কিছুটা ফাটল ধরল। অনেকগুলো গোত্রই জোট ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তাদের দাবি, তারা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অনুগত থাকার জন্য শপথ নিয়েছিল; হযরত আবু বকর (রা.) বা মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে নয়। আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর মৃত্যুর পরপরই সেই চুক্তি বা শপথ অকার্যকর হয়ে গিয়েছে। মৌখিকভাবে এসব গোত্রের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের অনেকেই আবার তখনো নিজেদেরকে মুসলমানই দাবি করছিল। তারা তখনো তাওহিদ এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর নেতৃত্বকে স্বীকারও করছিল। তারা তখনো নামাজ পড়ছিল, রোজা রাখছিল, মদ ও ব্যভিচার থেকেও দূরে থাকার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করল। ইসলামের এই ফরজ ইবাদতকে তারা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছিল না। তাই মদিনার কোষাগারে এসব গোত্রের তরফ হতে যাকাতের কোনো অর্থ জমাও পড়ছিল না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিছু কিছু গোত্র তো আবার মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করল। তাদের কেউ কেউ নিজেদেরকে নবি হিসেবেও দাবি করে বসল। তারা দাবি করল যে, তাদের কাছেও আল্লাহর ওহি আসে এবং তারা ঐশ্বরিক বিধান প্রণয়নের জন্যও দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাই মুসলিম উম্মাহ্‌র পাশাপাশি রাসূলে করিম ﷺ সকল গোত্রের সাথে সহাবস্থানের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তাও অব্যাহত রাখা অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ল।

খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.) যদি এসব দুরাচার মেনে নিতেন, তাহলে হয়তো ইসলাম আজ ভিন্ন রূপে আমাদের সামনে থাকত। কিন্তু আবু বকর (রা.) এসব অনাচারের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিলেন। তিনি এসব অন্যায় কর্মকাণ্ডগুলোকে দেশদ্রোহীতা হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। রাসূল ﷺ বলে গিয়েছিলেন, যে ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। আবু বকর (রা.) সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাহ্য করেননি। তাঁর মতে যে কেউ চাইলে ইসলাম গ্রহণ করবে বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কেউ যদি একবার ইসলামের ছায়াতলে আসে, তাহলে তাকে স্থায়ীভাবেই আসতে হবে। রাজনৈতিক একটি সংকট মোকাবেলা করার জন্য আবু বকর (রা.) একটি ধর্মীয় নীতিমালা তৈরি করলেন। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিটি আজও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হলো, আল্লাহর যে একত্ববাদ তা প্রতিফলিত হবে উম্মাহ্‌র একতাবোধ ও স্বাতন্ত্র পরিচয়ের মাধ্যমে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আবু বকর (রা.) আরও বেশি করে প্রমাণ করলেন যে, ইসলাম শুধু একটি বিশ্বাস নয় বরং এটি একটি সামাজিক প্রকল্প। মুসলমান সম্প্রদায় আর অন্য দশটি সম্প্রদায়ের মতো নিছক একটি সম্প্রদায় নয় বরং এমন একটি সম্প্রদায়, যার একজন মানেও সবাই।

নতুন খলিফা নিজেকে একজন দূরদর্শী পরিকল্পনাবিদ হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন। প্রায় এক বছর ধরে তিনি ভণ্ড নবি ও অন্যান্য অপকর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি সফল হলেন। গোটা আরব সম্প্রদায়গুলোকে তিনি আবারও এক করতে সক্ষম হলেন। অন্যদিকে, উম্মাহ্‌র সাথে তিনি নম্র, দরদি এবং পরোপকারী হিসেবে আচরণ করে সকলের প্রিয় ও আস্থাভাজন হয়ে উঠলেন। বিচক্ষণ নেতা আবু বকর (রা.) জীবনযাপনে খুবই সরল ও অমায়িক ছিলেন। তিনি খুব সাদামাটা পোশাক পরিধান করতেন এবং তার মালিকানায় বলার মতো কোনো সম্পদ ছিল না। তার প্রিয় শখ বলতে ছিল দাড়ি ও চুলে মেহেদী লাগানো। যখন কোনো বিরোধ বা বিদ্রোহ দেখা দিত, তিনি খুব শক্ত হাতে তা প্রতিরোধ করতেন। তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন না। তিনি সিনিয়র সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেই পথ চলেছেন। তিনি সমাজে সাম্য ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর চেয়ে প্রভাবশালী আর

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কেউ ছিল না। আর তাঁর নেতৃত্ব টিকে ছিল জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বিধানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোষহীন। অন্যরা তার সঠিক সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্যই আদিষ্ট ছিল। আর বাস্তবতা এমন ছিল যে, তার অধিকাংশ সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক ও সময়োপযোগী।

হিজরতের পূর্বে মক্কায় থাকা অবস্থায় আবু বকর (রা.) ছিলেন একজন সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ী। মদিনায় হিজরত করার আগেই তিনি তার সম্পদের বেশিরভাগ মানবতার কল্যাণে দান করে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ইসলাম গ্রহণকারী ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। খলিফা হওয়ার পর তিনি খুব সামান্য পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করতেন আর তাতে সংসার ঠিকমতো চলত না। তাই তিনি খলিফা হওয়ার পরও নিজে বাজারে গিয়ে ছোটোখাটো ব্যবসা করতেন। কখনো কখনো তিনি অর্থ রোজগারের জন্য প্রতিবেশীর পালিত পশুর দুধও বের করে দিতেন। আর তিনি ছিলেন খুবই শিশুবান্ধব। বাজারে যাওয়ার জন্য বাচ্চারা তাঁকে আদর করে ডাকলে তিনিও তাদের মিষ্টান্ন কিনে দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করতেন।

দ্বিতীয় খলিফা (১৩-২৪ হিজরি)

দুই বছর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর, কোনো এক আগস্ট মাসে প্রচণ্ড ঠান্ডা জ্বরে আক্রান্ত হন ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.)। মৃত্যু অতি আসন্ন, এটা উপলব্ধি করতে পারলেন তিনি। সেই সময়ে এক দিন মুসলমানদের মধ্যে দায়িত্বশীল পর্যায়ের এবং সিনিয়র সাহাবিদের একটি গ্রুপকে ডেকে জানান, তিনি হযরত উমর (রা.)-কে তার উত্তরাধিকারী অর্থাৎ খলিফা হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে যেতে চান। যাতে করে পরবর্তী সময়ে এই নিয়ে আর কোনো তর্ক-বিতর্ক না হয়।

ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত উমর (রা.) খুবই সাহসী যোদ্ধা ও বীর ছিলেন। তিনি একসময় মনে-প্রাণে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে ঘৃণা করতেন। তার ঘৃণা এতটাই বেশি ছিল যে, এক দিন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখতে পেলেন যে, তার বোন গাছের নিচে বসে পাতার ওপরে কী যেন লেখা পড়ছে। তিনি বোনকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী করছ? বোনটি উত্তরে জানায়, 'পড়ছি'। 'কী পড়ছ?' বোনটি ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমি কুরআন পড়ছি। আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।' উমর (রা.) ক্ষীপ্ত হয়ে বললেন, 'কী?' বোনকে খুব মারলেন। এরপরই তিনি বোনের হাত থেকে পাতাটি ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। এটা ছিল সূরা ত্বোয়াহার একটি অংশ। হযরত উমর (রা.) পড়তে গিয়ে অবাক হলেন কারণ তার মনে হচ্ছিল,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তাকে উদ্দেশ্য করেই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে হযরত উমরের (রা.) ভেতরে যেন কী ঘটে যায়। তিনি হাত থেকে তরবারি ফেলে দেন এবং মক্কার রাস্তায় দৌড় দেন এবং সরাসরি নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে চিৎকার করে বলতে শুরু করেন, 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করেছি, আপনার ওপর ইমান এনেছি। আপনি সত্যিই একজন আল্লাহর নবি।'

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন সাহাবি হয়ে ওঠেন। তবে তিনি সব সময়ই শক্ত মনের একজন মানুষ ছিলেন। ইংরেজিতে যাকে বলে 'টাফ গাই'। তার বলিষ্ঠ আচরণের জন্য সবাই তাকে সমীহ করত, কেউ কেউ আবার ভয়ও পেত। কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ মনের মানুষ। অনেকেই মনে করেছিল যে, উমর (রা.) খলিফা হলে না জানি কী হয়। কারণ, তাকে সবাই ভয় পায় এবং তাঁর সে রকমই একটি ইমেজও তখন ছিল। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে হযরত আলি (রা.) সামনে এগিয়ে আসেন এবং হযরত উমরের (রা.) প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করেন। এরপর মুসলিম উম্মাহ্ দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে হযরত উমরকে (রা.) মেনে নেয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর হযরত উমর (রা.) উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বলেন, তিনি জানেন যে মানুষ তাকে যতটা ভালোবাসে, তার থেকে অনেক বেশি ভয় করে। কিন্তু তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করে বলেন, সবাই এত দিন আসলে তার একটি রূপ দেখেছে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং হযরত আবু বকর (রা.) উভয়েই ছিলেন নরম মনের মানুষ। কিন্তু যারা নেতা হয়, তাদেরকে অনেক সময় কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আর তারা নরম হওয়ায় এই ধরনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা ও বাস্তবায়নে তারা তাকে উমরকে (রা.) কাজে লাগিয়েছেন। হযরত উমর (রা.) ছিলেন এমন এক তরবারি, যাকে রাসূল ﷺ বা হযরত আবু বকর (রা.) অনেক সময়ই ব্যবহার করেছেন। এখন সেই উমর (রা.) নিজেই খলিফা। তাই এখন আর তার তরবারি হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, যেহেতু তিনি এখন নেতৃত্বের চেয়ারে, তাই তাঁর আচরণও এখন ভিন্ন হতে হবে। কারণ তিনি জানেন, নেতাকে অনেক সময় কোমল প্রকৃতিরও হতে হয়। তাই এখন থেকে জনগণ তার কঠোর ও কোমল উভয় ধরনের রূপই দেখবে। যারা খারাপ কাজ করবে এবং অন্যায় আচরণ করবে, তারা উমরের (রা.) আগের কঠিন রূপটিই দেখবে। অন্যদিকে, যারা দরিদ্র, অসুস্থ, দুস্থ, বিধবা এবং এতিমরা তার কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে। তারা উমরের (রা.) নরম আচরণটাই দেখবে।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই উম্মাহ্ বুঝে গেল, তারা একজন যোগ্য ব্যক্তিকেই নেতা হিসেবে পেয়েছে। উমর (রা.) ১০ বছর উম্মাহ্‌কে নেতৃত্ব দেন এবং সেই

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সময়ের মধ্যেই তিনি ইসলামের অনেক ধর্মীয় বিধানকে সংকলিত ও বিন্যাস করেন। তিনি ইসলামের রাজনৈতিক ও আদর্শিক চেহারাকে স্পষ্ট করতে সক্ষম হন। তিনি ইসলামি সভ্যতার রূপরেখা প্রণয়ন করেন এবং তিনি এমন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা আকারে রোমের চেয়েও বড়। তিনি নিজেকে ইতিহাসের এক অমর নেতা ও অনুপম ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন। তিনি বর্তমান প্রচলিত ঐতিহাসিক নেতা বিশেষত সেইন্ট পল, কার্ল মার্ক্স, লরেঞ্জো ডি মেডিসি বা নেপোলিয়নের চেয়েও অনেক যোগ্য একজন নেতা। তথাপি এটাই দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা, ইসলামের অনুসারী ছাড়া অন্য ধর্মের লোকেরা তার সেই পরিচয়টি সম্পর্কে জানে না। তারা হযরত উমর (রা.)-কে আর দশটি সাধারণ নামের মতোই একজন মানুষের নাম হিসেবেই চেনে। বড়জোড় দ্বিতীয় খলিফা বা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর পর দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী নেতা হিসেবেই জানে।

হযরত উমর (রা.) নিজেকে ইসলামের ঐতিহ্যের একটি স্বাভাবিক আবির্ভাব হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ব্যক্তি উমরের (রা.) যোগ্যতা বা তার রাষ্ট্রনায়কোচিত কার্যক্রমকে সেভাবে তুলে ধরা যায়নি এবং উমর (রা.) নিজেও তা চাননি। আর অন্য সব মুসলিম নেতার মতোই তিনিও সেভাবেই নিজেকে সামনে এনেছেন যে, তার কথাই আইন নয়, তিনি শাসকও নন। তিনি মূলত আল্লাহর দেয়া বিধানই বাস্তবায়ন করছেন। তিনি ইসলামকে সার্বজনীন ও ব্যাপক করার স্বপ্ন দেখেছেন, মুসলমানদেরকে একটি ভারসাম্য ও ইনসাফপূর্ণ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং তার কাজের মাধ্যমে তিনি সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নও করেছেন।

তিনি সব সময়ই বলতেন, 'কোনো ব্যক্তির আদেশ নিষেধ বা কোনো ব্যক্তির ক্ষমতাকে ভয় পাওয়ার সুযোগ মুসলমানদের নেই। কারণ, তাদের আছে কুরআন; আর কুরআনই তাদের জন্য একমাত্র নির্ধারিত বিধান। আর মুসলমানদের রয়েছে রাসূল ﷺ-এর একজন আদর্শ। তাই মুসলমানদের আর কিছুর দরকারও নেই। উমর (রা.) আরও বলতেন, তাঁর একমাত্র দায়িত্ব হলো মুসলিম উম্মাহ্কে একত্রিত রাখা এবং আসমানি ওহি কুরআনের ভিত্তিতে কাজ করে উম্মাহ্কে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

হযরত উমর (রা.) সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন না। তাই হযরত আলি (রা.)সহ অন্যান্য শীর্ষ সাহাবিরা তাকে রাজকোষ থেকে একটি সম্মানজনক বেতন নেয়ার অনুরোধ করেন। সিনিয়র সাহাবিদের যুক্তি ছিল, যেহেতু ইসলামের পরিধি এখন গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই খলিফার এখন পার্ট-টাইম হিসেবে কাজ করার আর সুযোগ নেই। অন্যের পশুর দুধ দোয়ানোর সুযোগও তার আর নেই।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উমর (রা.) তাদের প্রস্তাবে রাজি হন। তবে তিনি এতটুকু টাকা নিতে রাজি হন, যাতে তিনি আর দশটা সাধারণ আরবের ন্যায় জীবনযাপন করতে পারেন; এর থেকে বেশি কিছু নয়। (বর্তমান সময়ে কোনো শাসক তো দূরের কথা, বড় কোনো কর্পোরেট কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাও এমনটা বলবেন বা এভাবে চলতে চাইবেন- তা ভাবা যায় না)।

রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাত অনুসরণ করতেন বিধায় হযরত উমর (রা.) নিজের জামা নিজেই সেলাই করতেন। এমনকি বড় কোনো রাষ্ট্রীয় কাজে এলেও তিনি সেভাবেই পোশাক পরে আসতেন। তিনি দিনের বেলায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন শেষে আবার রাতের আঁধারে খাবারের বস্তা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরতেন এবং অভাবি মানুষদের ঘরে তা পৌঁছে দিতেন। একদিন তাকে একজন দেখে ফেলে এবং তার কাছ থেকে বস্তাটি নিয়ে যেতে চায়, যাতে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। কিন্তু উমর (রা.) তাতে রাজি হননি। তিনি সেই ব্যক্তিকে বরং বলেছিলেন, 'তুমি দুনিয়াতে আমার এই সামান্য কষ্ট দেখে তা লাঘব করতে চাইছ। আমার বোঝা কমাতে চাইছ। কিন্তু শেষ বিচারের দিনে কে আমার বোঝা কমানোর দায়িত্ব নিবে?'

এসব ঘটনা হযরত উমরের (রা.) উৎকৃষ্ট চরিত্রকে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলে। আমি মনে করি, তিনি লোক দেখানোর জন্য এসব করতেন না। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন ভীষণ রকমের ধার্মিক নেতা। তিনি ভান করতে পারতেন না; একজন ত্যাগী, নিবেদিত ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তার এসব আচরণের প্রভাব সমসাময়িক সকলের ওপর ইতিবাচকভাবেই পড়েছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একজন মুসলমান শাসক কেমন হতে পারে বা কেমন হওয়া উচিত, হযরত উমর (রা.) তাঁর খেলাফতের সময় সেটা উপস্থাপন করে গেছেন।

হযরত উমর (রা.) নতুন একটি উপাধি পান, যে নামে অনেকেই তাকে সম্বোধন করত। তা হলো 'আমিরুল মুমিনিন' বা বিশ্বাসীদের নেতা। এই উপাধি হযরত উমরের (রা.) আধ্যাত্মিক ও সামরিক নেতৃত্বেরও পরিচয় বহন করে। সামরিক নেতা হিসেবে হযরত উমর (রা.) এতটাই সফল যে, তাকে আলেকজান্ডার বা জুলিয়াস সিজারের সাথে তুলনা করা যায়। কিন্তু তিনি কীভাবে এতসব গুণাবলি অর্জন করলেন, তা পর্যালোচনা করা সহজ নয়। ইসলামে দাখিল হওয়ার আগে তিনি খুব সাধারণ মানের একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু নেতা হওয়ার পর তিনি যেন পুরোই ভিন্ন মানুষ হয়ে যান। ইসলামের প্রথম দিকের যুদ্ধগুলোতে তিনি সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছেন ঠিকই; তাই বলে এটা বিস্ময়কর যে, তিনি এমন করে ইতিহাসের সেরা সামরিক কৌশলী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে যাবেন। তিনি এমন একজন সামরিক নেতা ছিলেন, যিনি ম্যাপ দেখে দেখে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যুদ্ধের কৌশল ও নীতি প্রণয়ন করলেন। কোথায় যুদ্ধ করলে মুসলমানরা জয়ী হবে আর কোথা থেকে আপাতত পিছিয়ে আসতে হবে, সেটাও তিনি যেভাবে নিরূপণ করেছেন, বিশ্বের ইতিহাসে তা একটি বিরল ঘটনা।

সৌভাগ্যক্রমে সেই একই সময়ে ইসলামের ইতিহাসে আরও কিছু বীর সেনার আবির্ভাব হয়। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। যিনি যুদ্ধক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি। এ ছাড়াও ছিলেন আমর ইবনুল আস (রা.), যিনি মিসর জয় করেছিলেন। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.), যিনি পারস্য জয় করেছিলেন।

হযরত উমর (রা.) দায়িত্ব গ্রহণ করেই প্রথম সেই সামরিক অভিযানটি শুরু করেন, যেটা তার পূর্বসূরি আবু বকর (রা.) শুরু করে গিয়েছিলেন। ভণ্ড নবি ও যাকাত বিরোধীদের বিদ্রোহের কারণে আবু বকরের (রা.) খেলাফতের শেষ দিকে যখন গোটা আরব জুড়ে অস্থিরতা তৈরি হয়, তখন বাইজেন্টাইনরা আরব সীমান্তে সৈন্য প্রেরণ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আরবের অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে সেখানে অভিযান চালিয়ে আরব দখল করে নিবে। আবু বকর (রা.) এই খবর পেয়ে আরব সাগরের উপকূলে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই মুসলমানরা বাইজেন্টাইন সৈন্যদের ধাওয়া করে তাদের আবার নিজ ভূখণ্ডে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। হযরত উমর (রা.) দায়িত্ব গ্রহণের পর মুসলমানরা দামেস্ক অবরোধ করে। তখন থেকেই মুসলমানরা আবার বাইজেন্টাইনদের তাড়া করে ফিরছে। অবশেষে ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তারা বাইজেন্টাইনদের সম্পূর্ণ পরাজিত করে।

পারস্যরা এরপরও নানা ধরনের উস্কানিমূলক তৎপরতার মাধ্যমে মুসলমান জাতিকে বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় একজন একজন করে গুপ্তচরকে শায়েস্তা করার পরিবর্তে হযরত উমর (রা.) সমস্যার একেবারে মূল শিকড় উপড়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সাসানিদ সাম্রাজ্যকে উৎখাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান।

প্রকৃতপক্ষে সাসানিদ সাম্রাজ্য জয়ের এই সিদ্ধান্তটি ছিল এক ধরনের জিহাদ। বর্তমান সময়ে এসে জিহাদ শব্দটি ভীষণ নেতিবাচকভাবে ব্যবহৃত হয়। জিহাদ নিয়ে অনেক বিতর্কও রয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর আমলে জিহাদ কথাটি সেভাবে বিস্তৃত হয়নি। আমি এই বইয়ের শুরুতেও বলেছি জিহাদ মানে মারামারি বা যুদ্ধ নয়। জিহাদ মানে মূলত প্রচেষ্টা চালানো। তবে শত্রুকে মোকাবেলা করাটাকেও জিহাদ বলা হয়। একইসঙ্গে জিহাদ বলতে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও বোঝানো হয়। কুরআনে জিহাদ বলতে মূলত আত্মরক্ষাকে বুঝানো হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই সম্পর্কিত আয়াতগুলো তখন নাযিল হয়, যখন কুরাইশরা ইসলামকে নিধনের মিশনে নেমেছিল। তাই সেই সময়ে এই ধরনের সংগ্রাম বা যুদ্ধের নৈতিক অপরিহার্যতাও দেখা দিয়েছিল। যেহেতু ইসলামের অনুসারীরা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দায়বদ্ধ, তাই যারা সেই ইসলামকেই নিধন করতে চায়, তারা মূলত শয়তানের দোসর। প্রকারান্তরে যারা মানবাধিকার ও ইনসাফ কায়েমের জন্য জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে, তারা আসলে এর মাধ্যমে আল্লাহরই পক্ষে কাজ করে।

কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে যেখানে মুসলমানরা আদিষ্ট হয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে হিজরত করে সম্পূর্ণ অজানা এক দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবং তারপর সেই নতুন করে চেনা মানুষগুলোর সাথে একত্র হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সেটা আবার কেমন আত্মরক্ষার লড়াই? আর যদি সেটা আত্মরক্ষার লড়াই না হয়, তাহলে সেটা আবার কেমন করে জিহাদ হয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে আপনাকে জানতে হবে, যে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সময় থেকেই আসলে একটি নতুন ধরনের চিন্তাধারা মানুষের সামনে আসে, যা আবু বকর (রা.) ও উমরের (রা.) খেলাফতের সময়ে এসে পূর্ণতা পায়। সেটা হলো এই পৃথিবীটি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হলো 'দার-আল-ইসলাম' বা শান্তির জগৎ আর অন্যটি হলো 'দার-আল-হার্ব' বা যুদ্ধের জগৎ। এই চিন্তাধারা অনুযায়ী বিভক্তি, বিভেদ ও হানাহানির এই পৃথিবীতে ইসলাম হলো একমাত্র শান্তির পরশ। তাই কেউ যদি শান্তির পরিধি বাড়ানোর জন্য দার-আল-ইসলামকে বাড়াতে প্রচেষ্টা চালায়, সেটা আসলে মহৎ কাজ। এমনকি তা যদি যুদ্ধও হয়। কারণ, এই শান্তি প্রতিষ্ঠার এই যুদ্ধটি প্রকারান্তরে অশান্তি আর যুদ্ধের বিভীষিকাময় দার-আল-হার্বকে সংকুচিত করবে, ধ্বংস করবে।

সেই সপ্তম শতাব্দীতে কতজন মানুষ জিহাদের এই দার্শনিক ব্যাখ্যা বুঝবে, তা নিয়ে আমার সংশয় আছে। তবে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উম্মাহ্‌র মধ্যে কোনো ধরনের দ্বিধা বিভক্তি ছিল না। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওফাতের পর মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের বিভাজনও দেখা দিয়েছিল। হযরত উমর (রা.) এও বুঝেছিলেন যে, তার জিহাদের ডাক মুসলমানদের মধ্যে সেই বিভাজন দূর করবে এবং তাদেরকে এই উসিলায় আবারও একত্রিত করবে।

পনেরো হিজরিতে প্রায় ত্রিশ হাজার সেনার বিশাল মুসলিম বাহিনী কাদিসিয়া নামক একটি জায়গায় সাসানিদদের ষাট হাজার সেনার মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়। তাদের উভয় পক্ষের সেনার মাঝখানে ছিল কেবল একটা নদী।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মুসলিম সেনাপতি ওয়াক্কাস (রা.) বেশ কয়েকবার সাসানিদ সেনাপতি রুস্তমের কাছে সমঝোতার বার্তা দিয়ে দূত প্রেরণ করেন। কথিত আছে এ রকম একটি দূতের কাছে রুস্তম একবার মুসলমানদের মূল নেতার সাথে কথা বলার ইচ্ছা পোষণ করেন। তার এই ইচ্ছার কথা জেনে দূত দৃঢ় কণ্ঠে জানায়, আমরা মুসলমান। আমরা সবাই সমান। আমাদের মধ্যে কেউ ছোট বড় নেই।

রুস্তম বললেন,

> 'দেখো, আমি জানি যে তোমরা আরবেরা খুবই দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত। আমি নিশ্চিত যে, তোমরা দরিদ্রতার কারণে খুবই অস্থির সময় কাটাচ্ছ আর তাই তোমরা এখানে যুদ্ধে এসেছ। যাক, আমি তোমাদের প্রত্যেককে দুটি করে পোশাক এবং এক ব্যাগ ভর্তি খেজুর দিব। তোমরা কি তা নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরে যাবে?'

মুসলিম দূত উত্তরে বললেন,

> 'জেনারেল, আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু নেয়ার জন্য এখানে আসিনি। আমরা বরং আপনাকে ইসলাম দিতে এসেছি। আপনি যে পথে আছেন, সেটা দোজখের পথ। আমরা আপনাকে বেহেশতে যাওয়ার একটি সুযোগ দিতে এসেছি।'

রুস্তম এই কথা শুনে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন,

> 'দেখো, তুমি আমাকে সেই পুরোনো ইঁদুরের গল্প মনে করিয়ে দিলে। ওই যে এক ইঁদুর ছিদ্র করে একটি খাবারের গুদামে ঢুকেছিল এবং তারপরে যতক্ষণ তার পেট না ভরে সে শুধু খেয়েছে। তারপর বের হওয়ার সময় সে আর বের হতে পারে না। কারণ, সে এত বেশি খেয়েছিল যে, অনেক মোটা হয়ে গিয়েছিল আর তাই তারই করা ছিদ্র দিয়ে সে আর বের হতে পারেনি। তারই করা ছিদ্র দিয়ে ঢুকে, সে ফাঁদে পড়ে যায় এবং পবরর্তী সময়ে বিড়াল তাকে হত্যা করে। তোমরা আরবেরাও চুরি করে আমাদের গুদামে ঢুকে পড়েছ এবং এখন তোমরা ফাঁদে পড়েছ। সেই ইঁদুরের মতো তোমাদের সবাইকে এখানেই মরতে হবে।'

মুসলিম দূত আর রুস্তমের মধ্যে এসব কথাবার্তা আরও বেশ কিছুটা সময় চলে। এক পর্যায়ে মুসলিম দূত তাকে বলে যদি আপনারা ইসলাম গ্রহণ করতে না চান, তাহলে আমাদেরকে খাজনা প্রদান করুন, আমরা আপনাদের কোনো ক্ষতি করব না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

খাজনা? রুস্তম আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। খাজনা? সে উল্টো তার এক সেবককে বলে মুসলমান দূতকে এক ব্যাগ ভর্তি ময়লা মাটি দেয়ার জন্য। উল্লেখ্য, সে সময় এই ধরনের মাটি ভর্তি ব্যাগ দিয়ে কবর বুঝানো হতো। অর্থাৎ রুস্তম বুঝিয়ে দেয় যে সে সকল মুসলমানকে হত্যা করে তাদের কবর রচনা করবে।

কিন্তু মুসলমানরা সেই মাটি ভর্তি ব্যাগ অত্যন্ত আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে।

তারপর উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যদিও রুস্তম সেই মোটা ইদুরের ফাঁদে পড়ার কথা বলেছিল কিন্তু বাস্তবে নদী পার হয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রুস্তম নিজেই ফাঁদে পড়ে যায়। নদীর ওপরে থাকায় তার বেশির ভাগ সেনা পালানোর রাস্তাটিও আর খুঁজে পায় না। কাদিসিয়ার যুদ্ধটি সব মিলে চার দিন স্থায়ী হয়। পারসিয়ানরা অনেক হাতি ও আরব উটে চড়ে যুদ্ধে এসেছিল। তৃতীয় দিনে গিয়ে যুদ্ধটি সারা রাত ধরে চলে। শেষে সাসানিদরা যখন হাল ছেড়ে দেয়, তখন সেই হাতি, উট আর ভারি বর্ম নিয়ে তাদের সৈন্যরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সাঁতরে ওপারে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে। কিন্তু ওজনদার পোশাকের কারণে তাদের বেশিরভাগই আর নদী পার হতে পারেনি, ডুবেই মারা যায়।

কাদিসিয়ার যুদ্ধে মুসলিম সেনাদের সাথে অনেক কবি সাহিত্যিকও যোগ দেন। তারা একদিকে কবিতা লিখে যেমন সৈন্যদের অনুপ্রেরণা দেন, ঠিক অন্যভাবে তারা আবার এই যুদ্ধটিকে এবং এর সফলতাকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেন। যাতে এই যুদ্ধের বীরত্বগাঁথা রোমানদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ ট্রোজান যুদ্ধকেও ছাপিয়ে যায়।

উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার কথা বলা যায়। কাদিসিয়া যুদ্ধের বিজয় যখন আসন্ন, তখন একজন ব্যক্তি ঘোড়ার ওপর চড়ে আরবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। খলিফাকে দ্রুত যুদ্ধের বিজয়ের খবরটি দেয়ার জন্য। মদিনার কাছাকাছি আসার পর একটি সড়কের পাশে একটি তালি মারা পোশাক পড়া একজন ব্যক্তির সাথে তার দেখা হয়। ঐ ব্যক্তি তার কাছে এসে তাকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি কাদিসিয়া থেকে এসেছেন? 'জি', লোকটি জানায়। 'সেখানে যুদ্ধের কী খবর? কী অবস্থা সেখানে?' বৃদ্ধ সেই ছাপোষা পোশাক পড়া মানুষটি বারবার জানতে চাইছিল। কিন্তু যুদ্ধের ময়দান থেকে আগত সেই ব্যক্তি তাকে কিছুই বলল না। কারণ, সে সরাসরি খবরটি খলিফাকে দিতে চেয়েছিল। সে ঘোড়ায় চড়ে আবার যাত্রা শুরু করল আর বৃদ্ধ লোকটিও তার পেছনে পেছনে আসতে থাকল। মদিনায় শহরের সদর দরজায় সেই ঘোড়াবাহী লোকটি এসে নামল। সেখানে সে একটি জায়গায় ভিড় দেখতে পেয়ে সেখানে গেল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সে মনে করল, এখানে নিশ্চয়ই খলিফা উমর (রা.) থাকবে বা না থাকলেও এরা নিশ্চয়ই তার সন্ধান দিতে পারবে। সে লোকগুলোকে যখন প্রশ্ন করল, 'খলিফা উমর (রা.)-কোথায়?' তখন লোকগুলো হাসতে হাসতে তাকে জানায় এতক্ষণ যেই হতদরিদ্র বৃদ্ধ ব্যক্তিটি তার ঘোড়ার পেছনে ছুটে এসেছে, সেই ব্যক্তিই হলেন খলিফা উমর (রা.)। এটাই ছিল হযরত উমরের (রা.) জীবনযাপনের ইতিহাস।

কাদিসিয়া যুদ্ধ জয় করার পর মুসলমানরা সাসানিদ রাজধানী সিটেসিফন দখল করে। এরপরও তাদের অভিযান অব্যহত থাকে। এক সময় গোটা সাসানিদ সাম্রাজ্যটি তারা বিজয় করে নেয় এবং এভাবেই সাসানিদ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এই সাসানিদরা শতাব্দীর পর শতাব্দী রোমান সাম্রাজ্যের সাথে লড়াই করে টিকেছিল। আর মাত্র তিন বছর লড়াই করে মুসলমানরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে।

অন্যদিকে, মুসলমানদেরই অন্য বাহিনীগুলো ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় এলাকা জুড়ে বিশেষত মিসর হয়ে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত এলাকায় বাইজেন্টাইনদের সাথে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল। এই যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি ছিল জেরুজালেম- যা মক্কা ও মদিনার পর মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্র ভূমি। কারণ, সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাস অবস্থিত। তা ছাড়া আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যে মিরাজের ইতিহাস তারও শুরুটা এই বায়তুল মোকাদ্দাসেই। তাই এই স্থানের ব্যাপারে মুসলমানদের আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। এই জেরুজালেমের পরাজয় ও হযরত উমরের (রা.) ভূমিকা নিয়েও একটি অমরগাঁথা পাওয়া যায়। জেরুজালেমের আত্মসমর্পণের সময় খলিফা উমরের (রা.) নিজের যাওয়ার প্রস্তাব আসে। হযরত উমর (রা.) তা জানতে পেরে উটের ওপর চড়ে মদিনা থেকে রওয়ানা দেন। সঙ্গে শুধু উট চালানোর জন্য একজন সেবক। ঐ সেবক যেন পুরো পথ না হাটে সেটা নিশ্চিত করার জন্য খলিফা উমর (রা.) আর সেবক পালাক্রমে উটে চড়তেন। অর্থাৎ যখন খলিফা উটে চড়তেন তখন সেবক হাঁটতেন আর যখন সেবক উটে চড়তেন তখন খলিফা নিজে হাঁটতেন। যখন তারা জেরুজালেমে পৌছান, তখন সেবকের উটে চড়ার পালা- তাই সে উটে চড়েই জেরুজালেমে প্রবেশ করে আর খলিফা তখন হাঁটছিলেন। জেরুজালেমের লোকেরা উটের ওপর থাকা সেবককেই উমর (রা.) মনে করেছিল এবং তার কাছেই আত্মসমর্পণের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। পরে সেই সেবকই তাদেরকে জানান যে আমি নই যিনি নিচে উটের রশি ধরে হাঁটছেন তিনিই খলিফা উমর (রা.)।

জেরুজালেমের খ্রিষ্টানেরা ভেবেছিল যে, ইসলামের খলিফা তাদের দখলে থাকা মসজিদ বায়তুল মোকাদ্দাসে (ঐ সময় মসজিদটি চার্চ হিসেবে ব্যবহৃত হতো)

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

নামাজ পড়তে চাইবেন। কিন্তু উমর (রা.) সেটা করলেন না। বরং তিনি জানালেন, 'আমি যদি আজ এই চার্চ দখল করে সেখানে নামাজ আদায় করার সিলসিলা চালু করি, তাহলে ভবিষ্যতে মুসলমানরা আমার এই কাজকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে অনেক বাড়ি দখল করে সেখানে মসজিদ বানাতে চাইবে। আর আমরা সেটা করার জন্য এখানে আসিনি। মুসলমানদের কাজও তেমনটি নয়। আপনারা এখন যেভাবে আপনাদের উপাসনা করছেন, সেটা অব্যহত রাখতে পারেন। শুধু মনে রাখবেন, আজ থেকে মুসলমানরাও আপনাদের সাথে এখানে বসবাস করবে। মুসলমানরা তাদের মতো করে ইবাদত করবে এবং ধর্মীয় সহাবস্থান ও সম্প্রীতির একটি অনন্য সাধারণ উদাহরণ স্থাপন করবে। যদি আমাদের কার্যক্রম আপনাদের পছন্দ হয় আপনারাও আমাদের মধ্যে শামিল হতে পারেন, না হলে নয়। কারণ আল্লাহই বলে দিয়েছেন যে দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।

যেভাবে হযরত উমর (রা.) জেরুজালেম দখল করলেন এবং সেখানকার খ্রিষ্টানদের সাথে আচরণ করলেন, তা সারা জীবনের জন্য মুসলমানদের সামনে একটি নীতিনির্ধারণ করে দেয়। কোনো অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল জয় করলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে মুসলমানদের করণীয় আচরণও এখানেই বুঝে নেয়া যায়। যাহোক, জেরুজালেমের খ্রিষ্টানরা দেখল যে মুসলমানদের অধীনে থাকতে গেলে তাদেরকে বিশেষ এক ধরনের খাজনা দিতে হবে- যাকে বলা হয় জিযিয়া। এটা তাদের জন্য ছিল দুঃসংবাদ। তবে জিযিয়ার ভালো দিক হলো, এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। অর্থাৎ এর আগে বাইজেন্টাইন শাসকদের এই খ্রিষ্টানরা যেই পরিমাণ খাজনা দিত, মুসলমানদেরকে তার চেয়ে অনেক কম খাজনা জিযিয়া হিসেবে প্রদান করতে হবে। বাইজেন্টাইন শাসকদের আরেকটি খারাপ দিক ছিল যে, তারা এই খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় আচারাদির ব্যাপারে যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করত- যা মুসলমানদের মধ্যে একেবারেই ছিল না। তাই কম খাজনা ও বেশি ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকায় খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সাথে সহজেই চুক্তি করতে রাজি হলো। তাই পুরোনো বাইজেন্টাইন শাসনের অধীনে থাকা জেরুজালেম জয় করতে গিয়ে মুসলমানরা তেমন কোনো বাধার সম্মুখীন হলো না। বরং উল্টো বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলায় খ্রিষ্টানরা অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে আরও সহযোগিতা করেছে।

উমর (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন ইসলামি সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ২০ লাখ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি। ধার্মিক মুসলমানরা দাবি করেন আল্লাহর কুদরতি সাহায্যেই তারা এই বিশাল এলাকা জয় করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে, ঐতিহাসিকেরা দাবি করেন, বাইজেন্টাইন ও সাসানিদরা আশেপাশের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সাথে এমনকি নিজেদের মধ্যেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা যুদ্ধকে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দীর্ঘদিন যুদ্ধের ফলে উভয় সাম্রাজ্যেরই কাঠামোগত দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল, আর তাই তাদের পতনও অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের মতো সব সাফল্যের পেছনে অন্য আরেকটি ব্যাখ্যাও অনেকে দেন। তারা বলেন, মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করা রীতিমতো অসম্ভব ছিল। কারণ, প্রতিপক্ষের যেকোনো সৈন্যদের তুলনায় মুসলমান সেনারা অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করত। কারণ, তারা মনে করত যুদ্ধের ময়দানে নিহত হওয়া মানেই শহিদ হওয়া। আর শহিদ হতে পারলে নিশ্চিত জান্নাত। এসব ব্যাখ্যা নিয়ে আমি নতুন করে কিছু আর বলব না বরং আরও কিছু বিষয় আলোচনার জন্য সামনে আনবো।

ইসলামের সেই যুগের মুসলমানরা ভাবত তারা খুব মহৎ কোনো কিছুর জন্য লড়াই করছে। তারা ভাবত এই যুদ্ধক্ষেত্র তাদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলবে আর মরনকেও করবে স্বার্থক। এটা ইতিহাসে বারবার প্রমাণ হয়েছে যে, মানুষ যেকোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারে যদি তারা একবার বিশ্বাস করতে পারে যে তাদের এই প্রচেষ্টা জীবনকে সাফল্য মণ্ডিত করবে। জীবনকে অর্থবহ কররার মানুষের যে ক্ষুধা তা অনেকটা খাওয়া-পরার ক্ষুধার মতোই। কিন্তু মানুষের প্রথাগত গতানুগতিক বাস্তবতা জীবনকে অর্থবহ করে তোলার তেমন একটা সুযোগ করে দেয় না। খলিফা উমরের (রা.) খেলাফতের সময় জীবনকে অর্থবহ ও সফল করে তোলার একটি সুযোগ পেয়েছিল মুসলমানরা।

মুসলমানদের এই চেতনাটি জাগ্রত হয়েছিল কারণ তাদের নেতা উমর (রা.) তাই অনুশীলন করতেন যা তিনি প্রচার করতেন। কথা ও কাজে তাঁর ছিল অসাধারণ মিল। তাঁর নেতৃত্বে মদিনায় সেই মূল্যবোধই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা মুসলমানরা সব সময় প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছে। সেগুলো হলো ভ্রাতৃত্ববোধ, স্বচ্ছতা, সম্প্রীতি, শালীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষা করা, সমতা এবং পারস্পরিক সহমর্মিতাবোধ। এক কথায় বলতে গেলে, খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম বছরগুলোতে মুসলমানরা এই মূল্যবোধগুলো সফলভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। যার ফলে পরবর্তী যুগের বিশেষত বর্তমান সময়ের মুসলমানরা বেশ পরিষ্কারভাবেই অনুধাবন করতে পারে যে তাদের পূর্বসূরিরা তাদের তুলনায় কতটা নিখুঁত ও উন্নতমানের জীবনযাপন করতেন। আরও বুঝতে পারা যায়, সেখান থেকে মুসলমানরা আজ কতটা দূরে সরে এসেছে।

তবে এই যে এত যুদ্ধ বিগ্রহ বা মুসলমানদের বিজয় তাতে সাধারণ মানুষের কতটা উপকার হয়েছে- সেই প্রশ্ন অনেকেই উত্থাপন করেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত উমরের (রা.) জমানায় মুসলমান সৈন্যদের সাধারণ নাগরিকদের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সম্পত্তি দখল করার কোনো অনুমতি ছিল না। তাদের অনুমতি ছিল কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভোগ করার এবং যে রাজ্যগুলো দখল করবে সেই রাজ্যের রাজাদের সম্পত্তিগুলো কেড়ে নেয়ার। এই সম্পত্তির পরিমাণও ছিল অনেক। যুদ্ধ জয়ের পর এই ধরনের সম্পত্তির পাঁচভাগের চারভাগই সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। সম্পদ বিতরণের ক্ষেত্রে সেনাপতি আর সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। সবাই সমান অনুপাতে পেত।

আর বাকি একভাগ চলে যেত মদিনায়। আল্লাহর রাসূলের সময় থেকেই একটি ধারাবাহিকতা চলে আসছিল যা উমরও (রা.) অব্যাহত রাখেন। তা হলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাওয়া পাঁচভাগের এক ভাগটি শহরে পৌছানো মাত্রই তা শহরের গরিব বাসিন্দাদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া।

মুসলমানদের এই বিজয় অভিযাত্রা পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকে তবে কোনো এলাকা জয় করলেই সেখানে সবাইকে ধর্মান্তরিত করা হতো না। অভিযান আর ধর্মান্তকরণ- এই দুটোকে সব সময় আলাদা রাখা হয়েছে। যাতে এটা জোর দিয়ে বলা যায় যে, তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে কাউকে মুসলমান বানানো হয়নি। মুসলমান সেনাপতিরা অধিকৃত অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতা নেয়ার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, সেখানকার মানুষকে মুসলমান বানানোর ওপরে নয়। কারণ, মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে সাথে মুসলিম সংস্কৃতি স্বাভাবিকভাবেই অধিকৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত। ইসলাম যে কেবল ধর্ম নয় বরং একটি বৃহৎ সামাজিক প্রকল্প-এই ধারণাটি খুব দ্রুতই আশেপাশের সব রাজত্বে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ মুসলমানরা ক্রমশ এসব সাগর, নদীপথ ও স্থল পথের রুটগুলো দখল করে নিচ্ছিল; সেগুলোই ছিল সেই সময়ের ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগের মূল নেটওয়ার্ক। তাই অন্য সকলকেও নিয়মিতভাবে এসব রুট ও নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে হতো। ফলে তারা মুসলমানদের কার্যক্রম, সংস্কৃতি ও মানসিকতা সম্পর্কে ভালোভাবেই জানার সুযোগ পেতেন। প্রথম ৫০ বছরে ইসলাম ভারতীয় মহাসাগরের পশ্চিম দিক পর্যন্ত এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। এর পাশাপাশি নীল নদ, কাস্পিয়ান সাগর তথা আরব উপকূলের পুরোটা এলাকায় ইসলাম পৌছে যায়। এই এলাকাগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ এতটাই ভালো ছিল যে, মুসলমানদের সব গল্পগাঁথাগুলো মানুষের মুখে মুখেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মুসলমানদের ধর্ম ও জীবনবোধ এভাবে ছড়িয়ে পড়ার আরেকটি বড় কারণ হলো, মুসলমানদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি অনেকের কাছেই খুব অজানা বা নতুন মনে হয়নি। এর আগের কয়েক সভ্যতা যে জরথুস্ত্র দর্শন অনুসরণ করে এসেছে তারাও মুসলমানদের মতো একেশ্বরবাদী চিন্তাধারাই লালন করত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বাইজেন্টাইনরা খ্রিষ্টানদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তারাও একেশ্বরবাদ সম্পর্কে অবহিত ছিল। আর ইহুদিরাও লেভান্ট অঞ্চলে এর আগেই মৌলবাদী ঘরানার একেশ্বরবাদের প্রচলন করে। তাই মুসলমানদের এক আল্লাহ তত্ত্ব এই বিশাল অঞ্চলের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণও ছিল না। কারণ তারা ঘুরে ফিরে এর মধ্যেই বিগত কয়েকশ বছর বসবাস করে আসছে। দর্শনগতভাবে এক হলেও কার্যত সকল ধর্মের একেশ্বরবাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

খলিফা উমর (রা.) তাঁর গোটা খেলাফতের সময়টায় সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক একজন নেতা হওয়ার পরও তিনি মুসলিম মতবাদকে বিশেষ করে ইসলামিক জীবনধারার কাঠামোকে তিনি দাঁড় করিয়ে গেছেন। এর আগে হযরত আবু বকর (রা.) প্রমাণ করে গেছেন ইসলাম শুধু মুসলমান নামের একটি সাধারণ সম্প্রদায় তৈরি করার কথা বলে না। বরং এমন একটি সম্প্রদায় রচনা করে যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীকে পাল্টে দেয়া। পরবর্তী সময়ে উমর (রা.) এই ধারণাকে আরও বলিষ্ঠ করেন, নতুন একটি বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেন্ডার রচনার মাধ্যমে। তবে উমরের (রা.) এই ক্যালেন্ডারের দিন গণনা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্মদিন থেকে শুরু হয়নি, শুরু হয়নি ওহি নাজিলের দিন থেকেও। এই ক্যালেন্ডারের দিন গণনা শুরু হয় হিজরতের দিন থেকে। যেদিন মুসলমানরা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে এসেছিলেন। উমরের (রা.) ক্যালেন্ডার আরও প্রমাণ করে যে ইসলাম কোনো ব্যক্তির একক মুক্তি লাভের জন্য আসেনি। বরং এমন একটি দর্শন নিয়ে এসেছে যার ওপর ভিত্তি করে গোটা পৃথিবী পরিচালিত হবে। অন্যান্য ধর্মরা তাদের অনুসারীদের শেখায় 'পৃথিবীটা দুর্নীতিতে ভরা, কিন্তু তুমি এর থেকে নিজেকে রক্ষা করেও বাঁচতে পারো। আর ইসলাম তার অনুসারীদের শেখায়, পৃথিবীটা দুর্নীতিতে ভরা কিন্তু তুমিই একে পাল্টাতে পারো।' সম্ভবত এই চেতনাটাই রাসূল ﷺ তার নবুওয়াতের জীবনের প্রথম দিকে প্রচার বেশি করেছেন। কিন্তু উমর (রা.) তাঁর খেলাফতের সময়ে এসে এই চেতনাটিকে শক্ত হাতে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) খেলাফতের কাজ করেছেন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে। কখনো নিজের সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দিতে পারেননি। তবে কুরআন রাষ্ট্র পরিচালনার যেই নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং রাসূল ﷺ যেভাবে দেখিয়ে গেছেন তাকে প্রশাসনিকভাবে প্রয়োগের খুব একটা সুযোগ তিনি পাননি। কিন্তু কুরআনের নীতিমালা ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে উমর (রা.) তার মুসলিম ডকট্রিন বা মুসলিম মতবাদের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি সকল সিদ্ধান্ত তা ছোট হোক বা বড়, কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই নেয়ার চেষ্টা করেছেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আবু বকরের (রা.) খেলাফতের সময় হযরত উমরের (রা.) পরামর্শ অনুযায়ী কুরআনের সকল আয়াতকে একত্রিত করা হয়। উল্লেখ্য, প্রথমদিকে যখন ওহি নাযিল হতো, তা একটু এলোমেলোভাবেই সংরক্ষণ করা হতো। কারণ যখনই ওহি আসত, উপস্থিত সাহাবিরা হাতের কাছে যা পেতেন, সেখানেই তা লিখে রাখতেন, তা হতে পারে এক টুকরো কাপড়, বা এক টুকরো চামড়া, কিংবা একটি পাথর বা হাড় বা গাছের পাতা। উমর (রা.) খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের পর এগুলোকে এক জায়গায় গুছিয়ে নিয়ে আসার কাজ শুরু করেন। প্রতিটি লেখা আয়াতকে পেশাদার হাফেজ তেলাওয়াতকারীদের তেলাওয়াতের সাথে মিলিয়ে যাচাই করে তারপর সংরক্ষণ করা হতো। এভাবে প্রতিটি আয়াত সংরক্ষণের পর তা আবার আয়াত নাযিল হওয়ার সময় উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবিদেরকে শুনানো হতো। এভাবে কয়েক ধাপে কাজ করে একটি গ্রহণযোগ্য কিতাব আকারে কুরআনকে সংরক্ষণ করা হয়।

কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে যদি উমর (রা.) সংশয়ে পড়ে যেতে, তাহলে তিনি কুরআনের কাছে এসেই সেই সমস্যার সমাধান খুঁজতেন। যদি কুরআনে স্পষ্ট উত্তর না পেতেন তাহলে তিনি সিনিয়র সাহাবিদের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। তাদের কাছে জানতে চাইতেন যে, রাসূল ﷺ-এ রকম পরিস্থিতিতে পড়লে কী করতেন। এই সিনিয়র সাহাবি বলতে প্রায় শতাধিক নারী বা পুরুষ সাহাবি যারা জীবিত অবস্থায় রাসূল ﷺ-কে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এই সিনিয়র সাহাবিরা একমত হয়ে যে সিদ্ধান্ত দিতেন উমর (রা.) তা নীতিমালা হিসেবে আবার সংরক্ষণ করতেন। শুধু তাই নয় তার খেলাফতের অধীনে থাকা সকল প্রাদেশিক শাসকদের কাছে সেই নীতিমালার কপি পাঠিয়ে দিতেন। যাতে তারাও এই নীতিমালার আলোকে ভবিষ্যতে এহেন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

হযরত উমর (রা.) জ্ঞানপিপাসু ও বিদ্বান লোকদের একটি টিম গঠন করেছিলেন যাদের একমাত্র কাজ হলো, আল্লাহর দেয়া ওহি, রাসূল ﷺ-এর জীবন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সংরক্ষণ করা। সেগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা যাতে যেকোনো পরিস্থিতিতে বা প্রয়োজনে খলিফা তাদের কাছ থেকে বিশেষজ্ঞ মতামত পেতে পারেন। এই বিদ্বানদের টিমের গঠনটি পরবর্তী সময়ে ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থার একটি নতুন ধারার সূচনা করে যাকে বলা হয় উলামা বা ইংরেজিতে বলা যায় স্কলারস।

একই সঙ্গে খলিফা উমর (রা.) মদিনায় মুসলিম আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেন। তিনি এই আইন বাস্তবায়নেও বেশ দৃঢ় মানসিকতা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পোষণ করেন এবং তার কারণেই মদিনায় মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। কুরআনে মদ্যপানের জন্য পৃথক কোনো শাস্তির কথা বলা হয়নি। কিন্তু উমর (রা.) অন্যান্য অপরাধের ব্যাপারে কুরআনের যে শাস্তি বর্ণিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করে মদ্যপানের শাস্তিও নিরুপণ করেন। যেমন, কুরআনে অপবাদ ও কুৎসা রটনার জন্য কষাঘাতকে শাস্তি হিসেবে বলা হয়েছে। উমর (রা.) বলেন মানুষ যেহেতু মদ্যপান করলে কুৎসা রটায় তাই মদ্যপানের শাস্তিও কুৎসা রটনার মতোই কষাঘাতই হওয়া উচিত। এই ধরনের পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যে প্রক্রিয়া উমর (রা.) চালু করেছিলেন তার ভিত্তিতেই পরবর্তী সময়ের মুসলমান স্কলাররা কিয়াসের প্রচলন করেন।

যিনার সর্বনাশা প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে হযরত উমর (রা.) খুবই সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ব্যভিচার ও পরকীয়ার বিরুদ্ধে খুবই কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি যিনার শাস্তি হিসেবে পাথর মারার প্রচলন করেন। কুরআনে এই শাস্তির কথা না বলা থাকলেও হযরত মুসার (আ.) সময়েও এই অপরাধে একই শাস্তির প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। একই সঙ্গে হযরত উমর (রা.) আরব দেশের একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রহিত করেন তা হলো সাময়িক বিবাহ। এর আগে আরবে এমন সুযোগ ছিল যে একজন ব্যক্তি ইচ্ছে করলে কিছু দিনের জন্য নারীদেরকে বিবাহ করতে পারেন। একই সঙ্গে যৌনতার অবাধ ব্যবহার রোধ করতে তিনি নারী ও পুরুষের পৃথক দায়িত্ব ও কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দেন। খলিফা উমরের (রা.) সময় থেকেই নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা স্থানে নামাজ পড়তে শুরু করেন।

হযরত উমর (রা.) কয়েকশ বছর আগে নারীকে সম্মান দিয়ে গেছেন। তাদের কর্মক্ষেত্র আলাদা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। বর্তমান সময়ে এসে অনেক মুসলিম সমাজেই আমরা সেই চিত্র আর দেখতে পাই না। একথা ঠিক যে, আজকের নারীবাদীরা যে পন্থায় নারী স্বাধীনতার কথা বলে, মদিনা সমাজে তা ছিল না। বরং নারীরা সেখানে আরও ভালো ছিল। আরবীয় বিভিন্ন গোত্ররা আগে থেকেই নারী এবং পুরুষের জন্য পৃথক দায়িত্ব ও ভূমিকার অনুশীলন করত। ইসলাম এসে তা আরও মজবুত করেছে। খলিফা উমরের (রা.) সময়ে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। মহিলারা সেই সময়ে পুরুষের পাশাপাশি সকল ধরনের কাজ করতে পারত। তারা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজে জড়িত ছিল। তারা বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নিত, বক্তব্য প্রদান করত, কবিতা লিখত ও সেগুলো আবৃত্তি করত। ত্রাণকর্মী হিসেবে যুদ্ধে যোগদান করত এমনকি কখনো কখনো যুদ্ধেও অংশ নিত। উমরের (রা.) সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। হযরত উমর (রা.) খলিফা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

হওয়ার পর আর দশটা সাধারণ নাগরিকের মতোই সেই বৈঠকগুলোতে অংশ নিতেন, নিজের মতামত দিতেন, অন্যদের মতামতও শুনতেন। নারী ও পুরুষ সকলেই সেসব বৈঠকে নির্ভয়ে তর্কে জড়াতে পারত। শুধু তাই নয়, হযরত উমর (রা.) একজন নারীকে মদিনায় হেড অব মার্কেট বা বিপণন প্রধান হিসেবে নিয়োগও দিয়েছিলেন। বেসামরিক দায়িত্ব হিসেবে এই কাজটি ছিল খুবই বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত নারীকে নির্মাণ কার্যক্রম তদারক করতে হতো। ব্যবসার অনুমোদন দিতে হতো এবং সেই সাথে দোকানীরা সঠিক ওজন দিচ্ছে কিনা তাও মনিটর করতে হতো। অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে মুসলিম নারীদের শরিয়ত সম্মতভাবে অংশগ্রহণের এই প্রক্রিয়াটি প্রথম হযরত উমর (রা.) শুরু করেছিলেন।

৭ম শতাব্দীতে এসে তৎকালীন পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যেই দাস প্রথার অনুমোদন দেয়া হয়। আরবও তার ব্যতিক্রম ছিল না। ইসলাম এই প্রথাকে একেবারে নিষিদ্ধ করেনি তবে ইসলাম দাসদের ওপরে মালিকদের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণকে অনেকটাই সীমিত করে দিয়েছে। হযরত উমর (রা.) এই প্রথার ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। হযরত উমরের (রা.) দাসনীতির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, কোনো মুসলমান দাস হতে পারবে না। যদি কোনো মুসলমান মালিক কোনো অধীনস্থ দাসের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে এবং তার ফলে সে গর্ভবতী হয়, তাহলে সেই মালিককে উক্ত দাসের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ ঐ দাসের ঔরসে যে সন্তান হবে তা যেন মুসলমান হিসেবে জন্ম নিতে পারে এবং তার পরপরই সে যেন মুক্ত হয়ে যায়। কোনো পরিবারকে ভেঙে কাউকে দাস হিসেবে নেয়া যাবে না। এ রকম পরিস্থিতি হলে সংশ্লিষ্ট মালিককে দাসদের গোটা পরিবারকেই কিনে নিতে হবে ইত্যাদি।

কোন মালিক দাসকে অপব্যবহার বা খারাপ কাজে ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ, দাসও মানুষ। কুরআন সকল মানুষকে সমান অধিকার দিয়েছে যা রাসূল ﷺ-এর বিদায় হজ্বের ভাষণে খুবই গুরুত্ব সহকারে উঠে এসেছে। হযরত উমর (রা.) আইন করেছিলেন, মালিক যা খাবে, দাসকেও তাই খেতে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, দাস যেন পরিবারের সবার সাথে একইভাবে খেতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। খলিফা উমরের (রা.) এসব বিধান সঠিকভাবে মানলে মুসলিম সমাজে দাসত্বের অস্তিত্ব থাকার কথা নয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলমান সমাজ পরবর্তী সময় বিভিন্ন সময়ে বারংবার এই প্রথার দিকে ফিরে গিয়েছে।

নিয়তির নির্মম পরিহাস যে, দাসদের অধিকার রক্ষায় মতো কিছু করলেও হযরত উমর (রা.)-কে মসজিদের ভেতর ছুরিকাঘাত করে যে হত্যা করে সে ছিল

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

একজন পারস্য দাস। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে বেশ কিছু সাহাবি হযরত উমরকে (রা.) পরবর্তী খলিফা মনোনয়ন দিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কেউ কেউ তার সন্তানের নামও প্রস্তাব করেছিলেন।

এতে উমর (রা.) রাজি হননি। বরং তিনি বলেন, 'তোমরা কি মনে করো যে আমি আমার পরিবারকে কোনো সুবিধা দেয়ার জন্য এই দায়িত্ব নিয়েছিলাম? তিনি কিছু সময় পরে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে হযরত উমর (রা.) আরেকটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান। তিনি ৬ সদস্যের একটি শুরা (পরামর্শ পরিষদ) গঠন করেন। যারা নতুন খলিফা নির্বাচন করবেন এবং সেই ব্যাপারে উম্মাতের মতামত গ্রহণ করবেন। এই শুরা গঠনের বিষয়টিকে পরবর্তীকালে ইসলামি চিন্তাবিদরা ইসলামের প্রথম গণতান্ত্রিক কাঠামো হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাহোক, হযরত উমর (রা.) গঠিত সেই শুরা দুই জনের নাম খলিফার জন্য চূড়ান্তভাবে বাছাই করেন। একজন ছিলেন হযরত আলি (রা.) আর অন্যজন হলেন হযরত উসমান (রা.)। কেউ কেউ আলিকে (রা.) পছন্দ করেন আবার কেউ কেউ উসমানের (রা.) পক্ষে রায় দেন।

শুরার প্রধান ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে জনসম্মুখে এই দুইজন সাহাবির সাক্ষাৎকার নেন। দুই সাহাবিকে শুরা প্রধান একটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটি ছিল, 'যদি আপনি খলিফা হন, তাহলে কি আপনি কুরআন, সুন্নাহ এবং আপনাদের দুই পূর্বসূরি হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমরের (রা.) দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কাজ করবেন?

হযরত আলি (রা.) কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করার ব্যাপারে 'হ্যাঁ' বলেন। কিন্তু পূর্বসূরি দুই খলিফার ব্যাপারে তিনি না বলেন। কারণ, তিনি মনে করেন, তার নিজস্ব কিছু দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং তিনি নিজের বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করবেন। অন্যদিকে, হযরত উসমান (রা.) কুরআন, সুন্নাহ এবং আগের দুই পূর্বসূরি অনুসরণ করার ব্যাপারে 'হ্যাঁ' বলেন। তিনি বলেন, আমি কোনো আবিষ্কারক নই যে, পূর্বসূরিদের চিন্তাধারার বাইরে গিয়ে নতুন কিছু করব।

এই উত্তর পাওয়ার পর শুরার প্রধান হযরত উসমানকেই (রা.) উম্মাহ্‌কে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সঠিক ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করেন। উপস্থিত সকলেই তা অনুমোদন করেন আর হযরত আলিও (রা.) বিলম্ব না করে তখনি নতুন খলিফার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

৪. বিভেদ-বিভাজন (২৪-৪০ হিজরি) ৬৪৪-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ

তৃতীয় খলিফা (২২-৩৬ হিজরি, ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং ইসলামের তৃতীয় খলিফা। ৬৮ বছর বয়সে এসে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন ১২ বছর। তবে তাঁর খেলাফতের এই মেয়াদটি পূর্বসূরি খলিফাদের মতো স্বস্তিদায়ক ছিল না। তার মেয়াদে অনেকগুলো সংকটের সৃষ্টি হয়। তবে সেগুলোকে বুঝতে গেলে প্রথম আমাদেরকে এই মানুষটি সম্পর্কে জানতে হবে। বিশেষ করে জানতে হবে যে, কীভাবে তিনি এমন একটি অবস্থায় নিজেকে আনতে সক্ষম হলেন কিংবা তিনি নিজেকে কীভাবে এতটা পরিণত করলেন যে তাকে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হিসেবে নির্বাচন করা হলো।

হযরত উসমানের (রা.) পিতা ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি। সেই সুবাদে হযরত উসমান (রা.) মাত্র ২০ বছর বয়সে বিশাল সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করেন। আর ৩০ বছরে পৌঁছানোর আগেই তিনি সেই ব্যবসা ও সম্পদের পরিমাণ আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হন। এই কারণে তাকে বলা হতো উসমান গণি বা ধনাঢ্য উসমান।

ইসলাম গ্রহণেরও আগে থেকেই হযরত উসমান (রা.) ছিলেন একজন সজ্জন ব্যক্তি। তিনি আগে থেকেই মদ পান করতেন না, নেশা করতেন না এবং নারীদের ব্যাপারেও ছিলেন সংযত। তিনি তার সুদর্শন চেহারার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী ও মিষ্টভাষী একজন ব্যক্তি।

আল্লাহর রাসূল ﷺ নবুওয়াত লাভের এক বছর পর এবং মদিনায় হিজরত করার ৯ বছর পূর্বে হযরত উসমান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এক দিন তিনি সফল একটি ব্যবসার কাজ শেষ করে বাসায় ফিরছিলেন। পথিমধ্যে রাত হয়ে যাওয়ায়

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং খোলা আকাশের নিচেই শুয়ে পড়েন। আকাশে তারা আর অন্ধকারের খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ করে মহাবিশ্ব আর এই বিশাল সৃষ্টি নিয়ে তার মধ্যে একরাশ ভাবনা ভিড় করে। তিনি হঠাৎ করেই উপলব্ধি করেন যে, এতো বড় একটা পৃথিবী একা একাই সৃষ্টি হতে বা চলতে পারে না। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। কে সেই সৃষ্টিকর্তা? এসব ভাবতে ভাবতেই তিনি একটি গায়েবি আওয়াজ শুনতে পান যেখানে তাকে বলা হয়, আল্লাহর একজন রাসূল (রা.) এই মুহূর্তে দুনিয়াতেই আছেন।

তিনি পরের দিন দ্রুত বাড়ি ফিরে আসেন এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকরের (রা.) কাছে গিয়ে পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আবু বকর (রা.) তখন তাকে মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর দাওয়াতি মিশন সম্পর্কে অবহিত করেন। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ যে একজন অবিনশ্বর সৃষ্টিকর্তার কথা প্রচার করছেন তাও জানান। হযরত উসমান (রা.) এই ঘটনা শুনে সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

তার ইসলাম ধর্ম কবুলের কথা জানাজানি হলে তার পরিবার ও গোত্রে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়। হযরত উসমান (রা.) ছিলেন কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। উমাইয়ারা ছিল ইসলামের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন। উসমানের (রা.) চাচা আবু সুফিয়ান ছিলেন ইসলাম বিরোধী শক্তির অন্যতম নেতা। ইতঃপূর্বে উসমান (রা.)-এর আরেক আত্মীয় আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে হত্যার জন্য আক্রমণও করেছিলেন। আবু বকর (রা.) না থাকলে হয়তো সেই ব্যক্তি সেদিন রাসূল ﷺ-কে হত্যাই করে ফেলত। উসমান (রা.)-এর ছিলেন দুই স্ত্রী। তারা দুজনই উসমানের (রা.) ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে তার বিপক্ষে চলে যান। তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি বিধায় পরবর্তী সময়ে উসমান (রা.) তাদের তালাক দিয়ে রাসল ﷺ-এর মেয়ে রুকাইয়াকে বিয়ে করেন। রুকাইয়ার মৃত্যুর পর তিনি উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন।

কুরাইশদের নিপীড়নের কারণে মক্কায় যেহেতু মুসলমানরা বেশ অসহায় অবস্থায় ছিল তাই উসমানের (রা.) মতো একজন সম্পদশালী ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর তারা বেশ স্বস্তি পেয়েছিলেন। হযরত উসমানও (রা.) তার বিশাল সম্পদ থেকে মুসলমানদের কল্যাণে সাধ্যমতো কাজ করেছেন। তিনি মুসলমানদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন সম্পদ দিয়ে, অর্থ দিয়ে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে আবিসিনিয়া হিজরতের আদেশ দেন। বলা বাহুল্য, সেই গোটা সফরের অর্থ যোগান দিয়েছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তিনিও সেই মুসলমানদের সাথে আবিসিনিয়া গমন করেন এবং সেখানেও ব্যবসা করে দারুণ সফলতা লাভ করেন। কয়েক বছর পর তিনি যখন মক্কায় ফিরে আসেন তখন তিনি পূর্বের চেয়েও বেশি অর্থশালী হয়েই ফিরেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মদিনায় হিজরত করার সময় অধিকাংশ মুসলমানই সব ছেড়ে পুরোপুরি নিঃস্ব হয়েই মদিনা গমন করেন। তৎকালীন মদিনার প্রধান কাজ ছিল কৃষিকাজ। কিন্তু ব্যবসা বান্ধব মক্কায় থাকা এসব মুসলমানরা কৃষিকাজের কিছুই জানতেন না। তাই হিজরতের ঘটনায় তারা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হন। তারা একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যান। তবে এক্ষেত্রে হযরত উসমান (রা.) ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি মদিনায় হিজরত করলেও মক্কায় তার পুরোনো ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার সকল কাজ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন। আর তার সাথে মক্কার লোকেরা ব্যবসা করত বা সম্পর্ক বজায় রেখেছিল তাদের নিজেদের আর্থিক স্বার্থেই। হযরত উসমান (রা.) মদিনায় গিয়েও উন্নতি করতে থাকেন। তবে কেউ বলতে পারবে না যে তিনি অসৎ প্রক্রিয়ায় বিপুল এই সম্পদের মালিক হয়েছেন। বরং তার উল্টো। আসলে কিছু লোক দুনিয়াতে আসেই সোনার পরশ পাথর হাতে নিয়ে। এসব মানুষ যেখানেই হাত দেন সেখানেই সোনা ফলে, উন্নতি আসে। হযরত উসমান (রা.) ছিলেন সে রকম ভাগ্যের একজন মানুষ। আর তিনি কৃপণও ছিলেন না । তিনি মানুষের কল্যাণে বেপরোয়াভাবে খরচ করতেন। মদিনায় মসজিদে নববিতে যখন মুসলমানদের জায়গা হচ্ছিলো না, তিনি তখন নিজ খরচে মসজিদ সম্প্রসারণ করে দেন। মদিনায় যখন মুসলমানরা প্রচণ্ড রকম পানির সংকটে পড়ে যায়, তখনো তিনি ইহুদি একটি গোত্রের কাছ থেকে একটি কূপ চড়া দামে কিনে তা জনসাধারণের কল্যাণে দান করে দেন।

এত পরিমাণ সম্পদ, আকর্ষণীয় চেহারা আর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়ার পরও হযরত উসমান (রা.) হীনমন্যতায় ভুগতেন। কারণ, তিনি মনে করতেন যে তিনি উত্তম নন। নিজের সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য তিনি নিয়মিত রোজা রাখতেন। নামাজে ও অন্যান্য ইবাদতে মশগুল থাকতেন এবং অহর্নিশ কুরআন তেলাওয়াত করতেন। সম্ভবত তার মাত্রাতিরিক্ত দান ও সদকার কারণেই তিনি ব্যবসাতেও এতটা সফল হচ্ছিলেন।

হযরত উসমান (রা.) সব সময় মনে করতেন যে তিনি রাসূল ﷺ-এর অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের মতো অতটা উৎকৃষ্ট নয়। এর কিছু কারণও ছিল। তিনি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি, কারণ সে সময়ে তার স্ত্রী অসুস্থ ছিল। উহুদের যুদ্ধে যখন বাতাসে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে আল্লাহর নবি ﷺ শহিদ হয়েছেন, তখন তিনি সেই সব সাহাবিদের একজন ছিলেন যারা আশাহত হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যান। হযরত উসমান (রা.) অবশ্য এই দুই যুদ্ধের ঘাটতি পরবর্তী সময়ে পুষিয়ে দেন মুতার যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার মাধ্যমে। কিন্তু মুতার যুদ্ধের কয়েক দিন পরই তার ছেলে মারা যায়। তখন হযরত উসমান (রা.) আবারও মনে করেন যে আল্লাহ বুঝি তার

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ওপর এখনো অসন্তুষ্ট। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি আরেকটা উত্তম কাজ শুরু করেন। তিনি নিয়মিত ক্রীতদাস ক্রয় করতেন এবং প্রতি শুক্রবার একজন করে ক্রীতদাসকে মুক্ত জীবনে যাওয়ার সুযোগ করে দিতেন।

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর হযরত উসমান (রা.) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যে উম্মাহ্‌র একতা না আবার নষ্ট হয়ে যায়। তিনি নিজের আত্মার অস্থিরতা নিয়েও বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। কীভাবে শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা প্ররোচনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবেন, তা নিয়ে তিনি পেরেশান থাকতেন। তিনি মনে করতেন, কিয়ামত যেকোনো দিন হতে পারে তাই কোনো কিছুর আশায় না থেকে তিনি প্রতিটি দিন আগের তুলনায় বরং আরও বেশি ভালো হওয়ার চেষ্টা করতেন। সেই কারণে রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর তিনি নফল ইবাদত, নামাজ ও তেলাওয়াত আরও বাড়িয়ে দেন। যাতে করে তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে জান্নাতে থাকতে পারেন। এই ধরনের পরোপকারিতা ও পরহেজগারিতাই তাকে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হওয়ার পথকে সুগম করে তোলে।

যখন হযরত উমর (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন ইসলাম তার নতুন একটি পরিচয়ে বিশ্বে আবির্ভূত হয়। উমরের (রা.) সময়ে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অনেক অগ্রগতি হয়। নতুন অনেক বিষয় আবিষ্কার হয় এবং অনেক সাম্রাজ্য মুসলমানদের হাতে আসে। আর হযরত উসমান (রা.) যখন খলিফার দায়িত্ব নেন তখন ইসলাম অনেক বড় একটি সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে। তাই তখনকার বাস্তবতায় শুধু দাওয়াতি কাজ, আত্মরক্ষা, আক্রমণ করার কৌশলগুলোই যথেষ্ট ছিল না। উসমানের (রা.) সময়ে এসে মুসলমানদেরকে রাজস্ব আদায় ও সংগ্রহ, দরবার ও আদালত পরিচালনা, ব্রিজ, সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার, বেতন নির্ধারণ ও প্রতিশোধের মতো জীবনঘনিষ্ঠ কর্মকাণ্ডগুলোকেও তত্ত্বাবধান করতে হতো। আর খলিফা হওয়ার পর হযরত উসমানের (রা.) এর ওপর সব দায়িত্ব আরোপিত হয়।

হযরত উসমান (রা.) তার খেলাফতের প্রথমার্ধ ব্যয় করেন কুরআন শরিফের একটি গ্রহণযোগ্য সংস্করণ তৈরি করার ব্যাপারে। তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের একটি টিম গঠন করে দেন। যাদের কাজ ছিল সেই সময়ে পাওয়া সকল সংস্করণের মধ্যে তুলনা করে এর অসংগতিগুলো বের করা এবং সেসব অনুচ্ছেদগুলোকে এক জায়গায় করা যেগুলো নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। পরিশেষে হযরত উসমানের (রা.) আন্তরিক ভূমিকার কারণেই একটি কুরআনের সংকলন সম্পন্ন হয়, যেখানে আয়াতগুলোকে দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে সাজানো হয়। আর এই সংস্করণের বাইরে আরও যা সংস্করণ বা আয়াত পাওয়া যেত সেগুলোকে ধ্বংস করা হয়। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কারণেই এর পর থেকে কুরআনের সকল সংস্করণে শব্দ, বাক্য

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পুরোপুরিভাবে মিলে যায় যা আজও বিদ্যমান। কেউ কেউ অবশ্য প্রশ্ন তুলেছিল যে উম্মাহকে একত্রিত রাখাই যদি এখন মূল কাজ হয় তাহলে এত সময় নিয়ে এত বড় কাজটি তিনি কেন করতে গেলেন? আবার কেউ কেউ তার কুরআন সংস্করণের কারণ ও হেতু নিয়েও নানা সংশয় প্রকাশ করে।

এরপরে তিনি দ্বিতীয় যেই বড় কাজটি করলেন তা হলো, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা। আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সময়ে আসলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বলতে তেমন কিছু ছিল না। মদিনায় তখন নানা খাত থেকে যে অর্থ আসত তা তাৎক্ষণিকভাবেই মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হতো। আবু বকর ও উমর (রা.) খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে মোটামুটি একই ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। যদিও আবু বকরের সময়েই প্রথম রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রচলন করা হয়। আর উমরের (রা.) সময়ে এসে সেই রাজকোষ অর্থে ভরে যায় আর সেই বর্ধিত অর্থগুলো তিনি সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। কারণ, উমরের (রা.) সময়েই ইসলামের একটি নির্দিষ্ট সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। উসমানের (রা.) সময়ে এসে রাষ্ট্রীয় কোষাগার পরিচালনা সরকারের অন্যতম একটি প্রধান কাজে পরিণত হয়। কারণ, এই কোষাগারের অর্থ দিয়েই রাষ্ট্রের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হতো।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেন। বিশেষ করে অনেক দূরে থাকা প্রদেশগুলো তার সময় থেকেই খাজনা দেয়া শুরু করে। যখন মিসরের তৎকালীন গভর্নর ও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি আমর ইবনে আস (রা.) মিসরের গভর্নর হিসেবে প্রত্যাশা মতো খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হন, তখন উসমান (রা.) তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে তারই সৎ ভাই আব্দুল্লাহকে মিসরের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন। আবদুল্লাহ অবশ্য কর আদায়ে বিরাট সাফল্য পান এবং আমরের তুলনায় দ্বিগুণ খাজনা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেন। এই পদায়নের ব্যাপারটি উসমানের (রা.) বিবেচনাবোধের যথার্থতা প্রমাণ করে যদিও আমর ইবনে আস (রা.) অভিযোগ করেন যে, বাড়তি চাপ দিয়ে অতিরিক্ত খাজনা আদায় মিসরের জনগণের জন্য জুলুম হয়ে যায়। এই ধরনের বাস্তবতাই ইসলামের শাসনের ইতিহাসে দুর্নীতি ও জুলুমের অভিযোগের জন্ম দেয়।

কোনো যুদ্ধে জয়ী হলে সেখানকার জমি বাজেয়াপ্ত করার ওপর দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। উসমান (রা.) তা বহাল রাখেন তবে সেখানে মুসলমানদের জমি কেনার ওপর থেকে তিনি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। হযরত উসমান (রা.) অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ঋণ নিয়ে এই ধরনের জমি ক্রয় করারও সুযোগ দেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সিনিয়র মুসলিম ব্যক্তিরা এই সুযোগ নিতে পারতেন। তার এই নীতির সুযোগে অতি অল্প সময়েই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বেশ কিছু সিনিয়র সাহাবি বেশ ভালো পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে যান। উসমানের (রা.) এই আর্থিক নীতিমালার সবচেয়ে বেশি সুবিধা পায় তার নিজের গোত্র উমাইয়ারা। কারণ তারাই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঋণ পাওয়ার সুযোগ পায়। একই সঙ্গে হযরত উসমান (রা.) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে তার কিছু আত্মীয় ও পছন্দসই ব্যক্তিকে নিয়োগ দেন। তার যুক্তি ছিল তিনি এই মানুষগুলোকে ভালোমতো চিনেন এবং তাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন। তার এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উমাইয়া গোত্রভুক্ত লোকেরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে পৌছে যায়।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা নিজে বেশ আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে থাকলেও তার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা মোটেও সেই ধরনের অবস্থায় ছিল না। খলিফা হিসেবে হযরত উসমান (রা.) কোনো বেতন নিতেন না কারণ তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ছিলেন। কিন্তু তিনি তার প্রিয় ও আস্থাভাজন ব্যক্তিদের জন্য অনেক বেশি খরচ করতেন। তার জনকল্যাণে করা খরচের হাত ছিল বেশ চওড়া। তিনি খলিফা হওয়ার পর গোটা ইসলামি সাম্রাজ্যে পাঁচ হাজারেরও বেশি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তার খেলাফতের সময় মদিনার রাস্তাঘাট প্রশস্ত হয় এবং নান্দনিক ডিজাইনে শহরে বড় বড় দালান কোঠাও নির্মাণ করা হয়। তার পদমর্যাদার সাথে মিল রেখে একটি অট্টালিকা টাইপেরও দালান নির্মাণ করা হয়। যেখানে তিনি কেবল রুটি ও পানি খেয়ে থাকতেন এবং সারা দিন ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

উসমান (রা.) গোটা সাম্রাজ্যে ব্যবসা বান্ধব উন্নয়ন করার পক্ষে সুপারিশ করেন। অনেক খাল বিল খনন করা হয়, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়। হাইওয়ে তৈরি করা হয় এবং বন্দরগুলো যুগোপোযোগী করা হয়। শহরের নতুন নতুন এলাকায় কূপ খনন করা হয় এবং পানি সরবরাহ পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা হয়। বাজারগুলোকে সরকারি মনিটরের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং সেগুলোতে সরকার কর্তৃক মার্কেট অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়। এতে উমরের (রা.) সময়কার বাণিজ্য কৌশলের অনেক কিছুই হয়তো হারিয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, উসমানের (রা.) আমলেও বেশ ভালো মানের উন্নয়ন ও অগ্রগতি চোখে পড়ছিল; তাই উন্নয়নের বিরোধিতা করার সুযোগও কম ছিল।

যদি ব্যক্তিগত মানের কথা বলা হয়, যদি মদ্যপান বা যৌনাচারের কথা বলা হয় তাহলে হযরত উসমান (রা.) ছিলেন অনেকটাই সন্ন্যাস ধরনের। তাই এসব বিষয়ে তার বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা ছিল না। যদি উসমানের (রা.) সম্মানজনক

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অবস্থানকে অনুশোচনা এবং ইবাদতের মানদণ্ডে যাচাই করা হতো তাহলে তিনি সেই সময়ে সেরা দশ জনের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু অর্থ রোজগারের ব্যাপারে তার মধ্যে কোনো জড়তা ছিল না, যেহেতু তিনি ব্যক্তির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিটিকে বড় করে দেখতেন।

হযরত উসমানের (রা.) খুব ঘনিষ্ঠ একজন ব্যক্তি ছিলেন তার চাচাতো ভাই মুয়াবিয়া (রা.)। এর আগে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) মুয়াবিয়া (রা)-কে দামেস্ক এবং এর আশেপাশের এলাকার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। উসমান (রা.) দায়িত্বে এসে তার চাচাতো ভাইয়ের রাজত্বের এলাকাকে আরও বাড়িয়ে দেন। তাই ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় থাকা কেন্দ্রীয় দফতরসহ পুরো ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় মুয়াবিয়া (রা.) শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

মুয়াবিয়া (রা.) ছিলেন মক্কায় কুরাইশদের অন্যতম শীর্ষ নেতা, যিনি তিনটি বড় যুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন। মুয়াবিয়া (রা)-এর মা হিন্দও তার স্বামীর সাথে যুদ্ধে যেতেন। জানা যায়, এই হিন্দ উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পিছু হটার পর হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর চাচা হযরত হামজার (রা.) মৃতদেহ কেটে কলিজা ভক্ষণ করেন। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য ছিল যে অতীতে যত অপরাধই করুক না কেন ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল ﷺ তার ওপর পুরোনো রাগের ঝাল মেটাতেন না। তখন তাকে আল্লাহর নবি ﷺ নিজের পরিবারের একজনই মনে করতেন। রাসূল ﷺ মুয়াবিয়া (রা)-কে খুবই যোগ্য মনে করতেন, তাই মুয়াবিয়া (রা) ইসলাম গ্রহণের পর সব সময় উনাকে নিজের কাছাকাছি রাখতেন।

কোনো সন্দেহ নেই যে হযরত উমর (রা.) মুয়াবিয়া (রা)-কে দামেস্কের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। কারণ, তার মনে হয়েছিল যে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। তবে রাসূল ﷺ কেন মুয়াবিয়া (রা)-কে যোগ্য মনে করে তাকে কাছে রাখতেন, এটা যদি তিনি বুঝতেন তাহলে হয়তো মুয়াবিয়া (রা)-কে তিনি ভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতেন। কারণ, দামেস্কের গভর্নর হওয়ার পরপরই মুয়াবিয়া (রা) তার যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার করে একটি সাহসী সেনাবাহিনী তৈরি করেন যা ব্যক্তি মুয়াবিয়া (রা)-এর অনুগত ও নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর এই সেনাবাহিনীর অস্তিত্বই পরবর্তী সময়ে উসমান (রা.)-এর অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ডের ফলে বিরাট এক ঐতিহাসিক সংকটের সৃষ্টি করে।

হযরত উসমানের (রা.) ১২ বছরের খেলাফতের শেষ দিকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের অসন্তোষ ও ক্ষোভ জমা হতে থাকে। মিসরে তার পালিত ভাই

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জন্য সেখানকার জনগণের ওপর এতটাই চাপ দিল যে তারা ভীষণ রকম অসন্তুষ্ট হয়ে গেল। ফলে সেখানে দাঙ্গা দেখা দিল। তৎকালীন মিসরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য খলিফা উসমানের (রা.) হস্তক্ষেপ কামনা করল। মিসরের গভর্নরকে অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি জানাল। কিন্তু তারা এই আবেদন করে কোনো সাড়া পেল না। তাই তারা খলিফার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করার জন্য মদিনায় একটি প্রতিনিধি দল পাঠাল। এসব ঘটনা যখন ঘটছে ঠিক একই সময়ে উত্তরের দিক থেকেও আরেকটি দল খলিফার কাছে রওয়ানা হলো। তাদেরও স্থানীয় গভর্নরের বিরুদ্ধে ছিল বিস্তর অভিযোগ। অর্থাৎ বুঝা গেল যে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতেই আসলে খলিফা উসমানের (রা.) বিরুদ্ধে বিশেষ করে তার মনোনীত ও নিয়োগকৃত প্রশাসকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠেছিল।

এসব আবেদন ও দরখাস্ত পেয়ে উসমান (রা.) বেশ নার্ভাস হয়ে পড়লেন। তিনি এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হযরত আলির (রা.) শরণাপন্ন হলেন। তিনি হযরত আলিকে (রা.) বললেন, যাতে তিনি তাদের অসন্তোষ কমাতে ভূমিকা পালন করেন, তাদেরকে শান্ত করেন এবং বুঝিয়ে শুনিয়ে আবার নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন। কিন্তু আলি (রা.) তাতে রাজি হলেন না। খুব সম্ভবত তিনি নিজেও খলিফার অনেকগুলো সিদ্ধান্ত ও কাজের সাথে একমত ছিলেন না। তিনি উসমানকে (রা.) জনগণের বৈধ সংকটগুলোকে শুনে তা সমাধান করার পরামর্শ দিলেন। এরপর উসমান (রা.) মিসর থেকে আগত সেই প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তাদেরকে মিসরের গভর্নর তথা নিজের পালিত ভাইকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করলেন। মিসরের সেই প্রতিনিধি দলকে দায়িত্ব দিলেন যাতে তারা দেশে ফিরে গিয়ে গভর্নরকে জানায় যে খুব শীঘ্রই তার জায়গায় নতুন একজন গভর্নর দায়িত্ব নিতে আসছেন।

খলিফার এসব কথা শুনে মিসরীয়রা আশ্বস্ত হলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে মিসরে রওয়ানা দিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে খলিফা উসমানের (রা.) একজন সেবকের সাথে তাদের দেখা হলো। সেই সেবকের কিছু আচরণে তাদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। তাই তারা তার শরীর তল্লাশী করল। তার কাছে একটি চিঠি পেল যেখানে তাদের ধারণা মতে খলিফার স্বাক্ষরও ছিল। চিঠিটি পাঠানো হচ্ছিল মিসরের গভর্নরের কাছে। যেখানে গভর্নর আব্দুল্লাকে আদেশ দেয়া হয় যাতে তিনি খলিফার কাছে নালিশ করা প্রতিনিধি দলের সদস্যদের গ্রেফতার করে দ্রুত তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। অসন্তোষের ব্যাপারটি আরও ছড়িয়ে পড়ার আগে তাকে সমূলে দমন ও উৎখাত করার আদেশও দেয়া হয় সেই চিঠিতে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

চিঠিটি হাতে পেয়েই মিসরের সেই প্রতিনিধি দল তীব্রভাবে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে মদিনায় ফিরে আসে। তাদের আসার খবর পেয়ে উসমানও (রা.) জলদি তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে দেখা করেন। জানতে চান কী হলো যে তারা এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল। মিসরের প্রতিনিধি দল তাকে সেই উদ্ধার করা চিঠি দেখালে তিনি ভীষণ রকম মর্মাহত হন। তিনি কসম কেটে বলেন যে, এই ধরনের কোনো চিঠি তিনি লেখেননি। প্রকৃতপক্ষে চিঠিটি লিখেছিল হযরত উসমানের (রা.) সমস্যাগ্রস্ত চাচাতো ভাই মারওয়ান- যিনি দামেস্কের গভর্নরের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি নিজে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এই চিঠিটি লিখে সেখানে উসমানের (রা.) জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করেছিলেন। খলিফা উসমানের (রা.) বয়স তখন প্রায় ৮০। বয়সের ভারে নজ্জু হওয়ায় সহজেই অনেকে তাকে ফাঁদেও ফেলতে পেরেছিল সেই সময়।

সে যাহোক, এবার আর সেই দরখাস্তকারীদের আর শান্ত রাখা গেল না। তারা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে একেবারে বেপরোয়া হয়ে ওঠল। প্রথমে তারা চিঠি জালকারী মুয়াবিয়া (রা)-এর ভাইকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে। খলিফা উসমান (রা.) তাদের সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে। তারপর তারা খলিফা উসমানকে (রা.) পদ ছেড়ে দিতে বলে যাতে তার থেকে উত্তম কেউ এই দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু খলিফা সেটা করতেও অস্বীকার করেন। তিনি জানান, তার দায়বদ্ধতা কেবল আল্লাহর কাছে। এখন তিনি যদি বেপরোয়া কোনো শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে পদ ছেড়ে দেন, তাহলে আল্লাহর নেয়ামতের সাথে উপহাস করা হবে। এসব বলে তিনি মোটামুটি অন্য সব কাজ থেকে ছুটি নিয়ে তার ঘরে চলে যান এবং কুপির আলো জ্বালিয়ে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করেন। উলেখ্য, যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে কিংবা মানসিক অস্থিরতার সময় উসমান (রা.) কুরআন তেলাওয়াত করার মাধ্যমেই সমাধান পাওয়ার বা অন্তরে প্রশান্তি পাওয়ার চেষ্টা করতেন।

অন্যদিকে, উসমানের (রা.) বাসার বাইরে দাঙ্গাকারীদের ক্ষোভ, উত্তেজনা ও বেপরোয়া কর্মকাণ্ড ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। তারা উসমানের (রা.) বাড়ির দরজা ভেঙে ফেলে এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করে ঘরে প্রবেশ করে। তারা খলিফা উসমানকে (রা.) কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় পায় এবং নিজেরা মুসলমান হওয়া স্বত্ত্বেও ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানকে (রা.) নির্মমভাবে হত্যা করে। নেতৃত্বের উত্তরাধিকারের সংকট থেকে এভাবেই এমন একটি সমস্যার উদ্ভব হয় যা কিনা ইসলামের অন্তরাত্মাকেও হুমকির মুখে ফেলে দেয়।

পরবর্তী চারটি দিন, এই বেপরোয়া দলটি মদিনার রাস্তায় ভাঙচুর ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মদিনার বাসিন্দারা এই সময় ভয়ে, আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বের হতেন না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তারা অপেক্ষা করছিলেন যে কবে এই অস্থির সময়টা কেটে যাবে। একসময় ধ্বংসযজ্ঞ কমে আসে কিন্তু তখন সেই ক্রুদ্ধ দলের নেতারা শর্ত আরোপ করেন যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তাদের আস্থাভাজন কোনো ব্যক্তি খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এরপর সকলের ভাবনা ঘুরে একজনের দিকেই স্থির হয়, যাকে একবার নয়, দুবার নয় তিনবার খলিফার পদের জন্য ভাবা হলেও শেষ পর্যন্ত আর দায়িত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু যাকে বলা হতো হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী- তিনি আর কেউ নন, রাসূল ﷺ-এর জামাতা হযরত আলি (রা.)।

প্রথমে আলি (রা.) সেই প্রস্তাবে রাজি হননি। কিন্তু তত দিনে সিনিয়র অনেক সাহাবি মারা গেছেন, অনেকে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনও করে গিয়েছেন। সবচেয়ে বড় বিপদ ছিল এটাই যে, বিদ্রোহী আর দাঙ্গাবাজরা হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল যে, যদি দ্রুততম সময়ের মধ্যে মদিনা আস্থাভাজন কোনো খলিফা বাছাই করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তারা গোটা অঞ্চলে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করবে। এহেন পরিস্থিতিতে শীর্ষ মুসলিম নেতৃবৃন্দ গিয়ে মসজিদে ভিড় করেন এবং হযরত আলিকে (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

এই সময়ে এসে এই দায়িত্ব পাওয়ার সুযোগটা হযরত আলির (রা.) মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এর আগে দীর্ঘ ২৫টি বছর এই দায়িত্বটি তার চোখের সামনে অন্যদের কাঁধে অর্পিত হয়েছে এবং তারা সেটা পালনও করেছেন। এর আগে ৩ বার খেলাফতের দায়িত্ব নির্ধারণকালে উম্মাহ্ তাকে খলিফা নির্বাচন করেনি, অথচ তখনো অনেক কিছুকে সঠিক পন্থায় নিয়ে আসার সুযোগ তার ছিল। প্রতিবার খেলাফত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরও তিনি নীরবে তা মেনে নিয়েছেন। কারণ, তার সামান্য প্রতিক্রিয়ায় উম্মাহ্র মধ্যে ব্যাপক বিভাজন সৃষ্টি করতে পারত। তাকে হয় সাম্রাজ্যের পতন দেখতে হতো নতুবা নিজেদের মধ্যে বিভেদ বিভাজন। আর এখন এমন একটা সময়ে উম্মাহ্ তার কাছে এসে করজোড়ে অনুরোধ করে দায়িত্ব নিতে বলেছে, যখন পরবর্তী খলিফার সামনে অনেকগুলো বড় বড় চ্যালেঞ্জ! কারণ, মাত্র কয়েক দিন আগে উম্মাহ্র কিছু লোকই তাদের খলিফাকে হত্যা করেছে।

চতুর্থ খলিফা (৩৬-৪০ হিজরি, ৬৫৬-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

আলি (রা.) শেষ পর্যন্ত খেলাফতের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন। কিন্তু খলিফা হওয়ার পর জনসম্মুখে দেয়া প্রথম ভাষণে তিনি জানান যে, অনেকটা পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়েই তাকে এই দায়িত্বটা নিতে হয়েছে। তিনি সেই ভাষণে দুঃখ করে বলেন যে, রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করার পর প্রথম প্রজন্ম পার না হওয়ার আগেই উম্মাহ্ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। তাই উম্মাহ্কে আমার শৃঙ্খলার ভেতরে আনতে হলে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তাকে অনেক কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি উম্মাহ্কে সতর্ক করে জানান, তারা যেন তার কাছ থেকে কঠোরতা ছাড়া আর কিছু আশা না করে।

তবে মুসলমানদের মধ্যে একটি অংশ তখনো ছিল যারা খলিফা আলির (রা.) বক্তব্য গ্রহণ করতে পারেনি। এরা হলো, উসমান (রা.) এর নিজ গোত্র উমাইয়া গোত্রের লোকজন। উসমানের (রা.) শাহাদাতের পরপরই তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা দামেস্কে পালিয়ে যান, যেখানে গভর্নর মুয়াবিয়া (রা.) তার অনুগত সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করছিলেন। শুধু সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করাই নয়, বরং মুয়াবিয়া (রা.) সেই সময়ে তার গোটা এলাকা ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন। নিজের সঙ্গে তিনি সব সময় একজন পেশাদার গল্প বক্তা রাখতেন। সফরের মধ্যে যেখানেই তিনি থামতেন, সেই গল্প বক্তা সেখানে জমায়েত মানুষদের কাছে মদিনায় খলিফা উসমানের (রা.) হত্যাকাণ্ডের কাহিনি বর্ণনা করতেন। মানুষ যখন সেই গল্প শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়ত, তখনই মুয়াবিয়া (রা.) সবাইকে একটি রক্ত মাখা শার্ট দেখিয়ে বলতেন, এই হলো সেই জামা যেটা পরিহিত অবস্থায় খলিফা উসমানকে (রা.) হত্যা করা হয়েছে। এটা ছিল খুবই উচুমানের একটি নাটকের দৃশ্যায়ন। মুয়াবিয়া (রা.) সেই উত্তেজিত অবস্থার দোহাই দিয়ে নতুন খলিফার কাছে দাবি জানান যাতে তিনি খলিফা উসমানের (রা.) হত্যাকারীদেরকে আটক করে শাস্তি দেন নতুবা পদত্যাগ করেন।

কিন্তু আলি (রা.) কীভাবে উসমানের হত্যাকারীকে গ্রেফতার করবেন? কেউ আসলে জানত না বা চিনত না যে উত্তেজিত দাঙ্গাবাজদের মধ্যে কে উসমানকে (রা.) হত্যা করেছে। আসলে সেই দাঙ্গাবাজদের সকলেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিল। মুয়াবিয়া (রা)-এর দাবি পূরণ করতে হলে আলিকে (রা.) গোটা দাঙ্গাবাজদের সবাইকেই আটক করতে হতো, যা কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত কাজ হতো না। দাঙ্গাবাজরা তখনো মদিনার রাস্তায় বেপরোয়াভাবেই ঘুরাফেরা করছিল। তাই বাস্তবিক কারণেই মুয়াবিয়া (রা)-এর দাবিগুলো পূরণ করা খলিফা আলির (রা.) পক্ষে সম্ভব ছিল না আর গভর্নর মুয়াবিয়া (রা) নিজেও তা ভালোভাবেই জানতেন।

কারণ, যারা উসমানকে (রা.) হত্যা করেছিল তারা তাদের আন্দোলন শুরু করেছিল অবিচার ও নিপীড়নের শিকার হওয়ার কারণেই। তারা মদিনায় যেই ক্ষোভ বা দুঃখ নিয়ে এসেছিল তা ছিল খুবই যৌক্তিক। কিন্তু খলিফাকে হত্যা করার মাধ্যমে তারা প্রকৃতপক্ষে নিপীড়নকারীদের হাতকেই শক্তিশালী করেছিল। এখন আলির (রা.) সামনে একটি উভয় সংকট পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। তাকে হয় নিপীড়কদের পক্ষ নিতে হবে নতুবা খলিফা উসমানের (রা.) হত্যাকারীদের পক্ষ নিতে হবে।

এমতাবস্থায় খলিফা আলি (রা.) সাম্রাজ্যের মূল সংকট সমূলে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সফল হন বা না হন, এটাই ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

একমাত্র উপায়। খলিফা আলি (রা.) উসমানের (রা.) বেশ কিছু সিদ্ধান্তকে বাতিল করে ও পুনর্বিবেচনা করে উম্মাহ্কে আবারও সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি যাই করেন না কেন, তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে বাস্তবায়ন করাও তার জন্য অপরিহার্য ছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে উসমানের (রা.) অবাধ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে নতুন একটি সম্প্রদায় হঠাৎ করে অর্থশালী হয়ে ওঠেছিল। তারা ইসলামের প্রকৃত চেতনা বাস্তবায়নে আলি (রা.)-এর গৃহীত সংস্কার কর্মসূচিগুলোকে ভালোভাবে দেখছিল না। তাদের জন্য আলি (রা.) হয়ে গেলেন মূর্তিমান আতঙ্ক ও হুমকি। অন্যদিকে, মুয়াবিয়া (রা)-কে (রা.) তারা বিবেচনা করল তাদের অর্থ ও জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি হিসেবে।

দায়িত্ব নিয়েই আলি (রা.) প্রথম উসমান (রা.) কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত সকল গভর্নরকে বরখাস্ত করে নতুন করে সব গভর্নর নিয়োগ করলেন। যদিও ইয়েমেনের একজন গভর্নর ছাড়া আর কোনো গভর্নর পদ ছাড়তে রাজি হয়নি। ইয়েমেনের সেই গভর্নর রাজকোষের সব অর্থসহ পালিয়ে গেল। ফলে তার জায়গায় নতুন যিনি দায়িত্ব পেলেন তিনি একটি দেউলিয়া অর্থনীতিকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেলেন।

এরই মধ্যে নতুন করে আরেক সংকটের সৃষ্টি হলো। নবিজির সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী আয়েশা (রা.) খলিফা উসমানের (রা.) হত্যাকাণ্ডের সময় মক্কায় অবস্থান করছিলেন। হযরত আলি (রা.) দায়িত্ব গ্রহণের পর যখন মুয়াবিয়া (রা) ঝামেলা শুরু করলেন তখন আয়েশা (রা.) আংশিকভাবে হলেও তাকে সমর্থন করলেন। এর কারণ ছিল আয়েশা (রা.) ও হযরত আলি (রা.) সম্পর্কের মধ্যে আগে থেকেই শীতল যুদ্ধ বিদ্যমান ছিল। তিনি মক্কায় এক জ্বালাময়ী ভাষণে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে মানুষ, বিদ্রোহীরা নিষ্পাপ উসমানকে (রা.) হত্যা করেছে। তারা নবির শহরের পবিত্রতা এবং হজের মাসের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। তারা মদিনার নাগরিকদের সম্পত্তি লুটপাট করেছে। আল্লাহর কসম, যারা হত্যা করেছে তাদের সবার জীবনের চেয়েও উসমানের (রা.) একটি আঙুলের মর্যাদা অনেক বেশি। যারা অন্যায় করেছে, তাদেরকে এখনো ধ্বংস করা হয়নি, আইনের আওতায় আনা হয়নি। কিন্তু উসমানের (রা.) হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার মাধ্যমেই ইসলামের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে।

তার এই ভাষণ শুনে উপস্থিত সকলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। হযরত আয়েশা (রা.) তারপর যুদ্ধকৌশল প্রণয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন, সেনাবাহিনীকে একত্রিত করেন এবং একটি সমর যুদ্ধের নকশা প্রণয়ন করেন। ইয়েমেনের গভর্নর যিনি রাজকোষের অর্থ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হযরত আয়েশার (রা.) কাছে সকল অর্থ জমা দেন এবং তার বশ্যতা স্বীকার করেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আর্থিক যোগানটা নিশ্চিত হওয়ায় হযরত আয়েশা (রা.) তার সেনাবাহিনী নিয়ে উত্তরে বসরার দিকে যাত্রা শুরু করেন। তিনি সেখানে আলির (রা.) নিয়ন্ত্রণে থাকা লোকদের দ্রুত ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে সেখানকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে সক্ষম হন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয় যে, উসমান (রা.) হত্যার সাথে আলি (রা.) সম্পৃক্ত ছিলেন। আলি (রা.) স্বীকারও করেন যে, তার কিছুটা হলেও দায় আছে! কারণ, উসমান (রা.) যখন বিপদে পড়ে তার সহযোগিতা চেয়েছিলেন তখন তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তিনি যদি সেদিন উসমানের (রা.) পাশে দাঁড়াতেন তাহলে হয়তো এভাবে উসমানকে (রা.) প্রাণ দিতে হতো না। এ রকম একটি মনোযাতনা হযরত আলির (রা.) মনেও ছিল। কিন্তু হযরত আলির (রা.) এই সরল ভাবনা গুজব সৃষ্টিকারীদের পালে আরও হাওয়া তুলে দেয় এবং প্রকারান্তরে খলিফা হিসেবে আলির (রা.) অবস্থানকেও দুর্বল করে দেয়।

হযরত আলি (রা.) হযরত আয়েশার (রা.) তৈরি করা বাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য নিজেও একটি সেনাবাহিনী গঠন করার চেষ্টা শুরু করেন। তিনি মুসলিমদেরকে বুঝান এটা একটা জিহাদ এবং অতীতের সব জিহাদের মতো এই জিহাদেও মুসলমানদের অংশগ্রহণ করা উচিত। কিন্তু মুসলমানরা সংশয়ে ও দ্বিধায় পড়ে যায়। কারণ, আলির (রা.) মতো আয়েশাও (রা.) আলির বিরুদ্ধে জিহাদেরই ডাক দিয়েছিলেন। উভয় পক্ষই জিহাদের আহবান জানায় সত্য, ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু বাস্তবতা ছিল এটাই যে, এই যুদ্ধটি এমন একটি মর্মান্তিক যুদ্ধ যেখানে মুসলমানের প্রতিপক্ষ ছিল তারই আরেক মুসলমান ভাই।

আয়েশা (রা.) এর সেই বাহিনীতে তালহা ও যুবায়েরের (রা.) মতো রাসূল ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবিদ্বয়ও ছিলেন। উসমানকে (রা.) যেদিন তার বাড়ির ভেতরে হত্যা করা হয় সেদিন ক্রুদ্ধ দাঙ্গাবাজদের মধ্যে এই দুইজনও ছিলেন বলে কেউ কেউ দাবি করে। তারা উসমান (রা.) হত্যায় সরাসরি জড়িত না হলেও আততায়ীদের সেই দলের ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন। এখন তারাই আবার হযরত আয়েশার (রা.) বাহিনীতে থেকে হযরত আলিকে (রা.) দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে উসমান (রা.) হত্যার বিচারের জন্য অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন।

হযরত আলি (রা.) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যখন মদিনা থেকে বের হন তখন তার হাতে খুব বেশি সৈন্য সংখ্যা ছিল না। কিন্তু কিছুদূর এগোতেই অনেকগুলো গোত্রের লোক এসে তার বাহিনীতে যোগ করে, ফলে বাহিনীর আকারও বেশ বৃদ্ধি পায়। যখন এই সেনাদল নিয়ে হযরত আলি (রা.) বসরায় পৌছলেন, তিনি তার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতিকে বিবি আয়েশার (রা.) কাছে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। সেই সমঝোতাকারী বিবি আয়েশাকে (রা.) বেশ ভালোই নমনীয়

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

করতে পেরেছিলেন। প্রথমত, হযরত আয়েশা (রা.) ঐ সেনাপতির কাছে স্বীকার করেন যে, তিনি মনে করেন না যে উসমান (রা.) হত্যায় আলির (রা.) আদৌ কোনো সম্পৃক্ততা ছিল। কিন্তু আলির (রা.) ব্যাপারে তার অভিযোগ হলো আলি (রা.) খলিফার দায়িত্ব নিয়েও উসমানের খুনীদের ধরতে পারেননি। হযরত আয়েশা (রা.)-এর পরে এটাও স্বীকার করলেন যে, উসমানের হত্যাকারী কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কিনা তাও নিশ্চিত করে বলা যাবে না। বরং এক ধরনের অস্থিরতার থেকেই এই খুনী দাঙ্গাবাজদের জন্ম হয়েছে। তিনি এও স্বীকার করেন যে, হযরত আলির (রা.) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে তিনি মূলত এই নৈরাজ্যকেই বৃদ্ধি করছেন এবং এর ফলে উসমানের (রা.) খুনীরা বেঁচে যাওয়ার সুযোগও পেয়ে যেতে পারে। সবশেষে তিনি অস্ত্র নামিয়ে ফেলে তার সেনাবাহিনীকে পরিত্যক্ত করে দেয়ার ব্যাপারেও একমত হন এবং আলির (রা.) সাথে যোগ দিতেও রাজি হন। হযরত আয়েশা (রা.) জানান তিনি পরের দিন হযরত আলির (রা.) সাথে সাক্ষাৎ করে সমঝোতার ধরন ও প্রক্রিয়া নিয়েও বিস্তারিত আলাপ করবেন।

এই সমঝোতার কৃতিত্ব উভয় পক্ষের। হযরত আলি (রা.) তাঁর দূরদর্শিতা দেখিয়েছেন সমঝোতার বার্তা পাঠিয়ে। আর হযরত আয়েশার (রা.) কৃতিত্ব হলো তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক সততা দেখিয়েছেন এবং এমনকি যুদ্ধের দামামার মাঝে থেকেও তিনি নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) সমঝোতা করতে রাজি হয়েছেন- এই বার্তা নিয়ে আলি (রা.)-এর দূত তার ক্যাম্পে ফিরে গেলেন। এই বোঝাপড়ার ব্যাপারটি উভয় শিবিরেই আনন্দ আর উৎসব ছড়িয়ে দেয়। মুসলমানদেরকে নিজেদের মধ্যে আর যুদ্ধ করতে হচ্ছে না, এটা সবাইকেই স্বস্তি দেয়। কিন্তু আনন্দের এই সুন্দর মুহূর্তগুলোতে উভয়পক্ষই একটি বিষয় ভুলে গিয়েছিলেন আর সেটা হলো, উভয় শিবিরেই উসমানকে (রা.) হত্যাকারী সেই দাঙ্গাবাজদের কেউ কেউ ঢুকে গিয়েছিল। তারা এই ধরনের সমঝোতাকে কখনোই মেনে নেয়নি। কারণ, তারা জানত যে যদি আলি (রা.) ও আয়েশার (রা.) মধ্যেকার বিরোধ মিটে যায়, যদি তারা এক হয়ে যায় তাহলে তারা ধরা পড়ে যাবে এবং তাদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেয়া হবে। তারা কোনোভাবেই এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সুযোগ দিতে রাজি ছিল না।

পরের দিন ভোরে, এই ধরনের মতালম্বী দাঙ্গাবাজদের একটি দল হযরত আলির (রা.) শিবির থেকে গোপনে বেরিয়ে গিয়ে হযরত আয়েশার (রা.) ঘুমন্ত সৈন্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হযরত আলি (রা.) ঘুম থেকে ওঠে দেখেন যে আয়েশার (রা.) সৈন্যরাও ফিরতি আক্রমণ করছে। হযরত আয়েশা ও হযরত আলি (রা.) উভয়ই মনে করে বসলেন যে, অপর পক্ষ সমঝোতার পথ বাদ দিয়ে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই হামলা শুরু করেছে। আর এভাবেই শুরু হয় ইসলামের ইতিহাসের মর্মান্তিক যুদ্ধ যা 'উটের যুদ্ধ' হিসেবে পরিচিত হয়। এই যুদ্ধকে উটের যুদ্ধ বলা হতো কারণ আয়েশা (রা.) উটের ওপর চড়ে এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। উটের ওপরে বসে থেকেই তিনি তার সৈন্যদের পরিচালনা করতেন। যুদ্ধটি তখনই শেষ হয় যখন তার উটটি ধরাশায়ী হয় এবং হযরত আয়েশা (রা.) পড়ে যান। হযরত আলি (রা.) সেদিনের যুদ্ধে জিতে যান। কিন্তু ভেবে দেখুন, ইসলামের জন্য সেই দিনটি কি ভয়াবহ ছিল! বিরাট পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির পর যখন তারা পরস্পর সামনা সামনি হলেন, তখন সেই ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তাদের কেমন অনুভূতি হয়েছিল। যুদ্ধের একপক্ষে ছিলেন রাসূল ﷺ প্রিয়তম স্ত্রী আর অপর পক্ষে রাসূল ﷺ-এর মেয়ে জামাতা। শাশুড়ি আর জামাইয়ের মধ্যেকার এই লড়াইয়ের ভিকটিম হয়ে শাহাদাত বরণ করেন ১০ হাজারেরও বেশি মুসলমান। যাদের অনেকেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবি।

যখন তারা দুজনেই বুঝতে পারলেন যে তারা বেশ কিছু মানুষ আর সময়ের প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তখন তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চেষ্টা করলেন। হয়তো তারা একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও মর্মান্তিক ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। কারণ, এরই মধ্যে এমন অনেক কিছু ঘটে গেছে যা তারা কোনোদিনও চাননি। তাই তারা আর কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হননি। উটের যুদ্ধের পর হযরত আয়েশা (রা.) মদিনায় ফিরে আসেন এবং তার জীবনের বাকিটা সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাদিস লিখে ও সংরক্ষণের কাজে ব্যয় করেন। তিনি তার জীবনের শেষার্ধে ইসলামের প্রাথমিক যুগের অন্যতম বিদুষী নারী হিসেবে সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেন।

হযরত আলিও (রা.) আর মদিনায় ফিরে যাননি। তিনি কুফাকে (আধুনিক ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর) তার শাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। সেখানকার লোকেরা তাকে নিরঙ্কুস সমর্থন দিয়েছিল বলে তিনি তাদেরকে পুরস্কার দেয়ার অংশ হিসেবেই সেখানে সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর তিনি খেলাফতের বাকি সময়টুকু সকলকে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আয়েশা (রা.)-এর সাথে যুদ্ধটি ছিল সমস্যার কেবল সূত্রপাত। যারা সুযোগসন্ধানী তারা তখনো নিজেদের দূরভিসন্ধিগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

ইতোমধ্যে মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলির (রা.) আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং নিজেকেই খেলাফতের যোগ্যতম দাবিদার হিসেবে ঘোষণা করে। হযরত আলি (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) উভয়েই সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে হাজির হন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

৩৬ হিজরি (৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) আলি (রা.) আর মুয়াবিয়া (রা.) যুদ্ধে মুখোমুখি হন। যুদ্ধটি তখনই পুরোদমে শুরু হয় যখন মুয়াবিয়া (রা.) সেনারা আলি (রা.) এবং তার সৈন্যদের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই আলির (রা.) সৈন্যরা নদীর তীরদেশ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারপর একটি স্থিরাবস্থা (যুদ্ধবিরতি) দেয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষ একমত হয় যা প্রায় মাস খানেক বিদ্যমান থাকে। উভয় শিবিরই একটু পিছু হটে আসে। প্রকৃতপক্ষে তারা উভয়েই কম রক্তপাতে বিজয় নিশ্চিত করতে চাইছিলেন। কারণ, লড়াইটা যেহেতু মুসলমানদের খেলাফতের দাবি নিয়ে, তাই যার পক্ষ বেশি মুসলমানদের রক্ত ঝরাবে সেই খেলাফত পাওয়ার দৌড়ে পিছিয়ে পড়বে।

এই স্থিরাবস্থাটির অবসান হয় চার দিনব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসবেত্তারা বলছেন যে, আনুমানিক পঁয়ষট্টি হাজার লোক সেই চারদিনের সংঘর্ষে নিহত হয়। এরপরে ফয়সালা হয় যে, উভয়পক্ষের সৈন্যরা আর যুদ্ধে লিপ্ত হবে না। বরং দুই পক্ষের দুই নেতা সম্মুখ সমরে লড়াই করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। হযরত আলির (রা.) বয়স তখন আটান্ন বছর। তথাপি তিনি ইতিবাচকভাবেই এই সম্মুখ লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) শেষ পর্যন্ত আর এভাবে লড়াই করতে সাহস পেলেন না।

হযরত আলির (রা.) সৈন্যরা পুনরায় আক্রমণ শুরু করল। এবার মুয়াবিয়া (রা) আর তার সৈন্যরা খুব সহজেই পরাজিত হয়ে গেল। তিনি তখন একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি ও তার সৈন্যরা নিজ নিজ বর্শার মাথায় কুরআনের পাতাকে বিদ্ধ করে এগোতে লাগলেন আর সামনে রাখলেন বেশ কিছু কারীকে-যারা অবিরাম কুরআন তেলাওয়াত করে যাচ্ছিল। এ রকম একটি পরিস্থিতি করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল যাতে এই কুরআনের স্বার্থে হলেও আলি (রা.) তাদের সাথে সমঝোতা করতে রাজি হন। কুরআনকে এভাবে ব্যবহৃত হতে দেখে হযরত আলির (রা.) সৈন্যরাও হতবিহবল হয়ে পড়ে এবং আলি (রা.) সমঝোতা করতে রাজি হন।

এই সমঝোতা করার ব্যাপারে হযরত আলি (রা.) খুব একটা কিছু ভাবেননি। কারণ, তিনি সব সময় শুরু থেকেই সমঝোতা করার পক্ষে ছিলেন। তারপরও তিনি একটি আলোচনার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এর মাধ্যমে আলির (রা.) খেলাফতের অধীনে সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখার জন্য মুয়াবিয়া (রা)-কে (রা.) নিশ্চিতভাবে রাজি করানো হবে। কিন্তু যখন উভয় পক্ষের সমঝোতাকারীরা একসাথে আলোচনার জন্য বসলেন। দুই সমঝোতাকারী একমত হয়ে জানালেন যে, তারা উভয়ই সমান আর সেই কারণেই তারা পূর্বের মতোই নিজেদের এলাকায় শাসন অব্যাহত রাখবে। মুয়াবিয়া (রা.) শাসন করবেন সিরিয়া আর মিসর আর বাকি পুরো খেলাফতটি শাসন করবেন আলি (রা.)।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই সমাধানটি আলি (রা.) চাননি, কিন্তু এটা তার পক্ষাবলম্বী শিয়াদের ভীষণ রকম উত্তেজিত করে তোলে। শিয়া গোষ্ঠীর জন্মই হয়েছিল এই বিতর্ক থেকেই। আলি (রা.) বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি মুয়াবিয়া (রা)-এর (রা.)-এর চালাকির শিকার হয়েছেন।

সেই সঙ্গে হযরত আলির (রা.) একটি অপূর্ণতাও ছিল। এর আগে থেকেই হযরত আলির (রা.)-এর কিছু ভক্ত দাবি করে আসছিল, খলিফা আলি (রা.) আল্লাহ প্রদত্ত নেতৃত্বের গুণাবলি ধারণ করেছেন। আর কেবল তার নেতৃত্বই মুসলিম সম্প্রদায়কে সকল ধরনের অকল্যাণ থেকে বাঁচাতে পারে। মূলত এই দাবি করার পেছনে প্রকৃত কারণটি ছিল রাসূল ﷺ-এর সাথে হযরত আলির (রা.) রক্তের সম্পর্ক। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর ওফাতের কয়েক দশকের মধ্যে যেহেতু নিয়োগপ্রাপ্ত খলিফারা ভিন্ন ধরণের একটি সামাজিক বিধি-বিধান চালু করেছিলেন। তাই হযরত আলি (রা.) সেই পথে না গিয়ে বরং এই সময়ে নিজের ভিন্ন একটি ইমেজ দাঁড় করান। তিনি এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বয়ান পেশ করতেন যেগুলোর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব, বিশালতা, তাওহিদ আর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। এক কথায় বলতে গেলে অন্য খলিফারা যেখানে রাসূল ﷺ-এর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক রূপটিকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, সেখানে আলি (রা.) আসলে ইমানের অন্তর্নিহিত চেতনাকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন। তাই শিয়ারাও হযরত আলিকে (রা.) ভিন্নভাবেই দেখত। তারা ভাবত আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ ও যোগ্যতা একমাত্র আলিরই (রা.) আছে। হযরত আলির (রা.) ভাবমূর্তিইও সেরকই ছিল।

সেই আলি (রা.) এখন মুয়াবিয়া (রা.) সাথে কীভাবে সমঝোতায় গেলেন? এটা ভেবে তার অনেক অনুসারী ও ভক্তরা হতাশ হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে যারা যুবক ছিল, তারা ছিল বেশি কট্টর এবং সে কারণেই তারা রাগে ক্ষোভে সম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে যায়। তাদেরকে ইতিহাসে খারিজি হিসেবে সম্বোধন করা হয়।

এই বেরিয়ে পড়া দলটি (খারিজি) হযরত আলির (রা.) অনুসারীদের মধ্যে থেকে হলেও, পরে তারা হযরত আলির (রা.) প্রভাব থেকেও বেরিয়ে যায়। তারা নতুন একটি বিপ্লবী চিন্তাধারার সূচনা করে। তারা রক্ত ও জ্ঞিনতত্ত্ব বলে কোনো কিছুর বিশেষ একটা গুরুত্ব দিতে রাজি ছিল না। এমনকি একজন ক্রীতদাসও একটি সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে তার যেই বিশেষ গুণটি লাগবে তা হলো উত্তম চরিত্র। কেউ নেতৃত্ব দেয়ার জন্য জন্ম নেয় না। আবার কেবল একটি নির্বাচন প্রক্রিয়াই একজন মানুষকে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার যোগ্য করে তোলে না। শুধু সেই ব্যক্তি খলিফা হওয়ার জন্য যোগ্য, যার মুসলিম চেতনার ব্যাপারে সর্বোচ্চ পরিমাণ আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা দৃশ্যমান থাকে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তাকে খলিফা বানানোর জন্যও কোনো নির্বাচন প্রক্রিয়ারও প্রয়োজন নেই। তবে মানুষের কাছে তার দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতাও থাকতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি খলিফা হওয়ার পর চরিত্রের দিক থেকে আর মান ধরে রাখতে না পারেন, তাহলে তিনি তার দায়িত্বের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন। অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তি তার পদে স্থলাভিষিক্ত হবেন। তবে ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় একজন খলিফা পদে আসীন হবেন বা অপসারণ হবেন- তার প্রক্রিয়া নিয়ে খারিজিরা অবশ্য সুস্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারেনি। তারা শুধু এতটুকুই অনুধাবন করেছিল যে হযরত আলি (রা.) খলিফা হিসেবে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন। তাই তার পদ ছেড়ে দেয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেহেতু তিনি পদত্যাগ করেননি, তাই তাকে সরানোর দায়িত্ব একজন তরুণ খারিজি নিজেই তার হাতে তুলে নেয়। ৪০ হিজরিতে সেই মাথা গরম করা তরুণটি হযরত আলি (রা.)-কে হত্যা করে।

আলির (রা.) অনুসারীরা সাথে সাথেই তার পুত্র হাসান (রা.)-কে উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাবতে শুরু করে। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) আবারও সেই নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে বসেন। তিনি হাসান (রা.)-কে বেশ বড় পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে খেলাফতের দায়িত্বটি না গ্রহণ করার আহবান জানান। এই অবস্থায় নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাতি হাসানের (রা.) মন ভেঙে যায়। আসলে ক্ষমতা নিয়ে আর কোনো সংঘাতে জড়ানোর মতো মানসিকতা বা দৃঢ়তা কিছুই তার অবশিষ্ট ছিল না। তাই তিনি দায়িত্ব না নিয়ে সরে পড়েন। কারণ তার কাছে খেলাফত বলতে তখন ক্ষমতা দখল ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিলো না। আর এটা করে লাভটাইবা কি? ইমাম হাসানের (রা.) এই দায়িত্ব না নিয়ে সরে যাওয়ার মধ্য দিয়েই উমাইয়া বংশের শাসন শুরু হয়।

হযরত আলির (রা.) শাহাদাতের মধ্যে দিয়ে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। মুসলিম ইতিহাসবিদরা ইসলামের চার খলিফাকেই সঠিক পথের অভিভাবক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তবে হিজরত থেকে শুরু করে আলির (রা.) শাহাদাত পর্যন্ত সব ঘটনা বিচার করলে এতে ধর্মীয় নাটকীয়তার অনেক উপাদানই পাওয়া যাবে। যদিও এই সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ বা সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে তথাপি এটাই বাস্তবতা যে, চার খলিফা এবং রাসূল ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের কেউই আসলে ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হননি। তারা প্রত্যেকেই ইসলামের মূল চেতনাকে মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করেছেন। তবে তাদের কেউই রাসূল ﷺ-এর মতো পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। তারা এই সময়ে যেসব সংকটের মুখে পড়েছেন তার সবগুলোই মূলত ধর্মতাত্ত্বিক। এর বাইরে এগুলোর অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই। ঐতিহাসিক বাস্তবতা এমনই যে, হযরত আলির (রা.) শাহাদাতের পর খেলাফতটি তার মূল চেতনা হারিয়েছে। এটি একটা গতানুগতিক সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

৫. উমাইয়া সাম্রাজ্য
(৪০-১২০ হিজরি) ৬৬১-৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দ

মুয়াবিয়া (রা.) কখনোই নিজেকে খেলাফত আমলের শেষ ব্যক্তি হিসেবে রেখে যেতে চাননি। কারণ, তিনি নিজেকে খলিফাই দাবি করতেন। তিনি বলতেন যে তার পূর্বসূরি খলিফাদের মতো তিনিও মহৎ একটি ধারাই বহন করে যাচ্ছেন। জীবনের শেষ বেলায় এসে তিনি তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করার জন্য আরব গোত্র প্রধানদের নিয়ে একটি কাউন্সিল বা সমাবেশ আহবান করেন। এই বৈঠকটিকে ইতঃপূর্বে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রা.) গঠন করা শুরার একটি উন্নত সংস্করণ বলেও তখন দাবি করা হয়। গোত্র প্রধানরা সেই সমাবেশে যোগদান করলেন। তাদের প্রত্যাশা ছিল বৈঠকে সম্ভাব্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করা হবে। তাদের মতামতকেও গুরুত্ব সহকারে নেয়া হবে। কিন্তু বৈঠকে হঠাৎ করেই মুয়াবিয়া (রা)-এর (রা.) একজন কট্টর সমর্থক লাফ দিয়ে উঠে তার পায়ের সামনে পড়ে যান এবং চক্রাকারে ঘুরতে থাকেন। অনেকটা উম্মাদ ব্যক্তির ন্যায়। সে বেপরোয়া সমর্থক মুয়াবিয়া (রা)-কে (রা.) ইঙ্গিত করে চিৎকার করে বলতে থাকে, এই মুহূর্তে আপনি বিশ্বাসীদের একমাত্র নেতা। আর আপনার মৃত্যুর পর আপনার ছেলে ইয়াজিদই হবে একমাত্র যোগ্য নেতা। আর যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের কেউ যদি ইয়াজিদকে পছন্দ না করেন, তাহলে তার ফয়সালা হবে তলোয়ারের মাধ্যমে। এটা বলেই সে তার খোলস থেকে তরবারি বের করে আনে।

উপস্থিত গোত্র প্রধানরা এই ঘটনার পেছনের কারণ ও বার্তাটি বুঝে যায়। এরপর তারা কিছুক্ষণ লোক দেখানো শোরগোল ও তর্ক-বিতর্ক করে। নাটকের শেষ দৃশ্যে তারা ইয়াজিদকেই পরবর্তী খলিফা হিসেবে বাছাই করে। এরপর তারা যখন বৈঠক শেষে ফিরে যায়, সকলেই অনুধাবন করে উত্তরাধিকার নির্বাচনে আর কখনোই কোনো আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হবে না। কারণ, গণতান্ত্রিকভাবে নেতা নির্বাচনের সকল পথ সেদিনের সেই ঘটনার পরই পুরোপুরি রুদ্ধ হয়ে গেল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইয়াজিদ যখন ক্ষমতায় বসেন সে বেশ ভালোই জানতেন যে, তার পিতা তাদের শাসনের বিরোধীদেরকে মোটেও দমাতে পারেননি। কেবল একটু কোণঠাসা করে রাখতে পেরেছেন। তাই দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই তার সম্ভাব্য হুমকি বা চ্যালেঞ্জদের মোকাবেলা করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে হযরত আলির (রা.) পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন ও অনুসারীদের তিনি সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। এর মধ্যে অবশ্য ইমাম হাসান (রা.) ইন্তেকাল করে গেছেন। তবে তার

ছোট ভাই ইমাম হুসাইন (রা.) তখনো জীবিত ছিলেন। শুধু নিজের পথকে ঝুঁকিমুক্ত ও প্রতিবন্ধকতাহীন রাখার জন্য কোনো রকমের উস্কানি ছাড়াই ইয়াজিদ ইমাম হুসাইনকে প্রতিহত করার পরিকল্পনা করে।

ইমাম হুসাইনের (রা.) বয়স তখন ৪০ এর কোঠায়। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন যে, তার পিতা হযরত আলির (রা.) অনুসারীরা তাকেই সত্যিকারের খলিফা মনে করে। তিনি এও জানতেন যে, মুসলমানদের অনেকেই প্রত্যাশা করে তিনিও তার পিতার মতো আধ্যাত্মিক ও ওহির বাণীগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কাজটি অব্যাহত রাখবেন। তবে একজন ব্যক্তির পক্ষে এত মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই তিনি রাজনীতি থেকে দূরে গিয়ে ইবাদত ও ধ্যানেই বেশি মগ্ন থাকতেন।

কিন্তু তিনি জানতে পারলেন যে, তার এতটা রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার পরও ইয়াজিদ তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে এবং তা পবিত্র নগরী মক্কা যাওয়ার পথেই। তিনি আর বরদাশত করতে পারলেন না। যদিও তার অধীনে কোনো সৈন্য ছিল না, সামরিক কোনো অভিজ্ঞতাও তার ছিল না। অন্যদিকে, ইয়াজিদের হাতে ছিল অসংখ্য গুপ্তচর, রাজকোষ এং সেনাবাহিনী। এরপরও এই অন্যায়কে মেনে নিতে না পেরে ৬০ হিজরিতে (৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে) ইমাম হুসাইন ইয়াজিনকে চ্যালেঞ্জ করেন। ইয়াজিদকে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে মাত্র ৭২ জন লোক নিয়ে মদিনা থেকে রওয়ানা করেন।

এই ৭২ জন লোকের এই দলকে সেনাবাহিনী হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এর মধ্যে ইমাম হুসাইনের (রা.) স্ত্রী, তার বাচ্চারা এবং বয়স্ক কিছু আত্মীয়স্বজন ছিলেন। যুদ্ধ বা সংঘাতে জড়ানোর মতো শক্তিশালী পুরুষ এই দলে তেমন কেউ ছিল না। তাহলে এই অল্প সংখ্যক দুর্বল লোক নিয়ে তিনি কেন শক্তিশালী ইয়াজিদকে মোকাবেলার জন্য বের হলেন? তিনি কি ভেবেছিলেন যে এই অল্প কিছু লোক দিয়েই তিনি ইয়াজিদকে উৎখাত করতে পারবেন? নাকি তিনি ভেবেছিলেন যে, অল্প লোক নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে অন্য গোত্রের লোকেরা তার দলে যোগ দিলে এক পর্যায়ে তার দলটি বিশাল আকার ধারণ করবে?

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আসলে তেমন কিছুই নয়। মদিনা ছেড়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তের বিদায়ী ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'তিনি নিশ্চিত যে তাকে হত্যা করা হবে তবে সেই জন্য তিনি মোটেই ভীত নন। কারণ, আদম সন্তানের গায়ে মৃত্যু সেভাবেই জড়িয়ে থাকে যেভাবে একটি শিশু কন্যার গলায় অলংকার হিসেবে নেকলেস জড়িয়ে থাকে। এরপরে তিনি কুরআনের সেই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন যেখানে ইয়াজিদের মতো অন্যায় শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। আয়াতটি তেলাওয়াত করে তিনি বলেন, যদি হযরত আলি (রা.) আর বিবি ফাতিমার (রা.) ছেলে হওয়ার পরও তিনি এই অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে না দাঁড়ান, তাহলে আর কে দাঁড়াবে? আর কে এর বিরুদ্ধে কথা বলবে?'

তাই ইসলামের সোনালি যুগের অন্য সব নায়কদের মতো ইমাম হুসাইন (রা.)ও একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। ইয়াজিদের বিরুদ্ধে তার সেই যাত্রাকে একটি তীর্থযাত্রার সাথে তুলনা করা যায়, যার ধর্মীয় গুরুত্বও অপরিসীম। এটা ছিল সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ।

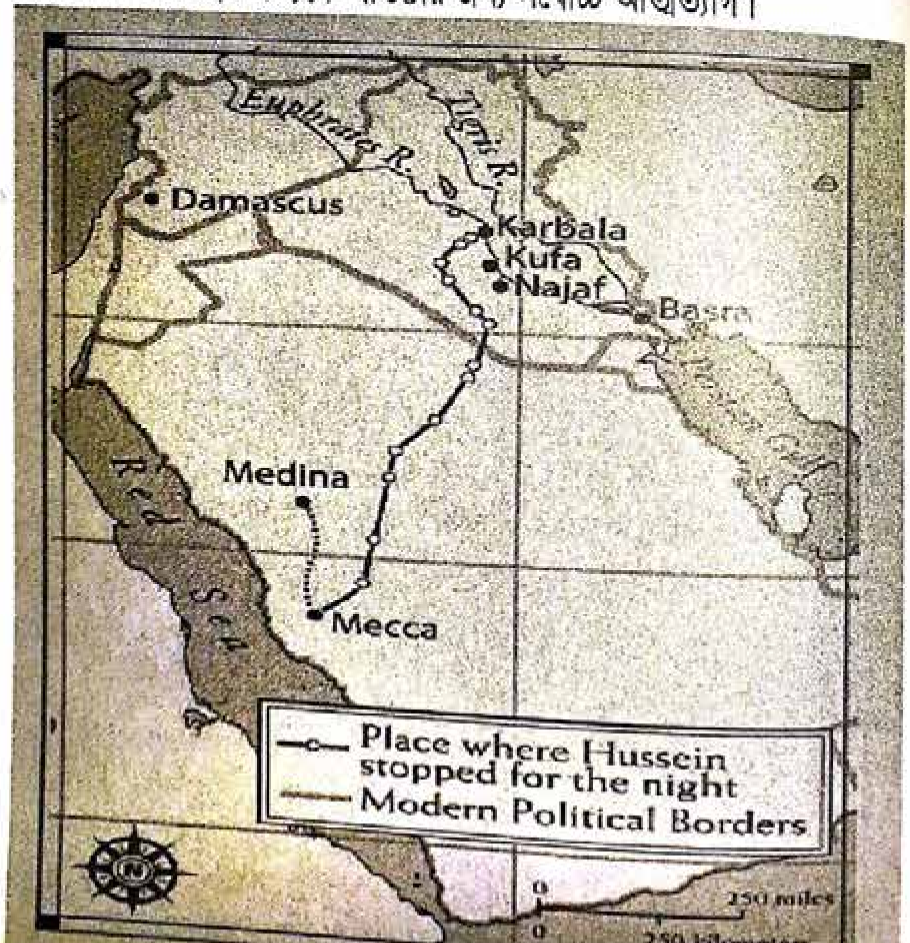

ইমাম হুসাইন (রা.)-এর কারবালার যাত্রাপথ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইয়াজিদ যখন জানতে পারল যে, নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ছোট নাতি তাকে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে বের হয়েছে। তখন সে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করল। ইমাম হুসাইন ইয়াজিদের সাম্রাজ্যের জন্য মোটেও হুমকি ছিল না। তা সত্ত্বেও ইয়াজিদ তাকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করতে চাইল যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস করতে না পারে। ইমাম হুসাইনের (রা.) ছোট দলকে ধ্বংস করার জন্য এতো বড় সেনাবাহিনীর কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইতিহাসে জানা যায়, ইয়াজিদ ইমাম হুসাইনের (রা.) দলকে প্রতিহত করার জন্য ৪শ থেকে ৪ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিল।

এই বিশাল সেনাদল ইমাম হুসাইনকে (রা.) আটক করে কারবালার দক্ষিণে একটি মরুভূমি থেকে। কারবালা শহরটি ইরাকের দক্ষিণ সীমান্তের নিকটাবর্তী। এলাকাটির তাপমাত্রা বেশি অতিরিক্ত। আপনি যদি গরমের সময়ে সেই এলাকার তাপমাত্রা দেখতে চান তাহলে দেখবেন তাপমাত্রা ১১৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কম নয়। সেই রকম তীব্র গরমের একটি দিনে ইয়াজিদের সেনারা ইমাম হুসাইনে (রা.) ছোট্ট দলকে ফাদে ফেলে। সেই সময়ে ইমাম হুসাইনের (রা.) দলটি ইউফ্রেটিস নদীর কাছাকাছি ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমাম হুসাইনকে সব ধরনের পানির সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করে রাখে সেই সৈন্যরা।

একে একে ইমাম হুসাইনের দলের সব সদস্য ইয়াজিদের সৈন্যদের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করলেন। আর দলে যেসব মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তারা মারা গেলেন পানির তৃষ্ণায়। যখন সর্বশেষ মানুষটিও লড়াই করতে গিয়ে শহিদ হলেন তখন ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর জেনারেল বিজয়ীর হাসি হাসলেন। তারপর তিনি ইমাম হুসাইনকে (রা.) হত্যা করে তার মাথা কেটে তাকে বিজয়ের চিহ্ন হিসেবে ইয়াজিদের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন।

সেই দ্বিখণ্ডিত মস্তক যখন ইয়াজিদের দরবারে পৌছালো, তখন ইয়াজিদ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের এক দূতের সাথে নৈশভোজে ব্যস্ত ছিলেন। ইমাম হুসাইনের কাটা মাথা সেখানে পৌছানোর পর গোটা আয়োজনটাই ভুণ্ডল হয়ে যায়। দ্বিখণ্ডিত মস্তক দেখে বাইজেন্টাইন দূত বলেন, তোমরা মুসলমানরা সম্মানীত একজন ব্যক্তির লাশের সাথে এ রকম আচরণ করো? আমরা কখনো যীশুখ্রিষ্টের বংশধরদের সাথে এই ধরনের বর্বর আচরণ করতে পারতাম না। এই কট্টর সমালোচনা ইয়াজিদকে আরও উত্তেজিত করে তোলে। তিনি সেই দূতকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে অবশ্য ইয়াজিদ নিজেও বুঝতে পারে যে, ইমাম হুসাইনের (রা.) কাটা মস্তক তার কাছে রাখলে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই তিনি আবার কাটা মস্তকটিকে কারবালায় পাঠিয়ে দেন এবং শরীরের অন্যান্য অংশের সাথে তখন মাথাটিকেও দাফন করে দেয়া হয়। আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইমাম হুসাইন (রা.)-এর কর্তিত মস্তক দেখে ইয়াজিদ কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি রাগ করে বলেছিলেন, আমি তো ইমাম হুসাইন (রা.)-কে হত্যা করতে বলিনি। কেবল চেয়েছিলাম তিনি যেন কুফায় ঢুকতে না পারেন।

ইয়াজিদ এরপরে তার শাসনকালের ব্যাপারে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে যান। আলির (রা.) কোনো বংশধর না থাকায় সে ধরে নিয়েছিল যে, সমস্যা তৈরি করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। হুসাইনকে হত্যা করার পর তার সাম্রাজ্যে নতুন বারুদের জন্ম হয়। যারা আলিকে (রা.) বরাবরই সত্য পথের একমাত্র নেতা হিসেবে স্বীকার করে তারা এই হত্যার পর থেকে নতুন একটি ধারায় পরিচিত হয়- যাদেরকে আমরা শিয়া বলি। শিয়া সম্প্রদায়ের বিষয়টা আসলে কী? কেউ যদি মনে করে যে শাসনভারের উত্তরাধিকার নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তার থেকেই শিয়াদের উৎপত্তি হয়েছে, তাহলে হযরত আলির (রা.) শাহাদাতের পরই এই ধারার বিলুপ্তি হয়ে যেত। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে আজ অবধি ক্ষমতা নিয়ে যত দ্বন্দ্ব হয়েছে এবং সেই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে যেসব ধারার সৃষ্টি হয়েছে তার সবগুলোই সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির মৃত্যুর পরে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিয়াদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণই ভিন্ন। হযরত আলির (রা.) শাহাদাতের পর তিনি যেন আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। শিয়াদের সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়তে থাকে। এমনকি যারা আলিকে (রা.) দেখেনি, বা তার শাহাদাতের অনেক পরে যাদের জন্ম তারা বরং হযরত আলির (রা.) আদর্শ নিয়ে আরও বেশি তৎপর। তাদের কাছে আলির (রা.) অবস্থান বরং আরও বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। তাদের অনেকেই মনে করছেন যে, প্রথম খলিফা হওয়া উচিত ছিল হযরত আলির (রা.)। কিন্তু এই চেতনাটি কীভাবে দিনে দিনে আরও প্রকট হয়ে ওঠছে?

এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে যে, খেলাফত নিয়ে যে বিতর্কটি দেখা গেছে তা কোনো রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গতানুগতিক সমস্যা নয়। এর মধ্যে ধর্মীয় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুও ঢুকে গেছে। কে বা কারা নেতৃত্ব পাচ্ছেন সেটাই যে এল সমস্যা, ব্যাপারটি তেমন নয়। কারণ, যারা আলিকে (রা.) নেতৃত্বের দাবিদার মনে করছেন, তারা শুরু থেকেই হযরত আলির (রা.) মধ্যে এমন কিছু বিষয় দেখেছেন যা খেলাফতের দাবিদার আর কারও মধ্যেই তারা খুঁজে পাননি। তারা হযরত আলির (রা.) মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত কিছু আলৌকিক ক্ষমতার সন্ধান পান। যা হযরত আলিকে (রা.) সাধারণ মানুষের থেকে অনেকটাই আলাদা করে ফেলেছে। এই গুণগুলো এর আগে শুধু রাসূলুলাহর ﷺ মধ্যেই দেখা যেত। কেউই বলেনি যে হযরত আলি (রা.) আল্লাহর নবি ছিলেন। এমন দাবি কেউ করবেও না। কিন্তু নবিও নয়, খলিফাও নয়, শিয়ারা হযরত আলিকে (রা.) নতুন একটি উপাধি দেয়। তাদের কাছে হযরত আলি (রা.) হলেন ইমাম। সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সাধারণভাবে ইমাম বলতে ইসলামে বুঝানো হয় যিনি নামাযের জামায়াতে ইমামতি করেন বা নেতৃত্ব দেন। অধিকাংশ মুসলমানদের কাছেই ইমাম মানে এখনো তাই। ইমাম শব্দটি মুসলমানদের কাছে ভীষণ সম্মানের। যখনই একদল লোক একসাথে নামাজ আদায়ের জন্য একত্রিত হয়, তখন তাদের মধ্যে যিনি অধিক যোগ্য বা সম্মানীত তিনি সেই জামায়াতে ইমামতি করেন। অন্যরা তাই করেন, যা ইমাম করেন। তবে তিনি দাঁড়ান সকলের সামনে এবং তাকে অনুসরণ করেই অন্যরা ইবাদতটি সম্পন্ন করেন। প্রতিটি মসজিদের একজন করে ইমাম থাকে।

কিন্তু যখন শিয়ারা ইমাম বলে, তখন তারা এতটা সরল ব্যাখ্যা করে না। তাদের কাছে ইমাম শব্দটি আরও অনেক বেশি সমৃদ্ধ, অর্থবহ ও সম্মানের। শিয়াদের মতে পৃথিবীতে ইমাম থাকবেন একজনই। একসাথে একজনের বেশি ইমাম কখনোই থাকবে না। তারা মনে করে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর কিছু অলৌকিক ও রহস্যময় ক্ষমতা ছিল যা তাকে আলাহ রাব্বুল আলামীন সরাসরি দান করেছিলেন। যেমন অতিরিক্ত শারীরিক ক্ষমতা, কিছু আলোর ঝটা। এগুলোকে তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর বারাকা হিসেবে অভিহিত করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন তখন এই আলোটি চলে আসে হযরত আলির (রা.) কাছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হযরত আলি (রা.) হয়ে যান প্রথম ইমাম। যখন হযরত আলি (রা.) শহিদ হন, তখন সেই নূর বা আলোটি চলে যায় তার বড় ছেলে হাসানের কাছে। তাই তিনি হয়ে যান দ্বিতীয় ইমাম। এরপর নূরের এই ঝলকানি চলে যায় তার ছোট ভাই হুসাইনের কাছে, যিনি হয়ে যান তৃতীয় ইমাম। যখন ইমাম হুসাইনকে কারবালায় শহিদ করে দেয়া হয়, তখন এই ইমামের ধারণাটি একটি সমৃদ্ধ ধর্মীয় চেতনায় পরিণত হয়। এই ধর্মীয় চেতনা সমৃদ্ধ ইমামরা এমন কিছু ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কাজ করেন বা এই মানুষগুলো (ইমামেরা) এমন কিছু ক্ষমতা ধারণ করেন যা মূল ধারার মতবাদে খুব একটা আলোচিত হয় না।

মূলধারার মতবাদ যা চলে এসেছে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমরের (রা.) মাধ্যমে এই ধারার দর্শনে বলা হয়, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন আল্লাহর একজন রাসূল এবং তিনি তাঁর নিজের জীবনের মাধ্যমে অসংখ্য নির্দেশনা রেখে গেছেন, যা অনুসরণ করে একজন মানুষ সঠিক ও সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করবে। রিসালাতের বিষয়টি খুবই বড় ও ব্যাপক। রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআনের বাইরে রাসূলের আরেকটি যে ধর্মীয় সম্পদ রয়েছে তা হলো তার সুন্নত। তার গোটা জীবনটাই সুন্নত। আর রাসূলের জীবনই হলো সর্বোত্তম আদর্শ যা অনুসরণ করে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করতে পারি। যারা এই মূলধারার দর্শনটি মানে তারা হলেন সুন্নি। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমানই সুন্নি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অন্যদিকে, শিয়ারা মনে করে যে তারা নিজেরা চেষ্টা করেই নিজেদেরকে বেহেশতে যাওয়ার জন্য যোগ্য বানাতে পারবে না। শুধু নির্দেশনাও এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। তারা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দুনিয়াতে এখনো সরাসরি নির্দেশনা আসছে। তবে তা আসছে আল্লাহর পছন্দসই কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে, যারা বাকি বিশ্বাসীদের মধ্যে সেই ঐশ্বরিক শক্তির চেতনা ছড়িয়ে দেয়। এই সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এসব জীবন্ত মানুষ যারা পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে এবং বিশুদ্ধ করে তোলে। তারা এই পছন্দসই ব্যক্তিদেরকে ইমাম বলে সম্বোধনে করে। এই ইমামদের উপস্থিতি যতক্ষণ এই পৃথিবীতে থাকবে, ততক্ষণ পৃথিবীতে অলৌকিক কিছু ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যাবে।

যখন ইমাম হুসাইন (রা.) কারবালায় যান, তার পক্ষে জেতার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তার একমাত্র আশা ছিল আল্লাহ চাইলে কোনো না কোনো অলৌকিক কিছু ঘটিয়েও দিতে পারেন। সেখানে অবশেষে তিনি এমন একটা সিলসিলা চালু করলেন, যা আসলে অলৌকিক কিছু ঘটার সম্ভাবনাকে সব সময়ের জন্য জিইয়ে রাখে। তিনি এবং তার সঙ্গীরা সকলেই মৃত্যুকে বেছে নিলেন, কারণ শিয়ারা মনে করে তাদের মৃত্যুই একটি নতুন অলৌকিক ধারার সূচনা করেছে। যেটা হলো শাহাদাত।

আজ অবধি গোটা বিশ্বের শিয়া মতাবলম্বীরা কারবালায় ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের দিনটিকে শোকের দিন হিসেবেই পালন করে। তারা এই দিনটিতে বিলাপ করে কাঁদে, শাহাদাতের চেতনাকে নতুন করে ধারণ করে। কারণ, এই শাহাদাত বরণের মাধ্যমেই ইমাম হুসাইন পাপ মোচন করার মতো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। কারবালায় শহিদ হওয়ার মাধ্যমে ইমাম হুসাইন আল্লাহর এত বেশি নৈকট্য লাভ করেছেন যে, শিয়ারা মনে করে হুসাইন (রা.) এখন পাপীদের জন্য মধ্যস্থতা করারও ক্ষমতা রাখেন। তাই শিয়ারা মনে করে যারা ইমাম হুসাইনকে (রা.) মানে এবং তার ওপর ইমান আনে তারা বেহেশতে চলে যাবে। এমনকি দুনিয়াতে সে যদি অনেক বেশি গুণাহও করে তথাপিও হুসাইনকে ভালোবাসার জন্য সে মুক্তি পেতে পারে। ইমাম হুসাইন (রা.) শিয়াদের জন্য এই বিশেষ সুবিধাটি দিবেন বলেও তারা মনে করে। হুসাইনের ওপর আস্থা রাখলে আপনি স্বর্ণ জিতবেন বা বড় পজিশনে যাবেন, ভাগ্য সহায় হবে কিংবা অনেক ভালোবাসা পাবেন তা নাও হতে পারে। তবে আপনি জান্নাত নিশ্চয়ই পাবেন, আর এটাই ইমাম হুসাইনের মিরাকল বা মুজিযা।

অন্যদিকে, মুয়াবিয়া (রা.) ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর নতুন একটি রাজনৈতিক গল্প প্রচার করা শুরু হয়। উমাইয়া সাম্রাজ্যের উথান হয়তোবা খেলাফতের মূল চেতনাটিকে বিলুপ্ত করে ইসলামের ধর্মীয় ধারাটির সমাপ্তি টেনেছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তবে এই সাম্রাজ্যই ইসলামকে সভ্যতা হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। ইসলামের নামে একটি রাজনৈতিক সাম্রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি পশ্চিমারা পৃথিবীর যে ইতিহাস রচনা করেছে, তাতে মুসলিম সাম্রাজ্যকালের সূচনা হয়েছে এই উমাইয়া শাসনামল থেকেই। তারা বিশ্ব মানচিত্রে ইসলামের পরিচয়ে একটি সোনালি যুগের সূচনা করে গেছে, যা তাদের পতনের পরও বহু দিন টিকে ছিল।

মুয়াবিয়া (রা)-এর (রা.) যত ধরনের সংকীর্ণতাই থাকুক না কেন, তিনি রাজনৈতিকভাবে খুব দক্ষ ও কৌশলী ছিলেন। আর এই যোগ্যতার কারণেই তিনি হযরত আলিকে (রা.) রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করে একটি শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, তার শাসনামলে এমন কিছু প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলা চালু করা হয়েছিল, যার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে একটি ইসলামিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা টিকেও ছিল কয়েক শতাব্দী ধরে।

আসলে গোটা ব্যাপারটিই নিয়তির খেলা। যখন রাসূল ﷺ নবুওয়াত লাভ করেন, উমাইয়ারা ﷺ সেই সময় মক্কার সবচেয়ে অভিজাত সম্প্রদায়। নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে আল্লাহর নবি ﷺ অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন ও ভোগ করার বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বিধবা ও এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের তিরস্কার করতেন। তখন নবিজি ﷺ ওপরোক্ত কথাগুলো যাদেরকে সমালোচনা করে বলতেন তারা হলেন এই উমাইয়া গোত্র। যত দিন আল্লাহর নবি ﷺ মক্কায় ছিলেন এই উমাইয়া গোত্রের লোকজন খেয়ে না খেয়ে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এবং তার অনুসারীদের অত্যাচার করেছে, কষ্ট দিয়েছে। নবিজির ﷺ হিজরতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাকে হত্যা করার যে পরিকল্পনাটি করা হয়, তারও নেতৃত্ব দিয়েছে এই উমাইয়ারাই। আর মদিনায় হিজরত করার পর ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কুরাইশরা যতগুলো যুদ্ধ পরিচালনা করেছে তাও হয়েছে এই উমাইয়া গোত্রের নেতৃত্বেই।

কিন্তু যখনই ইসলাম বিজয়ীর আসনে আসীন হলো, তখন বনু উমাইয়ার সবাই পুরোনো ধর্ম বাদ দিয়ে ইসলামে দাখিল হয়ে গেল। তারা ইসলামের নতুন সমাজব্যবস্থায়ও একটি ভালো অবস্থান অর্জন করে নিল। ইসলামে প্রবেশ করার আগে তারা ছিল সাধারণ একটি শহরের অভিজাত সম্প্রদায়। আর ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর এই উমাইয়ারা হয়ে গেল বিশ্বজনীন একটি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে অভিজাত সম্প্রদায়।

শাসক হিসেবে উমাইয়ারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার অনেকগুলো ভালো কৌশল ও সুযোগ-সুবিধা উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিল। বিশেষত হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমানের (রা.) শাসনামলে এই গোত্রের লোকেরা অনেক সুবিধা পায়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উমর (রা.) তার খেলাফতের সময়ে এসে আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে জিহাদ হিসেবে স্বীকৃতি দেন, যদি সেই যুদ্ধের মূল কারণ ইসলামের কল্যাণ হয়। জিহাদের এই নতুন সংজ্ঞা নতুন মুসলিম শাসকদেরকে সীমান্ত বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন দেশ জয়ে আক্রমণ করার জন্য ব্যাপকভাবে সুযোগ করে দেয়। আর এই নয়া মুসলিম শাসকগণ এই ধরনের আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহীও ছিলেন কারণ, এসব যুদ্ধ থেকে আর্থিক ফায়দা ও সম্পত্তি লাভের সুযোগও বেশি থাকত।

এ ছাড়াও, এই ধরনের যুদ্ধগুলো সাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় অস্থিরতা তৈরি করলেও সাম্রাজ্যের ভেতরে বেশ শান্তিপূর্ণ অবস্থা ধরে রাখে। খেলাফতের প্রথম দিকেই এই তত্ত্বটি প্রচলন করা হয়েছিল যে, যেখানে ইসলাম থাকবে সেখানে শান্তি আর ইসলামের বাইরে যা থাকবে তাতেই যুদ্ধ আর সহিংসতা বিদ্যমান থাকবে। তাই আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিষয়ে সেই অর্থে কোনো আপত্তি ছিল না। তা ছাড়া এই যুদ্ধনীতির আরেকটি ফায়দা ছিল এই যে, আরবের সব গোত্রের লোকেরাই এই যুদ্ধগুলোতে অংশ নিত। তারা বহিঃশত্রু নিয়ে এতটা ব্যস্ত ছিল যে, নিজেদের মধ্যে কোনো রকমের দ্বন্দ্বে বা কলহে জড়াতে পারত না। ফলে ইসলাম গ্রহণের আগে আরবের গোত্রে গোত্রে যেই বিবাদ ছিল, সেটাও এই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নীতির কারণে আর নতুন করে বৃদ্ধি পায়নি।

বিষয়টি আরও ভালো করে বুঝা যায়, যুদ্ধগুলোর ধরন ও প্রকৃতি দেখলেই। প্রথম দিকের এই যুদ্ধগুলোতে মুসলিম সেনাদলে তেমন কোনো পেশাদার সেনাপতি বা সৈন্য দেখা যেত না। আহামরি কোনো মাস্টার প্ল্যানও যুদ্ধের আগে করা হতো না। সাধারণত সকল গোত্র থেকেই প্রতিনিধি নিয়ে একটি সেনাদল তৈরি করা হতো। তারা যুদ্ধে যাওয়ার ঠিক আগে আগে যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে জানতে পারত। এই যুদ্ধগুলোতে মুসলমানরা অংশ নিত ইমানের জায়গা থেকে। তারা নিজেরা কি ভাবছে সেটা নয় বরং খলিফা কি আদেশ দিচ্ছেন, সেটাই ছিল তাদের কাছে বড়। আর তারা নিজেরাও জানত যে, যদি তারা সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়ানোর জন্য সীমান্তে যুদ্ধ না করে, তাহলে তারা হয়তো নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত হয়ে থাকত।

তা ছাড়া এই আক্রমণাত্মক যুদ্ধগুলো ইসলামের একটি আলৌকিক শক্তিরও পরিচয় বহন করে। কারণ, অপেশাদার সৈন্য নিয়েও মুসলিম বাহিনী যেখানেই যুদ্ধে গেছে তারা জয়লাভ করেছে। আল্লাহর সাহায্য ও অলৌকিক শক্তি ছাড়া তা কখনোই সম্ভব ছিল না। বলা হয় যে যীশুখ্রিষ্ট অন্ধের চোখ সারাতে পারতেন এবং মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। অন্যদিকে মুসা (আ.)-এর যাদুর লাঠির দিয়ে সাপকে গিলে খাওয়ার গল্প বা নীল নদের পানিকে দুইভাগে ভাগ করার আলৌকিক গল্পগুলো আমরা জানি। নবিদের এসব আলৌকিক ক্ষমতা দেয়া হয়, যাতে তারা নিজেদেরকে তাদের উম্মাতের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে পারেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সেই অর্থে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এই ধরনের কোনো আলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেননি। তিনি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়, এমন কিছু করে তাঁর অনুসারীদের তাক লাগিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করেননি। তার একটা বড় আলৌকিক ক্ষমতা বা মোজেযা ছিল জেরুজালেম থেকে বোরাক নামের সাদা ঘোড়ায় চড়ে আসমান ঘুরে আসা। তবে এই যাত্রাটিও কিন্তু কেউ স্বচোখে দেখেনি, বরং তিনি নিজেই এই যাত্রার পরে এসে তা তার সঙ্গীদের সাথে বর্ণনা করেছেন। কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, তাতে নবিজির রিসালাত মিশনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর সেই কারণেই তিনি মেরাজে উর্ধ্বাকাশে যাওয়ার পরও সেখান থেকে কাউকে বিশ্বাস করানোর জন্য আলাদা করে কোনো প্রমাণও নিয়ে আসেননি।

রাসূল ﷺ সবচেয়ে বড় মোজেযা ছিল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যখনই এই কুরআন কেউ পড়ে বা শোনে, তার ভেতরে বিস্ময়কর এক প্রতিক্রিয়া হয়। আরেকটি অলৌকিক ক্ষমতা দেখা যায়, যখন মুসলমানরা প্রতিপক্ষের তিনভাগের একভাগ সৈন্য নিয়েও যুদ্ধে বিজয়ী হয়। আর খেলাফতের সময় যখন ইসলামি সাম্রাজ্যটি বিস্তার ঘটানোর জন্য বিভিন্ন আক্রমণ পরিচালনা করা হয়, সেখানেও মুসলমানরা দারুণভাবে সফল হয়। অর্থাৎ রাসূলের ﷺ সেই মোজেয তখনো বিদ্যমান ছিল। যেভাবে মুসলমানরা একের পর এক অপরাজেয় সাম্রাজ্যগুলোকে জয় করেছে তা ঐশ্বরিক সহযোগিতা ছাড়া আর কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

উমাইয়াদের সময়ে এসেও মুসলমানদের সেই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। এমন না যে, সেখানেও বদরের মতো প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনভাগের একভাগ সৈন্য নিয়ে জেতার উদাহরণ আছে। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উমাইয়ারাও সাম্রাজ্য বিস্তারে ষোল আনা সফল হয়েছে। তারা নিজেদেরকে সত্যের প্রতীক মনে করত। তাই সেই চেতনা নিয়ে উমাইয়া সৈন্যরা যুদ্ধে গিয়েছে এবং তারা আগের প্রজন্মের মতোই সফলভাবে প্রতিপক্ষকে কুপোকাত করতে সক্ষমও হয়েছে। আর এই ধরনের যুদ্ধগুলো থেকে আর্থিক লাভও হতো বেশ। মুসলমানরা যেই সাম্রাজ্য জয় করত, সেই পরাজিত সাম্রাজ্যের রাজকোষটি মুসলমানরা অর্জন করত। ফলে সীমানা বৃদ্ধির পাশাপাশি মুসলিম সাম্রাজ্যের আর্থিক সক্ষমতাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ইসলামের প্রথম দিকের যুদ্ধগুলোতে যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত অর্থের এক পঞ্চমাংশ রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হতো। প্রথম দিকে এর বড় অংশই বিতরণ করা হতো গরিবদের মাঝে। কিন্তু খেলাফত চালু হওয়ার পর যুদ্ধের মালামালের একটি অংশ রাজকোষে জমা দেয়া হতো। আর প্রতিটি খলিফার আমলেই এর পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। আর উমাইয়ারা শাসনভার নেয়ার পর তারা যুদ্ধ সম্পত্তির পুরোটাই রাজকোষে জমা দেয়ার বিধান জারি করে। কারণ, তারা এসব অর্থ সরকারের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিভিন্ন খরচ পূরণ করতে বিশেষ করে অবকাঠামো নির্মাণ, উচ্চাবিলাসী জনকল্যাণমূলক কাজ বা বিরাট দাতব্য প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় করত। তাই আক্রমণাত্মক যুদ্ধে থেকে আসা অর্থকে কাজে লাগিয়ে উমাইয়ারা সমাজে নিজেদের ইতিবাচক একটি ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম হয়। তাদের আমলে নাগরিকরা বিলাস বহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে অথচ এর জন্য তাদেরকে বাড়তি কোনো কর দিতে হতো না।

তা ছাড়া উমাইয়াদের সামনে উসমান (রা.) এর কিছু দৃষ্টান্ত ছিল, যা তারা কাজে লাগিয়েছিল। খলিফা উসমান (রা.) ইসলামের বিধান মতো মুসলমানদের যেকোনো খাতে অর্থ বিনিয়োগ ও খরচকে অনুমোদন করেছিলেন। উসমানের (রা.) এই বিধানের ওপর ভিত্তি করেই উমাইয়ারা মুসলমানদেরকে নতুন বিজিত অঞ্চলে জমি কেনার অনুমতি দেয়। সেই জন্য রাজকোষ থেকে ঋণ দেয়ার সুযোগও প্রদান করে। যদিও এই ঋণগুলো পাওয়ার জন্য ঋণ প্রত্যাশী ব্যক্তিকে ওপরের মহলের সাথে ভালো যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখতে হয়। আর যেহেতু ইসলাম সুদকে অনুমোদন করে না, তাই যারা রাজকোষ থেকে এই বিশাল পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে পেত তাদেরকেও কোনো সুদ প্রদান করতে হতো না। এখনকার সময়ে এসে এই ধরনের সুদ মুক্ত ঋণের কথা ভাবাও যায় না।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) বীর যোদ্ধাদেরকে একটু ভিন্নভাবে রাখার পক্ষে ছিলেন। এই যোদ্ধারা নতুন নতুন দেশ জয়ে সাহসী ভূমিকা পালন করলেও উমর (রা.) তাদেরকে সব সময় ক্যান্টনমেন্টের মতো সুরক্ষিত এলাকায় রাখতেন। এর বেশ কিছু কারণও ছিল। এই যোদ্ধাদের মেজাজ ও মানসিকতা একটু অন্যরকম হতো। তাই তারা সাধারণ মানুষের সাথে লোকালয়ে থাকলে অনেক সময় বেসামরিক লোকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তা যেন না হয়, তাই এই যোদ্ধাদেরকে লোকালয় থেকে আলাদা রাখা হয়েছিল। আরেকটি কারণ ছিল, যাতে সংখ্যালঘু মুসলমানরা সংখ্যাগুরু মুসলমানদের দ্বারা কোনোভাবে অন্যায় আচরণের শিকার না হয়। কিন্তু উমাইয়াদের সময় এসে এই বিভাজনটি আর সেভাবে রাখা হয়নি। তখন এই ক্যান্টনমেন্টের মতো সুরক্ষিত এলাকাগুলো একেকটি আলাদা শহরে পরিণত হয়। যেখানে যোদ্ধারা অতি উন্নতমানের আবাসন গড়ে তোলে এবং একেকজন সেনা মূল শহরের বাইরে বেশ পরিমাণ সম্পত্তির মালিকও হয়ে যায়।

ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থাটি ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পুরো আলাদা। তাই সেখানে যেমন জমিদাররা অর্থনৈতিক উৎপাদন ও ভোগের একটি বিরাট কাঠামো হিসেবে কাজ করে, মুসলমান সমাজে তা হয় না। উমাইয়া শাসনামলে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

হস্তশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। আর বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বিশেষ করে যোদ্ধাদের ক্যান্টনমেন্ট এক পর্যায়ে অতি উন্নত আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়েছিল, তা ক্রমশ ব্যবসা বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এখানকার লোকেরা যেমন অনেক দূর থেকে বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে আসত, ঠিক তেমনি এদের তৈরি পণ্যও অনেক দূরে যেত। এভাবে এই আবাসিক এলাকাটি ক্রমান্বয়ে একটি অভিজাত শহুরে এলাকায় পরিণত হয়।

মুয়াবিয়া (রা.) এসব চিন্তাধারাগুলোকে মানুষ অনেক সমালোচনা করলেও এটাই ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, তিনি একজন যোগ্য আর্থিক ব্যবস্থাপক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করে গেছেন। তিনি ছিলেন কঠোর আবার বেশ উপভোগ্য ব্যক্তি। তার স্বযোগ্যতায় তিনি আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের ও গোত্রের প্রধানদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। যদিও এই জন্য তিনি অনেক লবিংও করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নয়ন করেছিলেন। এর ফলে তিনি যে শাসক হিসেবে শুধু লাভবান হয়েছিলেন তাই নয় বরং সভ্য সমাজ ব্যবস্থায়ও ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

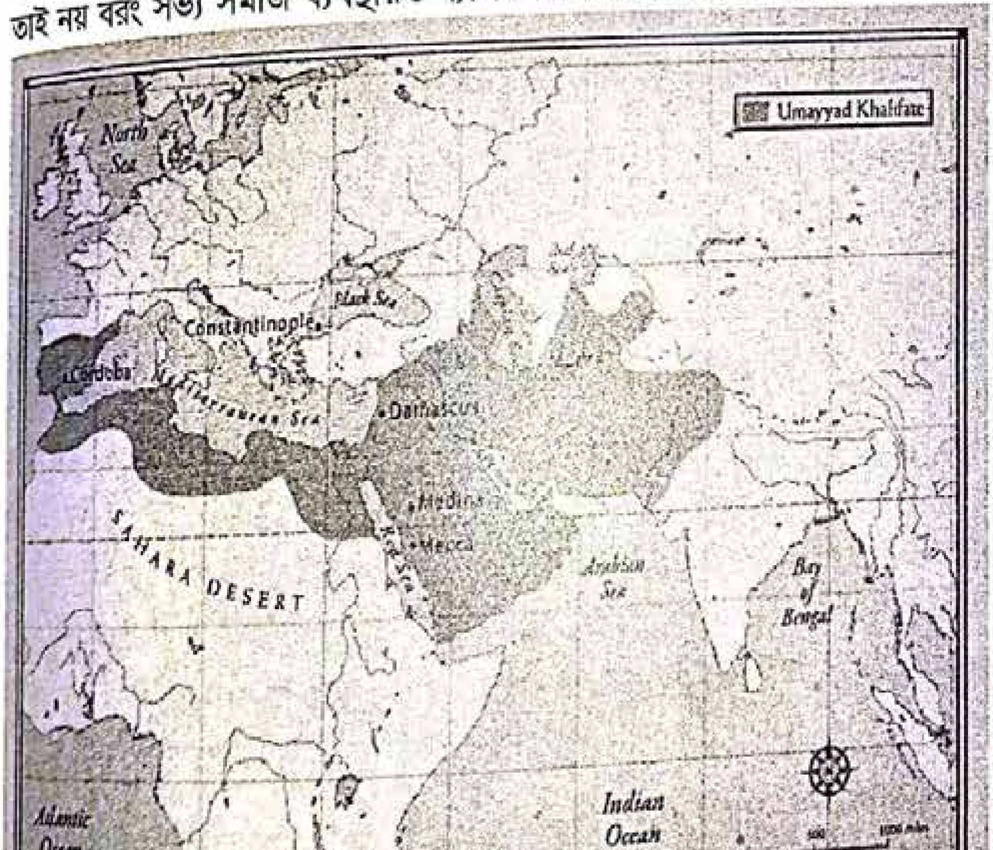

উমাইয়া খেলাফত

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কঠোর ও কোমলতার মিশ্রণে মুয়াবিয়া (রা)-এর কেমন মানুষ ছিলেন তা বুঝা যায় একটি চিঠি থেকে, যেটা মুয়াবিয়া (রা.) তার পালিত ভাই জিয়াদকে দিয়েছিলেন। জিয়াদ তখন বসরার গভর্নর। জিয়াদকে লেখা মুয়াবিয়া (রা.) সেই চিঠি খুবই শিক্ষণীয়। মুয়াবিয়া (রা.) চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ:

> 'তোমাকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যাতে প্রথমত তুমি টিকে থাকতে পারো এবং দ্বিতীয়ত ধর্মকে সমুন্নত রাখতে পারো। তুমি তোমার পাপগুলোকে আড়াল করে রাখবে। নিজেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের যে কয়টা আইন ও বিধি-বিধান আছে তাকে ব্যবহার করবে। রাতে অসহায় অবস্থায় বা মাতাল হয়ে ঘুরবে না। আমি যদি সন্ধ্যার পরে তোমায় রাস্তায় থাকার খবর পাই তাহলে তোমাকে হত্যা করব। নিজের সন্তানদের বেশি সুবিধা দিবে না। আমি চিরস্থায়ী খোদার নামে শাসন করি এবং তোমাকে সেই খোদার সম্পদ পাহারা দেয়ার জন্য নিয়োজিত করেছি। আমি তোমার কাছ থেকে আনুগত্য প্রত্যাশা করি এবং সেই আনুগত্য করলে তুমিও আমারও আনুকূল্য পাবে। মনে রাখবে, আমি তিনটি জিনিস করতে কখনোই পিছপা হবো না। ১. যারা আমার পক্ষে কথা বলে আমি তাদের পক্ষে দাঁড়াবোই। ২. আমি তোমাকে তোমার বেতন ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা যথাযথভাবে এবং সময়মতো দিয়ে দিবো এবং ৩. আমি তোমাকে অনেক বেশি সময়ের জন্য ময়দানে পাঠাবো না আর খুব বেশি দূরেও পাঠাবো না। আর শুনো, আমার বিরুদ্ধে কখনো নিজের রাগ বা ক্ষোভ দেখিও না। তাহলে তোমার পরিণতি হবে ভয়াবহ। আমি বহু মানুষের মাথা কেটে নিয়েছি তাই সতর্ক থেকো যাতে তোমার মাথা তোমার কাঁধের সাথেই লাগানো থাকে, আমার কেটে নিতে না হয়।'

এভাবে কঠোরতার মধ্য দিয়েই উমাইয়া শাসকেরা ইসলামের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা করেছে। উমাইয়া শাসনামলে শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানীদেরকে অনেক বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং বিধি বিধান বৃদ্ধি করা হয়, যার মধ্য দিয়ে ইসলামিক জীবনযাপন পদ্ধতি সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

উমাইয়া শাসনামলে যে কেবল আরবীয় ব্যবসা বা অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটে তাই নয়। বরং ইসলাম প্রবর্তিত সামাজিক বিধি বিধান ও আদর্শগুলোও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। যারা নতুন করে সম্পদশালী হয়েছে তারা তাদের বাড়তি সম্পত্তিগুলো নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে শুরু করে। এ রকমই একটা ব্যবস্থার নাম ওয়াকফ- যা এই উমাইয়া আমলে শুরু হয়। এই ধরনের দাতব্য কাজ করার জন্য এই অর্থশালী ব্যক্তিদের ওপর

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সামাজিকভাবে প্রবল চাপ ছিল। প্রত্যেকেই সমাজে সম্মান চায়, মূল্যায়ন চায়, আর উমাইয়া আমলে সমাজে সম্মান পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় ছিল ওয়াকফ্ কাজে সম্পৃক্ত হওয়া।

ওয়াকফের তত্ত্বানুযায়ী ওয়াকফকারী নিজেও কখনো ওয়াকফ বন্ধ করতে পারেন না। একবার চালু হয়ে যাওয়ার পর ওয়াকফের অবস্থান অনেকটা সার্বভৌম। এটাকে আপনি অলাভজনক কর্পোরেশনের মুসলিম সংস্করণ হিসেবে ভাবতে পারেন। যার জন্ম হয় দাতব্য সংক্রান্ত কাজ করার জন্য। মুসলিম আইন অনুযায়ী ওয়াকফের কোনো কর হয় না। ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলো দাতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এবং সেই অর্থ গরিবদের মাঝে বিতরণ করে। তা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ বা পরিচালনা করে। স্কুল চালায় কিংবা হাসপাতাল বা এতিমখানা পরিচালনা করে। ওয়াকফ হলো সমাজের বুর্জোয়া শ্রেণির ধর্মীয় কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার একটি মাধ্যম। যার মাধ্যমে তারা এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করে।

অবশ্যই ওয়াকফ ব্যবস্থাপনার কাজটি জটিল এবং একজন যোগ্য লোককেই ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা করতে হয়। নীতিমালা বা কৌশল প্রণয়ন করতে হয় এবং অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। আর ধর্মীয় আস্থা অর্জন করার জন্য ওয়াকফের কাজে এমন ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করতে হয় যারা দয়ালু এবং যাদের ধর্ম সম্বন্ধে ভালো-ধারণা রয়েছে। যত বেশি ধার্মিক ও জানাশোনা ব্যক্তি ওয়াকফের সাথে সম্পৃক্ত হবে তত বেশি সম্মান সে দাতা ও অর্থ লগ্নিকারীদের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে।

যেহেতু ওয়াকফ রিয়েল এস্টেট, দালান-কোঠা নির্মাণসহ নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হতো, তাই ওয়াকফ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর সমাজে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বেশ বৃদ্ধি পায়। (যদিও এ রকমও কেউ কেউ বলেন যে ধনীরা কর আদায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওয়াকফের প্রকল্পে সম্পৃক্ত হতে না) আর আপনি সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থান পেতে চাইলে একমাত্র উপায় হলো ওয়াকফের সাথে যুক্ত হওয়া। অন্যদিকে, ধর্মীয় শিক্ষাবিদ হতে চাইলেও যে আপনাকে বড় বা নামকরা পরিবারে জন্ম নিতে হবে তাও নয়। আপনার মেধা থাকতে হবে, দরদি হতে হবে এবং কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে পড়াশোনা করতে হবে। তাহলে আপনি ওয়াকফের সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

উমাইয়াদের আরেকটি বড় কাজ ছিল আরবি ভাষার ব্যাপকভিত্তিক প্রচলন। মুসলমানদের আরবি জানা প্রয়োজন কারণ ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায়। আপনি কুরআনের তেলাওয়াত শুনুন বা লিখুন, এই কুরআনই হলো আল্লাহর অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। সেই সময়ে যত নামকরা বই ছিল তার সবই লেখা হয়েছিল আরবি ভাষায়। এই কারণে উমাইয়ারা আরবিকে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা ঘোষণা করে। এমনকি পূর্বের পারস্যে এবং পশ্চিমের প্রচলিত গ্রিক ভাষার পরিবর্তে তারা আরবি ভাষার প্রচলন করে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এমনকি অন্য যেসব জায়গায় স্থানীয় ভাষার প্রচলন ছিল সেখানে আরবি ভাষার ব্যবহার তারা শুরু করে। তাই উমাইয়াদের সময়েই আরবীয়করণ এবং মুসলিম রাজত্বের ইসলামিকরণের কাজটি ব্যাপকতা লাভ করে।

পূর্বের খলিফারা যেসব রাজত্ব দখল করার পর সেখানকার পুরাতন ধর্ম বিশ্বাসগুলোকে বাতিল করে দেয়া হয়। অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে জরথুস্ত্র, বা খ্রিষ্টধর্ম বা পৌত্তলিকতা ছিল সেসব অঞ্চলের মানুষকে নতুন করে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসাকে আমি ইসলামিকরণ হিসেবে অভিহিত করেছি। অবশ্যই এসব এলাকার অনেকেই মুসলমান হয়েছিল অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত খাজনা থেকে বাঁচার জন্য। তবে এটাই একমাত্র সত্য নয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে, চাকরি পাওয়ার জন্যও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এটাও সত্য নয়। কারণ, ইসলামে দাখিল হলে সেই সময়ে যেই চাকরি পাওয়ার সুযোগ ছিল তার অধিকাংশই ধর্ম সংক্রান্ত। তা ছাড়া যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, ইসলামিক সাম্রাজ্যে তারাও পূর্বের ন্যায় দোকান চালাতে পারত। জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং সব ধরনের ব্যবসাও করতে পারত। এমনকি যোগ্যতা থাকলে এসব ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা সরকারি কাজেও যোগ দিতে পারত। মুসলিম মালিকেরা যোগ্যতা থাকলে সকল ধর্মের লোককে নিয়েই কাজ করার মানসিকতা রাখতেন। মানে যদি আপনার চিকিৎসাশাস্ত্র জানা থাকে তাহলে আপনি ডাক্তার হতে পারবেন। কিংবা স্থাপত্য বিদ্যা জানা থাকলে ভবন বানাতে পারবেন। আপনি খ্রিষ্টান হন বা ইহুদি, যোগ্যতা থাকলে অবশ্যই আপনি ইসলামিক সাম্রাজ্যে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিতে পারবেন। এটাই ছিল তখনকার বাস্তবতা। তবে আমার ধারণা অধিকাংশ মানুষ যারা ইসলামিক সাম্রাজ্যের অধীনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল কারণ তারা এর মাঝেই সত্যকে খুঁজে পেয়েছিল।

তা ছাড়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রক্রিয়া খুব কঠিন ছিল না। আপনি কালেমা তাইয়্যেবা বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কথাটি উচ্চারণ করলেই মুসলমানদের দলে শামিল হতে পারবেন।

কথাটা শুনতে যত সহজ মনে হয় প্রকৃতপক্ষে সেই আমলে এটা বলা ততটা সহজ ছিল না। কারণ, তখন সব ধর্মেই অনেক খোদার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাই অন্য সকল খোদাকে অস্বীকার করে এক আল্লাহকে স্বীকার করা খুব কঠিন ছিল।

আর মুহাম্মাদ ﷺ কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকার করার মানেও খুব ব্যাপক। এই কথার মানে একজন ব্যক্তিকে স্বীকার করা নয়। রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ যত বার্তা নিয়ে এসেছেন তাকেও স্বীকার করা এবং মেনে চলাকে বুঝায়। আপনি মুহাম্মাদকে ﷺ নবি হিসেবে স্বীকার করলে তাঁর কথামতো আপনাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে। রমজান মাসে রোজা রাখতে হবে, মদ ও শুকরের গোশতের মতো অনেক কিছু খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

৬. আব্বাসি যুগ
(১২০-৩৫০ হিজরি) ৭৩৭-৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ

ইয়াজিদের বংশধরেরা বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে শাসনকাজ পরিচালনা করে। তারা গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা সাম্রাজ্যের সীমানা পশ্চিমে স্পেন আর পূর্বে ভারত অবধি বিস্তৃত করে। তাদের শাসনের ইতিবাচক অর্জন হলো এই সময়ে এসে ইসলামিক দর্শনগুলো স্পষ্ট হয়। বিধানগুলো লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় এবং কোডবুক আকারে সুরক্ষিত হয়। ইসলামের একদল জ্ঞানী ব্যক্তিই কেবল ঐ কোডবুকগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা করতে পারত। যেমন : আজকের জমানায় এসে আমেরিকার আইনজীবীরা সংবিধানকে ধারণ করেন এবং এর থেকে প্রয়োজন মতো আইন প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা করেন। আর এসব ইসলামি জ্ঞানী ব্যক্তিরা তৎকালীন সময়ে খুবই নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থার একটি কাঠামোগত রূপ প্রণয়নে কাজ করতেন।

মূলধারার পশ্চিমা ইতিহাসে অবশ্য এই কাজগুলোর প্রশংসাই করা হয়েছে। উমাইয়া শাসকেরা সেই কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাকে বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সমাজে স্থিতিশীলতা থাকলে কৃষকেরা ঠান্ডা মাথায় পরের বছরে কোনো শস্য লাগাতে হবে তা নিয়ে ভাবতে পারে। স্থিতিশীলতা থাকলে ব্যবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিনিয়োগ করার সাহস পায়, ছাত্রছাত্রীরাও ভালোমতো চিন্তা করে কোর্স নিতে পারে কারণ, তাদেরকে হিসেব করে পড়তে হয়; কোন কোর্সে এখন পড়লে গ্রাজুয়েশন শেষ করে কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে। স্থিতিশীলতা থাকলে পণ্ডিতেরা এবং গবেষকরা নিশ্চিন্ত মনে পড়াশোনা বা গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারে। কারণ, তখন তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের নিরাপত্তা নিয়ে তাদের আর দুশ্চিন্তা করতে হয় না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তবে এই তথাকথিত স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য বেশ চড়া দামও গুনতে হয়। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ধনীরা আরও ধনী হয়। গরিব লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। শহরে নান্দনিক স্থাপত্য কাঠামো বৃদ্ধি পায় কিন্তু একই সঙ্গে গরিব লোকের বস্তিরও সংখ্যা বাড়ে। আর ন্যায় বিচার জিনিসটা এমন একটি পণ্যে পরিণত হয় যা শুধু ধনী লোকেরাই উপভোগ করতে সক্ষম। এসব বৈশিষ্ট্যই উমাইয়া শাসনামলে পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

আরো কিছু সংকট সমস্যাও একই সময়ে নতুন করে সামনে আসে। ইসলামিক সাম্রাজ্য খুব দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করায় অনেক নতুন নতুন গোত্র ও নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী সেই সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্যের অধীনে যুক্ত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় তখন যেই প্রশ্নটি বড় করে সামনে আসে তা হলো, কীভাবে এই ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর সাথে মুসলমানরা ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলবে? আর কীভাবেই তাদের সাথে সমতা নিশ্চিত করবে?

উমাইয়া শাসনামলে আরবিকরণ এবং ইসলামিকরণের কাজ তড়িৎ গতিতে আগালেও বাস্তবতা হলো তারা দুটি প্রক্রিয়াকে একসাথে কোথাও সফলভাবে চালাতে পারেনি। যেমন : উত্তর আফ্রিকায় আরবিয়করণের প্রক্রিয়াটি বেশ ভালোভাবে সফল হয়। এর কারণ ছিল সেই এলাকার যে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর যেই শক্তিটি ছিল তা অনেক আগেই ফিনিশীয় ঔপনিবেশের প্রভাবে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল। রোমানরা সেই অঞ্চলে একটি ল্যাটিন প্রভাব চাপিয়ে দিয়েছিল, পরবর্তী সময়ে ভ্যান্ডালরা এসেছিল জার্মানির আবহ নিয়ে আর সবশেষে এই এলাকায় প্রবেশ করে খ্রিষ্টানবাদ। উত্তর আফ্রিকায় তখন এমন কোনো একক ভাষা ছিল না যা দিয়ে গোটা অঞ্চলকে বেঁধে রাখা যাবে। যখন বেশ শক্তিমত্তা ও প্রভাব নিয়ে আরবেরা এই এলাকাগুলোতে প্রবেশ করে তখন এমন কোনো নৃতাত্ত্বিক শক্তিও ছিল না যা ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তাই আরবেরা খুব সহজেই এই এলাকায় প্রবেশ করে এবং সেখানে আগে যত ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদান ছিল তাকে গ্রাস করে ফেলে।

বিশেষ করে মিসর ও জর্দানসহ গোটা লেভান্ট অঞ্চলে মুসলমানরা একটু বেশি সহজেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কারণ, এই এলাকার মানুষ আগে থেকেই আরবদের সাথে ঐতিহাসিক একটি সম্পর্ক বজায় রাখত। তারা আরবদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানত। আর এই এলাকার মানুষ আর আরবদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে মিলও রয়েছে। আব্রাহাম বা ইবরাহিম, নোয়াহ বা নূহ এবং অ্যাডাম বা আদম (আ.) এদের উভয় জনগোষ্ঠীরই পূর্বপুরুষ। তা ছাড়া উভয় অঞ্চলের মানুষ আগে থেকেই একেশ্বরবাদী আর উভয় দেশের মানুষের ভাষাও ছিল এক; আর তা হলো আরবি ভাষা।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তবে পারস্য ছিল এই বাস্তবতা থেকে পুরোই ব্যতিক্রম। পারস্যের অধিবাসীরা ছিল ইন্দো-ইউরোপিয়ান ঘরানার। তাদের নিজেদেরই একটি প্রাচীন সভ্যতা ছিল, গর্বের ইতিহাস ছিল আর ছিল এমন একটি ভাষা যাকে কখনোই দমিয়ে রাখা যায় না। পারস্যের অনেকেই মুসলমান হয়েছিল কিন্তু তারা কখনোই আরবিয় হতে পারেনি। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা সমাজে বেশ বড় আকারের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল। ইসলাম প্রতিটি মুসলমানকে সমান চোখে দেখে। সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের অন্যতম মৌলিক রীতি। মুসলমান হলে সমান অধিকার দেয়া হবে- এটাই ছিল তৎকালীন শাসকদের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু উমাইয়ারা আরব-নিয়ন্ত্রিত যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তারা সমতা প্রতিষ্ঠা করার সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। আরবরা নতুন সমাজ ব্যবস্থায় শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা সমাজে অভিজাত সম্প্রদায় হয়েই থাকে। সমতা নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, উমাইয়ারা রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোকে আরও বেশি ব্যবহার করে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে। তারা একই সমাজে কয়েক ধরনের স্তর গঠন করে। যেমন: সবচেয়ে ওপরে ছিল সেই আরব মুসলমানরা যাদের রক্ত পুরোপুরি আরবের থেকে আসা। এর থেকে নিচের স্তরে ছিল সেসব মুসলমানরা যাদের পিতা-মাতার একজন আরব আর অন্যজন অনারব। তার থেকে নিচের স্তরে ছিল অনারব মুসলমানরা। তারও নিচে ছিল অনারব অমুসলমান গোষ্ঠী। তারও নিচে ছিল একেশ্বরবাদী অমুসলমানরা আর সবচেয়ে নিচে ছিল বহু ঈশ্বরকে মানা অমুসলমানরা।

একই সমাজের মানুষের মধ্যে এতটা বিভাজন বা স্তরকরণ বিশেষ করে নব্য আরব মুসলিম অভিজাতের সাথে পারস্য বনেদি পরিবারগুলোর বিভাজন একটা সময়ে গিয়ে মুসলিম সমাজে বড় আকারের ক্ষোভ এবং অসন্তোষ সৃষ্টি করল।

আরেকটি বিষয়ও ছিল যা তৎকালীন মুসলিম বিশ্বকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। মুসলমানদের ইতিহাস, বিলাসিতার ইতিহাস নয়। মুসলমান সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী অভিভাবকেরা খুবই সরল ও সাধাসিধে জীবনযাপন করতেন। তাদের সেই সরল ও সাদামাটা জীবন তাদেরকে কেবল শাসক নয় বরং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবেও সমাজে একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থান দিয়েছিল। আর সেই কারণেই উমাইয়া শাসকদের অতিরিক্ত বিলাসিতা দেখে সাধারণভাবে অনেকের মাঝেই প্রশ্ন জন্মেছিল, এরা মুসলমান হলেও এদের ভেতরে ভেজাল আছে। উমাইয়া শাসকদের আয়েশী জীবন দেখে অনেকেই বুঝতে পারছিল যে, এরা সেই ন্যায়বিচারক শাসক নয়। সেই ধরনের ইনসাফপূর্ণ সমাজ তারা প্রতিষ্ঠাও করতে পারেনি, যেই সমাজের কথা আখেরি নবি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ সারাজীবন প্রচার করে গেছেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অবশ্যই যারা অর্থশালী তারা এই ধরনের কথা পছন্দ করতেন না। সাধারণ মানুষরা রাজদরবারের বিলাসিতার কথা লোকমুখে শুনত। চোখের সামনে কোনো আরবকে দামী আতর মেখে উন্নত পোশাক পড়ে চলাচল করতে দেখত। তারা সেই নবির জীবনযাপনের সাথে উমাইয়াদের কোনো মিল খুঁজে পেত না, যেই নবি চার টুকরা কম্বলকেই বিছানা বানিয়ে বা গায়ে জড়িয়ে ঘুমাতেন। তারা সেই উমরের (রা.) সাথেও কোনো মিল পেত না যিনি নিজে রাতের আঁধারে পায়ে হেঁটে অভাবী মানুষদের কাছে খাবার পৌছে দিতেন। এসব ইতিহাসকে ভিত্তি করেই উমাইয়ারা ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু তারা শাসন করেছে এর পুরো বিপরীত স্টাইলে। আর এই কারণেই সমাজে অসন্তোষ বাড়তে থাকে যাকে কাজে লাগায় উমাইয়া বিরোধী দুটি পক্ষ শিয়া এবং খারেজি।

খারিজিদের সংখ্যা ছিল অনেক কম কিন্তু তাদের আন্দোলনটি ছিল বেশ মৌলিক। কাজকর্ম ছিল অনেকটা মৌলবাদী স্টাইলের। তাদের ধর্মদর্শনের মূল চাহিদা ছিল বিশুদ্ধতা। তারা বলতো, মুসলমানদের নেতা হতে পারবে কেবল সেই ব্যক্তি যে অক্ষরে অক্ষরে ধর্মীয় বিধি বিধান মেনে চলবে। এর থেকে যার বিচ্যুতি ঘটবে সে কখনোই নেতা থাকতে পারবে না। তাই কোনো ধর্ম নিরপেক্ষ বা হালকাভাবে ধর্ম পালন করা ব্যক্তি খারিজিদের বিবেচনায় শাসক হওয়ার যোগ্য ছিল না। খারিজিরা তাদের এই দর্শন এর পরিণতি কিংবা বাস্তবতা না ভেবেই প্রচার করত। অর্থাৎ আদৌ এই মানের কোনো ব্যক্তি আছে কিনা কিংবা এতগুণে গুণান্বিত কোনো ব্যক্তি না পাওয়া গেলে কীভাবে শাসন কাজ পরিচালনা হবে- এসব নিয়ে তাদের কোনো ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়নি। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে, কেউ ক্ষমতায় থাকলে তার দমন বা নিপীড়নের কারণে যখনই অন্য কেউ নিজেকে বঞ্চিত বা শোষিত মনে করত তখনই খারিজিরা তার কাছে গিয়ে তাদের বিশুদ্ধ নেতা সংক্রান্ত মতবাদ প্রচার করত। তাকে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উস্কে দিত।

সময় যত গড়ায়, খারিজিরা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে কারণ তারা এত বেশি শুদ্ধতা চাইছিল যে, ঐ সময়ে তা মোটেও সম্ভব ছিল না। প্রকারান্তরে বস্তুবাদী শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে অর্থশালী লোকের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছিল। সমাজে অসন্তুষ্ট কেবল তারাই ছিল যারা অর্থনৈতিকভাবে এগোতে পারছিল না। কিন্তু তারাও সেই আনন্দহীন কাঠখোট্টা জীবনও মেনে নিতে রাজি ছিল না- যা খারিজিরা কায়েম করতে চাইত। সেই কারণে খারিজিরা খুব একটা সুবিধা করতে পারছিল না। কিন্তু শিয়ারা উমাইয়া শাসন ব্যবস্থার জন্য সত্যিকারের হুমকি হয়েই থেকে গেল। আর ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের পর এই হুমকিটি ক্রমাগতভাবে যেন আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

শিয়া ইমামরা অবশ্য সরাসরি সিংহাসনকে কখনো চ্যালেঞ্জ করেননি। তারা চেষ্টা করেছিলেন খলিফা থেকে ইমামের সংজ্ঞা ও পরিপ্রেক্ষিতকে আলাদা রাখতে। তাদের চেষ্টা ছিল ইমাম খেতাবটাকে ধর্মীয় আঙ্গিকে বেশি প্রয়োগ করার। কিন্তু শিয়াদের মধ্যে যারা কট্টর ছিল তারা এই ইমামদের নামকে ব্যবহার করেই বিভিন্ন জায়গায় সংকট সৃষ্টি বা বিদ্রোহ সূচনা করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল হযরত আলির (রা.) বংশধর কাউকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা। তারা এই মর্মেই প্রচার করত যে, খলিফার পদটি উমাইয়াদের পাওয়ার কোনো সুযোগই নেই।

শিয়াদের এই হুমকিটি ছড়িয়ে পড়ছিল কারণ, উমাইয়া শাসনামলে বেশ কিছু নির্মম ঘটনা কিছু নিপীড়িত মানুষকেও একই জায়গায় নিয়ে এসেছিল। যেমন উমাইয়া আমলে শিয়ারাই ছিল ধর্মীয় সকল গোত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত। মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ছিল তার মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত ছিল পারস্যের মুসলমানরা। শিয়ারা তাই লড়াই শুরু করেছিল মূলধারার তথাকথিত ধর্মীয় প্রশাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, পারসিয়ানরা লড়াই শুরু করেছিল আরবঘেঁষা প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

এভাবে শিয়া এবং পারসিয়ানরা পরস্পরের কাছে চলে আসে। পারসিয়ানদের অনেকেই শিয়া মতবাদে যোগ দেয় আর অন্যদিকে শিয়ারাও পারসিয়ানদের মধ্য থেকেই লোক নিয়োগ করতে শুরু করে। আর এই দুই গ্রুপের ঘনিষ্ঠতায় বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে । বিশেষ করে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে এই বিদ্রোহটি বেশ বড়সড়ভাবে দেখা দেয়। উমাইয়াদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেই বিদ্রোহ দমনে হিমশিম খেতে শুরু করে।

এ রকমই এক পরিস্থিতিতে হিজরতের ১২০ বছর পর, রহস্যময় একজন মানুষ মার্ভ নামক একটি শহরে আগমন করে। এই শহরটি ছিল দামেস্ক থেকে পনেরো শ মাইল পূর্বে। এখানে এসে লোকটি নতুন করে উমাইয়া বিরোধী প্রচারণা শুরু করে। তার মুখে ছিল সেই সহস্রাব্দ পুরোনো কথা-তা হলো ভালো আর মন্দের লড়াই চিরন্তন আর সেই লড়াইয়ে সে নিজেকে সত্যের পক্ষেই থাকার দাবি করে।

এই মানুষটি সম্বন্ধে আগে থেকে কেউ তেমন একটা কিছু জানত না। এমনকি কেউ তার সত্যিকারের নামটাও জানত না। তিনি নিজেকে আবু মুসলিম নামে পরিচয় দেন। কিন্তু এটা তার ছদ্মনাম তা বুঝাই যায়। কারণ, আবু মুসলিম মানে মুসলিমের পিতা বা অন্য কোনো মুসলমানের ছেলে বুঝানো হয়। সুতরাং এটা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কারও নাম হতে পারে না। তবে একটা জিনিস নিশ্চিতভাবেই বুঝা যায় যে লোকটা মুসলমান। যাহোক, আবু মুসলিম নামের এই মানুষটি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন বিপ্লবী। হাশিমাইত নামক ইরাকের একটি দলের সদস্য ছিল সে। তাকে গোপনে এই মার্ভ শহরে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। এই হাশিমাইট দলটিকে একটি গোত্র বলা যায় আবার একটি রাজনৈতিক দলও বলা যায়। এর মূল সদস্য সংখ্যা কখনোই তিরিশ এর বেশি রাখা হতো না। এই দলটির নাম রাখা হয় প্রিয়নবির ﷺ নিজ গোত্র বনু হাশিমের নামানুসারে। এই দলটির উদ্দেশ্য ছিল নবিজির ﷺ পরিবারের কোনো সদস্যকে মুসলিম বিশ্বের নেতা বানানো। এটা ছিল সে সময়ে তৎপর অনেকগুলো সরকার বিরোধী দলের মতোই আরেকটি দল। এই সকল উমাইয়া বিরোধী দলগুলোর মূল কথা ছিল একটাই আর তা হলো, মুসলমানরা বিপথগামী হয়ে পড়েছে। ইতিহাস তার গতিপথ হারিয়ে ফেলেছে কিংবা রাসূলের মূল শিক্ষা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। আর উমাইয়াদেরকে উৎখাত করে রাসূলের পরিবারে কাউকে ক্ষমতায় এনে বসালেই আবার সব ঠিক হয়ে যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিম ইতিহাসে এই কথাগুলো বারবার উঠে এসেছে। এমনকি আজকের দিনে এসেও হরহামেশাই এই ধরনের কথা আমরা শুনতে পাই।

তবে এতো কিছুর পরও হাশিমাইটরা সামনে নিয়ে আসার মতো রাসূল ﷺ-এর সত্যিকারের পরিবারের কোনো সদস্যকে পায়নি। শেষমেষ তারা পায় আবু আল আব্বাসকে। যিনি ছিলেন রাসূলের চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালেবের বংশধর। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর সাথে রক্তের সম্পর্কের এবং তিনি সচেতনভাবেই হাশিমাইটদের সেই লড়াইয়ে নিজের নাম লিখিয়েছিলেন।

আব্বাসের বংশধর নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ, মূল যে আব্বাসের কথা বলা হচ্ছে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন অনেক পরে এসে। আর তাকে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে কেউ কখনো কল্পনাও করে নি। তাই এই ব্যক্তি রাসূলের উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রত্যাশিত ছিলেন না। হযরত আলি ও ফাতিমা (রা.) এর কোনো বংশধরকে পাওয়া গেলে বেশি ভালো হতো, তবে সেই সময়ে আলি (রা.) বংশধর যারা ছিলেন তারা হাশিমাইটদের চিন্তার সাথে একমত ছিলেন না। তাই আবু আল আব্বাসকে নিয়েই তাদের আগাতে হয়। অনেক সময় সংগ্রাম করতে গিয়ে পরিস্থিতির কারণে আপনাকে এমন নেতাকে সামনে রাখতে হয় যাকে হয়তো আপনি সামনে রাখতে বা দেখতে চাননি। কিন্তু আপনার সামনে উত্তম কোনো বিকল্পও থাকে না। সেই সময়ে হাশিমাইটদের অবস্থাও ছিল অনেকটা সে রকম।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

খোরাসান প্রদেশে থাকা শিয়া ও পারসিয়ান বিদ্রোহীদের আস্থা অর্জন করতে আবু মুসলিমের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। এই প্রদেশটি ইরান থেকে শুরু হয়ে আফগানিস্তান অবধি বিস্তৃত ছিল। সেখানে যে, ভাষণ গুলো আবু মুসলিম দিয়েছিলেন তাতে তিনি স্পষ্ট করে কখনোই বলেননি যে, তাদের বিপ্লব সফল হলে খলিফা হিসেবে কে দায়িত্ব নিবেন। তাই শিয়ারা ভেবেছিল নিশ্চয়ই হযরত আলির (রা.)-কোনো বংশধরই খলিফা হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে হয়তো এখনই আবু মুসলিম তার নামটি ফাঁস করছেন না।

আবু মুসলিম ছিলেন ভীষণ রকম বেপরোয়া এবং ক্যারিশমাটিক একজন নেতা। তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে আব্বাসি বিপ্লবের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন। (আব্বাসি নামেই বিপ্লব পরিচিত হয় আর এই আব্বাসি কথাটি এসেছে তাদের নেতা আবু আল আব্বাসের নামানুসারে)। খোরাসানে আবু মুসলিম একদল বিপ্লবী মানসিকতার লোককে নিয়োগ করেন। তাদেরকে তিনি যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেন এবং হাশিমি মতাদর্শে দীক্ষিত করেন। যারা তার মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছিল, তারা সবাই কালো পোশাক পরিধান করত এবং কালো ব্যানার বহন করত। তাদের অস্ত্রগুলোতেও তারা কালো রং মেখে ছিল। উমাইয়া সেনাদের সব কিছু ছিল সাদা রং এর। পোশাকের রং এর ভিন্নতার বিষয়টি খুব সামান্য বিষয় নয়। এই রংদুটোও রূপক অর্থে ভালো আর মন্দের লড়াইকেই বুঝাত। তা ছাড়া পারস্যে সাদা রংটিকে মনে করা হতো শোক আর মৃত্যুর রং।

১২৫ হিজরিতে আবু মুসলিম আর তার কালো পোশাক পরিহিত সেনারা পশ্চিম অভিমুখে তাদের অভিযান শুরু করে। তারা পারস্য সাম্রাজ্য সীমানা পার হওয়া অবধি খুব সামান্যই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কারণ, অধিকাংশ মানুষই আসলে অহংকারী উমাইয়া শাসকদের পতনই প্রত্যাশা করছিল। তাই আবু মুসলিমের বাহিনী কোনো প্রতিরোধ তো পায়ইনি বরং তারা যত সামনে এগুচ্ছিল তাদের তত লোকবল ও সমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে সাদা ও কালো পোশাক পরিহিত সেনারা অবশেষে ইরাকের জাব নদীর তীরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে কালো পোশাকের সেনাদের জয় হয় এবং ক্ষমতাসীন উমাইয়া খলিফা নিজের জীবন বাঁচাতে মিসরের দক্ষিণে পালিয়ে যায়। এক বছরের মধ্যে আব্বাসীয় সেনারা তাকে খুঁজে বের করে সেখানেই হত্যা করে।

হাশিমিরা আবুল আব্বাসকেই ইসলামের নতুন খলিফা হিসেবে ঘোষণা করে। কেউ এই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলার সুযোগ পেল না। এই নিয়োগটি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ছিল না। কোনো নির্বাচন ছিল না অথবা পরামর্শসভার মাধ্যমে আলোচিত হওয়ার মাধ্যমেও নিয়োগটি নির্ধারিত হয়নি। এই প্রথম

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইসলামের খলিফা নির্ধারণ হলো গায়ের জোরে, অস্ত্রবাজ এক বাহিনীর চাপের মুখে। তারপরও কেউ তেমন একটা প্রতিবাদ করে নি। কারণ, যেভাবেই হোক খলিফার পদটি তো আবার নবিজির পরিবারের মাঝে ফিরে এল। এরপর আবার ইসলামের সামাজিক রূপায়ণটি বিকশিত হতে শুরু করল। আবু মুসলিম আব্বাসীয়দের ক্ষমতা আরোহণের ঘটনায় খুব আশাবাদী হলো, আনন্দিতও হলো। কারণ, সে তার কাজের পুরস্কার প্রত্যাশা করেছিল যেহেতু আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় আসা এবং উমাইয়াকে সরানোর পেছনে তার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তার সেই আশা কিছুদিনেই ভেস্তে যায়। এক সময় সে বুঝে যায়, তার কাজটি ছিল গাঁধার খাটুনির মতো। সে শুধু দিয়েই যাবে আর প্রতিদানে শুকনো ধন্যবাদ ছাড়া আর কিছুই তার কপালে জুটবে না।

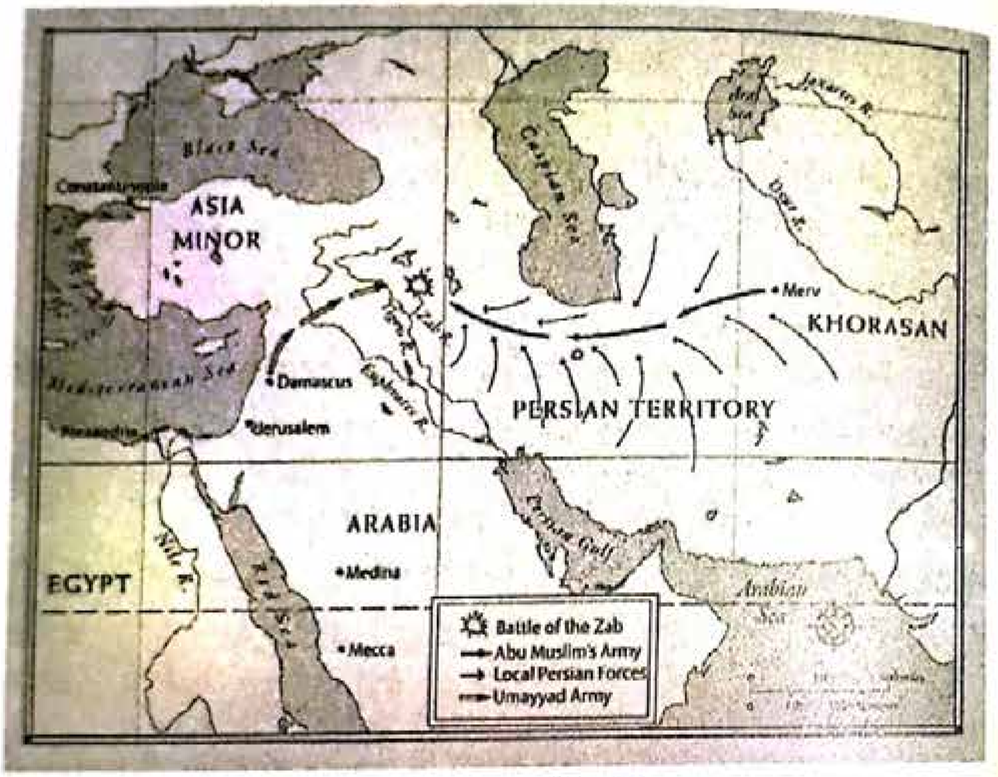

আবু মুসলিম এবং আব্বাসীদের উত্থান

নতুন আব্বাসি খলিফা জানতেন যে মুয়াবিয়া তার ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করেছিলেন কিছু ক্ষেত্রে শত্রু হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে। আবার কিছু ক্ষেত্রে পুরোনো শত্রুদের সাথে বিবাদ মিটিয়ে। সেই একই কৌশলের অংশ হিসেবে নতুন শাসক উমাইয়া গোত্রের শীর্ষ নেতাদেরকে দাওয়াত দিলেন। সুন্দর একটি আয়োজনও ছিল যাতে উভয় পক্ষই অনুভব করে যে তাদের মধ্যে আর কোনো সমস্যা নেই।

খাওয়া দাওয়ায় তেমন কোনো বিলাসিতা ছিল না। দয়াল নবি ﷺ যেভাবে হযরত উমরের (রা.) সাথে বার্লি, রুটি ও সুপ শেয়ার করে খেয়েছিলেন, সেদিনও খাবারের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আইটেমে তাই ছিল। উমাইয়ারা কুশনে আরাম করে শুয়ে গল্প করছিলেন, আর সেবকেরা সুন্দর ট্রেতে তাদের খাবার নিয়ে আসছিলেন। আড্ডাবাজি আর হাসি তামাশায় সেদিনের দাওয়াতের আসর জমে ওঠেছিল বেশ। যখন সবাই রাতের মূল খাবারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন ঠিক সেই মুহূর্তে ওয়েটাররা তাদের ট্রের ওপরের চাদর ফেলে দিয়ে লুকিয়ে রাখা অস্ত্রগুলো বের করেন। আসলে তারা কেউই ওয়েটার ছিল না, তারা সকলেই ছিলেন যোদ্ধা যাদেরকে উমাইয়া অতিথিদের খুন করার জন্যই সেখানে নতুন খলিফা দাওয়াত দিয়ে এনেছিলেন। উমাইয়াদের কেউ কেউ উঠে পালাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। বের হওয়ার সব দরজাই খলিফার নির্দেশে বন্ধ হয়ে গেছে আগেই। একে একে সকল উমাইয়া অতিথিকেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেদিনের এই ঘটনা থেকেই খলিফা আবুল আব্বাসকে নতুন একটি উপাধি দেয়া হয়। আর তা হলো, 'আল সাফফা- যার মানে হলো হত্যাকারী'। আর বাহ্যত এই উপাধিটি পেয়ে আব্বাসীয়রা বেশ খুশিই হয়েছিল।

তবে এত কিছু করেও খলিফার খুব যে উপকার হলো, তা নয়। কয়েক দিন পরেই তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তার ভাই আল মনসুর হন নতুন খলিফা। মনসুরকে কিছুটা বিদ্রোহের মুখে পড়তে হয়েছিল কিন্তু আবারও এগিয়ে আসেন সেই আবু মুসলিম। তিনি মনসুরের জন্য খলিফার চেয়ারকে সুরক্ষিত করে তুলেন। এরপরই আবু মুসলিম খোরাসানে ফিরে যান। আবু মুসলিম নিজের জন্য কখনোই খেলাফতের দায়িত্ব চাননি। যদিও তার হাতে সামরিক শক্তি ছিল তথাপি তিনি কখনো এই ধরনের চিন্তা করেননি। তিনি সব সময়ই আব্বাসি শাসকদের আনুগত্য করে যেতে চেয়েছেন। তিনি আসলে ছিলেন সত্যিকারের একজন অনুগত সৈনিক।

কিন্তু কেন যেন, এত কিছুর পরও মনসুর তাকে ঠিক পছন্দ করে উঠতে পারেননি। সম্ভবত এর একটি কারণ ছিল আবু মুসলিমের জনপ্রিয়তা। এর পাশাপাশি তার নিয়ন্ত্রণে ছিল বেশ বড় একটা সেনাবাহিনীও । কোনো শাসক কখনোই এমন কোনো ব্যক্তির ওপর আস্থা রাখতে পারেন না যার নিজের নিয়ন্ত্রণে পৃথক একটি সেনাবাহিনী থাকে। একদিন মনসুর তার দরবারে আবু মুসলিমকে দাওয়াত দিলেন। আব্বাসীয়দের দাওয়াত কেউ পেলে তাকে চরম আপ্যায়ন করা হয়। সারা রাত তার আনন্দে আর ব্যস্ততায় কাটে। আবু মুসলিমও সেই সম্মাননা পেলেন। মনসুর তাকে নিয়ে নদীর তীরে একটি ক্যাম্পে গেলেন এবং সেখানে তারা প্রথম দিন পার করলেন। খলিফা মনসুর আব্বাসীয়দের ক্ষমতা আরোহণে এবং তার টিকে থাকার পেছনে আবু মুসলিমের ভূমিকা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করলেন। কিন্তু এর পরের দিনই মনসুরের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা আবু মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার দেহটা পাশেই নদীতে ফেলে দেয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এভাবেই মুসলমানদের দ্বিতীয় গোত্রের খেলাফত শুরু হয়।

নির্দয় কৌশল দিয়ে আব্বাসীয়দের যাত্রা শুরু হলেও তারা এসব কাজের পেছনে একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। তারা তাদের এসব কাজকে উম্মাহর জন্য বৈপ্লবিক নতুন ধারা হিসেবে অভিহিত করে। তারা ঘোষণা দেয়, তাদের স্টাইল অন্য সবার থেকে ভিন্ন হবেই। কারণ, তারা উম্মাহ্‌কে সঠিক পথে নেয়ার চেষ্টা করছে।

উমাইয়ারা বেশ বিলাসবহুল জীবনের ইতিহাস গড়লেও আব্বাসিয়রা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই সাধাসিধে জীবনযাপন করত। উমাইয়াদের মতো আব্বাসি জমানায়ও মুসলিম সাম্রাজ্য ও অর্থনীতি শক্তিশালী হতে থাকে। আর উমাইয়াদের মতো আব্বাসি শাসকেরাও নানা ধরনের কুটকৌশল প্রয়োগ করে। সেইসাথে পুলিশ ও পেশাদার সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে তাদের ক্ষমতাকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার চেষ্টা করে।

আব্বাসীয়রা শেষ মুহূর্তে যাকে খলিফা হিসেবে নিয়োগ করে, তাকে নিয়ে শিয়ারা মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। কিন্তু যারা এমন ভাবছেন তারা ভুল করছেন। কারণ, আব্বাসীয়রা অনেকগুলো ভালো কাজও করেছিল। তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সামাজিক কাঠামোগুলোর অনেকখানি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আব্বাসীয়দের সময়ে এসেই ইসলামের মূলধারাটি সুন্নি ধারা হিসেবে পরিচিতি পায়।

আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় আরোহণের পর কিছুদিন অবধি শিয়ারা ভেবেছিল যে, সাফফারা হয়তো শিয়া ইমামদের ক্ষমতায় বসাবে। কারণ, হাশিমিরা রাসূলের গোত্রের সদস্যকে ক্ষমতায় আনতে চেয়েছিল। আর সেই কারণেই শিয়ারা ভেবেছিল হয়তো এই সুযোগে হযরত আলির (রা.)-কোনো বংশধরকে তারা সামনে নিয়ে আসবে। কিন্তু হয়েছিল উল্টো। বরং আলির (রা.) বংশধরদের আরও হন্য হয়ে খোঁজা হয়। এমনকি আব্বাসীয়দের তৃতীয় খলিফা মারা যাওয়ার পর তার একজন সেবক প্রাসাদে গোপন একটি রুম খুঁজে পায়। যেখান দিয়ে মাটির নিচের অন্ধকার ঘরে যাওয়া যেত। সেখানে মূলত হযরত আলির (রা.) বংশধরদের খুঁজে খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে লাশগুলো গুম করে ফেলা হতো।

অন্যদিকে, উমাইয়া শাসনামলের যেসব ভালো দিক ছিল, আব্বাসীয়রা তার বাস্তবায়নও অব্যাহত রাখে। উমাইয়াদের সময়ে চিত্রকলা, দর্শন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যাপক উন্নয়ন হয়। এর সবগুলো উন্নয়নের ধারাবাহিকতাই আব্বাসি সময়ে বহাল থাকে। তাই আব্বাসি যুগের প্রথম দুশত বছর ইসলামের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিগণিত হয়। এমনকি পশ্চিমা ইতিহাসেও এই সময়ের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আব্বাসি খলিফা মনসুর প্রথম বাগদাদে নতুন করে একটি রাজধানী স্থাপন করেন। তার এই রাজধানী বানানোর প্রকল্পটি শেষ হয় ১৪৩ হিজরিতে। তিনি যেই অনবদ্য শহরটি নির্মাণ করেছিলেন, তা আজও বিদ্যমান। যদিও এতগুলো বছরে বেশ কয়েকবার এই শহরটি ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে গেছে, তথাপি শহরটি তার পূর্ণ কাঠামোতে আজও বিদ্যমান। বর্তমানে অবশ্য শহরটি আবারও ভয়াবহ দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

রাজধানী হিসেবে বাগদাদকে বাছাই ও সংস্কার করার পূর্বে খলিফা মনসুর তার সম্রাজ্যটি বেশ কয়েকবার ভ্রমণ করেন। অবশেষে তিনি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় এই শহরটিকে রাজধানী বানানোর জন্য পছন্দ করেন। পছন্দমতো স্থানটির একেবারে মাঝখানে খলিফা মনসুর দেয়াল দিয়ে চারপাশকে ঘিরে একটি সার্কুলার সীমানাও নির্মাণ করেন। যার ভিত্তি ছিল ৯৮ ফিট উঁচু এবং ১৪৫ ফিট প্রশস্থ। এই জায়গাটি আসলে রাজধানীর মূল নার্ভ সেন্টার হিসেবে সে সময় বিবেচিত হতো।

এই বৃত্তাকার শহরটি নির্মাণে প্রায় পাঁচ বছর লেগে যায় । নকশাবিদ স্থপতি, হস্তশিল্পবিদ এবং কারিগরেরাসহ প্রায় এক লক্ষ মানুষ মিলে এই বিশাল কাজটি সম্পন্ন করে। এই শ্রমিকরা তাদের নিজেদের বাড়িঘরও বানায় বৃত্তাকার শহরের সীমানার বাইরে। একই সাথে সেই নির্মাণ কাজটিও চলছিল সেই সময়। তাই প্রকল্পটি শেষ হলে দেখা যায় বৃত্তাকার একটি শহর যাকে ঘিরে আছে আরেকটি ছোট শহর। আর এত মানুষের আনাগোনা যেখানে, সেখানে ব্যবসায়ীরা পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসবে না, তা তো হয় না। তাই বণিকেরাও আকর্ষণীয় এই শহরকে কাজে লাগাতে বিনিয়োগ করে, দোকান বাজার খুলে বসে। সব মিলিয়ে নতুন একটা শহর আর শহরের বাইরে উপশহরটি বেশ ভালোভাবেই চালু হয়ে যায়।

২০ বছরের মধ্যে বাগদাদ তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় শহরে পরিণত হয়। আজও অবধি এত বড় শহর আর কেউ নির্মাণ করতে পারেনি। আর বাগদাদই প্রথম শহর, যেখানে জনসংখ্যার পরিমাণ ১০ লাখ অতিক্রম করে। নদীর অববাহিকায় নির্মিত হওয়ায় এই শহরটির মাঝখান দিয়ে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মতো বড় দুটি নদী বয়ে চলেছে। আর খাল কেটে কেটে নদীর পানি বিভিন্ন দিকে ডাইভার্ট করায় শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে অতি চমৎকারভাবে পানির ফোয়ারাও দেখা যায়। এই পানির ব্যবহারটি বাগদাদ শহরকে ভেনিস শহরের কাছাকাছি পৌছে দিয়েছে। এর পাশাপাশি অনেকগুলো ব্রীজ বানানো হয় যেগুলো দিয়ে জনগণ ঘোড়া চালাত। আর অন্যদিকে পথিকের চলাচলের জন্য ফুটপাথও নির্মাণ করা হয়। বড় দুটি নদীর অববাহিকায় অবস্থান করায় শহরটিকে কেন্দ্র করে নৌবন্দরও গড়ে ওঠে। স্থলপথেও সব জায়গা থেকে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বাগদাদে যাওয়া যেত, নৌপথেও প্রতিদিন সেখানে জাহাজ এসে নোঙ্গর করত। এসব জাহাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষ করে চীন, ভারত, আফ্রিকা কিংবা স্পেন থেকে পণ্য বাগদাদে নিয়ে আসত। ফলে বাগদাদে বিশ্বের সব জায়গার সেরা জিনিসটাই পাওয়া যেত।

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের বিষয়টি রাষ্ট্রের নীতিমালার ওপর নির্ভর করে। প্রতিটি নাগরিকদের আলাদা আলাদা প্রতিবেশী আছে, বাস্তবতা আছে, সেই আলোকেই সেই সমাজের বাণিজ্য গড়ে ওঠে। আপনি রাস্তায় হয়তো কাপড়ের ব্যবসায়ী পাবেন বা সাবান ব্যবসায়ী বা ফুলের দোকান কিংবা ফলের। ইতিহাসে জানা যায়, বাগদাদে এমন সড়ক ছিল যেখানে সড়কের দুপাশে কয়েক হাজার দোকান একসাথে ছিল। এমন কোনো আইটেম নেই, যা সেখানে পাওয়া যেত না। ইয়াকুব নামে আরব একজন ব্রাজক লিখে গেছেন যে, সেই সময়ের বাগদাদে ছয় হাজারেরও বেশি রাস্তা ও গলি ছিল, যার অধিকাংশের পাশেই দোকানের পসরা ছিল। এ ছাড়া ছিল তিরিশ হাজারেরও বেশি মসজিদ এবং দশ হাজার সরাইখানা বা আবাসিক হোটেল।

এই শহরকে কেন্দ্র করেই অ্যারাবিয়ান নাইটস বা আরব্য রজনীর সেই রূপকথাগুলো রচিত হয়েছিল। এই রূপকথাগুলো সাহিত্যের আকারে আসে আব্বাসি যুগেই, তবে আরও বেশ খানিকটা পরে। বিশেষ করে বিখ্যাত আলাদিন ও যাদুর চেরাগের গল্পটি তৈরি হয় চতুর্থ এবং সবচেয়ে বেশি পরিচিত আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশীদের সময়ে। হারুর আর রশীদ ছিলেন ইনসাফের প্রতীক। তার সম্বন্ধে যেসব গল্প প্রচলিত আছে সেগুলো তাকে একজন মহানুভব শাসক হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে হাজির করেছে বারবার। বলা হয়, খলিফা হারুন-অর-রশীদ প্রায়শই দুঃখী মানুষদের সাহায্য করার জন্য ছদ্মবেশে শহরে ঘুরতে যেতেন।

উমাইয়াদের চেয়েও আব্বাসি খলিফারা নিজেদেরকে আরও রহস্যের মোড়কে রাখতে সক্ষম হন। এমনকি সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা ধনী লোকটাও সচরাচর খলিফার সাক্ষাৎ পেতে সেই সময়ে হিমশিম খেতেন। খলিফারা অন্য কিছু মধ্যস্বত্বভোগীদের দিয়ে তাদের কাজগুলো করাতেন। খলিফারা নিজেরা দরবারে প্রতিদিনের কাজে সেই ভাবে জড়িত হতেন না। এর আগে সাসানিদ ও বাইজেন্টাইন শাসকেরাও এমন কৌশল অবলম্বন করতেন। ইসলাম এসব প্রাচীন রাজতন্ত্রকে হটিয়েছিল এর থেকে সর্বোত্তম কিছু দেয়ার জন্য। কিন্তু নিয়তির এমন পরিহাস যে আবার ঘুরে ফিরে সেই সাসানিদ ও বাইজেন্টাইনের নানা শাসন কৌশলই ইসলামের পরবর্তী সময়ের শাসকদের মধ্যে বারবার ফিরে আসছিলে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

৭. জ্ঞানী, দার্শনিক ও সুফি সাধকদের যুগ (১০-৫০৫ হিজরি) ৬৩২-১১১১ খ্রিষ্টাব্দ

এতক্ষণ আমি মধ্য পৃথিবীর সভ্যতার বিকাশে মুসলিম সভ্যতার বিবর্তনকে যেভাবে দেখিয়েছি তাতে রাজনৈতিক ঘটনাবলিই বেশি স্থান পেয়েছে। অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে একই সময়ের মধ্যে। কোনোটাই হয়তো ইসলামের মৌলিক দর্শনের চেয়ে বড় নয়। তা ছাড়া এই সময়ের ভেতরই সামাজিক শ্রেণিগুলোর বিকাশ ঘটেছে। আর বিপরীত ও বিকল্প নানা ধরনের চিন্তাধারারও সম্প্রসারণ ঘটেছে।

প্রথম থেকে ইতিহাসটি পর্যবেক্ষণ করলে এটা অনুধাবন করা যায় যে, কীভাবে জীবনযাপন করতে হবে বা ইবাদত করতে হবে। সেই ব্যাপারে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর অনুসারীদের জন্য পরিপূর্ণ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। সেই অনুসারীরা কতটা সফলভাবে সেই নির্দেশনাগুলো মানছে, তা অবশ্য হিসেব করে বলা কঠিন। কিন্তু যেটা নিশ্চিত করে বলা যায়, তা হলো হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তার গোটা জীবনব্যাপী কাজ করে পাঁচটি মৌলিক কাজকে নির্ধারণ করে গেছেন। যেই কাজগুলো ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তি স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

প্রথমটি হলো শাহাদাত: এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল।

দ্বিতীয়টি হলো নামাজ: দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।

তৃতীয়টি হলো যাকাত: বছরে একবার সামর্থ্যবান ব্যক্তি তার সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ গরিব ও যাকাতপ্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করবে।

চতুর্থটি হলো রোজা: প্রতি বছর রমজান মাসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এবং পঞ্চমটি হলো সামর্থ্যবান ব্যক্তি জীবদ্দশায় অন্তত একবার পবিত্র নগরী মক্কায় হজব্রত পালন করা।

খেয়াল করে দেখুন এই অনুষ্ঠানগুলো। এই পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে কেবল একটি মাত্র স্তম্ভ আছে যা বিশ্বাস সম্পর্কিত কিন্তু সেখানেও শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, সাক্ষ্য দেয়ারও অপরিহার্যতা রয়েছে। আর বাকি চাঁরটি মৌলিক স্তম্ভই হলো কাজ সম্পর্কিত। ইসলাম কেবল একটি বিশ্বাস বা ধারণা নয়। ইসলাম মানে হলো নিয়মিত এবং শৃঙ্খলার সাথে কিছু কাজ করা; যেমনটি আমরা ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্যতালিকা বা ডায়েটের ক্ষেত্রে অনুসরণ করি।

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ যখন ইন্তেকাল করলেন তখনই ইসলামের এই পাঁচটি স্তম্ভ মুসলমানদের প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইসলামে তো এর বাইরেও আরও অনেক ইবাদত ও ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনের সুযোগ রয়েছে। সেগুলোর কী হবে?

আসলে যত দিন নবিজি জীবিত ছিলেন তত দিন ধর্মীয় রীতিনীতির কারণ ও প্রয়োগ নিয়ে তেমন একটা ভাবতে হয়নি। কারণ, প্রিয়নবি ﷺ নিজেই সে সময় যেকোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতেন। মানুষ যে শুধু তাঁর কাছ থেকে প্রতিদিন অনেক কিছু শিখতে বা জানতে পারত তাই নয়। বরং তাঁর মাধ্যমেই তৎকালীন মুসলমানরা যে, কোনো বিষয়ে নির্দেশনাও তাৎক্ষণিকভাবে জেনে নিতে পারতেন।

প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিতভাবে আল্লাহর কাছ থেকে ওহি লাভ করতেন। কেবল যে শুধু সাধারণ মূল্যবোধ এবং আদর্শ নিয়েই তাঁর কাছে ওহি আসত তাই নয়। বরং এমনও হতো যে হঠাৎ করে মুসলমানরা কোনো সমস্যায় পড়েছে তাহলেও সেই ব্যাপারে নবিজির ﷺ কাছে ওহি চলে আসত। এমনকি যদি কোনো পরাশক্র মদিনায় আক্রমণ করার জন্য পরিকল্পনা করত, আল্লাহ নিজেই সেই খবর রাসূল ﷺ-কে দিয়ে দিতেন। সেই মোতাবেক রাসূল ﷺ মুসলিম সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে ফেলতেন। কিংবা ধরা যাক, কোনো যুদ্ধের পরে মুসলমানরা অনেক যুদ্ধবন্দি পেল। তাদেরকে নিয়ে আসলে কি করা হবে, তাদেরকে কি হত্যা করা হবে? নাকি ক্রীতদাস হিসেবে করে রাখা হবে? নাকি পরিবারের সদস্য হিসেবে তাদেরকে রেখে দিবে? নাকি তাদেরকে মুক্ত করে দিবে? এসব প্রশ্নের উত্তরগুলো আল্লাহ নিজেই মহানবিকে ﷺ জানিয়ে দিতেন এবং নবিজিও সাথে সাথে মুসলমানদেরকে সেই বার্তা পৌছে দিতেন।

এটা সকলেই জানেন যে, মুসলমানরা মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়েন। কিন্তু শুরু থেকেই ব্যাপারটা এমন ছিল না। প্রথম দিকে মুসলমানরা জেরুজালেমের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়তেন। হঠাৎ করেই এক দিন ওহি আসে এবং মুসলমানদের ওপর নির্দেশনা জারি হয় মক্কার দিকে নামাজ পড়ার জন্য। আর সেদিন থেকেই মুসলমানরা মক্কার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ছেন। শেষ পর্যন্ত সেদিকেই মুখ করেই নামাজ পড়ে যেতে হবে কারণ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন এবং আর কোনো নবিও কোনো দিন আসবেন না, ফলে কেবলা পরিবর্তন করার মতো ক্ষমতা বা সুযোগ কিংবা সম্ভাবনাও নেই। এক কথায় বলতে গেলে যত দিন মুহাম্মাদ ﷺ জীবিত ছিলেন ইসলাম সব সময়ই তার স্বকীয়তায় ছিল। তখন নিয়মিত ইসলামের বিবর্তন হতো আর সেটা হতো নবিজির মাধ্যমেই।

কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ওফাতের সাথে সাথেই মুসলমানদের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, এখন তাদের কি হবে? কীভাবে হবে? মুসলমানদের মধ্যে এখন অনেক সাধারণ মানের প্রশ্নও জেগে ওঠল। যেমন, আমরা যে নামাজ পড়ি সেখানে হাত আমরা কোথায় বাঁধবো? একটু ওপরে বাঁধবো নাকি একটু নিচে? নামাজের জন্য যে আমরা অজু করি সেখানে পা ধোয়া বলতে কতটুকু ধোয়াকে বুঝায়? হাঁটু পর্যন্ত নাকি গোড়ালি পর্যন্ত?

আর শুধু পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভ মানলেই মুসলমানের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। মুসলমানদের নামাজ রোজার পাশাপাশি আরও কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে। বিশেষত উম্মাহ্‌র প্রতি প্রতিটি মুসলমানের করণীয় আছে। মুসলমানদেরকে সাধারণভাবে যেকোনো মানুষের প্রতি অনেক কোমল আচরণ করতে হবে, সুন্দর ব্যবহার করতে হবে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিন্তু এত কিছু যেই কুরআনকে নিয়ে করা হলো, সেই কুরআন কিন্তু সরাসরি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সংকটগুলোর সরাসরি উত্তর দেয় না। প্রকৃত বাস্তবতা হলো যে, অধিকাংশ ধর্মীয় গ্রন্থগুলো খুব সাধারণভাবে কিছু নির্দেশনা প্রদান করে। যেমন: পাপ করো না, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করো বড় মনের মানুষ হও, তোমাদের সকল আমল বিবেচনা করেই সেই অনুযায়ী প্রাপ্য দেয়া হবে। জাহান্নাম খুব ভয়ংকর জায়গা, বেহেশতে হলো শান্তি আর শান্তি, আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার জন্য শুকরগুজারি হও, আল্লাহর প্রতি ইমান আনো প্রভৃতি। এমনকি কুরআন যেসব ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে মতামত দিয়েছে সেখানেও ব্যাখ্যা করার অবকাশ রয়েছে।

আর ব্যাখ্যা করার বিষয়টি আসলেই খুব জটিল। যদি প্রত্যেকেই কুরআনের দ্ব্যর্থক বিষয়গুলোকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে তাহলে সেই ব্যাখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর ব্যাখ্যা ভিন্ন হলে বিভাজনও বেশি হবে। উম্মাহ্ তখন দ্বিধায় পড়ে যাবে। ফলে যেই সংকট হবে, তা মোকাবেলা করা খুব সহজ হবে না।

দ্য স্কলার্স

মুসলমানদের জন্য সময়ের প্রয়োজনেই দ্ব্যর্থক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করাটা দরকার হয়ে পড়ে । যাতে বিষয়গুলো একটু খোলাসা হয় এবং সকলেই যেন একটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারে। প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা কোনো বিষয় বুঝার জন্য আলাদা করে নিজেদের যুক্তিকে কাজে লাগাতে আগ্রহী ছিল না। কারণ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন যে, যুক্তি দিয়েই যদি সব বুঝা যেত, সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত তাহলে ওহি নাজিলের দরকার হতো না। প্রথমদিকের কোনো খলিফারাই দাবি করেননি যে, কোনো জটিল বিষয় অনুধাবন করার জন্য তাদের কাছে ওপর থেকে কোনো নির্দেশনা আসে। তাদের এই সরলতা আর সততা তাদেরকে ইসলামের ইতিহাসে আরও বেশি স্মরণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

শুরু থেকেই কুরআনের কোনো নির্দেশনার বিষয়ে মুসলমানদের একমাত্র ভরসার জায়গা ছিল রাসূলের স্মৃতি বা তার কোনো কথা বা সুস্পষ্ট ভাষ্য। এক্ষেত্রে প্রথম নীতিমালা নির্ধারণ করেন হযরত উমর (রা.)। যখনই এমন কোনো বিষয় তার সামনে আসত যেই ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না, হযরত উমর (রা.) তখনই প্রশ্ন করতেন 'এ রকম পরিস্থিতিতে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কী করতেন বা কী সিদ্ধান্ত নিতেন?

হযরত উমরের (রা.) এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সেই সময়ের মুসলমানরা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সব কথা, কাজ, মন্তব্যকে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ নেয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ ﷺ যা বলেছেন তা অনেকেই শুনেছে, ফলে ভাষ্যও অনেকগুলো পাওয়া যেত। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনোটা বিশ্বাসযোগ্য? কারণ, তাঁর নামে অনেক উক্তিই পরবর্তীকালে এসেছে যার একটি আরেকটির সাথে সাংঘর্ষিক। বিষয়টা এখানেই থেমে থাকল না। কার মাধ্যমে নবিজির কথাটি আমাদের কাছে এসে পৌঁছাল বা তার মান কী রকম বা তথ্যের প্রকৃত উৎসটা কিরকম, সেই ব্যক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য? বর্ণনাকারীর তথ্যটি আবার যাদের মাধ্যমে এসেছে তারা কী ধরনের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি? এসব প্রশ্নও তখন আসতে শুরু করল।

আগেও যেমন বলা হয়েছিল, হযরত উমর (রা.) খলিফা হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পরপরই এই ধরনের একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করেছিলেন। তাই সেই সময়ে ইসলামি শক্তিদের হাতে যেমন পেশাদার সৈন্যদের একটি সদাপ্রস্তুত বাহিনী ছিল, ঠিক তেমনি পেশাদার জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদেরও একটা দল সব সময়ই দায়িত্বরত থাকত।

তবে পরবর্তী সময়ে এসে হাদিস এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো যে, যেকোনো ক্ষুদ্র বিশেষজ্ঞ প্যানেল দিয়ে তা আর নিয়ন্ত্রণ করা গেল না। নতুন নতুন হাদিস বিরতিহীনভাবে আসতে শুরু করল। উমাইয়াদের সময়ে এসে এমন পরিস্থিতি হলো যে, রাসূল ﷺ-এর হাজারো হাদিস, উদ্ধৃতি এবং সিদ্ধান্ত যেন এখানে সেখানে বাতাসে ভেসে বেড়াতে শুরু করল। এর মধ্যে কোনটা সঠিক আর কোনটা ভেজালে ভরা তা নির্ধারণ করার জন্য বিশেষজ্ঞরা ছিলেন। তবে তারা ক্রমশ বিষয়টা জটিল করে ফেললেন। কোনো জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তি এ রকম কিছু মতামত দিতে পারলেই তখন অনেক সুনাম অর্জন করতেন। আর এই সুযোগে তারাও অনেক ছাত্র আর ভক্ত পেয়ে গেলেন। এক পর্যায়ে এসব শিষ্য আর ভক্ত নিয়ে নতুন একটি শিক্ষাশ্রেণির জন্ম হলো। এই কাজটিকে অনেকেই অধিক সওয়াবের আশায় ওয়াকফ্‌ও মনে করতেন।

হাদিস শব্দের আক্ষরিক অর্থ বচন। তবে শুধু মুখের কথাকে হাদিস ধরলে হাদিসের পুরো অর্থ পাওয়া যায় না। কারণ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথা সাধারণ কোনো মানুষের কথা নয়, আবার শেক্সপিয়ার বা আইনস্টাইনের মতো কোনো মনীষীর কথার মতোও নয়। যদি রসাত্মক বা শোকাবহ সৃষ্টিতে শেক্সপিয়ার অনবদ্য না হতেন তাহলে কেউ হয়তো তার কথাকে তেমন একটা গুরুত্ব দিত না। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-এর বেলায় ব্যাপারটা তেমন নয়। নবি বলেছেন কিনা এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হাদিসের মধ্যে অনেক হাদিস যেমন আছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি কিছু হাদিস আছে একেবারেই সাধারণ কথাবার্তায়। সেগুলো কথাবার্তা হিসেবে সাধারণ হলেও আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, সাধারণ কোনো মানুষ নয় বরং স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কথাগুলো বলেছেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যেহেতু হাদিসের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই হাদিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারটিতেও বেশ সুচারো ও সুষ্ঠু পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। কে হাদিসটির বর্ণনা করেছেন বা কারা শুনেছেন- এই প্রতিটি বিষয়ই অনেক বেশি নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করা হয়। এমন ব্যক্তিদের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা হয় যারা সরাসরি নবিজিকে দেখেছেন। এতগুলো প্রক্রিয়া শেষেই একটি হাদিসকে সহীহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার বলা যায় যে, মূল তথ্যদাতার ব্যাপারটি আসলে রাসূল ﷺ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ যিনি হাদিসটি বর্ণনা করছেন তিনি রাসূলুল্লাহর কতটা ঘনিষ্ঠ সাহাবি ছিলেন সেটাও একটা মানদণ্ডের নির্নায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আবার যারা এটা শুনে বর্ণনা করছেন তারাও ব্যক্তিগত জীবনে কেমন চরিত্রের বা কতটা সৎ সেটাও হাদিসের গ্রহণযোগ্যতার বিচারে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।

হাদিস সংগ্রহের ক্ষেত্রে এ রকম একটি গল্প প্রচলিত আছে। প্রখ্যাত হাদিস সংকলক বুখারী একবার একটি হাদিসের যথার্থতা যাচাই করছিলেন। তিনি হাদিসের সাথে প্রথম যার সম্পর্ক খুঁজে পেলেন তিনি খুবই আস্থাভাজন। দ্বিতীয় সোর্স যিনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিনিও বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষায় উতরে গেলেন। তৃতীয় ব্যক্তির কাছে যখন বুখারী পৌছালেন তখন তিনি দেখলেন যে লোকটা একটা ঘোড়াকে মারছে। এটা দেখে বুখারী ভাবলেন, হাদিসের তৃতীয় বর্ণনাকারী যদি এভাবে ঘোড়াকে মারে তাহলে আসলে তো তার মান নেই। আর বর্ণনাকারীর যেখানে মান নেই সেখানে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা কীভাবে আসবে- এই মর্মে তিনি হাদিসটাকে পরে আর সহীহ হিসেবে গ্রহণ করলেন না।

মোদ্দা কথা, যিনি হাদিসটি বর্ণনা করছেন তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় করার জন্য একজন হাদিস সংগ্রহকারীকে সেই বর্ণনাকারী সম্বন্ধেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, সেই সময়টিকে পরিমাপ করতে হয়। একজন হাদিস সংগ্রহকারীকে হাদিস বর্ণনার প্রেক্ষাপটটিও যাচাই করতে হয়। কারণ, ঠিক কী কারণে সেই সময় রাসূল ﷺ কথাটি বলেছিলেন তা প্রেক্ষাপট না জানতে পারলে কোনোভাবেই অনুধাবন করা সম্ভব হবে না। এইভাবে ব্যক্তির যথার্থতা বা সময়ের মূল্যায়ন করে হাদিস সংগ্রহ করার এই প্রক্রিয়াটিকে মনীষীরা 'সাইন্স অব হাদিস' হিসেবেও উল্লেখ করেছেন।

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইন্তেকালের সত্তর থেকে আশি বছর পর থেকেই ইসলামি পণ্ডিতেরা বিভিন্ন ইস্যুতে বা বিষয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বক্তব্যগুলোকে সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এভাবেই ইসলামের আদর্শিক মতবাদটিও একটি কাঠামোর আকার পায় ফলে তা মুসলমানদের ইসলামসম্মত জীবনযাপনেরও

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পথকে সহজতর করে। আপনি বিস্মিত হতে পারেন কিন্তু বাস্তবতা হলো, এসব হাদিস সংগ্রহকারী শুধু যে হাদিস সংগ্রহ করেছেন তা নয় বরং এগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি বিন্যাসও করেছেন। তাই আপনি যদি খাবার খাওয়া সংক্রান্তে রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চান তাহলে খাদ্যতালিকা সম্পর্কে আলাদা একটি বিভাগ পাবেন। ঠিক এ রকম আপনি পোশাক পরিচ্ছদ, যুদ্ধবিগ্রহ থেকে শুরু করে যেকোনো বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর ভাষ্যগুলো আলাদা আলাদা করে সন্নিবেশিত অবস্থায় হাদিসগ্রন্থগুলোতে পাবেন। হাদিস সংগ্রহকারীরা প্রথমদিকে এলোমেলোভাবে কাজ করলেও কাজটি সুন্দর করে শুরু করেন উমাইয়া আমলে; তবে তা পরিণতি পায় আব্বাসি যুগে এসে।

এরপরও উম্মাহ্‌র সামনে নতুন নতুন হাদিস আসা অব্যাহত থাকে। তবে হিজরির ৩০০ বছর পরে এসে মূলত ৬টি হাদিস গ্রন্থ বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই হাদিসগ্রন্থগুলো কুরআনের ব্যাখ্যাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং ইসলামের জ্ঞানের দ্বিতীয় গ্রহণযোগ্য উৎস হিসেবে মুসলমানদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে।

তবে কুরআন ও হাদিসের মতো সহজপ্রাপ্যতার পরও মুসলমানরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অনেক সংকটেই সঠিক উত্তর খুঁজে পায় না। তাই অনেক সময়ই এমন পরিস্থিতিতে মানুষকে পড়তে হয় যেখানে খুব জটিল ও বিতর্কিত বিষয়ে তাকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই কুরআনের বৈধ চেতনাকে ধারণ করেই মুসলমানরা এসব জটিল পরিস্থিতিতে এমন কিছু মুসলিম মনীষীর শরণাপন্ন হয় যারা কুরআন ও হাদিস সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান রাখেন। যারা 'সাইন্স অব হাদিস' প্রসঙ্গেও অনেক দক্ষতা সম্পন্ন। কারণ, কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান থাকা বিশেষজ্ঞরাই পারবেন, জটিল পরিস্থিতিতে ইসলামের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে; যা কোনোভাবেই কুরআন ও হাদিসের মূল চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

এমনকি অনেক মনীষীরাও মূলত নিজের বিবেককে কাজে লাগিয়ে নানা সিদ্ধান্ত নেন, যাকে ইসলামি শরিয়তের ভাষায় কিয়াস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। উল্লেখ্য, কিয়াসের এই ধারণাটির প্রচলন করেন হযরত উমর (রা.) যিনি মদ্যপানের শাস্তিটি কি হবে তা কিয়াসের মাধ্যমেই নির্ধারণ করেছিলেন। এই কারণেই বির্তকমূলক বিষয়াবলীতে উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে সত্যিকারের ইসলামি পণ্ডিতেরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক রেফারেন্সের কাছ থেকে সাহায্য নিতেন। পূর্বে নেয়া হয়েছে এ রকম কোনো সিদ্ধান্তের আলোকে নিজেরা আবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন। আর কিয়াস করতে গিয়েও যদি তারা কোনো সমস্যা অনুভব করতেন তাহলে তারা সর্বসম্মতভাবে যেই সিদ্ধান্ত আসে তাই মেনে নেয়ার চেষ্টা করতেন। যাকে ইসলামি পরিভাষায় ইজমা বলা হয়। আর এই ধরনের ঐকমত্য

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যেকোনো বিষয়ে প্রদত্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারে মুসলমানদের আস্থা বাড়িয়ে দেয় কারণ রাসূল ﷺ বলে গেছেন, আমার উম্মাহ্ কোনোদিন ভুল কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারবে না।

যদি কোনো ব্যক্তি কুরআন, হাদিস, কিয়াস ও ইজমা বিষয়ে পূর্ণ অবগত থাকেন তাহলেই তিনি নৈতিক ও আইনগত ভাবনার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছতে পারবেন। যাকে বলা হয় ইজতিহাদ। যুক্তির ওপর ভর করে মুক্ত ও খোলামেলা ভাবনার ক্ষমতাকেই বলা হয় ইজতিহাদ। যদি কোনো বিষয়ে ওহির বাণী থেকে সরাসরি কোনো বার্তা না পাওয়া যায় অথবা যদি অতীতের কোনো সুস্পষ্ট উদাহরণ না পাওয়া যায় তাহলেই কেবল ইসলামি পণ্ডিতেরা ইজতিহাদ করতে পারবেন।

আর ক্রমাগতভাবে ইজতিহাদের ক্ষেত্রটিও সংকুচিত হয়ে আসে। কারণ, যখন কোনো বিষয়ে মুসলিম কোনো বিশেষজ্ঞ কাজ করেন বা গভীর অধ্যয়ন করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন তখন, সেটাও জ্ঞানের উৎস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। তার পরবর্তী সময়ে যদি আবার কোনো মনীষী এই বিষয়ে কাজ করতে চান, তাহলে তাকে শুধু কুরআন, হাদিস, ইজমা বা কিয়াস জানলেই হবে না। বরং এগুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখার পাশাপাশি তার পূর্বসূরিরা এই বিষয়ে কি মতামত দিয়ে গেছেন এবং সেগুলোর প্রেক্ষাপট কি সেই সম্পর্কেও ধারণা রাখতে হয়। কেবল তখনই তার নতুন করে ইজতিহাদ করার মতো যোগ্যতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হয়।

এতসব প্রক্রিয়া পার হয়েই অবশেষে ৩০০ হিজরির শেষ দিকে গিয়ে সকল মনীষিরা একমত হয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল পরিসরের নিত্য নৈমিত্তিক সংকট থেকে শুরু করে একেবারে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের টুকিটাকি যেমন খাওয়া দাওয়া, স্বাস্থ্য বা যৌন জীবনসহ সকল বিষয়ে নীতিমালা, দায়বদ্ধতা, সুপারিশমালা, সতর্কতা, নিয়মকানুন, শাস্তি বা পুরস্কারের বিধান প্রণয়ন করা হয়। আর এই নীতিমালা ও বিধিবিধানগুলোকেই এক কথায় শরিয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শরিয়াত বলতে ইসলামিক আইনের চেয়েও আরেকটু ব্যাপক কিছু বুঝায়। শরিয়াত বলতে ইসলামিক ধারায় জীবনযাপনের গোটা পদ্ধতিকেই বোঝায়- যার তেমন একটা সম্প্রসারণ বা উন্নয়নের অবকাশ নেই। তবে প্রতিনিয়তই নতুনভাবে আবিষ্কার করার মতো অনেক কিছুই আছে। শরিয়াত হচ্ছে এমন একটা গাইডলাইন- যা অনেকক্ষেত্রেই পর্যটকরা ব্যবহার করেন। আপনি গাইডলাইন মেনে চললে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন আর না মানলে হয়তো ভুল করে কোনো বনে জঙ্গলে গিয়ে আটকা পড়বেন।

সুন্নিরা অনুসরণ করার জন্য চারটি মাযহাব বেছে নিয়েছে আর অন্যদিকে শিয়াদের মাযহাব একটাই। চারটি মাযহাব মানার সুযোগ থাকায় সুন্নিদের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিবেচনা বা পর্যালোচনার সুযোগটাও অনেক বেশি। এই মাযহাবগুলোর মধ্যে অনেক ভিন্নতাও রয়েছে। তবে এটা আসলেই প্রশ্নসাপেক্ষ যে, প্রকৃতপক্ষে কতজন মুসলমান এই চারটি মাযহাব সম্বন্ধেই স্বচ্ছ ধারণা রাখে বা রাখতে পারে।

সুন্নিদের এই চারটি মাযহাবের নাম রাখা হয়েছে, সেই মহান মনীষীদের নামে যারা আসলে এই চিন্তাধারাগুলোকে একটি চূড়ান্ত কাঠামো দিয়ে গেছেন। যেমন : হানাফি মাযহাবটি হয়েছে তার প্রবর্তক আবু হানিফা (র.)-এর নামে, যিনি ছিলেন পারস্যের মানুষ। যদিও তিনি শিক্ষকতা করেছেন ইরাকের কুফাতে। মালিকি মাযহাবের নাম হয়েছে প্রখ্যাত আইন বিশারদ মালিক বিন আনাস (র.) এর নামে- যিনি আবার শিক্ষকতা করেছেন মদিনায়। শাফেয়ি মাযহাবটির নাম রাখা হয়েছে মক্কার ইমাম শাফেয়ীর নামে যদিও তিনি পরবর্তী জীবনে মিসরে স্থায়ী হন। আর সর্বশেষটি হাম্বলি মাযহাব, যার নামকরণ হয়েছে এর প্রবর্তক আহমেদ বিন হাম্বল (র.)-এর নামে। এই মনীষীর ব্যাপারে আমি অধ্যায়ের পরের দিকে আরেকটু বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব।

এই মাযহাবগুলোর নিয়মবিধি প্রণয়নের ব্যাপারে পার্থক্য ছিল। মাযহাবগুলোর প্রণীত আইনেও ভিন্নতা ছিল। কিন্তু আব্বাসি আমলের আগ পর্যন্ত এই চারটি মাযহাবকেই মূলধারার সঠিক পন্থা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। একজন মুসলমান চাইলেই এর চারটি মাযহাবের মধ্যে যেকোনো একটিকে অনুসরণ করার জন্য বেছে নিতে পারেন। আর এই মাযহাবের প্রতিটি বিষয় মানতে গিয়ে প্রতিটি মাযহাবের মধ্যেই আবার নতুন করে একদল মানুষ তৈরি হয়, যারা এই মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি, শরিয়াতের বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান রাখতে শুরু করেন। এই মানুষগুলোকেই বলা হলো উলামা। উলামা হলো আলিম শব্দটির বহুবচন। আর আলিম শব্দের মানে হলো জ্ঞানী। তাই উলামা অর্থ হলো জ্ঞানী শ্রেণি।

যদি আপনার ধর্ম সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান থাকে এবং সেই জ্ঞান সম্বন্ধে আপনার সম্প্রদায়ের মানুষজন অবগত হয় তাহলে আপনি উলামা হিসেবে গণ্য হবেন। উলামা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করলে সেই সময়ে ওয়াকফ বিভাগের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা যেত। ছাত্রদের পড়ানো যেত এবং নিজেই একটা স্কুল চালু করতে পারত। উলামারা বিচারপতি হিসেবেও কাজ করতে পারতেন। শুধু এমন বিচারপতি নয় যে মামলা শুনে রায় ঘোষণা করবে কিন্তু এমন বিচারপতিও হতে পারত, যারা সামাজিক বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সিদ্ধান্ত দেয়ারও এখতিয়ার রাখতেন। যদিও কাজের প্রেক্ষাপট ও অবস্থান ভিন্ন ছিল তথাপি খেলাফতের সময়ে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও উলামাদের কাছ থেকে অনেক ধরনের পরামর্শ নিতেন। উলামারা সেই সময়ে আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন, আদালতকে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

নিয়ন্ত্রণ করতেন। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন এবং মুসলিম সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তত্ত্বাবধান করতেন। গোটা সভ্য জগতে তাদের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। কারণ, উম্মাহ্র অনেক কার্যক্রম ও কৌশল এই উলামাদের ওপর নির্ভর করত। তাদের প্রভাব বা ক্ষমতাটি ছিল সামাজিক পর্যায়ে, তবে অনেক সময়ই তা রাজনৈতিক প্রভাবের চেয়েও বেশি কার্যকরী ছিল।

একটা বিষয় এখানে খোলাসা করে বলা দরকার, তা হলো উলামাদেরকে কেউ কখনো নিয়োগ দিত না। ইসলামে কোনো পোপ বা পাদ্রির মতো পদবি নেই। তাহলে কীভাবে একজন মানুষ উলামা শ্রেণিতে গণ্য হতেন? এর একমাত্র পথ ছিল মানুষের আস্থা, শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি অর্জন করা। এটা ছিল একটা চলমান প্রক্রিয়া। এখানে কোনো লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট নেই, যা দিয়ে আপনি কাউকে উলামা হিসেবে প্রমাণ করতে পারবেন। উলামারা ছিলেন একটি আত্মবাছাইকৃত ও আত্মনিয়ন্ত্রিত শ্রেণি। তাদের একমাত্র দায়বদ্ধতা ছিল ইসলামের প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শ। একজন আলেম এককভাবে এই আদর্শের কোনো জায়গাতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না। কারণ, ইসলামি আদর্শ অনেক পুরোনো, অনেক শক্তিশালী, অনেক শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া চাইলেই কেউ উলামা হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারবে না। যদি না তার ইসলাম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকে এবং ওপরে বর্ণিত কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের প্রক্রিয়ায় সে মানোত্তীর্ণ না হতে পারে। কারও যদি স্বাভাবিক অবস্থায় ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকে, তাহলে তা উচ্চস্বরে তোলার জন্য তাকে আলেম হতে হবে। আর আলেম হতে গেলে তাকে যে পড়াশোনা করতে হয়, জ্ঞান অর্জন করতে হয় তাতে দেখা যায় শেষে তার আর ঐ প্রশ্ন করার কারণটাই থাকে না। তাই আন্দাজে এবং খেয়ালের বশে ইসলামকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা সবার উচিত নয়। যারা এ রকম করেন, তাদেরকে আমাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত। কারণ, উলামা শ্রেণি হলেন ইসলাম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেয়ার বা প্রশ্ন করার সঠিক ব্যক্তি কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের জ্ঞান ও যোগ্যতা নিয়ে এতটাই হীনমন্যতায় ভোগেন যে সাধারণ মানুষের মতো প্রশ্ন করার সাহস তারা আর খুঁজে পান না।

দ্য ফিলোসোফার্স বা দার্শনিকদের সময়

ইসলামে উলামাই একমাত্র দার্শনিক গোষ্ঠী নয়। যদিও এই উলামারাই মতবাদ হিসেবে ইসলামের কাঠামোটি তৈরি করেছেন। তথাপি উলামাদের বাইরে ইসলামে আরেকটি চিন্তাশীল গোষ্ঠী ছিল- যারাও বেশ বড় একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। এই মানুষগুলোর কাজ ছিল অতীতের সব দর্শন ও আবিষ্কারকে ইসলামের আলোকে পর্যালোচনা করা। এদের সবকিছুকে একটি

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

একেক পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা। এই ধরনের কাজ করতে করতেই মুসলিম বিশ্বে আরেকটি চিন্তাশীল শ্রেণির জন্ম হয় যারা ছিলেন দার্শনিক।

ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ায় একটা সময়ে এসে আরবের সাথে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও তাদের চিন্তাধারার সাথে পরিচয় ঘটে। যেমনঃ আরবরা তখনই প্রথমবারের মতো ভারতের হিন্দুদেরকে, মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে, পারস্য জাতিকে এবং গ্রিকদেরকে জানার সুযোগ পায়। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন রোমান সাম্রাজ্য বলতে আর তেমন কিছুই টিকে নেই। কন্সট্যান্টিপোল বুদ্ধিবৃত্তির বাইরে একটি খরাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। তাই তখনো পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী বা চিন্তাশীল লোকদের বেশিরভাগই গ্রিক ভাষায় লেখালেখি করতেন। গ্রিক ভাষায় পটু এই মানুষগুলোর বেশিরভাগ থাকতেন আলেকজান্দ্রিয়ায়, যা মুসলমানরা আগেই জয় করে নিয়েছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় সেই সময়ে বিশাল একটি লাইব্রেরি ছিল। সেখানে জ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা বসবাস করতেন। তাই তৎকালীন গ্রিসো-রোমান বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই আলেকজান্দ্রিয়া শহরটি।

এখানেই মুসলমানরা প্রথমবারের মতো প্লোটিনাসের কাজ সম্পর্কে জানতে পারে। প্লোটিনাস প্রথম বলেন যে, এই মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তার সবই একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত। আর এসব কিছু মিলে একটি রহস্যময় সত্তাকে ইঙ্গিত করে, যার কাছ থেকে আসলে সবকিছুর সূচনা হয়েছে। আর সেই সত্তার কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

এই রহস্যময় একক সত্তার ধারণার সাথে মুসলমানরা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রচারকৃত এক আল্লাহর সত্তার মিল খুঁজে পান। শুধু তাই নয়, প্লোটিনাসের দিকে তাকালেই মুসলমানরা অনুধাবন করতে পারেন যে, প্লোটিনাস কিছু সংখ্যক স্বতঃসিদ্ধ নীতিমালা থেকে এমন কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার করে গেছেন যা ভীষণ রকম যৌক্তিক। এই পরিস্থিতি দেখে মুসলমানরা আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেন এই মর্মে যে, ইসলামের ঐশ্বরিক বাণী বা ওহিগুলোকেও তারা হয়তো যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন।

আরও গবেষণা করে মুসলমানরা জানতে পারেন যে, প্লোটিনাস এবং তার সহকর্মীরা একক সত্তা সম্পর্কে যেসব কথাবার্তা বলছেন তা মূলত আরও হাজার বছর পূর্বেই আরেকজন দার্শনিক বলে গেছেন, যার নাম প্লেটো। প্লেটোকে জানতে পারার মাধ্যমে মুসলমানরা গ্রিক দর্শনের মূল ভান্ডারটির সন্ধান পেয়ে যায়। ফলে তারা এরিস্টটল এবং তারও আগে যেসব দার্শনিক গ্রিসে জন্মেছিলেন, ক্রমান্বয়ে সবার সম্বন্ধেই মুসলমানরা পরিচিত হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আব্বাসি আমলের শাসকদের মধ্যে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তীব্র আগ্রহ ছিল। তাই সেই সময়ে কেউ যদি গ্রিক, সংস্কৃতি, চাইনিজ বা পারসিয়ান ভাষা থেকে কোনো কিছু আরবি ভাষায় অনুবাদ করতে পারত, তাহলে তাকে অনেক সম্মানী প্রদান করা হতো। আর সেই কারণেই পেশাদার অনুবাদকেরা সেই সময়ে দলে দলে বাগদাদে গমন করেন। তারা মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদ এবং অন্যান্য শহরগুলোর পাঠাগারগুলোকে নানা ধরনের অনুবাদ বই দিয়ে ভর্তি করে ফেলে। মানব ইতিহাসে মুসলমানরাই প্রথম এসব দার্শনিকের জন্ম দেয়, যারা অন্যভাষার কাজের সাথে বা অন্য দর্শনের সাথে নিজেদের চিন্তাধারা তুলনা করার সুযোগ পায়। বিশেষ করে গ্রিক এবং ভারতীয় গণিতের মধ্যে কী পার্থক্য, গ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের তুলনা, পারস্য ও চীনা কসমোলোজি কিংবা বিভিন্ন দেশ ও জাতির অধিবিদ্যার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলোকে তারা যথাযথভাবে জানার সুযোগ পায়। মুসলমান দার্শনিকরা আরও যেই কাজটি করে, তা হলো তারা একটি কার্যকর কর্মকৌশল প্রণয়ন করে। যার মাধ্যমে পুরোনো এই চিন্তাধারাগুলো কীভাবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উপস্থাপন বা প্রত্যাখ্যান করা যাবে- তাও নির্ধারণ করে। কীভাবে আধ্যাত্মিকতাকে যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কীভাবে আকাশ ও মাটিতে থাকা সব কিছুকে সরল একটি দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তুলে ধরা যায়, সেই কৌশলটিও তারা প্রণয়ন করে। যেমন :

অদৃশ্য কাঠামো

↓

প্রথম বুদ্ধিমত্তা

↓

প্রাথমিক বিষয়াবলী

↓

প্রকৃতি

↓

স্থান সংক্রান্ত বিষয়াবলী

↓

উপাদান/উপকরণ

↓

খনিজ সম্পদ, গাছপালা এবং জীবজন্তু

প্লেটো দাবি করেছেন, আমরা এই বস্তু জগতে যা কিছু দেখি তা হচ্ছে একটি মায়াময় প্রতিচ্ছবি। যার এল কাঠামোটি রয়েছে একটি অপরিবর্তনীয় এবং অসীম অবয়বে। তাই আমরা মূলত আমাদের চোখ দিয়ে যা দেখি, তা আসলে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আর কিছুই নয়; বরং একটি অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। যার নিখুঁত ও এল রূপায়ণটি রয়েছে মহাবিশ্বের মূল রাজ্যে। প্লেটোর এই দাবির ধারাবাহিকতায় মুসলমান দার্শনিকদের কেউ কেউ দাবি করেন, প্রতিটি মানুষ আসলে তার বাস্তব অবয়ব এবং প্রতিচ্ছবির সংমিশ্রণ। পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার পূর্বে তাদেরকে সব শেখানো হয়, আত্মাটি তখন প্লেটোর দাবি মতো এক মহাজগতেই বসবাস করে। এরপর ধরনীতে জন্ম নেয় মানুষ, আত্মাটি শরীরের সাথে মিশে একাত্ম হয়, তারপরে অজস্র ঘটনাবলি আর বিবর্তন। মৃত্যু হলে শরীর ও আত্মা আবার আলাদা হয়ে যায়, শরীর থেকে যায় বস্তুর জগতে আর আত্মাটি ফিরে যায় রাব্বুল আলামিনের কাছে, যেটা আত্মার এল ঠিকানা।

প্লেটোর প্রতি এই অতি সুধারণার কারণে মুসলমান দার্শনিকরা ধীরে ধীরে এরিস্টটলেরও ভক্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে এরিস্টটলের যুক্তি, তাঁর শ্রেণিবিন্যাস করার কৌশল এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার দক্ষতাকে মুসলমানরা ভীষণ রকম সমীহ করতে শুরু করে। এরিস্টটল থেকে জ্ঞান নিয়েই মুসলমান দার্শনিকরা কোনো কিছুকে স্পষ্ট যুক্তির ওপর ভিত্তি করে শ্রেণি বিকাশের মাধ্যমে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করতে শুরু করে। কেমন ছিল মুসলমান দার্শনিকদের এই শ্রেণি বিন্যাসগুলো। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক আল কিন্দি এই বস্তু জগৎকে পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতে ভাগ করেন। এগুলো হলো বস্তু, অবয়ব, গতি, সময় এবং স্থান। তিনি আবার এই মৌলিক বিষয়গুলোকে ছোট ছোট গ্রুপে বিভাজিত করেন। যেমন: গতিকে তিনি ভাগ করেছেন ছয় ভাগে। সেগুলো হলো প্রজন্ম, দুর্নীতি, বৃদ্ধি, হ্রাস, অবস্থার পরিবর্তন এবং অবস্থানের পরিবর্তন। এইভাবে ক্রমাগতভাবে তিনি এই বস্তুজগতের প্রতিটি বিষয়কে বোধযোগ্যভাবে শ্রেণিবিন্যাস করে গেছেন।

বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিকরা তাদের দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে আধ্যাত্মিকতা এবং বিচার-বিবেচনাবোধের মধ্যে মিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। তারা দাবি করেন আমাদের মূল সত্তাটি আসলে বিমূর্ততা এবং বেশ কিছু নীতিমালার মিশ্রণে তৈরি হয়েছে। তারা আরও বলে গেছেন যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যটি হলো আমাদের আত্মাকে বিশুদ্ধ করা। যাতে ইন্দ্রিয়জাত বিভিন্ন কিছুর থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে আমরা যেন তাকে বিমূর্ততার কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারি। আমরা যেন বস্তুজগতের এসব মোহময় ঘটনাকে বাদ দিয়ে মহাবিশ্বের বিদ্যমান প্রকৃত সত্যটি জানার চেষ্টা করতে পারি। দার্শনিক আল ফারাবি ছিলেন এই ধরনের চিন্তাধারার অগ্রদূত। তিনি মনে করেন যে, ছাত্রছাত্রীরা তাদের পড়াশোনা শুরু করবে প্রকৃতির অধ্যয়ন দিয়ে। এরপর তারা এর পেছনের যুক্তিগুলোকে জানার চেষ্টা করবে এবং পরিশেষে তারা জ্ঞানের সবচেয়ে বিমূর্ত ধারায় প্রবেশ করবে, সেটি হলো গণিত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

গ্রিক মনীষীরাই প্রথমে জ্যামিতি আবিষ্কার করেন। ভারতীয় গণিতবিদেরা প্রথমে শূন্য সংখ্যাটি সম্বন্ধে ধারণা দেন। ব্যাবিলনিয়ানরা প্রথমে স্থানের গুরুত্ব আবিষ্কার করেন। পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা এই সকল চিন্তাধারা ও আবিষ্কারগুলোকে পেয়ে এগুলোকে একটি নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসেন। নিজেরাও এই তথ্য ভাণ্ডারে নতুন অনেক কিছু যোগ করেন। মুসলমানরা গণিতের নতুন শাখা অ্যালজেবরা আবিষ্কার করেন। এই কথা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে, মুসলমানদের আবিষ্কৃত সেই অ্যালজেবরাই আধুনিক গণিতের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে।

একই সঙ্গে অতীতের বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তাধারা ও আবিষ্কারকে মুসলমানরাই প্রথম সরাসরি কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। যেমন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে মুসলমানরা যে ধারণা পায় সেটাকে কাজে লাগিয়েই ইবনে সিনা অসুস্থতার আধুনিক ধারণাটি আবিষ্কার করেন। অ্যানাটমি, রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া, হার্টের প্রকৃতি ও কাজের ধরন এবং শরীরের অন্যান্য অংগের কি ভূমিকা- এই সকল তথ্য প্রথমবারের মতো মানুষকে জানান। আর সেই কারণেই তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে ভালো ও বড় হাসপাতালটি মুসলমানরা বানাতে সক্ষম হয়, যেখানে চিকিৎসা নেয়ার জন্য দূর দুরান্ত থেকে মানুষ আসত। শুধু বাগদাদেই ছিল একশরও বেশি হাসপাতাল।

আব্বাসীয় আমলের মুসলমান দার্শনিকরা জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে রসায়ন শাস্ত্র, প্রাণীবিদ্যা, চোখের কাঠামো, রোগ ও চিকিৎসা, উদ্ভিদবিদ্যাসহ আধুনিক বিজ্ঞানের সকল শাখার ভিত্তি রচনা করেন। তবে অতীতের দার্শনিকদের মতো তারাও এসব বিজ্ঞানের শাখাগুলোকে পৃথক পৃথক নাম দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তারা সবটা মিলিয়েই বিজ্ঞান বলতেন এবং এই জ্ঞান অর্জনটিকে ভীষণ রকম জরুরি মনে করতেন। এই কারণেই দেখা যায়, সেই আমলের যে মুসলিম মনীষীদের কথা আমরা জানতে পারি, তারা এখনকার দিনের জ্ঞানীদের মতো কেবল একটা বিষয় জানেন না। বরং বিজ্ঞানের অন্য শাখায়ও তাদের জ্ঞান ছিল। তাই দেখা যায়, একজন মনীষী যদি চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি জিনিস আবিষ্কার করেছেন, তিনি হয়তো গণিতের জন্যেও অনেক কিছু দিয়ে গেছেন আবার দর্শন এমনকি বিচারশাস্ত্র সমম্বন্ধেও তার আবার লেখনী রয়েছে। এসব মুসলিম মনীষীরা মূলত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকেই জ্ঞান অন্বেষণের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করতেন। চারিপাশের ঘটনাবলি থেকেই তারা কিছু জানার বা শেখার চেষ্টা করে গেছেন প্রতিনিয়ত। তারা এখনকার সময়ের মতো একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে দিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষণের মাধ্যমে একে ভুল বা সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন না। এই কারণে তারা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দিয়েও গেছেন অনেক বেশি। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের নামে পশ্চিম ইউরোপে যেসব আবিষ্কার দেখি তা ইউরোপের আবিষ্কারের আরও ৭শ বছর আগে-মুসলমানরা এই আব্বাসীয় আমলেই আবিষ্কার করে গেছেন।

বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের মাঝে বরাবরই কিছুটা ব্যবধান ছিল। প্রাথমিক যুগে ধর্মের উচ্চতর প্রভাব থেকে বিজ্ঞানকে আলাদা রাখা বেশ কঠিন ছিল। ধর্মচর্চাকারী আর বিজ্ঞানীরাও নিজেদের কাজের ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যখন গ্যালিলিও প্রথমবারের মতো দাবি করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, ধার্মিকেরা তখন তাকে বিচারের মুখে ঠেলে দেয়। এমনকি বাইবেলে বর্ণিত বিবর্তনবাদের ব্যাপারে উগ্রপন্থী খ্রিষ্টানদের সাথে আজকের দিনে এসেও পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের বিবাদ রয়েছে। বিজ্ঞান বরাবরই ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করেছে কারণ, বিজ্ঞান নির্ভর করে তাঁর মেথডের বিশ্বস্ততা এবং সফলতার ওপর। আর ওহির মাধ্যমে কোনো কিছুকে বিজ্ঞান বিশ্বাস করতে চায় না। আর সেই কারণেই পশ্চিমা বিশ্বের ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে একমত হয়ে তাদের কাজের জগৎকে দুইভাগে ভাগ করে ফেলেছেন। তাদের মতে প্রাকৃতিক যে নিয়মাবলী সেটা নিয়েই মূলত বিজ্ঞানীরা কাজ করবেন। তাদের আওতায় থাকবে সাইন্স অব ন্যাচার। প্রকারান্তরে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবে ধর্ম এবং দর্শনশাস্ত্র।

নবম এবং দশম শতাব্দীর ইরাকে (প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল গ্রিসের মতো) বিজ্ঞান অবশ্য ধর্ম থেকে আলাদা ছিল না। দার্শনিকরা এই ধরনের একটি পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিলেন। তারা মনে করতেন যে, ধর্ম হলো তাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র আর ধর্মতত্ত্ব হলো তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের জায়গা। তাদের কাছে ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র উভয়টাই সর্বোচ্চ পরিমাণ গুরুত্ব পেত। সেই আমলে উদ্ভিদবিদ্যা হোক, কিংবা চোখের কোনো চিকিৎসা উপকরণ হোক কিংবা কোনো রোগের প্রতিষেধক হোক-যাই আবিষ্কৃত হোক, তা ছিল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের কঠোর সাধনার ফল।

তবে এতো কিছুর পরও দার্শনিকদের মধ্যে কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষ করে ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা পৃথিবীকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেন। একটি হলো বিশ্বাসীদের সম্প্রদায় আর আরেকটা হলো অবিশ্বাসীদের সম্প্রদায়। বিশ্বাসীদের জন্য এক ধরনের আইন করা হতো আর অবিশ্বাসীদের জন্য ভিন্ন রকমের। আরেক ধরনের নিয়মকানুন ছিল, বিশ্বাসীদের সাথে অবিশ্বাসীদের তথ্যাদি বিনিময়ের জন্য। তাই যেকোনো ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করার আগে তৎকালীন দার্শনিকরা এটা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করতেন যে, লোকটা কি বিশ্বাসী বা ইমানদারদের অন্তর্ভুক্ত নাকি এর বাইরের কেউ?

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিছু কিছু দার্শনিকরা এমনও মন্তব্য করে গেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা গুরুতর পাপ করেছে তারা তৃতীয় একটি অবস্থানে থাকবে- যা কিনা বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীদের মাঝামাঝি। তবে কট্টরপন্থী মূলধারার দার্শনিকরা এই তৃতীয় অবস্থানের ধারণার সাথে একমত নন। এই তৃতীয় অবস্থানের পক্ষে থাকা দার্শনিকদের মধ্য থেকেই পরবর্তী সময়ে নতুন এক শ্রেণির জন্ম হয়, যার নাম মুতাজিলিতিস বা অপসৃত। যেহেতু তারা মূল ধারার থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন একটি চিন্তাধারা নিয়ে আছে- তাই তাদেরকে কট্টরপন্থী ওলামাদের পক্ষ থেকে এই ধরনের উপাধি দেয়া হয়। কালানুক্রমে এই ধর্মতাত্ত্বিকেরা নতুন এক ধরনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেন, যা দার্শনিকদের কাছেও বেশ গুরুত্ব পায়। তারা বলেন, ইসলামের মূল বিষয়টি হলো তাওহিদে বিশ্বাস করা, আল্লাহ তায়ালার একক সত্তা এবং সার্বজনীনতায় বিশ্বাস করা। তারা আরও যুক্তি দেন যে, কুরআন কখনোই অসীম বা অনন্ত বা সৃষ্টির উর্ধ্বে থাকা কিছু নয়। কারণ, যদি তাই হতো তাহলে কুরআনও আল্লাহর পাশাপাশি একটি অনন্ত ও অসীম সত্তার আকার পেত, যা বলা বা বিশ্বাস করা খোদাদ্রোহিতার শামিল। তাই তারা দাবি করেন যে, অন্য অনেক সৃষ্টির মতো কুরআনও আল্লাহ তায়ালার একটি সৃষ্টি। এটা নিঃসন্দেহে একটি অনবদ্য বই, কিন্তু বই ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর এটা যদি বই হয়, তাহলে অবশ্যই একে ব্যাখ্যা করার বা সংশোধন করার সুযোগও থাকবে।

এই দার্শনিকরা বলেন, আল্লাহরও আমাদের মতো হাত, পা, চোখ, কান আছে- এই ধরনের ভাবনা ভাবার ব্যাপারে তাওহিদের চেতনা আমাদেরকে বারণ করে। যদিও কুরআনে এই ধরনের কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে মনে হয় আল্লাহ দেখতে বা শুনতে পান। তবে এই দার্শনিকরা বলেন এসব কথাকে শাব্দিকভাবে দেখা যাবে না; বরং রূপক অর্থে বিবেচনা করতে হবে।

আবার আল্লাহ ন্যায়বিচার করেন, ক্ষমা করেন, এই ধরনের কথাও তাওহিদের চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক বলে তারা মনে করেন। তারা বলেন, আল্লাহ এমন একজন সত্তা যাকে কল্পনা করা বা যার গুণ ধারণ করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ যেসব গুণবাচক উপাধিতে আল্লাহকে ডাকে, তা আর কিছুই নয়, মানুষের একেকটি খোলা জানালার মতো, যা দিয়ে সে আল্লাহকে অনুধাবন করার চেষ্টা করে। মুতাজিলিতিসদের মতে, এগুলো আসলে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে আমাদের নিজেদের বর্ণনা।

এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মুতাজিলিতিসরা এই দর্শনে পৌঁছায় যে, ভালো এবং মন্দ, সঠিক এবং ভুল যা আছে, সবই আসলে সৃষ্টিকর্তার অপরিবর্তনীয় বাস্তবতার একটি রূপায়ণ। মানুষ যেভাবে প্রকৃতির বিধিবিধানগুলো আবিষ্কার করে,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ঠিক সেভাবে এই বিষয়গুলোও চিহ্নিত করতে পারে। আরেকটি বিষয় হলো বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক মতামতের গ্রহণযোগ্যতা এবং ওহির সাথে তার চিন্তাগত ব্যবধানটি বেশ বড় আকারের বিতর্কের কারণে পরিণত হয়। মুতাজিলিতিসরা যুক্তির পক্ষে কথা বলে। কারণ তারা যুক্তিগুলোকে সত্য ও নৈতিক সত্যগুলোকে আবিষ্কার করার ওছিলা হিসেবে দেখতে চায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের যাবতীয় আচরণ বা প্রকৃতির বিধিবিধান সবই একটি অনুসন্ধানী জগতের দিকে ইঙ্গিত করে- সেটাই হলো চিরন্তন সত্য।

দার্শনিক বা বিজ্ঞানীরা কমবেশি সকলেই মুতাজিলিতিস শ্রেণির সাথে সম্পৃক্ত থাকত। কারণ, কেবল মুতাজিলিতিসরাই তাদের অনুসন্ধানের জায়গাগুলোকে বৈধতা দান করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার যুক্তিকে ওহির ওপরে অবস্থান দেয়। যেমন : দার্শনিক আবু বকর আল রাজি। তিনি দাবি করেন অতীতে নবিদের ওপরে যেসব অলৌকিক বিষয় আরোপ করা হয়েছিল তার সবই কিংবদন্তীতুল্য। জান্নাত বা জাহান্নাম যাই বলা হোক না কেন, এগুলো সব আসলে মনের সৃষ্টি; বাস্তবে এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই।

এভাবে বিভিন্ন ধরনের এলোমেলো চিন্তা সামনে চলে আসার কারণে আলেম ওলামা এবং দার্শনিকদের মধ্যে অনেক ব্যবধান বেড়ে গেল। নতুন করে সংকটের জন্ম হলো। দার্শনিকরা যাই বলতেন, তার ব্যাপারে ওলামাদের মতামতকে তারা মোটেও গুরুত্ব দিতেন না। এটা একটা সমস্যাও বটে। যদি কোনো বুদ্ধিমান বা বিবেচক মানুষ নিজেই তার বিবেচনাবোধকে কাজে লাগিয়ে বুঝতে পারে যে, কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল; তাহলে সে কেন অহেতুক ওলামাদের সাথে শলাপরামর্শ করবে বা আলোচ্য ইস্যুতে রাসূলের ﷺ হাদিস শুনতে চাইবে?

দার্শনিকদের সাথে ওলামাদের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো সেখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আলেমরা ভালো অবস্থানে ছিলেন। তারা সেই সময়ের আইনকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। যুবকদের শিক্ষা ব্যবস্থা তদারকি করতেন। বিয়ের মতো সামাজিক অনুষ্ঠান বা কার্যক্রমগুলোতেও তাদের তত্ত্বাবধান ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের পক্ষে জনসমর্থনও ছিল। প্রকারান্তরে মুতাজিলিতিসদেরও কিছু সুবিধা ছিল। তারা শাসকদের কাছ থেকে ভালো পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। রাজপরিবারের, সম্ভ্রান্ত শ্রেণির এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরও আশীর্বাদ পেতেন। বিশেষ করে আব্বাসীয়দের ৭ম খলিফার সময় তারা অনেক বেশি সুবিধা পায়। কারণ, তার আমলে মুতাজিলিতিসদের তত্ত্বকে সরকারি ধর্মতত্ত্ব বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। বিচারকদেরও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য সেই আমলে এই মুতাজিলিতিসদের তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হতো এবং মোটামুটি এক ধরনের পরীক্ষা দিয়ে নিজেদেরকে প্রমাণ করতে হতো।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মুতাজিলিতিসরা এই সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আরও যেন ভয়ংকর হয়ে উঠল। তারা সরকারি আশীর্বাদকে কাজে লাগিয়ে তাদের তত্ত্বের বিরোধী লোকদের ওপর নানা ধরনের দমন-নিপীড়ন চালাতে শুরু করল।

এখানে আবার আমি ফিরে যেতে চাই, চার মাযহাবের অন্যতম এক মাযহাব হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের কাছে। আগেই বলেছিলাম, চারটি মাযহাবের মধ্যে হাম্বলী মাযহাব হলো সবচেয়ে কট্টর ও রক্ষণশীল। ইবনে হাম্বল ১৬৪ হিজরিতে অর্থাৎ আব্বাসি আমল শুরু হওয়ার ৩৬ বছর পর বাগদাদে জন্ম নেন। তিনি এমন একটি সময়ে জন্ম নেন, যখন সমাজের অনেকের কাছেই আব্বাসিয়দের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাচ্ছিল। অনেকেই মনে করছিল যে আব্বাসিয়রাও ক্রমশ উমাইয়াদের মতো দুনিয়াবী ভোগ বিলাসের পথেই যাচ্ছে। অনেকে এটাও ভাবছিল, ইসলাম ভুল পথে যাচ্ছে এবং সেই কারণে গোটা দুনিয়াই জাহান্নামগামী হয়ে পড়ছে। আর ইসলামকে তার সঠিক রাস্তায় ফিরিয়ে আনার মাধ্যমেই আবার ইসলামের সত্যিকারের রূপ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই অবস্থায় সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইমাম ইবনে হাম্বল প্রচার করলেন, নতুন যা কিছু আবিষ্কার হচ্ছে, নয়া যেসব চিন্তা সামনে আসছে, তার সবকিছুকে বাদ দিয়ে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সেই মদিনার যুগে। যেখানে রাসূল ﷺ শান্তির শাসন কায়েম করেছিলেন। ইবনে হাম্বল আরও বললেন, কেউই নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। কিন্তু কেউ যদি তার আত্মাকে প্রশান্তি দিতে চায়, তাহলে তার একমাত্র করণীয় কাজ হলো রাসূল ﷺ কে অনুসরণ করা এবং কুরআনের ওহির বাণীকে বিশ্বাস করা। অন্যান্য মাযহাবরা যেখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার ব্যাপারে কিয়াসের ওপর নির্ভর করেছিলেন, সেখানে ইবনে হাম্বল এই প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে কেবল কুরআন ও হাদিসকে অনুসরণ করার ওপরই মতামত ব্যক্ত করেন।

এরপর তিনি একদিন রাজদরবারে গমন করেন এবং দরবারের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত দার্শনিকদের সাথে 'কুরআন সৃষ্টি করা হয়েছে নাকি এটি সৃষ্ট কোনো স্বত্তার উর্ধ্বে' এই মর্মে একটি বিতর্কে অংশ নেন। দার্শনিকরা ইবনে হাম্বলকে তাদের যুক্তি দিয়ে আক্রমণ করেন অন্যদিকে ইবনে হাম্বলের নেতৃত্বে থাকা আলেমরা ওহির বক্তব্য দিয়ে পাল্টা যুক্তি দাঁড় করান। দার্শনিকরা তাকে যতই যুক্তির আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চান না কেন, ইমাম ইবনে হাম্বল সকল সময়েই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন। এই বিতর্ক শেষমেশ কোনো ফলাফল দেয়নি কারণ বিতার্কিকদের কেউই আসলে তাদের অবস্থান থেকে সরে আসেননি। কোনো ধরনের ঐকমত্যেও পৌছাতে পারেননি। এক পর্যায়ে ইবনে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

হাম্বল প্রচলিত আইন মানতে অস্বীকার করায় তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এরপরও তিনি তার চিন্তা পরিবর্তন করেননি। তাকে এক পর্যায়ে কারাগারে বন্দি করা হয়। এরপরও তিনি হার স্বীকার করেননি এবং ওহির শ্রেষ্ঠত্বকে একটি বারের জন্যেও ছোট হতে দেননি।

তাই শাসক মহল তার ওপর চাপ দেয়া অব্যাহত রাখে। তারা তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মারতে থাকে, যতক্ষণ না তার হাড়-গোড় ভেঙে যায়। তারা সব সময় ইবনে হাম্বলকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখত। এভাবে কয়েক বছর তাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখা হয়। এত নির্যাতনের পরও তার চিন্তাধারায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। কারাগারের ভেতরে মজলুম অবস্থায় থাকায় তার সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বেড়ে যায়। সাধারণ জনগণ যারা আব্বাসীয়দের ভোগ বিলাস নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল, তারা ইবনে হাম্বলের দৃঢ়তায় সাহস পায়। ফলে তার পক্ষে এক ধরনের জনসমর্থনও গড়ে ওঠে। আব্বাসীয়রা এই জন অসন্তোষকে আবার খুবই ভয় পেত। কারণ, খলিফা পরিবর্তনের সময় জনগণ ক্ষিপ্ত থাকলে সাম্রাজ্যের পতনও ঘটে যেতে পারে। আবার জনগণের আবেগকে উড়িয়েও দেয়া যায় না। কারণ, সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে যিনি বেশি সমর্থনপ্রাপ্ত হবেন, তার জন্য পরবর্তী খলিফা হওয়ার পথটাও সহজ হয়ে যায়। তাই জনগণের আবেগকে আব্বাসীয়দের জন্য গুরুত্ব না দেয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। জেলে থাকা অবস্থায় ইবনে হাম্বল বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। বাড়িতে ফিরে তিনি ব্যাপক সংখ্যক জনতার ভালোবাসায় সিক্ত হন। এই দৃশ্য দেখে রাজদরবারও তার চিন্তা-দর্শনের প্রতি কিছুটা নমনীয় হতে বাধ্য হয় এবং গ্রিক দর্শনের প্রভাবে ইসলামি দর্শনশাস্ত্রে যেসব বিষয় ইতঃপূর্বে প্রবেশ করেছিল, তারা সেগুলোকে বাদ দিতেও বাধ্য হয়। পরবর্তী খলিফা মুতাজিলিতিসদের অবস্থানকে আরও দুর্বল করে দেন এবং ইবনে হাম্বলকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করেন। এরপর থেকেই আবারও আলেমদের অবস্থান সংহত আর দার্শনিকদের অবস্থান দুর্বল হতে থাকে।

সুফিবাদের আবির্ভাব

আলেম-ওলামারা শুরু থেকেই আইন ব্যাখ্যা করার কাজটি করতেন। কিন্তু কিছু মানুষকে তা মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাদের চাওয়া ছিল, 'কুরআনের যে ঐশ্বরিক শক্তি বা ওহির যে সক্ষমতা, তা কি কেবল কিছু বিধি-বিধান প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? আর যেহেতু ওহি নাযিল হবে না, কুরআনের থেকে তাহলে আমাদের নতুন কিছু পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই? আমরা আল্লাহর অলৌকিকত্বকে এখনো উপভোগ করতে চাই প্রভৃতি।'

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এর পরপরই কিছু মানুষ নিত্যদিনের ইবাদত করার পাশাপাশি আরও আধ্যাত্মিক সাধনা করতে শুরু করে। তারা বিরতিহীনভাবে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করে কিংবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আল্লাহর জিকির করতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাগদাদের আল জুনায়েদের কথা। তিনি তার প্রতিদিনের কাজকর্ম শেষ করে এক নাগাড়ে চার শ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। তৎকালীন সময়ের অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের বিলাসী জীবনযাপনের পরিবর্তে তারা স্বেচ্ছায় দরিদ্রতাকে বরণ করে নেন। তারা শুধু রুটি আর পানি খেয়ে দিন পার করতেন। বিলাসী আসবাবপত্র পরিহার করতেন। মোটা ধরনের সস্তা কাপড় পরিধান করতেন। আরবিতে এই ধরনের জীবনযাপনকে 'সুফ' বলা হতো আর এই সুফ থেকেই সুফিবাদের উত্থান।

সুফিরা আলাদা করে কোনো গোত্র বা শ্রেণি চালু করতে চায়নি। তারা দুনিয়াবী উচ্চাবিলাস এবং দুর্নীতির বিরোধী ছিলেন। তাত্ত্বিকভাবে প্রতিটি মুসলমানেরই সে রকম হওয়ার কথা। কিন্তু সুফিরা এই সাধারণ মানের মুসলমানদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা ছিলেন। তাদের একমাত্র প্রচেষ্টা ছিল, কীভাবে মনকে বিশুদ্ধকরণ করা যায়? কী এমন পোশাক পরলে বা কীভাবে জীবনটা অতিবাহিত করলে অন্য সব পার্থিব বিষয়াবলীকে ছেড়ে আল্লাহতে বিলীন হওয়া যায়?

তারা এমন সব কৌশল বের করলেন, যা তাদের প্রথাগত ধর্মীয় আচারাদি ও জীবনবোধের বাইরে নিয়ে যায়। কেউ কেউ আবার নিজেদের সংকীর্ণতাকে জয় করার জন্য আধ্যাত্মিক লড়াই চালানোর কথাও বলেন। সেই যুক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য তারা হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর একটি হাদিসের রেফারেন্স দিতেন। রাসূল ﷺ যেখানে বলেছেন 'সকল ধরনের জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ'। এখানে অন্যান্য জিহাদ বলতে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই ধরনের লড়াইয়ের চেয়েও নিজের ইগো ও নফসের অন্যান্য কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে করা জিহাদকে বড় বলা হয়েছে।

ধীরে ধীরে চতুর্দিকে একটি খবর ছড়িয়ে পড়ে। তা হলো এই সুফিদের মধ্যেই কেউ কেউ এই বস্তুজগতের সীমানাকে ভেঙে আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার পথ আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বসরার কথা। সেখানে রাবেয়া বসরি নামক এক মহিলার কথা জানা যায়। যিনি আজও সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে কিংবদন্তী হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি জন্মেছিলেন উমাইয়া বংশের শাসনামলের শেষ দিকে। আর যখন আব্বাসীয়দের আমল শুরু হলো, তখন তিনি একজন যুবতী।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিশোরী অবস্থায় একদিন তিনি তার পরিবারের সাথে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একদল ডাকাত তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। তারা রাবেয়ার বসরির পিতা মাতাকে হত্যা করে তাকে দাসী হিসেবে বিক্রি করে দেয়। এভাবেই তার সাথে বসরার সম্পর্ক শুরু হয়। দাসী হিসেবে তার ঠিকানা হয় বসরার খুব অর্থশালী এক ব্যক্তির বাসায়। তার সেই মালিক পরবর্তী সময়ে জানান, তিনি একসময় আবিষ্কার করলেন যে, এই মেয়ের সাথে আধ্যাত্মিক কিছু বিষয় আছে যা তাকে রীতিমতো বিস্মিত করে। একদিন রাতে রাবেয়া নামাজ পড়ছিলেন। সেই সময়ে এই ব্যক্তি (রাবেয়াকে ক্রয়কারী ব্যক্তি) দেখেন রাবেয়ার চারপাশে অদ্ভুত এক আলো এসে ভর করেছে। সাথে সাথেই তিনি অনুধাবন করেন যে, তার বাসায় একজন দরবেশ বসবাস করছেন। তার দাসী আসলে এ রকমই একজন ব্যক্তি। এটা উপলব্ধি করেই তিনি রাবেয়াকে মুক্ত করে দেন এবং তার জন্য উত্তম বিয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি রাবেয়ার সামনে শহরের সবচেয়ে অভিজাত পরিবারগুলোর নাম দেন এবং তাকে বলেন, তুমি শুধু পছন্দ কর। তুমি যার নাম বলবে, আমি তার সাথেই তোমার বিয়ে দিব।

রাবেয়া তার উত্তরে জানান, তিনি কোনো ব্যক্তিকে বিয়ে করতে পারবেন না। কারণ, তিনি ইতোমধ্যেই একজনের প্রেমে পড়ে গেছেন।

প্রেমে পড়েছ? কার? রাবেয়ার মালিক জানতে চাইলেন।

আল্লাহর প্রেমে। রাবেয়া উত্তর দিলেন। তারপর তিনি আল্লাহর প্রেমে তার লেখা কিছু কবিতা পাঠ করলেন। যা শুনে সেই মালিক সাথে সাথে তার সাগরেদে পরিণত হয় এবং আমৃত্যু সাগরেদ হিসেবেই থাকে। এরপর রাবেয়া বসরি ধ্যানের জগতে প্রবেশ করেন। এর ফলে তিনি এমন এক অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেন, যা তাকে নিয়মিত এমন সব কবিতা লেখার সামর্থ্য দেয়, যা শুনলে যে কেউ আল্লাহর প্রেমে পড়ে যেতে বাধ্য।

'হে আমার খোদা, এখন তিমির রাত, ঝিকিমিকি তারা জ্বলছে
নিস্তব্ধ চারিপাশ, সবাই এখন ঘুমুচ্ছে
যত রাজা বাদশা আছে সবার দরজা এখন বন্ধ
আর যারা আছে প্রেমিক-প্রেমিকা, তারাও নিজেদের মাঝে আবদ্ধ
শুধু আমি একা, এখানে পড়ে আছি, শুধু তোমার সাথেই আমি আছি।'

রাবেয়া বসরী এই ধরনের কতগুলো কবিতা লিখে গেছেন তা আমার জানা নেই। কিন্তু এটা জানা গেছে সেই সময়ের তার খ্যাতি ছিল সর্বত্র জুড়ে। অনেকেই তখন শুধু তাকে এক নজর দেখার জন্যই বসরা আসত। অনেকেই তাকে দেখে এটা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উপলব্ধি করেছিল যে এই নারী আল্লাহকে কাছে পাওয়ার কৌশল বের করে ফেলেছে। আর রাবেয়া বসরীর মতে, স্রষ্টার এই ভালোবাসা পেতে যুদ্ধ করতে হয় না, ভালোবাসতে হয় সব কিছু ছেড়ে, বেপরোয়াভাবে শুধু অসীম আর অনন্ত আল্লাহকেই ভালোবাসতে হয়।

এটা বলা সহজ। কিন্তু আসলে কীভাবে একজন মানুষ স্রষ্টার প্রেমে পড়ে? রাবেয়া বসরীর কৌশলটি বুঝার জন্য অনেকেই তখন তার সাধনা করেছে। কেউ কেউ হয়তো সামান্য কিছুটা গভীরে যেতে পেরেছে। তবে তাদের মতে, এটা এমন এক জগৎ যেখানে একটু প্রবেশ করলে আরও অনেকগুলো দরজা খুলে যায়। যারা সেই সময় রাবেয়া বসরীর সান্নিধ্যে থেকেছে, তাদেরকে আমি তার ছাত্র বলতে চাই না। কারণ, তাদের সেই সাধন প্রক্রিয়ায় কোনো বই ছিল না, কোনো বৃত্তি ছিল না, কোনো পড়াশোনাও ছিল না। রাবেয়া বসরী কখনো কাউকে পড়াননি। তিনি শুধু আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাতেন। আর তাই তার কাছে যেই আসত সেই কেমন করে যেন বদলে যেত। এটাই হলো সুফিবাদের যাদুর পরশ। সুফিবাদে আপনি এমন কিছু কৌশল পাবেন যা শুধু সাধক দরবেশের মধ্যেই থাকে। যা আবার তার সান্নিধ্যে থাকা মূরীদদের (সাগরেদ) মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

সেই সময় অবধি, অধিকাংশ মুসলিম সাধকেরাই সুফি হওয়ার প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতেন এবং নিজেদেরকে ইবাদত ও কুরআনের তেলাওয়াতের মধ্যেই ব্যস্ত রাখতেন। তাদের সব প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহকে কত বেশি ভয় করা যায়। রাবেয়া বসরী আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই তার আধ্যাত্মিক সাধনা পরিচালনা করতেন। একটা বিষয় এখানে বুঝা দরকার যে, এসব সাধকেরা প্রথমে ভালোমানের মুসলমান ছিলেন এবং পরে সুফি হয়েছেন। এই কথাটি এই জন্য বললাম কারণ আজকের দিনে অনেকেই নিজেকে সুফি বলে দাবি করেন, যারা নিজেদেরকে নাচে ও গানে ব্যস্ত রাখেন এবং অদ্ভুত ধরনের একটি ভাব নিয়ে চলেন। অথচ সেই আমলের সুফিরা নিছক কোনো আবেগে চলতেন না। তারা নিজেদেরকে কোনো উঁচু পদে নেয়ার জন্য এই পথে যাননি। তাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন শুরুই হতো ইসলামের পরিচিত সব ইবাদত আমল দিয়ে। এর সাথে নিরেট সাধনা যোগ করে আরও উন্নতমানে পৌছতে চেষ্টা করতেন।

সাধারণ মানুষও এই সুফিদের কাছে যেতেন উদ্দেশ্য নিয়েই। তারা এই সুফিদের সহায়তায় কোনো একটি মানে পৌছতে চাইতেন। কারণ, একজন সুফি সাধকের সান্নিধ্য পাওয়া মানে ভিন্ন কোনো কৌশল শেখা যাকে এই সুফিরা 'তরিকা' বা পদ্ধতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। যারা এই তরিকার ভেতরে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্রবেশ করতেন তারা আশা করতেন যে তারা এমন এক সুউচ্চ অবস্থানে পৌঁছাবেন যেখানে তারা আল্লাহর রাহে সব ধরনের অহংকার ও দাম্ভিকতাকে বিসর্জন দিতে পারবেন।

বিচারক এবং ইসলামের কট্টরপন্থী আলেমরা সুফিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না। তা ছাড়া এসব সাধকদের কেউ কেউ পরবর্তী সময়ে যেসব অদ্ভুত দাবি করতে শুরু করলেন তা একটু খামখেয়ালিপূর্ণ হতে শুরু করল। কারও কারও কথাবার্তা একটু বেশিই অতিরঞ্জিত হয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষদের মুখে মুখে বিভিন্ন সুফি সাধকের অনেক ধরনের সত্য মিথ্যা মিশ্রিত আলৌকিক ক্ষমতার গল্পগুলো ছড়িয়ে পড়ল। আর আলেম ও সুফিদের মধ্যেকার এই মুখোমুখি অবস্থান আরও বড় হয়ে ধরা পড়ল দশম শতাব্দীর শেষ দিকে, যখন আল হাল্লাজ নামে পারস্যে একজন সাধকের আবির্ভাব হলো।

হাল্লাজ শব্দের অর্থ হলো কাপড়ে তুলা ভরার যন্ত্র। এটা ছিল তার পিতার ব্যবসা। হাল্লাজ নিজেও বড় হয়ে পিতার এই ব্যবসাই শুরু করেন। কিন্তু তার মনে আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার তীব্র বাসনা ছিল আর তাই তিনি বাড়ি-ঘর ছেড়ে এমন একজন সুফি সাধকের সন্ধান লাভের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। যিনি কিনা তাকে সুফি দর্শনের গোপন কিছু কৌশল শেখাতে পারবেন। এ রকম একটা পর্যায়ে তিনি একসময় কাবার সামনে যান এবং সেখানে কোনো নড়াচড়া ছাড়া একটি বছর দাঁড়িয়ে থাকেন। (নোট দিতে হবে।) এই সময় তিনি কারও সাথে কোনো কথাও বলতেন না। একটা বছর, ভাবা যায়। কতটা গভীর মনোযোগ থাকলে এমনটা হওয়া সম্ভব। যাহোক, সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি ভারত ও মধ্য এশিয়া ভ্রমণে যান এবং সেখানে জনগণের সামনে অনেকগুলো কবিতা, হামদ গেয়ে এবং অসংখ্য ভাষণ প্রদান করেন। এক পর্যায়ে এই অঞ্চলগুলোতে তার অনেক ভক্ত শ্রোতাও তৈরি হয়।

কিন্তু একটা পর্যায়ে সুফিরা তার ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কারণ কোনো একটা পর্যায়ে হাল্লাজ এমনও দাবি করতে শুরু করেন যে, 'আমার যে পাগড়ি আল্লাহর বস্ত্র দিয়েই মোড়ানো রয়েছে। আমার পোশাকের ভেতরেও আল্লাহ ছাড়া আর কিছু নেই। আর আমি একমাত্র সত্য।' উল্লেখ্য, আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নামের মধ্যে একটি হলো তিনি সত্য। তাই হাল্লাজ এই সুরে কথা বলায় অনেকেই তার সুরে বুঝে যান যে, হাল্লাজ নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করছে।

এটা আসলে অতিরিক্ত ছিল। তাই আলেমরা তার বিরুদ্ধে শাস্তি দাবি করল। আব্বাসি খলিফাও আলেমদের প্রশমিত করতে চাইলেন। আর তাই তিনি দার্শনিকদের ওপর থেকে তার আশীর্বাদও প্রত্যাহার করে নিলেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এরপরই হাল্লাজকে কারাবন্দি করা হয়। ১১ বছর তিনি কারাগারে থাকেন। তবে হাল্লাজ নিজেকে এরই মধ্যে দুনিয়া থেকে এতটাই দূরে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি কোনো কিছুরই আর পরোয়া করতেন না। জেলের ভেতরে বসেও তিনি আল্লাহকে নিয়ে এলোমেলো সব কথা বলা অব্যহত রাখেন। নিজেকে তিনি কখনো কখনো যীশুখ্রিষ্ট হিসেবেও দাবি করতেন। আবার কখনো বলতেন যে তিনি একজন শহিদ। একটা বিষয় পরিষ্কার যে, তিনি কোনো কিছুকেই ব্যবহার করতে ছাড়েননি। তার এই অবস্থা দেখে কট্টরপন্থী আলেমরা এতটাই শঙ্কিত হয়ে পড়ল যে, তারা আর তাকে কোনো সুযোগ দিতে চাইল না। তারা রাষ্ট্রের শাসকদের ওপর চাপ দিল যাতে তারা এই হাল্লাজকে আর কোনো সুযোগ না দিয়ে দ্রুত হত্যা করে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ শুধু যে হাল্লাজকে হত্যা করেছিল তাই নয়। তারা তাকে ঝুলিয়ে রাখে, তার লাশ থেকে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে। শেষমেশ তার লাশটাও আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। এতে যে খুব কাজ হয়েছিল তা নয়। হাল্লাজ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে ঠিকই কিন্তু সুফিবাদের পতন হয় না। বরং দর্শন হিসেবে তা আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নানা ধরনের ক্যারিশমাটিক ক্ষমতা নিয়ে নানা ব্যক্তির আবির্ভাব অব্যাহত থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল অভিজাত সুফি, যেমন : জুনায়েদ। আবার কেউ কেউ ছিল আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ কিছু ক্ষমতার অধিকারী যেমন, রাবেয়া বসরী বা হাল্লাজ।

এক কথায় বলতে গেলে এগার শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে মুসলমানদের মধ্যে তিনটি পৃথক শ্রেণির অস্তিত্ব দেখা যায়। এদের মধ্যে একটি শ্রেণি ছিল বিদ্বান-ধর্ম তাত্ত্বিকদের শ্রেণি-যারা ইসলামিক মতাদর্শকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করত এবং আইন প্রণয়ন ও আইন ব্যাখ্যা করার কাজটিও করত। দ্বিতীয় শ্রেণিটি ছিল বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের- যারা প্রাকৃতিক জগতের নানা পদ্ধতি ও বিধিবিধান নিয়ে কাজ করতেন। আর তৃতীয় শ্রেণিটি ছিল সুফি সাধকদের- যারা আল্লাহর সাথে মানুষের যোগাযোগ তৈরি করার জন্য সাধনা করতেন। এই গ্রুপগুলোর একেকটির দায়িত্ব অন্যটির সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিল থাকলেও বাস্তবতা হলো তারা আসলে বিপরীত চিন্তাধারা লালন করতেন। আর কিছু কিছু সময়ে তাদের আদর্শিক অবস্থান এতটাই আলাদা ও বিপরীতমুখী হতো যে, সেই বিরোধীতার কারণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থাও দেখা দিত। এ রকমই এক সন্ধিক্ষণে খোরাসান প্রদেশে এক পারস্য পরিবারে একজন বুদ্ধিজীবীর জন্ম হয়, যিনি বিশ্ব ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তার নাম আবু হামিদ মুহাম্মাদ আল গাজ্জালি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

গাজ্জালির যখন ২০ বছর বয়স তখনই তিনি তার সময়ের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন সেই সময়ের অন্য যে কারও চেয়ে বেশি সংখ্যক হাদিস মুখস্থকারী ব্যক্তি। তৎকালীন সময়ের আলেমরা মুতাজিলিতেস নামক দার্শনিকদের মোকাবেলা করার জন্য একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এই আদর্শিক তত্ত্বকে 'আশারাইত' নামে অভিহিত করা হতো। এই ধারার মানুষেরা বিশ্বাস করতেন ইমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি নির্ভর করে শুধু ওহির ওপর, যুক্তির ওপরে নয়। যুক্তির কাজ হলো ওহির বার্তাকেই সংহত ও সহযোগিতা করা। আশারাইত বিশ্বাসীরা প্রায়ই মুতাজিলিতেস নামক দার্শনিকদের সাথে উন্মুক্ত বিতর্কে লিপ্ত হতেন। কিন্তু মুতাজিলিতেসরা অনেক গ্রিক কৌশল জানায় তারা সেই বিতর্কগুলোতে জিতে যেত। উল্টো অনেক ক্ষেত্রেই আশারাইতরা তাদের কথা বার্তা শুনে সংশয়ে পড়ে যেতেন।

সেই মুহূর্তে গাজ্জালি যেন আশারাইতের জন্য ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। দার্শনিকদের পরাজিত করার জন্য গাজ্জালি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনিও দার্শনিকদের দলে যোগ দিবেন এবং তাদের যুক্তি দিয়েই তাদেরকে পরাজিত করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি প্রচুর পরিমাণ প্রাচীন বই ও দার্শনিক মতবাদ পড়াশোনা করেন। যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং গ্রিক ইতিহাস ও দর্শনগুলো অধ্যয়ন করেন। তারপরে তিনি গ্রিক দর্শন নিয়ে একটি বই লিখেন যার নাম ছিল 'দ্য এইমস অব দ্য ফিলোসোফার্স' বা দার্শনিকদের উদ্দেশ্য। এটা ছিল মূলত এরিস্টটলকে নিয়ে। বইটির সূচনায় তিনি বলেন যে, গ্রিকরা ভুলের মধ্যে ডুবে আছে এবং তিনি তা প্রমাণ করবেন। কিন্তু তার আগে এই বইতে তিনি গ্রিক দর্শনকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করবেন যাতে বইটির পাঠকরা পরবর্তীকালে বুঝতে পারেন যে, তিনি গ্রিক দর্শনকে ভালোভাবে জেনে বুঝেই প্রত্যাখ্যান করার কাজে হাত দিয়েছেন।

গাজ্জালির স্বচ্ছ মন মানসিকতা ও খাস নিয়ত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি এরিস্টটল নিয়ে এতটাই বিস্তর পড়াশোনা করেছেন বা লিখেছেন কিংবা এরিস্টটলের ব্যাপারে তার জ্ঞান এতটাই গভীর ছিল যে অনেক এরিস্টটল ভক্তরাই তার বইগুলো পড়ে এরিস্টটলকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন।

গাজ্জালির লেখা এই বইটি আন্দালুসিয়ার সীমানা পার হয়ে খ্রিষ্টীয় ইউরোপে প্রবেশ করল। সেখানেও অসংখ্য মানুষ তার ভক্ত হয়ে গেলেন। অনেক দিন আগে রোম সাম্রাজ্যের পতন হওয়ার পর পশ্চিমা ইউরোপও পুরোনো গ্রিক দর্শনের ব্যাপারগুলো অনেকটাই ভুলে গিয়েছিল। তাই এদের মধ্যে অনেকেই এরিস্টটলকে প্রথমবারের মতো জানার সুযোগ পান গাজ্জালির এই বইটির মাধ্যমেই।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যদিও ইউরোপে গাজ্জালির বইয়ের যেই সংস্করণ যায় সেখানে তার লেখা ভূমিকাটি ছিল না। তাই খ্রিষ্টানরা জানতে পারেনি, আদ্যপান্ত বইটি এরিস্টটলের ওপর লেখা হলেও প্রকৃতপক্ষে লেখক নিজে প্রচণ্ড এরিস্টটল বিরোধী। অনেকে এমনও মনে করত যে, বইটি আসলে এরিস্টটল নিজেই লিখেছেন, পরে কোনো কারণে হয়তো তিনি লেখকের জায়গায় নিজের নাম না লিখে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। সে যাহোক, 'দ্য এইমস অব দ্য ফিলোসোফার্স' বইটি ইউরোপিয়ানদের এতটাই মোহিত করেছিল যে, তারা এরিস্টটলকে আবার সুউচ্চ অবস্থানে নিয়ে যান। আরও পরের দিকে, খ্রিষ্টীয় দার্শনিকরা এই বইটির থেকে তথ্য নিয়েই চার্চ দর্শন এবং এরিস্টটলিয়ান দর্শনের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা চালায়।

অন্যদিকে, গাজ্জালিও বসে থাকেননি। তিনি তার প্রথম বই 'দ্য এইমস অব দ্য ফিলোসোফার্স'-এর পরবর্তী বক্তব্য তুলে ধরেন তার দ্বিতীয় বইতে- যার নাম 'দ্য ইনকোহেরেন্স অব দ্য ফিলোসোফার্স' বা দার্শনিকদের অসঙ্গতি। এই বইটিতে গাজ্জালি গ্রিক দর্শনের ২০ টি মৌলিক কথাকে তুলে ধরেন যেগুলোর ওপর গ্রিক দর্শন এবং গ্রিসো-ইসলামিক দর্শন নির্ভর করেছিল। এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে এই ২০টি বক্তব্যকে খুব চমৎকারভাবে খন্ডন করেন। তার সবচেয়ে ভালো আলোচনা হয়েছে কজ এবং এফেক্ট নিয়ে। তিনি কোনো কিছুর কারণ ও প্রভাব নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা আসলে তাকে অনেক সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে গেছে। আমরা সাধারণভাবে মনে করি, কাপড়ে আগুন লাগার জন্য আগুনই দায়ী। কিন্তু গাজ্জালি বলেন, আল্লাহই কাপড়ে আগুন লাগিয়ে দেন। আল্লাহই সব কিছুর প্রথম এবং একমাত্র কারণ। আগুন হলো কেবল একটি উসিলা। গাজ্জালির মতো একই সুরে পরবর্তী সময়ে পশ্চিমেও অনেকেই কথা বলেছেন। অষ্টদশ শতাব্দীতে স্কটল্যান্ডের দার্শনিক ডেভিড হুমে এবং ১৯৭০ সালে আমেরিকান দার্শনিক জেন বুডিস্ট এলান ওয়াটস বস্তুর কারণ ও প্রভাব নিয়ে কাছাকাছি ধরনের চিন্তা প্রকাশ করেন।

বিষয়টাকে যেভাবেই দেখা হোক না কেন, এটাই বাস্তবতা যে, কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত এই যুক্তিগুলো সামনে চলে আসায় বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও চিন্তাধারাগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ, অনেকেই তখন ভাবেন, যদি আসলেই কোনো কিছুর কারণে কিছু না হয় তাহলে প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক এই জগতকে এতো অর্থবহ করে বিবেচনা করার কী মানে আছে? যদি আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর পেছনের মূল কারণ হয় তাহলে কোনো কিছুর সম্পর্কে ভালোমতো জানার একমাত্র উপায় হলো আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাকে জানা।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তার মানে একটা জিনিসই ভালোমতো জানা দরকার, সেটা হলো ওহি। আর ওহি ভালোভাবে বুঝতে মানুষকে শুধু একটি শ্রেণির লোকদেরই দারস্থ হতে হবে, আর সেটা হলো আলেম ওলামা। আর কারও কাছে কোনো কিছু জানার জন্য না গেলেও চলবে।

গাজ্জালি সব ধরনের গণিত, যুক্তি এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অনুমোদন করেছেন যেগুলো উপসংহারে সুন্দর ও সঠিক একটি ফলাফল ইঙ্গিত করে। কিন্তু যখনই কোনো যুক্তি ওহির সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছে, তখনই তিনি তাকে ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার মানে বিজ্ঞান তখনই সঠিক যখন তা ওহির মতো একই উপসংহারে পৌছায়। আর যদি তাই হয়, তাহলে আলাদা করে বিজ্ঞান জানারই বা কি দরকার? সত্য আমরা কেবল একটি জায়গা থেকেই পাবো, আর তা হলো ঐশ্বরিক ওহির বার্তা।

কিছু কিছু দার্শনিক অবশ্য গাজ্জালির এই চিন্তাধারাকে মানতে পারেননি। যেমন : বলা যায় ইবনে রুশদের কথা যিনি ইউরোপে এভেরস নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি গাজ্জালির সব যুক্তিকে খণ্ডন করে 'দ্য ইনকোহেরেন্স অব দ্য ইনকোহেরেন্স' নামে আরেকটি বই রচনা করেন। তবে তাতে খুব একটা কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যেকার লড়াইয়ে গাজ্জালি জয়লাভ করেন। আর এর পরপরই গ্রিক নির্ভর মুসলিম দর্শন গতি হারিয়ে ফেলে এবং মুসলমানরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

গাজ্জালি তার এসব কাজের জন্য প্রচণ্ড সম্মান লাভ করেন। তাকে বাগদাদের ঐতিহাসিক নিজামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবেও নিয়োগ দেয়া হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে মধ্যযুগীয় ইসলামিক বিশ্বের সুতিকাগার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কট্টরপন্থী মুসলমানরা তাকে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু এরপরও গাজ্জালির কিছু সংকটও দেখা দেয়। যদিও তিনি ধর্মীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান রাখতেন, তথাপি এতো মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির মাঝেও তিনি কি যেন একটা শূন্যতা অনুভব করতেন। তিনি ওহিতে সর্বাধিক বিশ্বাস করতেন। হাদিস মেনে চলতেন। শরিয়ার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অনুগত ও বিশ্বস্ত। কিন্তু তারপরও কেন যেন তিনি আল্লাহকে অনুভব করতে পারতেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই ধরনের মানসিক অভাববোধ থেকেই ইতঃপূর্বে সুফিবাদের জন্ম হয়েছিল। গাজ্জালিরও হঠাৎ করে আধ্যাত্মিকতার সংকট দেখা দেয়। একটা সময়ে গিয়ে হঠাৎ করেই তিনি সব ধরনের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন; তার সকল বন্ধু, পরিজন ও ভক্তদেরকে ফেলে রেখে নির্জনতায় চলে যান।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কয়েক মাস পর তিনি যখন ফিরে আসেন তখন তিনি ভিন্ন একজন মানুষ। তিনি ঘোষণা করেন আলেম ওলামারা সঠিক। তবে সুফি সাধকেরা আরও বেশি সঠিক। তিনি আরও বলেন, আইন আইনই এবং তা আপনাকে মেনে চলতে হবে। কিন্তু আপনি শুধু বই পড়ে আর ভালো ব্যবহার করে আল্লাহর সন্ধান পাবেন না। আল্লাহকে পেতে হলে আপনার অন্তরকে খুলে দিতে হবে এবং একমাত্র সুফিরাই জানে যে কীভাবে অন্তরকে স্রষ্টার রাহে উন্মুক্ত করে দিতে হয়।

এরপর গাজ্জালি দুটো বিখ্যাত বই লিখেন যার নাম ছিল 'দ্য অ্যালকেমি অব হ্যাপিনেস' এবং 'দ্য রিভাইবাল অব দ্য রিলিজিয়াস সাইন্স'। এই দুটি বইয়ে গাজ্জালি মূলত ইসলামের মৌলিক চেতনা এবং সুফিবাদের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, শরিয়াতকে সুফিবাদী তরিকার মধ্য দিয়েও পালন করা সম্ভব। তিনি ইসলামের মূল কাঠামোর ভেতরেই সুফিবাদ বা রহস্যময়তাকে ধারণ করার চেষ্টা করেন। এর মধ্য দিয়ে সুফি সাধকদের জন্য সম্মানজনক একটি অবস্থান নিশ্চিত করেন।

গাজ্জালির আগমনের পূর্বে তিনটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু গাজ্জালির কর্মকাণ্ডের পরে এর মধ্যে দুইটি ধারা (আলেম ও সুফি) সম্মান ও স্বীকৃতি পায় আর তৃতীয়টি (দার্শনিক শ্রেণি) ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

ব্যাপারটি এমন ছিল না যে, গাজ্জালি দার্শনিকদের তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করে আর সেই কারণেই তারা বিপদে পড়ে যায়। কিংবা এমনও বাস্তবতা ছিল না যে, গাজ্জালি দার্শনিকদের ভুল প্রমাণ করায় জনগণও তাদের বিপক্ষে চলে গিয়েছিল। খুব কমই এমন হয় যে, জনগণ প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে কোনো কিছু বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করে। তা ছাড়া দর্শনে এমন বিষয় খুব কমই আছে যাকে নিশ্চিত করে সঠিক বা ভুল বলা যায়।

বাস্তবতাটি এমন হয়ে গিয়েছিল যে, কিছু মানুষ দর্শন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চা থেকে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল। অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিল যে, যুক্তি খুবই মারাত্মক একটি বিষয় যা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই অনেকেই দর্শন ও যুক্তির কাঠামোকে প্রত্যাখ্যানও করে ফেলেছিল।

পরবর্তী কয়েক বছরে এই ধরণের দর্শনবিমুখী মানুষের সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছিল। দুটি ভিন্ন ধারার বিশ্বাস নিয়েও অনেক মানুষ থাকতে পারে। কিন্তু সমাজে যখন গন্ডগোল হয়, তখন মানুষ আসলে তাদের সুস্থ চিন্তাধারা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্রতি ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। কোনো মতবাদে একক ধরনের চিন্তা এবং ভিন্নমতের প্রতি ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। কোনো মতবাদে একক ধরনের চিন্তা ও চেতনা থাকলে সমাজে সংহতি প্রতিষ্ঠা হয়। আর এর বিপরীতে একই মতবাদ থেকে নানা ধরনের ভাবনার বিকাশ ঘটলে মানুষের মধ্যে বিভাজন ও বিভ্রান্তিও অনেক বেড়ে যায়।

আরেকটি বিষয় হলো, মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদাও বেশ পরিবর্তিত হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বরং নারীরা অনেক বেশি স্বাধীনতা ও সম্মান উপভোগ করেছে। যা আজকের দুনিয়াতে এমনকি মুসলিম দেশগুলোতেও দেখা যায় না। শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন প্রভাবশালী নারী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী। নবি মোহাম্মাদও ﷺ শুরুতে তার অধীনেই ব্যবসা করতেন। অন্যদিকে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সর্বকনিষ্ঠা স্ত্রী আয়েশা (রা.) নিজে হযরত উসমানের (রা.) শাহাদাতের পর বড় একটি সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। অথচ তার নেতৃত্ব দেখে কেউ অবাক হয়নি। ইসলামের প্রথম দিকগুলোর যুদ্ধে নারীরা সেবিকা হিসেবে, সহায়ক শক্তি হিসেবে এমনকি কখনো কখনো যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে উম্মে হাকিম নামে এক বিধবা বাইজেন্টাইন সেনাদের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে যুদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া আরও বেশ কিছু যুদ্ধের খবরও পাওয়া যায় যেখানে নারীরা সরাসরি অংশ নিয়েছে। কবিতা রচনা ও পাঠ করেছে এবং যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন।

এ ছাড়া ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, নারীরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বৈঠকগুলোতে অংশ নিয়েছে। খলিফা উমরের (রা.) সাথে জনৈক নারীর তর্কযুদ্ধের কথা আমরা জানি। অন্যদিকে, এও জানি যে, খলিফা উমর (রা.) একজন নারীকে মদিনার বাজার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া পরবর্তী যুগে নারীদের মধ্য থেকে মুসলিম বিদুষী হওয়ার সংখ্যাও কম নয়। হিজরতের প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই আমরা হাফসা, উম্মে আল দারদা, আমরা বিন আব্দুল রহমান প্রমুখ নারীদের কথা জানি যারা হাদিসের বিষয়ে অগাধ জ্ঞান রাখতেন। অনেক নারী ছিলেন যারা তাদের ক্যালিগ্রাফির জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তারা অন্যদেরকেও এসব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। নারী পুরুষ উভয়ই তাদের কাছে শিখার জন্য যেত। তারা জনসম্মুখে ভাষণও দিতেন।

এক কথায় নারীদেরকে জনজীবন থেকে কখনোই সরিয়ে রাখা হতো না। নারীদেরকে অন্দরমহলে রাখার বিষয়টা ছিল বাইজেন্টাইন বা সাসানিদ শাসনের ঐতিহ্য। ইসলামের নয়। কিন্তু সেই ঐতিহ্য থেকে মুসলমানরা ধীরে ধীরে সরে এল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উচ্চ সামর্থ্যবান আরব পরিবারগুলোতে নারীরা কিছুটা কাজের সুযোগ পেত, তবে সাধারণ নারীদের ঘরবহির্ভূত কাজের পরিমাণ চতুর্থ হিজরি থেকেই আশঙ্কাজনকভাবে কমতে শুরু করে। আব্বাসি আমলের শেষে এসে পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল হয়ে পড়ে। সেই সময়ে যারা যুক্তি ও বিজ্ঞানকে নৈতিকতা ও ধর্মের জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তারাই মূলত নারীদেরকে আবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন।

গাজ্জালি তার 'দ্য রিভাইভাল অব দ্য রিলিজিয়াস সাইন্স' বইতে বিয়ে, পারিবারিক জীবন এবং যৌন জীবনের সঠিক পদ্ধতি নিয়ে রেখাপাত করেছেন। সেখানে তিনি স্পষ্টত বলেছেন যে, নারীদের ঘরের ভেতরে নিভৃতে থাকা উচিত। তারা যখন তখন ঘরের বাইরে যাবে না। প্রতিবেশী বা অনন্যদের সাথে প্রয়োজন সাপেক্ষে সাক্ষাৎ করবে। নারীরা তার স্বামীর উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতে বাড়িঘর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। স্বামীর সুখেই সে সুখ খুঁজে পাবে এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাবে না। যদি সে স্বামীর অনুমতি নিয়ে বাইরে যায় তাহলে যথাযথভাবে পর্দা করেই যাবে। সতর্ক থাকবে যাতে বাইরের কোনো মানুষ তাকে দেখতে বা তার কণ্ঠ শুনতে না পারে। গাজ্জালি অবশ্য পুরুষদের কর্মকাঠামো নিয়েও আলোচনা করেছেন। তবে ওপরের বাক্যগুলোতে দেখা যাচ্ছে তিনি ঘর আর বাহিরকে দুটি আলাদা জগৎ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যেখানে নারীরা থাকবে মূলত ঘরমুখী আর বাইরের জগৎটি পুরোপুরি থাকবে পুরুষের কব্জায়।

নতুন কোনো পরিবর্তনের ব্যাপারে অযাচিত আশঙ্কা এবং স্থিতিশীলতার জন্য আকাঙ্ক্ষা সমাজে ঐতিহ্যবাহী উপাদানগুলোকে অক্ষুণ্ণ রাখে। তৎকালীন মুসলিম সমাজও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সেই সমাজে শুধু যে প্রাচীন আরব সমাজের নানা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল তা নয় বরং বাইজেন্টাইন ও সাসানিদদেরও অনেক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন ছিল। গাজ্জালির চিন্তাভাবনা শুধু সেই সময় নয় বরং পরবর্তী আরও এক শতাব্দী ধরেই বিদ্যমান ছিল। কারণ, এই সময়টাতেই আসলে সমাজে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নানা ধরনের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতাও মানুষের সামনে আসে যা মূলত পরবর্তী সময়ের বিরাট বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক সংকটের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

৮. তুর্কিদের আবির্ভাব ও উত্থান
(১২০-৪৮৭ হিজরি) ৭৩৭-১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

সব ধরনের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার কখন বেড়ে যায়? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে রাজনৈতিক সেইসব ঘটনাবলির পরিণতির মধ্য দিয়েই, যা বিগত কয়েক শতাব্দীতে ঘটেছিল। একই সময়ে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনও বিকশিত হয়েছিল যেগুলো আমি পূর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছি। রাসূল ﷺ-এর জমানা থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রথম দুই শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ আব্বাসি আমলের শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের এমনটা ভাবার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ ছিল যে, তারাই সভ্যতার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। সেই সময়ে ইউরোপিয়ান সংস্কৃতি থাকলেও তা ছিল অনেকটা না থাকার মতোই। অন্যদিকে, ভারতবর্ষ তখন অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এরই মধ্যে আবার বৌদ্ধ দর্শনও চীনে প্রবেশ করে ফেলেছিল। আর ইতিহাস থেকে জানা যায় চীনে সেই সময় তাং এবং সাং রাজবংশের নেতৃত্বে একটি বৈপ্লবিক উত্থান ঘটেছিল আর সেই উত্থানটি হয়েছিল মধ্য পৃথিবীতে মুসলমানদের উত্থান ও বিকাশের মতো অনেকটা একই সময়েই। তবে মেসোপোটামিয়া বা মিসরে ইসলামি জোয়ারের যে ধাক্কা লেগেছিল তা অবশ্য চীনে পৌঁছায়নি। কারণ, ভৌগোলিকভাবেই চীন এই অঞ্চলগুলো থেকে বেশ দূরে অবস্থান করছিল।

যদি মুসলমান রাজত্বটি সেই সময়ে বিশ্বকেন্দ্রের অভ্যন্তরে অবস্থান করছিল বলেই ধরে নেয়া হয় তাহলে বিশ্ব ইতিহাসের সকল কার্যকর ব্যাপারগুলো মুসলিম সম্প্রদায়গুলোকে প্রভাবিত করবে- সেটাই স্বাভাবিক ছিল। সেই সময়ে যে ইস্যুগুলো বেশি আলোচিত ছিল যেমন শিয়া এবং মূল ধারার মধ্যেকার বিবাদ, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যেকার বিতর্ক কিংবা পারস্য ও আরবদের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব- সবগুলোকেই এই কাঠামোর আওতায় নিয়েই বিবেচনা করতে হবে। যারা একটু আশাবাদী মানসিকতার, তারা মনে করে যে ইতিহাসের গতি প্রকৃতিগুলো খুবই স্বাভাবিকভাবেই সংগঠিত হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

একথা ঠিক যে, ঐশ্বরিক যে আশীর্বাদ মক্কা আর মদিনার উপরে এসেছিল তার প্রভাব তখনো বিদ্যমান ছিল। ইসলাম সেই শক্তির জোরে ক্রমশ আরও শক্তিশালী ও দৃঢ় অবস্থানে পৌছে যাচ্ছিল। অন্যদিকে, ভারতে হিন্দুদের অবস্থান ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এমনকি আফ্রিকার একটি বড় অংশও চলে এসেছিল ইসলামের ছায়াতলে। কেবল ইউরোপ আর চীনা অঞ্চল ছিল ইসলামিক সাম্রাজ্যের পরিসীমার বাইরে। অবস্থাদৃষ্টে এমন মনে হচ্ছিল যে, এই দুটি অঞ্চলেও ইসলামের প্রবেশ ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কিন্তু বিশ্বজনীন এই সম্প্রদায়- যা কিনা মানবতার কল্যাণ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্রত ছিল, তা এক সময় তার মূলনীতি থেকে সরে আসতে শুরু করে; একই সঙ্গে তার গৌরবোজ্জ্বল যাত্রাপথ থেকেও যেন পিছলে পড়ে যায়। যখন ইসলাম তার ক্ষমতা ও সম্মানের চূড়ান্ত শিখরে ছিল তখনই তার খেলাফতের ভেতরে ফাটল ধরে। ইতিহাসবিদরা অবশ্য মনে করেন যে খেলাফতের ফাটলটি দেখা দেয় সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছানোর আগেই। এটা আসলে তখনই শুরু হয় যখন আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আরোহণ করে।

সেই জটিল পরিস্থিতিতে আব্বাসীয়দের নতুন খলিফা উমাইয়া বংশের জীবিত সব উত্তরাধিকারীকে একটি অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে কৌশলে হত্যা করে। তবে এত প্রচেষ্টার পরও একজন উমাইয়া উত্তরাধিকারী কীভাবে যেন বেঁচে যায়। তার নাম ছিল আব্দুর রহমান। তিনি সেই অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রথমে দামেস্কে যান এবং পরে উত্তর আফ্রিকার দিকে পালিয়ে যান। তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তার যাত্রা অব্যাহত রাখেন যতক্ষণ না তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের একেবারে শেষ প্রান্তসীমায় না পৌছান। শেষ পর্যন্ত তিনি আন্দালুসিয়ান স্পেনে গিয়ে তারপর সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

স্পেনের স্থানীয় অধিবাসীরা আব্দুর রহমানকে পেয়ে খুশি হয়। খারিজিদের খুব ছোট একটা দল তখনো সেখানে কোনোরকমে টিকে ছিল; তারাও এসে আব্দুর রহমানের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে। স্পেন ভৌগোলিকভাবে মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিল, তাই তারা বাগদাদ কেন্দ্রীক আব্বাসীয়দের শাসন দখল সম্পর্কে কিছুই জানত না। তারা তখনো উমাইয়াদেরকেই তাদের শাসক হিসেবে মেনে চলত। আর তাই সেই উমাইয়াদের একজন প্রতিনিধিকে নিজেদের মাঝে পেয়ে তারা স্বস্তি অনুভব করল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আব্দুর রহমান আন্দালুসিয়ার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পেলেন এবং লোকেরা সানন্দে তাকে মেনেও নিল। ফলে আন্দালুসিয়া নামক অঞ্চলটি বাগদাদ ভিত্তিক আব্বাসি খেলাফতের মূল পরিধির বাইরে স্বাধীন একটি রাজ্য হিসেবে পরিচালিত হতে শুরু করল। তখন এভাবেই মুসলিম শাসনের কেন্দ্রবিন্দু তৈরি হয়ে গেল দুইটি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্রথমদিকে এই বিভাজনটি কেবল রাজনৈতিক বিভাজনই ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন আব্বাসীয়রা দুর্বল হতে শুরু করল তখন আন্দালুসিয়া থেকে ভিন্ন আওয়াজ উঠে এল। তারা শুধু নিজেদেরকে আব্বাসীয়দের খেলাফতের বাইরে থাকার ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখল না বরং তারা দাবি করল যে তারাই সত্যিকারের খেলাফতের হকদার। আশেপাশের বেশ বড় একটি অংশের মানুষ সেই উমাইয়াদের দাবিতে সাড়াও দিল। এভাবেই খেলাফতের মধ্যে ফাটলটি শেষ পর্যন্ত বিশাল দুটি বিভাজন সৃষ্টি করে।

উমাইয়াদের এ রকম দাবির পেছনে বাস্তবিক অর্থে কিছু যৌক্তিকতাও ছিল। আন্দালুসিয়ার রাজধানী কর্ডোভা ছিল মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে বহু দূরে, ইউরোপের ভেতরে। শহরটি খুবই বিশাল ও জমকালো ছিল। সেই সময়েই আন্দালুসিয়ায় পাঁচ লাখের বেশি লোক বসবাস করত। শহরে ছিল অসংখ্য সরাইখানা, হাসপাতাল, স্কুল, মসজিদ এবং অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান। কর্ডোভার বড় লাইব্রেরিটিতে পাঁচ লাখেরও বেশি বই ছিল। স্পেনে কর্ডোভা ছাড়াও আরও অনেকগুলো বড় শহর ছিল।

তৎকালীন কোনো শহরের অধিবাসী ৫০ হাজারের বেশি হলেই তাকে বড় শহর হিসেবে গণ্য করা হতো। কারণ, তৎকালীন অধিকাংশ ইউরোপিয়ান শহরে ২৫ হাজারের বেশি লোক পাওয়া যেত না। এমনকি রোম একটা সময় অনেক বড় শহর হিসেবে পরিচিত থাকলেও কালের বিবর্তনে তা তখন একটি গ্রামের আকারে পৌছে ছিল। শুধু কিছু কৃষক আর কিছু জোতদারই সেখানে তখন অবস্থান করছিল।

প্রাথমিকভাবে ইসলামের এই রাজনৈতিক বিভাজন তার সভ্যতার বিকাশে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি। তাই আন্দালুসিয়া থেকে তখনও আগের মতোই বিশ্বের অন্যান্য দেশে ও সাম্রাজ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল। আন্দালুসিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগর হয়ে মধ্য পৃথিবীতে (মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি সাম্রাজ্যে) নিয়মিতভাবে কাঠ, খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য পণ্য রপ্তানি করা হতো। অন্যদিকে, এসব অঞ্চল থেকে আন্দালুসিয়া নানা ধরনের বিলাসী হস্তশিল্প, সিরামিক, আসবাবপত্র, দামি কাপড়-চোপড় এবং মসলা আমদানি করত।

প্রকারান্তরে উত্তর ও পূর্বদিকের খ্রিষ্টান দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের অবস্থা তেমন একটা ভালো ছিল না। এটা এই জন্য নয় যে, তাদের মধ্যে অনেক শত্রুতা ছিল। বরং এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা না জমার মূল কারণ ছিল ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টানদের কাছে বেচার মতো সেই অর্থে তেমন কোনো ব্যতিক্রমধর্মী পণ্য ছিল না। আবার ইউরোপিয়ানদের কাছেও পণ্য কেনার মতো টাকাও ছিল না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সেই সময়ের আন্দালুসিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যাই ছিল বেশি তবে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদেরও আবাস ছিল সেখানে। উমাইয়াদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আন্দালুসিয়ার সাথে হয়তো বাগদাদ কেন্দ্রিক আব্বাসীয়দের সাথে অনেক কিছুই মিলত না। তথাপি প্রকৃত সত্য এটাই মুসলমান সাম্রাজ্যের বাকি অংশে যেসব নিয়ম মানা হতো, আন্দালুসিয়ার শাসকেরাও একই ধরনের নীতিমালা অনুসরণ করতেন। আন্দালুসিয়ায় বসবাসরত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নিজস্ব ধর্মীয় নেতা ও বিচারিক ব্যবস্থা ছিল এবং তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মচর্চা করতে পারতেন। যদি এই ইহুদি বা খ্রিষ্টানেরা কখনো কোনো মুসলমানের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়তেন তাহলে, মুসলিম আইন অনুসারে মুসলিম আদালতে তার বিচার হতো। আর যদি তারা নিজস্ব গোত্রের কারও সাথে বিবাদে জড়াতেন তাহলে তাদের নিজ ধর্মীয় বিচারকদের দ্বারাই ধর্মানুযায়ী যাবতীয় বিচার সম্পন্ন হতো।

অমুসলিমদেরকে জিজিয়া কর দিতে হলেও তাদেরকে যাকাত বা দাতব্য কোনো দান করতে হতো না। তারা সামরিক বাহিনী এবং শীর্ষ রাজনৈতিক পদগুলোতে কাজ করার সুযোগ পেত না। এর বাইরে অন্য সকল কাজ বা চাকরি করার অবাধ স্বাধীনতা তাদের ছিল। মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিষ্টানেরা সবাই একই সাথে সম্প্রীতির মধ্য দিয়েই বসবাস করত। যদিও সবাই অনুধাবন করত যে, মুসলমানদের হাতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে। অবস্থাটি সে সময় এমন ছিল যে, সবাই কম বেশি মানতো যে অন্য সব ধর্মের চেয়ে ইসলাম অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর এবং মুসলিম সভ্যতাই সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও উৎকৃষ্ট। যেমন আজকের সময়ে তৃতীয় বিশ্বের সবাই মনে করে যে মার্কিন ও ইউরোপিয়ান সভ্যতা অনেক এগিয়ে- তখনকার সময়ে ইসলামিক সভ্যতার বিষয়ে ঠিক একই ধরনের ধারণা প্রচলিত ছিল।

সেই সময়ে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকেরা কতটা সৌহার্দপূর্ণ অবস্থায় ছিল তা আরও জানা যায়, রাজা সানচোর জীবনী থেকে। দশম শতাব্দীর শেষে সানচো, উত্তরাধিকারী হিসেবে স্পেনের উত্তর দিকে অবস্থিত লিওন নামক একটি খ্রিষ্টান রাজ্যের রাজা নিযুক্ত হন। সানচোর অধীনস্তরা তাকে আড়ালে মোটা সানচো বলে ডাকত। একটা রাজার জন্য এই ধরনের সম্বোধন বা উপাধি মোটেও সুখকর ছিল না। সানচোকে তার শারীরিক স্থূলতার জন্য গালিগালাজ করা হলেও তার কীর্তিমান কর্মকে সেইভাবে প্রচার করা হয়নি। যেহেতু অধীনস্তদের অনেকেই সানচোকে তার দীর্ঘকায় শরীরকে তার জন্য দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করত। সেই কারণে তারা তাকে রাজ্য পরিচালনার অযোগ্য হিসেবে অভিহিত করে বরখাস্ত করে দেয়।

সানচো তার সেই কঠিন সময়ে হিসদাই ইবনে সাপরুত নামক একজন ইহুদি চিকিৎসকের সন্ধান পায়। যে কিনা চিকিৎসা করে মোটা শরীরকে চিকন

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বানিয়ে দিতে পারে। হিসদাই কর্ডোভার মুসলিম শাসকের অধীনে চাকরি করতেন। সানচো এই খবর পেয়ে তার মাকে নিয়ে দক্ষিণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং সেখানে গিয়ে চিকিৎসা নেয়। তৎকালীন মুসলিম শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমান সানচোকে রাজকীয় অতিথি হিসেবে অভ্যর্থনা জানান এবং তার চিকিৎসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে রাজপ্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা করেন। সুস্থ হয়ে সানচো লিয়নে ফিরে এসে তার রাজদায়িত্ব পুনরায় ফিরে পায় এবং আব্দুর রহমানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

একজন খ্রিষ্টান শাসক, মুসলমান শাসকের দরবারে থাকা একজন ইহুদি চিকিৎসকের সেবা পেয়ে ভালো হয়ে যাওয়ার এই ঘটনাটি উপলব্ধি করলেই বুঝা যায় সেই সময়ের মুসলিম স্পেন কতটা মানবিক ছিল। আজও যখন ইউরোপিয়ানরা মুসলমানদের সোনালি যুগের কথা বলে, তারা এই স্পেনের খেলাফতের দিকেই বেশি ইঙ্গিত করে। কারণ, মুসলিম খেলাফতের আওতায় থাকা এই অঞ্চলের কথাই ইউরোপিয়ানদের জন্য জানা সবচেয়ে সহজ ছিল।

তবে কর্ডোভাই একমাত্র শহর ছিল না যা কিনা, আব্বাসি রাজধানী বাগদাদকে চ্যালেঞ্জ করে টিকেছিল। দশম শতাব্দীতে আরও কয়েকটি শহর বাগদাদের জন্য হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

যখন আব্বাসীয়রা নিজেদেরকে সুন্নি হিসেবে অভিহিত করে খেলাফত পরিচালনা শুরু করে, তখন তারা শিয়া মতাদর্শ অবলম্বনকারীদেরকে বিদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা দেয়। ৩৪৭ হিজরিতে (৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে) তিউনিশিয়ার শিয়া যোদ্ধারা মিসরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং তারা নিজেদেরকে সত্যিকারের খেলাফতের দাবিদার হিসেবে দাবি করে। কারণ, তারা মনে করে যে, তারাই নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মেয়ে হযরত ফাতিমার (রা.) বংশধর। এই যুক্তিতে তারা নিজেদেরকে ফাতিমাইদ নামে পরিচয় দিতে শুরু করে। তারা তাদের রাজত্বের রাজধানীর নাম দেয় কাহিরা। কাহিরা আরবি শব্দ, যার অর্থ বিজয়। এই কাহিরাকেই আজকের সময়ে আমরা কায়রো হিসেবে চিনি।

মিসরের এই শাসকদের হাতে বড় কিছু সম্পদ ছিল। উত্তর আফ্রিকার বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নীল নদ ও নীলনদ তীরবর্তী উর্বর এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই এলাকাটি ছিল আসলে ভূমধ্যসাগরীয় গোটা বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু। লোহিত সাগর থেকে ইয়েমেন এবং আরেক প্রান্তে ভারতীয় মহাসাগর পর্যন্ত যে ব্যবসা বাণিজ্য সেই সময়ে পরিচালিত হতো, তার মূল পয়েন্ট ছিল এই কায়রোতেই। ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে গিয়ে এই এলাকাটি কর্ডোভা ও বাগদাদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে ছাড়িয়ে যায়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কায়রোতেই ফাতিমাইদরা বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। আল আজহার আজও তার শক্তিশালী অবস্থান ও মর্যাদা নিয়েই টিকে রয়েছে। অন্য দুটি খেলাফতের অধীনে যেমন বড় বড় শহর, ব্যস্ত বাজার, সহনশীল নীতিমালা এবং অসংখ্য সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ হচ্ছিল। ঠিক তেমনি এই ফাতিমাইদের খেলাফতেও এই ধরনের কার্যক্রম একইভাবে চলছিল। ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো বিশ্বজনীন সম্প্রদায় মুসলমানের আরেকটা নতুন ক্ষেত্র হলো মিসর। এক কথায় বলতে গেলে সহস্রাব্দের গোড়াতে এসে মুসলিম খেলাফতটি বড় তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

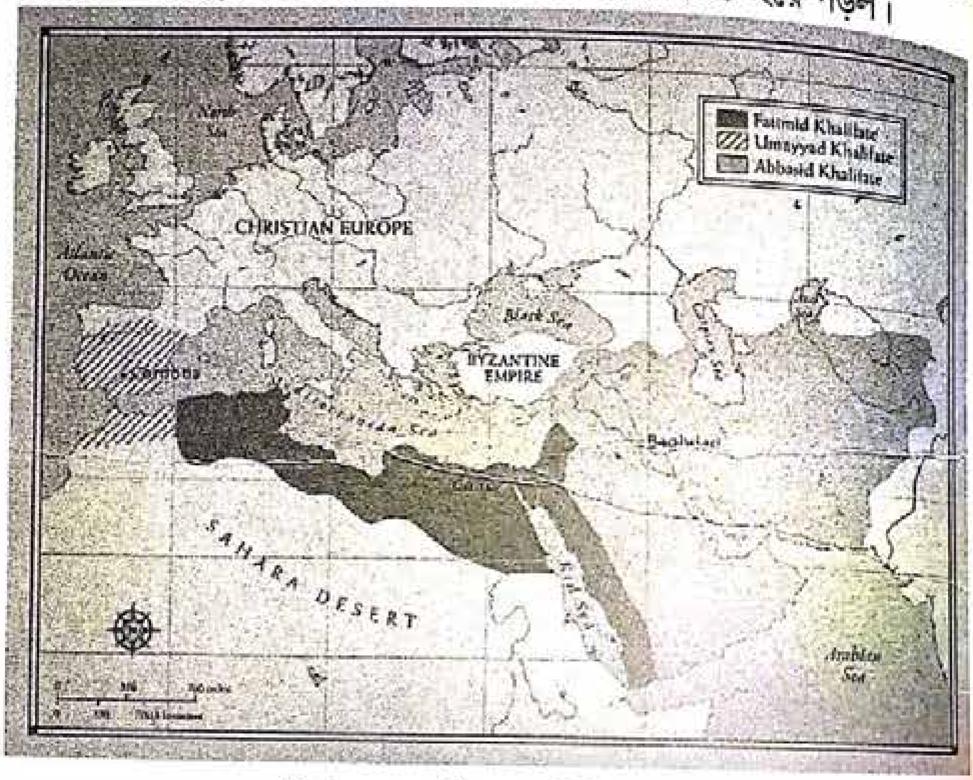

উমাইয়া, আব্বাসী এবং ফাতিমী খেলাফত

প্রতিটি খেলাফতই নিজেদেরকে একমাত্র সঠিক ও গ্রহণযোগ্য খেলাফত হিসেবে দাবি করছিল। কিন্তু যেহেতু তত দিনে খলিফারা তাদের মূল চেতনা হারিয়ে অনেকটা ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনায় প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল, তাই নামে খেলাফত হলেও প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি খেলাফত পৃথক তিনটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চেহারা নিয়েই টিকে ছিল।

প্রথমদিকে আব্বাসীয়দের হাতেই সবচেয়ে বেশি ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাদের হাতেই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাজধানী। কিন্তু একসময়ে এসে এই বৃহৎ ভূখণ্ডের মালিক হওয়াটাই তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীন রোমও একই ধরনের সংকটে পড়েছিল। কারণ, রোম এতটাই বড় সাম্রাজ্য ছিল

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যেকোনো একটি জায়গা থেকে একজন প্রশাসকের দ্বারা সেই বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। আব্বাসি খেলাফতেরও একই অবস্থা হলো। আর সেই সীমাবদ্ধতাকে কেন্দ্র করে এমন একটি বিশাল আমলা শ্রেণির জন্ম হলো, যারা খলিফাকে শক্ত আইনের মোড়কের ভেতরে নিয়ে গেল। খলিফা তার রাষ্ট্রযন্ত্র আর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার ভিড়ে এমনভাবে হারিয়ে গেলেন যে, জনগণের কাছ থেকে তিনি সম্পূর্ণ আড়ালেই চলে গেলেন।

রোমান সম্রাটদের মতো তখন আব্বাসি খলিফারাও দেহরক্ষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। এই দেহরক্ষীরাই শেষ পর্যন্ত এমন একটা বিরাট লেজের আকার ধারণ করে যে, পরবর্তীকালে তারাই তাকে পরিচালনা করতে শুরু করে। অনেকটা লেজ কুকুরকে নাড়ানোর মতো অবস্থা আর কি। রোমান রাজাদের সেই দেহরক্ষীদেরকে বলা হতো প্রিটোরিয়ান গার্ড। এদের বেশিরভাগই ছিল জার্মান গোত্রের। রোমান রাজ্যের উত্তর সীমান্তের বর্বর জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে থেকেই এদেরকে নিয়োগ দেয়া হতো। যদিও ইতিহাসের অদ্ভুত সত্য হলো, এই বর্বরদের বিরুদ্ধেই রোমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যুদ্ধ করে আসছিল। একটা সময় পর তারাই রোমান সভ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

আব্বাসি খেলাফতেও ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। এখানে রাজার দেহরক্ষী বাহিনীকে বলা হতো মামলুক, যার মানে ক্রীতদাস। তবে এরা সাধারণ ক্রীতদাস নয়, একটু অভিজাত ধরনের ক্রীতদাস। আব্বাসীয়রাও উত্তরের সীমান্তের বর্বর জাতিগোষ্ঠী থেকে এই দেহরক্ষী দলটি গঠন করে। রোমানদের বেলায় দেহরক্ষীরা ছিল জার্মানির আর আব্বাসীয়দের বেলায় দেহরক্ষীরা হলো তুর্কি বংশোদ্ভূত। তবে আজ যে স্থানটিকে আমরা তুরস্ক বলি, সেখানে তখন এই তুর্কিরা থাকত না। আজকের তুরস্কে এরা অভিবাসী হয়ে গিয়েছে। তুর্কিদের আসল আবাস ছিল মধ্য এশিয়ায়, ইরান ও আফগানিস্তানের উত্তরে। রোমানরা যেমন জার্মান ক্রীতদাস কিনত। আব্বাসীয়রাও ঠিক তেমনি সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন দাস- বাজার থেকে এসব তুর্কি ক্রীতদাসদেরকে কিনত। পরবর্তী সময়ে তাদেরকে দেহরক্ষী হিসেবে ব্যবহার করত। খলিফারা এদেরকে দেহরক্ষী হিসেবে বেশি পছন্দ করত কারণ, তারা আরব ও পারস্য- এমন কোনো জাতিগোষ্ঠীর লোককেই বিশ্বাস করতে পারত না। কারণ, এসব আরব বা পারস্য লোকদের শিকড় অনেক গভীরে হতো। তাদের অনেক আত্মীয়স্বজন থাকত এবং যে কারণে তাদের লোভে পড়ে বা স্বার্থের কারণে অনেক কিছু করারও সম্ভাবনা ছিল। এতে খলিফারা বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকত। খলিফারা এমন লোকদেরকে দেহরক্ষী হিসেবে পছন্দ করতেন, যাদের খলিফা ছাড়া আর কারো সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না। রাজদরবার ছাড়া আর কোনো বাড়ি থাকবে না। এমনকি তাদের মনিব ছাড়া আর কেউ থাকবে না, যার আনুগত্য করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এসব ক্রীতদাসদেরকে একেবারে বাচ্চা অবস্থায় নিয়ে আসা হতো। পরবর্তী সময়ে তাদেরকে মুসলমান হিসেবে বিশেষ স্কুলে পড়াশোনা করানো হতো। যেখানে তাদেরকে বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি মার্শাল আর্টও শেখানো হতো। বড় হয়ে যখন তারা অভিজাত দেহরক্ষী বাহিনীতে যোগদান করত তখন তাদেরকে খলিফার প্রতিনিধি হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। বাস্তবতাও এমনই ছিল। তখন সাধারণ মানুষ খলিফাদেরকে স্বচোখে দেখার সুযোগ তেমন একটা পেত না। আর সেই সুযোগে এসব তুর্কি দেহরক্ষীরাই সেই জনগণের কাছে হয়ে উঠলেন খলিফার অবয়বের মতো, যেন তারাই খলিফার প্রতিনিধি।

নিঃসন্দেহে তারা ছিল রাগী, সহিংস এবং হিংস্র- এ রকমই তাদেরকে বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। খলিফাকে নিরাপত্তা দিতে গিয়ে তারা খলিফাকে সাধারণ জনগণের থেকে অনেকটাই দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তাদের অন্যায় কার্যক্রমের কারণে খলিফারা আরও বেশি অজনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ফলে খলিফার নিরাপত্তাহীনতাও বেড়ে যায়। যার কারণে খলিফাদের আরও বেশি দেহরক্ষী দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই অবস্থায় মামলুক দেহরক্ষীদের আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য খলিফা সামারা নামের পৃথক শহর তৈরি করেন। খলিফা নিজেও সেই শহরে প্রাসাদ নির্মাণ করে তারপর থাকতে শুরু করেন।

এরই মধ্যে, বুয়িদ নামের একটি পারস্য গোত্রের লোকেরাও খলিফার দরবারে উপদেষ্টা, কেরানি এবং সহকারী হিসেবে যোগ দেয়। তারা ক্রমশ গোটা আমলাতন্ত্র এবং প্রশাসনের প্রাত্যহিক কাজের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বুয়িদরাও খলিফাদের অনুকরণে তুর্কি ক্রীতদাসদেরকে বাগদাদে আমদানি করতে শুরু করে এবং আবাসিক স্থাপনায় এদেরকে লালন পালন করতে শুরু করে। এই ক্রীতদাসদের উপর তাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ছিল বিধায়, কালক্রমে এদেরকে নিজেদের দেহরক্ষী হিসেবে কাজে লাগাতে শুরু করে। বুয়িদরা এমন পর্যায়ে চলে যাওয়ার পরও এসব কাজের বিরোধিতা করার মতো তেমন কেউ ছিল না। বুয়িদরা তুর্কি ক্রীতদাসদেরকে এমন বয়সে নিয়ে আসত, যখনও পর্যন্ত তাদের কোনো পারিবারিক স্মৃতি থাকে না। তাদের পরিবার, মা, বাবা কাউকেই তারা চিনতে পারে না।। তাদের স্মৃতির মানসপটে কেবল থাকে তাদের সামরিক স্কুল এবং ক্যাম্প, যেখানে তারা বড় হয়েছে। আর ক্যাম্পের পরিচালকের প্রতি কেবল তারা অনুগত থাকতে শিখেছিল। বুয়িদরা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মোড়কে নতুন এক রাজতন্ত্র চালু করে। তারা খলিফার পদটিতে হাত দেয় না। বরং খলিফাকে তার স্বপদে রেখে তারা খলিফার নাম ব্যবহার করে প্রয়োজনমতো আইন চালু করে। সিংহাসনে না গিয়েও সর্বোচ্চ পরিমাণ সুযোগ সুবিধা ও আরাম আয়েশ উপভোগ করে। এভাবেই একটা পর্যায়ে পারসিয়ানরাও আরব খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যায়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এসব পারসিয়ান প্রশাসকরা অবশ্য খেলাফতের অন্য এলাকাগুলোর শাসনকাজে হাত দিতনা। তাদের সেটা নিয়ে কোনো মাথাব্যথাও ছিল না। দূরের প্রদেশগুলোকে তারা ছেড়ে দিত, সেখানে যার প্রভাব বেশি তারাই সেখানে শাসন করার সুযোগ পেত। এভাবে গভর্নরেরা একসময় ছোট ছোট রাজ্যের রাজায় পরিণত হলেন। আর পারস্যের এই ছোট রাজতন্ত্রটি পুরোনো সাসানিদ রাজ্যের কাঠামোতে আবারও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো।

অনেকের কাছেই মনে হতে পারে যে, ক্রীতদাসদেরকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকানোর মতো নির্বুদ্ধিতা কে করবে। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি রাজাই এক কাজটি করেছেন। পারস্য প্রশাসকরাও তুর্কি মামলুকদেরকে একইভাবে ব্যবহার করেছে। ফলে একটা সময়ে তারাও পারস্য রাজাদেরকে দিব্যি নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। বিষয়টা শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তুর্কিদের প্রভাব ও আক্রমণ যখন শুরু হয় তখন গোটা সাম্রাজ্য জুড়েই অস্থিরতা তৈরি হয়। সীমান্তগুলোতে তুর্কিদের প্রবেশ ঠেকানোর জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। তত দিনে তুর্কিরা খেলাফতের বাইরে ও ভিতরে এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, তাদেরকে আর দমন করা সম্ভব হচ্ছিলো না। অন্যদিকে, ছোট ছোট রাজ্যগুলো, যেখানে গভর্নররাই রাজা হয়ে উঠেছিলেন সেখানেও মামলুক তুর্কিরা তাদের মনিবদেরকে হত্যা করে নিজেরাই নতুন রাজতন্ত্র চালু করে।

ঠিক একই সময়ে সাম্রাজ্য ভেঙে পড়া এবং সমাজে দুর্বল ঐক্যের সুযোগ নিয়ে তুর্কিরা উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে বিপুলভাবে প্রবেশ করতে থাকে। তুর্কিরা ছিল ভালো যোদ্ধা। নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করায় তাদের আবেগও ছিল প্রবল। তারা একেকটি শহরে ঢুকে আক্রমণ চালায় এবং সব তছনছ করে দেয়। ফলে রাজপথ ও মহাসড়কগুলো অরক্ষিত হয়ে পড়ে। ব্যবসা বাণিজ্য স্তিমিত হয়ে পড়ে, দরিদ্রতা বেড়ে যায়। তুর্কি মামলুকরা যে কয়টি জায়গায় সংঘাতে জড়িয়েছিল তাও ছিল তুর্কি যাযাবরদের সাথেই। অর্থাৎ যেভাবেই হোক না কেন, সময়টা তখন এমন ছিল যে চারিদিকে শুধু তুর্কি আর তুর্কি।

এরই মাঝে এক টুকরো আলো হয়ে পারসিয়ান একটি রাজতন্ত্র টিকে ছিল যার নাম সামানিদ। তারা অক্সাস নদীর তীরে বসবাস করত। বর্তমানে এটি আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্তে পড়েছে। এই এলাকায় সেই সময় বালখ এবং বোখারা নামে দুটি বিশাল শহর গড়ে ওঠেছিল। এখানেই পারসিয়ান সাহিত্য নতুন করে আবার প্রাণ ফিরে পায়। আর সেই শক্তি দিয়েই পারসিয়ান ভাষা তখনো আরবির সাথে অস্তিত্বের লড়াই করে যাচ্ছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিন্তু সামানিদদের মাঝেও মামলুকেরা ছিল। এ রকমই একজন মামলুক জেনারেল সামানিদকে হটিয়ে গাজানাভিদ নামক নতুন একটি শাসন চালু করলেন। গাজানাভিদ নাম দেয়ার কারণ হলো নতুন এই শহরের রাজধানী করা হয়েছিল গজনিতে, যা কাবুলের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। গাজানাভিদ রাজতন্ত্রে দীর্ঘমেয়াদী যে শাসক ছিলেন তার নাম মাহমুদ। তিনি কাসপিয়ান থেকে ইন্দুস পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি নিজেকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম যৌথ শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি নতুন একটি উপাধি ধারণ করেন, যার নাম হলো সুলতান। যেহেতু মাহমুদ দেখলেন যে, খলিফা উপাধিটি তখনো আধ্যাত্মিক নেতার উপাধি হিসেবে মুসলিম বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই তিনি নিজেকে সুলতান হিসেবে পরিচয় দিলেন। খলিফা না হয়েও এই মাহমুদ ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খলিফার মতোই সমপরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নেতা। সেই সময় থেকে আজও অবধি মুসলিম বিশ্বের কোথাও না কোথাও অন্তত একজন হলেও সুলতানের অস্তিত্ব দেখা গেছে।

শিক্ষিত পারস্যবাসীকে শাসন করার মতো যোগ্যতা সুলতান মাহমুদের ছিল। তিনি শিক্ষিত ও বিদ্বানদের জন্য অনেক সম্মানী ও পুরস্কারের ঘোষণা দেন। ফলে তার দরবারে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৯০০ জন কবি, ইতিহাসবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকরা এসে যোগ দেয়। এতে সুলতান মাহমুদ ও তার দরবারের সম্মান এবং গুরুত্ব ঐতিহাসিকভাবে অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়।

এরই মধ্যে একজন ছিলেন মহাকবি ফেরদৌসি। যিনি শাহনামা নামের একটি অমর মহাকাব্য লিখেন যেখানে সৃষ্টির শুরু থেকে ইসলামের নবির আবির্ভাব পর্যন্ত পারস্যদের গোটা ইতিহাসটি তুলে ধরা হয়েছে এবং পুরো ইতিহাসটাই ছন্দের আকারে ধারণ করা হয়েছে। ফেরদৌসিকে বিখ্যাত পশ্চিমা সাহিত্যিক দান্তের সাথেও তুলনা করা হয়। সুলতান মাহমুদ প্রতিটি শ্লোকের জন্য ফেরদৌসিকে বিশাল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা দেয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু ফেরদৌসি যখন তাকে শাহনামাটি লিখে জমা দেন (শাহনামা তখনো পর্যন্ত বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘ মহাকাব্যগ্রন্থ) তখন মাহমুদ ঘাবড়ে যান। তিনি অনুভব করেন যে এই বইয়ের যে আকার সেই মানের স্বর্ণ দিতে গেলে অনেকটা সম্পদ গচ্চা যাবে। তাই তিনি ফেরদৌসিকে সোনার পরিবর্তে রৌপ্যমুদ্রা দেয়ার কথা বলেন।

ফেরদৌসি এতে অপমানিত বোধ করে অন্য একজন রাজার কাছে গিয়ে বইটির সত্ত্ব দিয়ে দেন। পরে অবশ্য মাহমুদ তার কৃতকর্মের জন্য আফসোস করেছিলেন। তিনি গাড়ি ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ফেরদৌসির কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে তিনি মহাকাব্যটি ফিরিয়ে নিয়ে এসে মাহমুদের কাছে জমা দেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে । স্বর্ণমুদ্রাভর্তি গাড়ি যখন ফেরদৌসির বাড়ির দরজায় পৌছায় ততক্ষণে তিনি পরপারের উদ্দেশ্যে অন্তিম যাত্রা শুরু করেছেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

শাহনামা (ইংরেজিতে বইটির নাম দ্য বুক অব কিংস) হলো দুই কিংবদন্তী ভাইয়ের বংশধরদের মধ্যকার লড়াইয়ের গল্প। ভাইদের নাম হলো ইরান এবং তুরান। ইরান দ্বারা তিনি পারস্যকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন আর তুরান দ্বারা তুর্কিকে। বইটির গল্প অনুযায়ী ইরান হলো ভালো আর তুরান হলো মন্দ। এটা অবাক হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার নয়। কারণ, বইটি হলো ইরানের জাতীয় মহাকাব্য। আমার ধারণা, তুর্কিদেরকে ভালোভাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি বলেই সুলতান মাহমুদ এই বইটিকে ছাপানোর দায় নেননি।

ফেরদৌসি তার এই মহাকাব্যের শেষদিকে আরবদেরকে নিয়েও অনেক নেতিবাচক কথা বলেছেন। ইসলাম যখন আরবে আসে, তখন পারস্য সভ্যতা কতটা সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল আর আরব তখন কোন পশ্চাতপদ অবস্থানে ছিল, বইটিতে তাও তুলে ধরা হয়। তার বইটি হলো আরবদের পতন এবং পারস্যদের উত্থানের এক বিস্ময়কর কাহিনি গাঁথা। তবে ফেরদৌসি ছাড়াও আরও অনেক কবি সাহিত্যিকই সে সময় আরবদের সমালোচনা করে সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন।

সুলতান মাহমুদ শিল্পকলার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্যাপারটা তেমনও নয়। তিনি গর্ব করে বলতেন যে তিনি তার জীবনে কতগুলো হিন্দু মন্দিরকে ধ্বংস করেছেন। তিনি এসব মন্দিরকে ধ্বংস করে মন্দিরে থাকা সব সোনা গয়না হীরা জহরতকে নিজের রাজধানীতে নিয়ে এসে সেই টাকা দিয়ে দরবারের সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করতেন। তার ভারত আক্রমণ এবং হিন্দু নিধনের মতো কর্মকাণ্ড তাকে ইতিহাসে ভিন্ন অবস্থান এনে দিয়েছে।

মাহমুদের পরে তার ছেলে মাসুদ ক্ষমতায় এসে হেলমান্দ নদীর তীর ঘেঁষে একটি জায়গায় তার রাজধানী নির্মাণ করে। জায়গাটি ছিল আমার ছেলেবেলার শহর লাসকারগা'র নিকটে। এখনও সেই শহরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন সেখানে রয়েছে। আমার শৈশবে আমি প্রায়শই ভাবতাম যে, আমি যেই জঙ্গল দিয়ে খেলে বেড়াই, ঘুরে বেড়াই, সেখানেই কোনো এক সময় হয়তো মাসুদ হরিণ শিকার করে বেড়িয়েছেন।

ব্যক্তিগতভাবে মাসুদ খুবই ভয়ংকর ধরনের একজন মানুষ ছিলেন। তিনি শারীরিকভাবে এতটাই ভারি ছিলেন যে, ঘোড়াতে চড়তে পারতেন না। ফলে তিনি সব সময় হাতির উপর আরোহণ করতে শুরু করেন এবং হাতির উপরে চড়েই হেলমান্দ নদীর প্বার্শবর্তী জলাধার দিয়ে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করতেন। তার বিশালকায় শরীরই ছিল তার সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এতো বড় এবং ভারি একটি তরবারি চালাতেন যা অন্যরা কেউ হয়তো উঁচুই করতে পারত না। এসব কারণে তার পিতা সুলতান মাহমুদও তাকে ভয় করে চলত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সুলতান মাহমুদের ইন্তেকালের সময় মাসুদ বাগদাদে ছিলেন। জনগণ এই ফাঁকে তার অন্য এক ভাইকে নতুন সুলতান ঘোষণা করে। খবর পেয়ে মাসুদ জলদি নিজের এলাকায় ফিরে আসেন এবং তার ভাইকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। শুধু ক্ষমতা থেকে ভাইকে সরিয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি তার আপন ভাইয়ের চোখদুটিকেও তুলে নেন, যাতে সে ভবিষ্যতে আর তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে। এরপর তিনি গাজানাভিদ সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার পিতার মতো সেও যুদ্ধ ও শিল্পকলাকে একসাথে অব্যাহত রাখেন। ফলে তার সময়ে সাম্রাজ্যে একদিকে যেমন জৌলুস ছিল ঠিক তেমনি অন্যদিকে, প্রচণ্ড বর্বরতারও চিহ্ন ছিল। পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছিল যে গাজানাভিদ সাম্রাজ্যের কখনো পতনও হবে না।

তবে তার শাসনামলে মোট চারবার উত্তরের অক্সাস নদী পার হয়ে অযুজ তুর্কিরা গাজানাভিদ সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। তুর্কিদের যেই গ্রুপটি এই সাহসী কাজটি করে, তাদেরকে বলা হতো সেলজুক। তারা খোরাসানে (পূর্ব ইরান ও পশ্চিম আফগানিস্তানের একটি অংশ) ঘাঁটি গড়ে। সুলতান মাসুদ তাদের সাথে মোট চারবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এরমধ্যে প্রথম তিনবার তিনি সেলজুকদের পরাজিত করলেও চতুর্থবার তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ১০৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লাসকারগা'র উপর থেকে নিজের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেন। পরাজিত মাসুদ তার পিতার শহরে এসে ঠাঁই পেলেও গাজানাভিদদের সোনালি যুগের সেখানেই অবসান হয়, শুরু হয় সেলজুক আমল।

সেলজুকরা এবার পশ্চিমে বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। তাদের নেতারা লেখাপড়া জানতেন না। আর এটাকে তারা খুব একটা পাত্তাও দিতেন না। তাদের মানসিকতা এমন ছিল, যদি কোনো ব্যক্তি ভালোভাবে তরবারি চালাতে পারে তাহলে সে প্রচুর পরিমাণ সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে। যা দিয়ে চাইলে অনেক শিক্ষিত লোককে কিনে নেয়া সম্ভব। তারা অসংখ্য শহর জয় করলেও নিজেরা থাকার জন্য তাঁবুকেই পছন্দ করত। কারণ, তাঁবুতে থাকলে যখন তখন যেকোনো দিকে সরে যাওয়া যায়। নিজেরা তেমন একটা না থাকলেও অনেকগুলো শহরেই তারা বিশাল অর্থায়ন করে, যা দিয়ে শহরগুলোতে নানা রকম অট্টালিকা ও স্থাপনা নির্মাণ করা হয়। এক পর্যায়ে তারা নিজেদের ধর্মকে পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে। যদিও তারা যে খুব একটা ধর্মকে বুঝে বা ভালোবেসে ধর্মীয় বিশ্বাস পালন করত তা নয়। এটা মূলত সভ্য জগতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কৌশল হিসেবেই তারা করেছিল।

১০৫৩ খ্রিষ্টাব্দে একজন অল্পবয়সী সেলজুক রাজপুত্রকে খোরাসান শাসন করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। তার নাম ছিল আলপ আরসালান। এই নামের অর্থ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

হলো সাহসী সিংহ। তার অধীনস্ত সেনারা তার এই নামটি দিয়েছিল। তিনি একজন পারস্য সহকারী নিয়ে তার শাসন শুরু করেন। এই সহকারীর নাম ছিল নিজাম-উল-মুলক যার অর্থ রাজ্যের শৃঙ্খলা। আলপ আরসালান কোনো জনসমাগমে দাঁড়ালে তাকে সহজেই আলাদা করা যেত, কারণ তিনি ছিলেন ৬ ফুট লম্বা। তার চেয়েও বড় কথা তার মোছটি ছিল অস্বাভাবিক দীর্ঘ। কথিত আছে তার মোছটি এতটাই লম্বা ছিল যে তার দুই কাঁধ অবধি মোছটি পেঁচানো যেত। আর এ রকম দীর্ঘ মোছ নিয়ে যখন তিনি টগবগিয়ে তার ঘোড়া ছুটাতেন তখন পেছন থেকে দেখতে তাকে ভয়ংকর মনে হতো।

তার পারস্য সহকারীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে তিনি খোরাসানে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং অর্থনীতিকে মজবুত করেন। সেলজুক নেতাদের ইতিহাস এমন ছিল যে, কোনো নেতা মারা গেলে ক্ষমতা নিয়ে তাদের ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ও সংঘাত শুরু হয়ে যেত। এই সুযোগে আলপ আরসালান গোটা অঞ্চলে সহজেই তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এর জন্য তার পারসিয়ান সহকারীই বেশি কৃতিত্বের ভাগীদার। কারণ, তার পরামর্শেই আরসালান এই অবস্থানটি অর্জন করেন। সুলতানাতের দায়িত্ব পেয়েই আরসালান মানচিত্রের দিকে চোখ বুলিয়ে ভাবতে শুরু করেন, আর কোন কোন অঞ্চলটি তিনি জয় করতে পারেন।

তিনি সেলজুক সাম্রাজ্যকে ককেশাস পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এরপর আরও পশ্চিমে তিনি তার অভিযাত্রা অব্যাহত রাখেন। এক পর্যায়ে তিনি এশিয়া মাইনরে পৌঁছে ক্ষান্ত দেন। এই বিরাট অঞ্চলটি তখন কনস্ট্যানটিপোল শাসন করত। আর কনস্ট্যানটিপোল তখনো ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে।

১০৭১ সালে, মানজিকার্ত নামক একটি শহরের কাছে আলপ আরসালান তৎকালীন বাইজেন্টাইন শাসক রোমানাস দিওজিনেসের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। রোমানাসের প্রায় লাখ সেনার বাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি রোমানাসকে কারাবন্দি করেন যা গোটা পশ্চিমা জগতের জন্য বিস্ময়কর আঘাত হিসেবে পরিগণিত হয়। এরপর সবাইকে আরও অবাক করে দিয়ে তিনি বন্দি রোমানাসকে মুক্ত করে দেন এবং তাকে বিরাট উপঢৌকনসহ পুনরায় কনস্ট্যানটিপোলে পাঠিয়ে দেন। মূলত এটা ছিল খ্রিষ্টান রাজার প্রতি সেলজুক সুলতানের বদান্যতা। মানজিকার্তের এই যুদ্ধটি মানব ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটা ছিল সেলজুকদের সবচেয়ে বড় বিজয়। আবার এটা ছিল সেলজুকদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা-যদিও রোমানাসকে ছেড়ে দেয়ার পরে পরবর্তী ২৬ বছর পর্যন্ত অনেকেই তা বুঝতে পারেনি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পরবর্তী বছরেই খোরাসানে আলপ আরসালান মৃত্যুবরণ করেন। তার ছেলে মালিক শাহ নতুন সুলতান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও নিজাম-উল-মূলকের পরামর্শ ও সহযোগিতায় তার বাবার মতো কীর্তিমান হওয়ার সুযোগ পান। তিনি তুর্কিদের পক্ষে সিরিয়া ও পবিত্র ভূমি জয় করেন।

পারসিয়ান সহকারী এবং সেলজুকদের পরপর দুই সুলতানের বন্ধুত্ব উভয়পক্ষকেই উপকৃত করে। সুলতানেরা একের পর এক দেশ জয় করতেন, আর নিজাম-উল-মূলক তার আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা করতেন।

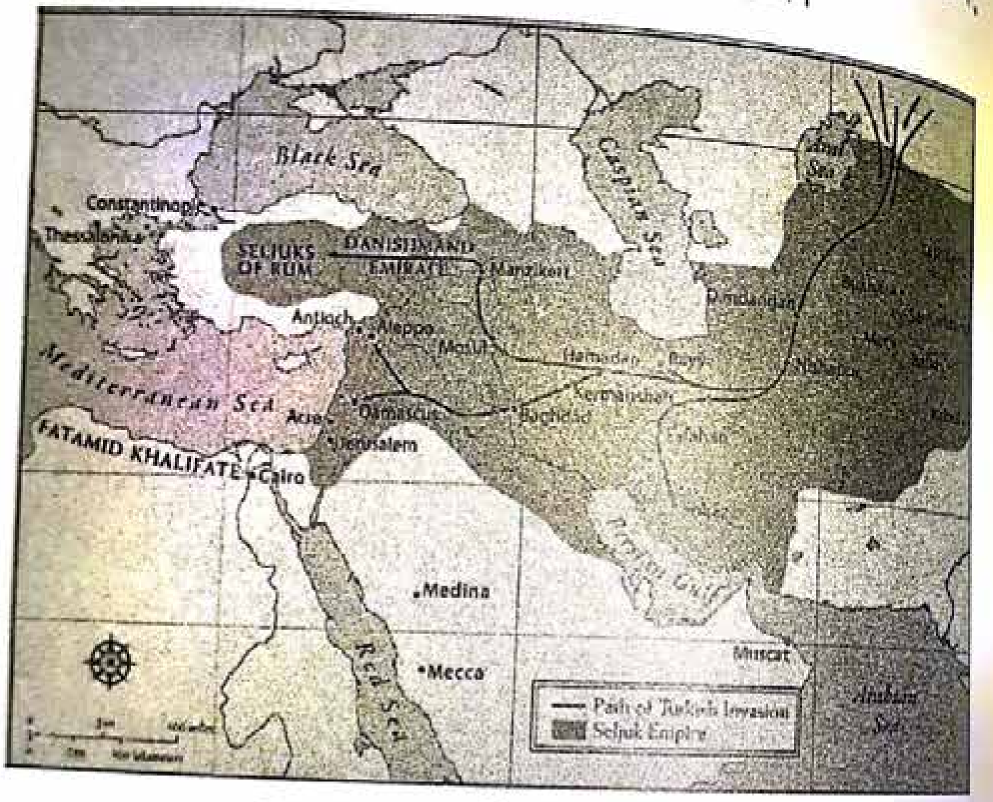

সেলজুক সাম্রাজ্য : মুসলিম বিশ্বে তুর্কিদের উত্থান

সেই সময়ে শাসন ব্যবস্থাপনার কাজটি ছিল খুবই দুরূহ। কারণ, সুলতানেরা একেকটি এলাকা বিজয়ের পর তাদের বিভিন্ন আত্মীয়কে তা শাসন করার দায়িত্ব দিতেন। আর এসব আত্মীয়রা সেসব অঞ্চলের দায়িত্ব পেয়ে এগুলোকে নিজেদের সম্পত্তি বলে মনে করতেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই তুর্কিরা দেশ চালাতে খুব যোগ্য ছিল না। তাদের অনেকেই খাজনা আর লুটতরাজের পার্থক্যই বুঝতে পারত না।

এই পরিস্থিতির উত্তরণে, নিজাম-উল-মূলক খাজনা আদায়ের একটি উত্তম পদ্ধতি আবিষ্কার করেন এবং তিনি বেশ কিছু পরিদর্শকও নিয়োগ করেন যাতে খাজনা আদায়ের নামে জনগণকে ঠকানো বা শোষণ করা না হয়। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

রাষ্ট্র অর্থকে কাজে লাগিয়ে রাস্তাঘাটকে উন্নত করেন এবং রাস্তা দিয়ে যাতে পথিকেরা নিরাপদে চলাচল করতে পারে বা ব্যবসায়ীরা নির্বিঘ্নে পণ্য আনা নেয়া করতে পারে তা তদারকির জন্য একটি পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় খরচে বাহির থেকে আসা অতিথি ও ব্যবসায়ীদের জন্য আবাসিক হোটেলও নির্মাণ করেন। একই সাথে তিনি অসংখ্য মাদ্রাসাও নির্মাণ করেন যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইসলামের সঠিক দর্শন সম্পর্কে জানতে পারে। এই মাদ্রাসায় যাতে ছাত্রছাত্রীরা সত্যিকারের ইসলাম শিখতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি কট্টরপন্থী সুন্নি আলেমদেরকে দিয়ে একটি পাঠ্যসূচিও প্রণয়ন করেন।

তার এই সকল কাজই ছিল তৎকালীন যুদ্ধবাজ তুর্কিদের চিন্তাধারার সাথে সাংঘর্ষিক। তারপরও নিজাম-উল-মূলক এই কাজটি করেছেন যাতে তিনটি ধারার মুসলমানরাই একটি স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে। কারণ, তখনকার সময়ের তুর্কিরা চাইত যেকোনো ভাবেই হোক, তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে। আরবরা চাইত ধর্মীয় চেতনাকে সমুন্নত রাখতে। আর পারসিয়ানরা চাইত প্রশাসন, দর্শন, কবিতা, চিত্রকলা, স্থাপত্যবিদ্যা ও বিজ্ঞানকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে উপভোগ করতে এবং এরই মাধ্যমে সভ্যতাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে। নিজাম-উল-মূলকের ভারসাম্যমূলক নীতির কারণে নতুন এই শাসন ব্যবস্থায় একই সঙ্গে একজন তুর্কি সুলতান ও তার সেনাবাহিনী, একজন আরব খলিফা ও আলেম সম্প্রদায় এবং পারস্যের প্রভাবিত একদল শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর সহাবস্থান ছিল।

এই স্থিতিশীল সহাবস্থানের কারণে কৃষকেরা তাদের কাজ করতে পারত। ব্যবসায়ীরাও সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারছিল, পর্যাপ্ত খাজনাও পাওয়া যাচ্ছিল। সেনাবাহিনীর বেতনও ঠিকমতোই দেয়া যেত এবং সর্বোপরি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও ভালো ছিল।

কিন্তু নিজাম-উল-মূলকের একজন শত্রুও ছিল। তার নাম হাসান সাবাহ। সে ছিল আততায়ীদের একটি গ্রুপের নেতা। এরা ছিল শিয়াদের থেকে বেরিয়ে আসা একটি দল।

শিয়ারা ধর্মীয় একজন নেতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। যাকে তারা ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাদের মতে পৃথিবীতে একই সময়ে একজনের বেশি ইমাম থাকতে পারে না।। ইমামের ওফাতের পরপরই তার যাবতীয় ক্ষমতা তার কোনো একজন ছেলের উপর হস্তান্তরিত হয় এবং তার ফলে সেই ছেলেই নতুন ইমাম হয়ে যায়। সমস্যা হলো প্রতিবার একজন ইমামের ওফাতের পরই একটা বিতর্ক দেখা দিত যে, ইমামের কোনো ছেলেটি পরবর্তী সময়ে ইমাম হবে। আর এই বিতর্ক থেকেই পরবর্তী সময়ে আরও ছোট ছোট বিভাজন হয়ে নতুন নতুন গোত্রের জন্ম দিত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এরকমই একটি বির্তক হয়েছিল ৫ম ইমামকে নিয়ে। সেই বিতর্ক থেকে জাইদি নামক নতুন একটি গোত্রের জন্ম হয়। ৬ষ্ঠ ইমামের ইন্তেকালের পর বিভাজন আরও বেড়ে যায়। সেখান থেকেই ইসমাইলিয়া নামক নতুন সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। এই ইসমাইলিয়ারা একটা সময় পর্যন্ত শিয়াদের মধ্যে বেশ প্রভাবশালী ছিল। মিসরে ফাতিমাইদ নামের যে খেলাফতটি চালু হয়েছিল তাও করেছিল এই ইসমাইলিয়ারাই।

এগারো শতকের শেষ দিকে এসে ইসমাইলিয়ারা আরও দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে সংখ্যালঘু গ্রুপটি তৎকালীন ফাতিমাইদ খলিফাদের বিলাসবহুল জীবনযাপন নিয়ে খুবই অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত ছিল। তারা ধনী ও গরিব সামাজিক শ্রেণিতে বিশ্বাস করত এবং এর সমাধান হিসেবে ইসলামের মৌলিক আচারাদিকে ফিরিয়ে আনার পক্ষেও ছিল। এই গ্রুপটি নতুন করে সদস্য বাড়ানোর জন্য পারস্যতে হাসান সাবাহ নামক ঐ প্রতিনিধিকে প্রেরণ করে।

পারস্যে এসে হাসান সাবাহ নিজের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেন। তিনি উত্তর ইরানের এলবার্জ পর্বতমালায় অবস্থিত আলামুত দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। এই দুর্গটি খুবই সুরক্ষিত ছিল কারণ দুর্গে উঠার রাস্তাটি এতটাই সরু ছিল যে, সেখানে সাধারণভাবে কোনো সেনাদল গমন করতেই পারত না। কীভাবে হাসান সাবাহ এই দুর্গটি জয় করেছিল তা নিয়ে অনেক কথা চালু আছে। কেউ বলেন যে সে কৌশলে দুর্গটি নিয়ে নিয়েছে। কেউ বলেন, তার আলৌকিক ক্ষমতা ছিল যা দিয়ে সে দুর্গের ভেতরে থাকা লোকদেরকে সম্মোহন করে ফেলেছিল। যাই হোক না কেন, এটাই বাস্তবতা ছিল যে সাবাহ সেই দুর্গটা জয় করে নেন এবং সেখানেই তার আততায়ী বাহিনীকে সমবেত করতে শুরু করেন।

কেন তার বাহিনীকে আততায়ী বাহিনী বা অ্যাসাসিন বলা হতো? এর কারণ হলো এই গ্রুপটাই প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড পরিচালনা শুরু করে। শতাব্দীকাল পরে মার্কো পোলো দাবি করেন যে, সাবার সেনারা ভাং খেয়ে নিজেদেরকে অন্য রকম আবেগীয় অবস্থানে নিয়ে নিত। যাতে তারা নির্বিঘ্নে খুনগুলো করতে পারে। এই কারণে তখন তাদেরকে হাসিসিন বলা হতো। আর সেখান থেকেই এই অ্যাসাসিন কথাটি এসেছে। তবে এই ব্যাখ্যা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণটা হলো:

সাবাহ ছিলেন আদি চিন্তাধারার সন্ত্রাসের মানসিকতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি। তিনি খুনকে মূলত প্রোপাগান্ডা হিসেবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন। যেহেতু কোনো দেশ দখল করার মতো বিরাট বাহিনী বা সামর্থ্য তার ছিল না, তাই তিনি একক

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কোনো আততায়ীকে পাঠাতেন বা আততায়ীর কোনো দলকে পাঠাতেন; যাতে তারা যথাযথভাবে তাদের টার্গেটকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে। তারা সব সময় এমন ব্যক্তিদেরকে হত্যা করার জন্য টার্গেট করতেন, যাদেরকে খুন করলে বড় আকারের প্রভাব পড়বে বা অনেক শোরগোল সৃষ্টি হবে। এসব আততায়ীরা নির্দিষ্ট এলাকায় গিয়ে তাদের হত্যার পরিস্থিতি তৈরি করতেন। এটা করতে কখনো এক মাস আবার কখনো বা বছর খানেকও সময় লেগে যেত। এই সময়ের মধ্যে তারা চেষ্টা করতেন যাতে কোনো না কোনোভাবে তাদের টার্গেট ব্যক্তির সেনা দলে ঢোকা যায় বা তার বাসায় প্রবেশ করা যায় অথবা অন্য কোনোভাবে তার আস্থা অর্জন করা যায়।

এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াটা কী কোনো ভাং খোর বা নেশাগ্রস্ত লোকের পক্ষে ঠিকমতো পালন করা সম্ভব? লেবানিজ লেখক আমিন মালোওফ বলেন, অ্যাসাসিন শব্দটি এসেছে পারসিয়ান শব্দ অ্যাসাস থেকে, যার অর্থ হলো ভিত্তি। অন্য অনেক ধর্মীয় নেতাদের মতো সাবাহ নিজেও তার অনুসারীদেরকে বলেন যে, ইসলামের মূল বার্তাগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই তিনি আবার সেই ইসলামকে তার মূল ভিত্তির কাছাকাছি নেয়ার চেষ্টা করছেন। যদিও এটাও বাস্তবতা যে এককেজন ধর্মীয় নেতা বা দার্শনিকের কাছে ইসলামের মূল ভিত্তির সংজ্ঞা আবার ভিন্ন ভিন্ন ছিল। সাবাহ যে চিন্তাধারা প্রকাশ করেন তাকে ইসলামের মূল ধারার অনেক ব্যক্তিত্বই ইসলামিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিলেন না। তবে একটা বার্তা যেটা সাবাহ দিতেন সেটা হলো হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং আলি (রা.) ছিলেন আল্লাহর একজন প্রতিনিধি। তাই তার পরে তার বংশধরদের ভেতর থেকেই মুসলিম উম্মাহ্‌র ইমামরা আবির্ভূত হন এবং তাই হওয়া উচিত।

সাবাহ আরও প্রচার করেন যে, কুরআনের একটি বাহ্যিক অর্থ আছে। তবে একই সঙ্গে কুরআনের অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থও রয়েছে। বাহ্যিক যে অর্থগুলো আছে তা দিয়ে মূলত ধর্মীয় আচারাদি, মুয়ামেলাত বা ব্যবহারিক বিষয়াবলী, নৈতিক ও আইনগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এগুলো সবই সেই সাধারণ মানুষদের জন্য, যারা জ্ঞানের গভীরে যেতে চান না। কিন্তু প্রকৃত যে গূঢ় কুরআন, তার প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি শব্দের গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ ও ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে সেগুলোকে বিভিন্ন ধরনের সাংকেতিক কোড দ্বারা লুকানো আছে। যারা সেই সাংকেতিক কোডগুলো আবিষ্কার করতে পারেন তারাই এই রহস্যময় বিশ্বজগতের রহস্যগুলোকে অনুধাবন করতে পারেন।

ক্রমে অ্যাসাসিনরা একটি গোপন সংস্থা হিসেবেই সংগঠিত হতে থাকে। তাদের পরিচিতি, বিশ্বাস বা চিন্তাধারা প্রসঙ্গে অন্য কারো কোনো ধারণাই ছিল না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তাই কেউই আসলে জানত না যে কতজন লোক অ্যাসাসিন গ্রুপের সদস্য, অথবা বাজারে, মসজিদে বা অন্য কোনো স্থানে কোনো লোকটি অ্যাসাসিন গ্রুপের সদস্য। এই দলে নতুন কাউকে অনেক দফা প্রশিক্ষণের পর অন্তর্ভুক্ত করা হতো। কিন্তু কেউ যদি একবার এই দলের সদস্য হতে পারত, তাহলে তাকে একটি পদবি দেয়া হতো। আর সেটা হতো তার জ্ঞান এবং যোগ্যতার উপর ভিত্তি করেই। একটি পদবি বা মর্যাদা থেকে আরেকটু উচ্চ পর্যায়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কুরআনের অর্থের অনেক গভীরে যেতে হতো। যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তি একেবারে মৌলিক চেতনার কাছাকাছি না যেতে পারত ততক্ষণ তাদেরকে সাবাহ'র এই দলের মূল কেন্দ্রের কাছাকাছি নেয়া হতো না।

যদিও অ্যাসাসিনরা অনেক গোপনে তাদের পরিকল্পনাগুলো করত, কিন্তু শেষমেশ যখন হত্যা করার সময় হতো, তখন তারা অনেকটা প্রকাশ্যেই হত্যা করতে চেষ্টা করত। তারা যে কাউকে শুধু হত্যাই করতে চাইত তা নয়। বরং প্রকাশ্যে খুন করার মাধ্যমে তারা গোটা বিশ্বকে এই বার্তাটাই দিতে চেয়েছে যে, অ্যাসাসিনরা ইচ্ছে করলে যে কাউকে, যেকোনো সময়, যেকোনো স্থানে হত্যা করতে পারে। সাবাহ চেয়েছিলেন যে এসব হত্যার টার্গেটরা যেন সব সময় আতঙ্কে থাকে। যাতে তারা তাদের বন্ধুদেরকে নিয়ে, তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ক্রীতদাসকে নিয়ে, এমনকি তাদের স্ত্রীদেরকে নিয়েও আতঙ্কে থাকে, ভয়ে থাকে। কারণ, এদের যে কেউ অ্যাসাসিন গ্রুপের সদস্য হতে পারে, যে কারও হাতেই তাদের মৃত্যু হতে পারে। এইভাবে সাবাহ তার মতো প্রভাবশালী লোকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করত।

সাবাহ'র পক্ষে যারা এই হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত করত তাদেরকে বলা হতো ফেদায়িন। ফেদায়িন মানে ত্যাগ স্বীকারকারী। যখন এই অ্যাসাসিনরা জনসম্মুখে কোনো হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করত, তারা জানত যে তারা ধরাও পড়ে যেতে পারে এবং হত্যার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারাও নিহত হতে পারে। এটা বুঝার পরও তারা একটুও পরোয়া করত না। বরং তাদের এই কর্মকাণ্ডের একটি অংশই ছিল নিজেদের মৃত্যু। এই অ্যাসাসিনরা সবাই ছিল আত্মঘাতী। তারা যে, কোনো হত্যাকাণ্ড করার পর নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করত। যাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে যে এরা সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই থাকে। তাই এদেরকে ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না।

অ্যাসাসিনদের আবির্ভাব, ঝঞ্ঝামুখর বিশ্বে নতুন আরেক সংকট হয়ে দেখা দিল। তৎকালীন সময়ে আগে থেকেই নানা ধরনের দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ ছিল। সুন্নিরা তখন শিয়াদের সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিল। বাগদাদ কেন্দ্রিক আব্বাসি খলিফারা কায়রো

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ফিত্তিক ফাতেমাইদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত ছিল। অন্যদিকে, তুর্কিদের উত্থান ও প্রভাবও বিশ্বে বর্বরতা বৃদ্ধি করেছিল। আর সেই মুহূর্তে আততায়ীদের এই অ্যাসাসিন নামক দলটি গোটা অঞ্চলের জন্য একটি দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিল।

অ্যাসাসিনরা বেশ বড় গলায় তাদের হত্যাকাণ্ডের ঘোষণা প্রদান করত। তারা অসংখ্য সেলজুক কর্মকতা এবং সুন্নি আলেমদের হত্যা করেছিল। এমনকি তারা পূর্বের খলিফাকেও হত্যা করেছিল। অধিকাংশ সময়ে তারা শুক্রবার জুমার নামাজের ভিড়ের মধ্যে তাদের টার্গেটদেরকে হত্যা করতে চেষ্টা করত। কারণ, মানুষকে তারা গোটা ঘটনাটাই জানাতে বেশি আগ্রহী ছিল।

এভাবে চলতে চলতে ১০৯২ সালে নিজাম-উল-মূলক যখন অবসরে যান তার পরপরই অ্যাসাসিনরা তাকে হত্যা করে। মাসখানেক পর তারা নিজামের অধিপতি, আলপ আরসালানের পুত্র সুলতান মালিক শাহকেও হত্যা করে। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে দুইজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ায় গোটা সাম্রাজ্যের ভীত নড়ে ওঠে। এই দুই হত্যাকাণ্ড গোটা সাম্রাজ্যের ক্ষমতার ভারসাম্যকেও নষ্ট করে দেয়। শুরু হয় সেলজুকদের ভাইয়ে ভাইয়ে এবং পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব সংঘাত। ফলে সেলজুক সাম্রাজ্যের পশ্চিমের অঞ্চলগুলো খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভক্ত হয়ে যায়। এশিয়া মাইনর থেকে সিনাই পর্যন্ত প্রতিটি শহর বিশেষ করে জেরুজালেম, দামেস্ক, আলেপ্পো, এনটয়েক, ত্রিপলি, এদেসা- সব কাছাকাছি হলেও একেকটি শহরের দায়িত্ব একেকজন রাজপুত্র নিয়ে নেয়। প্রতিটি রাজকুমার তার শহর শাসন করলেও তাদের মনে কোনো স্বস্তি ছিল না, প্রতিটি মুহূর্তে একজন রাজপুত্র আরেকজন রাজপুত্রকে সন্দেহ করত।

১০৯৫ সালে এসে মুসলমানদের সার্বজনীন সম্প্রদায়ের ধারণাটি রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হলো। আলেমরা কুরআনের, হাদিসের এবং শরিয়তের কথা বলেও সমাজকে একতাবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হলেন। দার্শনিকরা তখন অনেকটাই ছন্নছাড়া। টুকটাক কিছু কাজ তারা করতেন, তবে তাদের কণ্ঠস্বরও অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছিল। এমন একটা সময়েই গাজ্জালি জন্মেছিলেন ও কাজ করছিলেন। গাজ্জালি যে সময়টায় আসেন সেই সময়ে যুক্তিকে মেনে চলাটাই যেন ছিল অযৌক্তিক। আর সেখান থেকেই হয় বিপর্যয়ের সূত্রপাত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

৯. ব্যাপক বিপর্যয় ও নৈরাজ্য
(৪৭৪-৭৮৩ হিজরি) ১০৮১-১৩৮১ খ্রিষ্টাব্দ

পশ্চিমা জগৎ থেকে আক্রমণ

সেই সময়ে মুসলমানদের উপর মূলত দুটো বিপর্যয় নেমে এসেছিল। একটি ছোট আকারের, আর অপরটি বেশ বড়। ছোটটি এসেছিল পশ্চিম থেকে। যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে মুসলমানরা ইউরোপের ব্যাপারে খুবই কম জানত। অন্যদিকে, ইউরোপিয়ানরাও আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে তেমন একটা জানত না। তৎকালীন মুসলমানদের জানা মতে, বাইজেন্টাইন থেকে আন্দালুসিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে মূলত ঘন বন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বনে মানুষ বলতে যারা ছিল তারা এতটাই আদিম ও বর্বর যে, তারা তখনো শুধু শুয়োরের গোশতই খেয়ে দিন কাটাতো বলে, মুসলমানরা জানত। আর মুসলমানদের কাছে খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা মূলত বাইজেন্টাইন কিছু গির্জা এবং তাদেরই সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা এলাকায় অন্যান্য ছোট গির্জাগুলোকেই বুঝত। মুসলমানরা আরও জানত, পশ্চিমের দিকে ইতালি ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় এলাকাগুলো আবিষ্কার হওয়ার পর, কোনো এক সময় সেখানে সভ্যতার ছোয়া লেগেছিল। এসব এলাকাগুলোতে দু-একবার মুসলমানরা গিয়েছিলও বটে, কিন্তু সেই পশ্চিমা সভ্যতার কিছুই তখন আর অবশিষ্ট নেই।

মুসলমানদের কাছে থাকা এই তথ্যগুলো যে পুরোপুরি ভুল ছিল তা নয়। ইউরোপ আসলে বড় একটা সময় মহা বিপর্যয়ের মধ্যেই ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জার্মান বিভিন্ন বর্বর গোত্রের হামলা, হানসদের আক্রমণ, আভার্সদের হামলা, মাগইয়ার্সদের হামলা এবং মুসলমানদের আক্রমণ-এসব মিলিয়ে ইউরোপ বেশ নাস্তানাবুদ অবস্থাতেই ছিল। ইউরোপের প্রায় সকলেই তখন ছিল চাষী।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে পরিশ্রম করত, যাতে তাদেরকে অন্তত না খেয়ে থাকতে না হয়। একই সঙ্গে তারা তৎকালীন সমাজের অভিজাত সশস্ত্র বাহিনী এবং ধর্মযাজকদেরকেও সেবা করতে অভ্যস্ত ছিল। অল্প কিছু লোক তখন চার্চে যেত। আর অন্যদিকে, অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা আত্মরক্ষার কৌশল ছাড়া আর কিছু শিখতে চাইত না। পড়ালেখা ও জ্ঞান অর্জন থেকেও তারা ছিল অনেক দূরে।

পরের শতকের দিকে এসে নতুন কিছু যন্ত্র, বিশেষ করে কৃষি প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হলো। ইউরোপের অবস্থা তখন এতটাই পশ্চাৎপদ ছিল যে তারা যে এগুলোকে গুরুত্ব দিবে, বা এগুলোকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাগ্য বদলাবে- এতটুকু যোগ্যতাও তাদের ছিল না। বহু পরে তারা এই প্রযুক্তিগুলোর সাথে পরিচিত হয় এবং এগুলোকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। প্রযুক্তিগুলোকে চিনতে পারার পর তারা এই নতুন যন্ত্রগুলোকে দিয়ে সহজেই মাটি গর্ত করতে শিখে, সেচ কাজ করতে শিখে, বনের পর বন পরিষ্কার করে এবং নতুন নতুন কৃষিজ জমি তৈরি করে। ফলে কৃষকেরা পূর্বের চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করতে শুরু করে।

দ্বিতীয় বড় আবিষ্কারটি ছিল ঘোড়ার গলাবন্ধনীর আবিষ্কার। এটা ছিল আগের ইয়োকের একটু উন্নত সংস্করণ। ইয়োকটা মূলত প্রাণীর গলায় পড়ানো হতো, যাতে প্রাণীটি সেই ইয়োককে ব্যবহার করে একটি লাঙ্গল বহন ও চালাতে পারে। আগে যে ইয়োকটি ইউরোপিয়ান কৃষকেরা ব্যবহার করত, তা শুধু গরুর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেত। কারণ তার আকৃতিটাও গরুর উপযোগী ছিল। সেটা ঘোড়ার গলায় লাগাতে গেলে ঠিকমতো ফিট হতো না এবং অনেক সময় ঘোড়াটি দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হতো। সেই সময়ে নাম না জানা এক আবিষ্কারক ঘোড়ার জন্য মানানসই গলাবন্ধনী আবিষ্কার করেন। সেটাকে ব্যবহার করতে শুরু করায় কৃষকেরা লাঙ্গল টানার জন্য গরুর বদলে ঘোড়াকেও কাজে লাগানোর সুযোগ পান। আর যেহেতু ঘোড়া গরুর তুলনায় ৫০ ভাগ দ্রুতগতিতে লাঙ্গল টানতে পারে, তাই কৃষকেরা এভাবেই একই সময়ের মধ্যে বেশি জমি চাষ করার সুবিধাটাও পেয়ে গেল।

আরেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার ছিল ত্রিমৌসুমী চাষের কৌশল। এর আগে কৃষকেরা একবার জমিতে কোনো ফসল চাষ করার পরপরই আবার সেই ফসল লাগালে ভালো ফলন পেত না। তাই তারা বছরের বড় একটি সময়ে কাজ কর্ম না করে বসে থাকত, উপবাস করত। এই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ইউরোপিয়ান কৃষকেরা তাদের জমিকে নিজেরাই দুইভাগে ভাগ করে চাষ করত। একভাগে এক বছর চাষ করলে অন্যভাগে পরের বছর চাষ করত। এরপরও বছর জুড়েই তাদের জমির একটি বড় অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

একটা সময়ে এসে ইউরোপিয়ানরা বুঝল জমিকে এক বছর পর পর বিশ্রাম দিলে খুব একটা কাজ হয় না, উৎপাদনও কমে যায়। যদি তিন বছর পর পর একটা ফসল চাষ করা যায় তাহলে জমির উর্বরতা বেশি থাকে। এটা অনুধাবন করার পর চাষীরা তাদের জমিকে তিনভাগে ভাগ করল। দুই ভাগে তারা এক বছর চাষ করত আর অন্য অংশটি খালি রেখে দিত। এতে করে তারা আগের চেয়ে বেশ ভালো ফলাফল পেল।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তন দিয়ে আসলে যে অনেক বড় কোনো পরিবর্তন হয়েছিল তা কিন্তু নয়। তবে নতুন সব প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তিগুলো আসার পর ইউরোপিয়ান কৃষকেরা প্রথমবারের মতো উদ্বৃত্ত ফসল রাখার সুযোগ পায়। আর এভাবে বাড়তি ফসল পাওয়ার পরই তাদের চোখ খুলে যায়। তারা এই উদ্বৃত্ত ফসলটি নিয়ে অন্য কোনো চাষীর সাথে লেনদেন শুরু করে। যার যে জিনিসটার অভাব সে হয়তো তখন অন্য কারও কাছ থেকে কোনো কিছুর বিনিময়ে তা আদায় করার চেষ্টা করে। এভাবে ফসলের পরিমাণ যখন বাড়তে থাকে, তখন তারা আরও কিছু নতুন কাজে হাত দেয়। তারা কিছু হস্তশিল্প নির্মাণ করে এবং সেগুলো দিয়ে নতুন করে ব্যবসা শুরু করে। এভাবে এক সময় বাজারের সৃষ্টি হয়। আরও পরে সেই বাজারগুলোকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে। শহর মানুষের মধ্যে তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে। মুদ্রার প্রচলন হয়। মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বাজার থেকে সেই বাজারে ক্রয় বিক্রয় করে সময় পার করতে শিখে। এভাবেই ইউরোপে আবারও টাকার চাকা ঘুরতে শুরু করে, টাকাটা দ্রুত ছড়িয়েও পড়ে। ধীরে ধীরে ইউরোপিয়ানরা নিজেদের ঘর, চেনা গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এসে আশেপাশের এলাকাগুলোতে যাতায়াত করতে শুরু করে।

কিন্তু তারা বেড়াতে যেত কোথায়? আসলে যে সময়ের কথা হচ্ছে, তখন ছিল নানা ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের যুগ। তাই অধিকাংশ সময়েই এই ইউরোপীয় চাষীরা বিভিন্ন মাজারে বা ধর্মীয় স্থাপনায় ঘুরতে যেত, যাতে তারা আলৌকিক কিছুর সন্ধান পায়। যাদের টাকা কম, তারা স্থানীয় ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতেই যেত। আর যাদের কাছে একটু বেশি অর্থ ছিল তারা পবিত্র ভূমিগুলোতে তীর্থযাত্রায় যেত। ফিলিস্তিনের বেথেলহাম, জেরুজালেম যীশুখ্রিষ্টের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় তারা এই অঞ্চলগুলোতে বেশি যেতে চাইত। পশ্চিমা ইউরোপিয়ানদের জন্য এই তীর্থযাত্রাগুলো ছিল খুবই ভয়ংকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। তখনকার সময়ে আজকের মতো ডলার বা সার্বজনীন কোনো মুদ্রা চালু ছিল না। তাই তীর্থযাত্রীরা কোনো কিছু কেনার নিমিত্তে স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা বহন করতেন। আর সেই কারণেই তারা এই ধরনের যাতায়াত করার ক্ষেত্রে সব সময় ডাকাতের আক্রমণের ঝুঁকিতে থাকতেন। এই ধরনের ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তীর্থযাত্রীরা একা না গিয়ে দলবদ্ধভাবে যেতেন। এর পাশাপাশি তারা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দেহরক্ষী ভাড়া করে সবাই মিলে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে যেতেন। সেখানে গিয়ে তারা যীশুখ্রিষ্টের জন্মস্থান এবং পরবর্তী সময়ে যীশুখ্রিষ্ট তার সতীর্থদের সাথে যেসব জায়গায় ছিলেন সেসব স্থান পরিদর্শন করতেন। তারা এসব পবিত্র জায়গায় গিয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতেন, স্বর্গভিক্ষা চাইতেন। সেই সাথে শারীরিক অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা নানা ধরনের আনন্দযোগে মত্ত হতেন। তীর্থস্থানে যেসব বাজার ছিল সেসব বাজার থেকে নানা ধরনের জিনিস কিনতেন, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের দেয়ার জন্য উপহার কিনতেন এবং পরিশেষে নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করতেন।

একটা সময়ে গিয়ে সেলজুক তুর্কিরা, সহনশীল ফাতেমাইদ সম্প্রদায় আর তারও পরে অলস প্রকৃতির আব্বাসীয়দের কাছ থেকে ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করায় সেলজুকরা তখন কিছুটা ধর্মান্ধ ছিল। তারা ভদ্রতা, আভিজাত্য, দাতব্য বা মানবসেবা নিয়ে খুব একটা পরোয়া করত না। তবে যদি স্বজাতিপ্রেমের কথা বলা যায় বা অন্য ধর্মের বিশ্বাসীদেরকে অবজ্ঞা করার কথা বলা হয়, তাহলে সেলজুকদের মতো মারাত্মক আর কেউ ছিল না। বিশেষ করে যেসব ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা দূর দেশ থেকে আসত বা একটু বন্য এলাকায় থাকত তাদেরকে তারা অনেক বেশি অপমান ও অপদস্থ করত।

বিশেষ করে ফিলিস্তিনে যে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা যেত, তারা অনেক বেশি হেয় প্রতিপন্ন হতো। ব্যাপারটি এমন ছিল না যে, তাদেরকে অত্যাচার করা হতো কিংবা হত্যা করা হতো। কিন্তু তাদেরকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অপমান করা হতো, বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলা হতো। ফলে আগত তীর্থযাত্রীরা নিজেদেরকে সর্বদা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক মনে করতে বাধ্য হতো। তারা যেকোনো জায়গায় যেতে বা ঢুকতে গেলে সবার শেষে সুযোগ পেত। ধর্মীয় স্থাপনায় যাওয়ার জন্য তাদেরকে বিশেষ অনুমতি নিতে হতো। যেকোনো কিছু পাওয়ার জন্য বা দেখার জন্য তাদেরকে অনেক বাড়তি টাকা গুনতে হতো। সাধারণ দোকানিরাও তাদেরকে অবজ্ঞা করত। স্থানীয় কর্মকর্তারাও তাদের সাথে অসহনীয় মাত্রার দুর্ব্যবহার করত।

যখন তারা তীর্থ সফরের পরে ইউরোপে ফিরে আসত, তখন রাগে ফেটে পড়ার মতো অনেক কিছুই তাদের অভিজ্ঞতায় ছিল। কিন্তু তারা তা না করে অধিকাংশ সময়ে প্রাচ্যের সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছলতা নিয়েই বেশি কথা বলত। বিশেষ করে সফরে থাকাকালীন তারা সেখানে যে মানের প্রাসাদ টাইপের বাড়ি-ঘর দেখেছে, বা সেখানকার মানুষেরা যে দামি দামি পোশাক পরত, যে ভালো মানের খাবার খেত, উন্নত প্রসাধনী ব্যবহার করত, বা সেখানে স্বর্ণের যে অবাধ ছড়াছড়ি, সে সবগুলো নিয়েই তারা কথা বলত। এসব গল্প শুনে উপস্থিত সকলের মনে নতুন করে হিংসা আর ক্ষোভেরও জন্ম দিত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১০৭১ সালে যে ঐতিহাসিক মানজিকার্তের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল, সেই যুদ্ধে সেলজুকরা বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করে তাদের সাম্রাজ্য দখল করে নিয়েছিল। এই খবরটি ইউরোপিয়ানদের জন্য খুবই চমকপ্রদ ছিল। কারণ, বাইজেন্টাইনরা কারও কাছে হারতে পারে এটা তারা কখনো ধারণাই করতে পারেনি। ঐ যুদ্ধের সময় বাইজেন্টাইন শাসকেরা পশ্চিমের নাইট খেতাবপ্রাপ্তদের কাছে সাহায্য চেয়েছিল, যাতে তারা তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। বাইজেন্টাইনরা তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পোপের কাছেও সতর্কবার্তা পাঠিয়ে বলেছিল, 'যদি কন্সট্যানটিপোলের পতন হয় তাহলে মোহামেডানরা (মুসলমানরা) রোমেও ঢুকতে দ্বিধাবোধ করবে না'।

অন্যদিকে, একই সময়ে ইউরোপিয়ানদের অর্থনীতি ধীরে ধীরে সুসংহত হচ্ছিল এবং জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু ইউরোপিয়ানদের মধ্যে সে সময়ে দুই ধরনের কালচার বা ব্যবহারিক সংস্কৃতি দেখা যাচ্ছিল। যেমন একটি সংস্কৃতিতে, বনেদী সম্প্রদায়ের বাচ্চারা কায়িক শ্রম করবে এটাকে তখন মোটেও ভালো চোখে দেখা হতো না। এই বনেদী লোকদের একমাত্র কাজ ছিল জমি কেনা এবং যুদ্ধ করা। দ্বিতীয় যে সংস্কৃতিটি ছিল তা হলো, যদি কোনো জমির মালিক মারা যায়, তাহলে সব সম্পত্তি তার বড় ছেলে উত্তরাধিকার সুত্রে পাবে। অন্য কোনো সন্তানকে কিছু দেয়া হবে না। যাতে বড় ছেলে নির্ভিঘ্নে সমৃদ্ধের পথে হাঁটতে পারে।

এই ভাগাভাগির ব্যাপারটা শুধু জমির মালিকানার ক্ষেত্রেই ব্যবহার হতো তা নয়, বরং বিভিন্ন দেশের শাসকেরাও এই নীতিটি অনুসরণ করত। এই কারণেই রাজ্যগুলোকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক সন্তানকেই কিছু কিছু করে দায়িত্ব দিয়ে দিত। এতে বড় সাম্রাজ্যগুলো ভেঙে পড়ছিল এবং অনেকগুলো ছোট রাজ্যের জন্ম হচ্ছিল। উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্সের কথা বলা যায়। ফ্রান্স সাম্রাজ্যটি ছোট ছোট অনেকগুলো কাউন্টিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যারা এই কাউন্টিগুলো শাসন করত, তাদেরকে বলা হতো ক্যাসটেলান। এমন অনেক ক্যাসটেলানও সেই সময়ে ছিল, যার হাতে হয়তো কেবলই একটামাত্র দুর্গ আর তার নিয়ন্ত্রণে থাকা জমিটুকুই ছিল। যেহেতু দুর্গগুলোকে আর বিভক্ত করা যায়নি, তাই একেকজন ক্যাসটেলানকে অন্তত একটি করে হলেও দুর্গের নিয়ন্ত্রণ দেয়া হতো। অতএব, বুঝাই যাচ্ছে রাষ্ট্রের কাঠামোটাই তখন ক্রমশ অনেক দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

এভাবে বাড়ির বড় ছেলেরা বাড়তি ক্ষমতা পাওয়ার কারণে প্রতিটি প্রজন্মেই দেখা যেত, এমন কিছু বনেদি লোক থেকে যাচ্ছে যাদের যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। আর সে সময়ে অন্য দেশ জয়ের ব্যাপারটিও সীমিত হয়ে পড়েছিল, ফলে যুদ্ধ করবার অবকাশও তেমন একটা ছিল না। ইউরোপিয়ানদের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

জন্য সর্বশেষ শত্রু ছিল ভাইকিংসরা। কিন্তু তারাও আর শেষ পর্যন্ত হুমকি ছিল না। কারণ, এগারো শতকে এসে তারা ইউরোপের অধীনে চলে এসেছিল। তাই তখন কাজ কর্ম নেই এই ধরনের নাইটদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়ে যাচ্ছিল।

তবে তীর্থযাত্রীদের এসব অভিযোগ ও ভোগান্তি জায়গামতো ঠিকই পৌছে গিয়েছিল। ১০৯৫ সালে পোপ দ্বিতীয় আরবান, ক্লেয়ারমন্ট নামক একটি ফরাসি ধর্মাশ্রমের বাইরে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি সেখানে সমবেত ফরাসি, জার্মানী এবং ইতালিয়ান নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, খ্রিষ্টান সমাজ এখন ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন। পবিত্র ভূমিতে তীর্থযাত্রায় গিয়ে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে অপমানিত ও অপদস্থ হয়েছে সেসব ইতিহাস তিনি সবাইকে জানান। সেই সাথে উপস্থিত সমবেত জনতাকে আহবান জানান, যাতে তারা জেরুজালেমের পবিত্র মাটি থেকে তুর্কিদেরকে বহিষ্কার করার জন্য সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। পোপ আরবান তার ভাষণে বলেন, যারা পূর্ব দিকে জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে এই অভিযানে অংশ নিবে তাদেরকে লাল রং এর একটি ক্রস চিহ্নিত পোশাক পড়তে হবে। সেটাই হবে তাদের প্রতীক। এই সমর অভিযানকে তিনি ক্রইসেদ নামে অভিহিত করেন। এই শব্দটি মূলত এসেছে ফরাসি ক্রস শব্দ থেকে। সেখান থেকেই খ্রিষ্টানরা অভিযানটিকে ক্রুসেড নামে আখ্যায়িত করেন।

জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে এই সামরিক অভিযানটিকে পোপ আরবান এক ধরনের তীর্থযাত্রা হিসেবে অভিহিত করেন, ফলে এই অভিযানটি একটি ধর্মীয় আকারও ধারণ করে। পোপের ক্ষমতা ও প্রভাবও মানুষের কাছে অনেক বৃদ্ধি পায়। আর সেই ক্ষমতাবলেই পোপ ঘোষণা করেন, 'যারা জেরুজালেমে যাবে এবং মুসলমানদেরকে হত্যা করবে তাদের অতীতের সকল পাপ মোচন হবে'।

অনেকেই নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারেন যে, এই ধরনের উন্মত্ত ঘোষণা বেপরোয়া নাইটদেরকে কতটা উজ্জীবিত করেছিল। আগেই বলা হয়েছে, এই নাইটরা যুদ্ধ করা ছাড়া কিছুই শিখেনি। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে তারা যুদ্ধ করার তেমন একটা সুযোগও পাচ্ছিল না। পোপ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে যুবকেরা, তোমরা পূর্বের দিকে জেরুজালেমে ছুটে যাও। তোমাদেরকে এত দিন যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, এত দিন পরে তা কাজে লাগানোর সুযোগ হয়েছে। সুতরাং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো। সেখানে গিয়ে তোমাদের পকেট ভর্তি করে স্বর্ণ ভরতে পারবে। যাও সেই ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নাও। কারণ, এই নিয়ন্ত্রণটি নেয়ার জন্যই তোমাদের জন্ম হয়েছে। আর তোমরা যদি কেউ এই অভিযানে গিয়ে মারা যাও, তাহলে জেনে রাখো তোমরা নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে।"

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ক্রুসেডাররা যখন প্রথমবারের মতো মুসলমান ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তখন তাদের উদ্দেশ্য ও সামর্থ্য সম্পর্কে মুসলমানদের তেমন কোনো ধারণাই ছিল না। প্রাথমিকভাবে মুসলমানরা অনুমান করেছিল, এসব অনুপ্রবেশকারীরা বলকান বেতনভোগী সেনা; যারা মূলত কন্সট্যানটিপোলের শাসকের সেবায় কাজ করে। তাদেরকে প্রথম যে মুসলমান শাসক মোকাবেলা করেন তিনি হলেন, সেলজুক রাজকুমার কিলিজ আরসালান। তিনি নিকেইয়ে নামক একটি শহর থেকে আনাতোলিয়া শাসন করতেন। কন্সট্যানটিপোল থেকে এই এলাকায় যেতেও তিন দিন সময় লাগত। ১০৯৬ সালের গ্রীষ্মের এক দিনে রাজকুমার আরসালান জানতে পারেন যে, এক দল অদ্ভুত ধরনের লোক তার রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এদেরকে অদ্ভুত বলার কিছু কারণও আছে। প্রথমত তাদের বাহ্যিক পোশাকটা ভিন্ন রকম ছিল। দেখতে ঠিক যোদ্ধার মতো মনে হতো না। আরসালান সময় নিয়ে তাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করলেন। তিনি জানতে পারলেন, এই লোকগুলো নিজেদেরকে ফ্রাংক বলে দাবি করে। যদিও তুর্কি ও আরবরা অবশ্য তাদেরকে বলত আল-ইফরাঞ্জ বা দ্য ফ্রাঞ্জ। এসব অনুপ্রবেশকারীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, তারা পশ্চিমের অনেক দূর থেকে এসেছে শুধু মুসলমানদেরকে হত্যা করে জেরুজালেমকে দখল করার জন্য। তবে জেরুজালেমের আগে প্রথমে তারা নিকেইয়ে নামক শহরটিকে দখল করতে চায়।

আরসালান তাদের আসার পথটি নিয়ে বেশ ভালোভাবে পর্যালোচনা করলেন এবং একটা পর্যায়ে তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললেন; সেই খ্রিষ্টান বাহিনীকে এমনভাবে পিষে ফেললেন, যেভাবে আমরা পিঁপড়াকে পিষে ফেলি। তিনি অসংখ্য অনুপ্রবেশকারীকে আটক করলেন এবং বাকিদেরকে তাড়া করে বাইজেন্টাইনে পাঠিয়ে দিলেন। গোটা বিষয়টা তিনি এত সহজে করে ফেললেন যে, ভবিষ্যতে একই দিক থেকে নতুন কোনো হুমকি আসবে বলে তিনি ধারণাই করেননি।

কিন্তু তিনি তখন জানতেন না, যে বাহিনীকে তিনি পরাজিত করেছেন তারা আসলে কিছুই না। মূল বাহিনীটি পরে আসছে, যারা মুসলমানদের কাছ থেকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকাটি পরবর্তী দুই শতাব্দীর জন্য কেড়ে নিবে। যখন পোপ আরবান খ্রিষ্টান অভিজাত শ্রেণির সামনে অনুপ্রেরণামূলক সেই ভাষণগুলো দিচ্ছিলেন, তখন পিটার ও হারমিট নামের দুজন ভবঘুরে ছিল যারা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে একই বার্তাই দিয়ে যাচ্ছিল। পোপ আরবান মূলত সম্ভ্রান্তদেরকে নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু পাপ মোচনের সেই সুযোগ সাধারণ খ্রিষ্টানরাই বা কেন হারাবে? তাই পিটার ও হারমিট সাধারণ খ্রিষ্টানদের মাঝে কাজ করেও বেশ সাড়া পাচ্ছিল। তারা একটি বাহিনী তৈরি করল যেখানে চাষী, শিল্পী, বণিক, নারী এমনকি শিশুরা পর্যন্ত যোগ দেয়ার সুযোগ পেল। তার বাহিনীটি মূল

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সেনাবাহিনী সংগঠিত হওয়ার আগেই সংগঠিত হয়ে গেল। আবার এভাবেও বলা যায় যে, তার বাহিনীর সেই অর্থে সংগঠিত হওয়ার মতো কোনো দরকারও ছিল না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা এমন ছিল যে, আমরা যেহেতু ঈশ্বরের কাজ করতে যাচ্ছি তাই সংগঠিত করাটা ঈশ্বরেরই দায়িত্ব। তার বাহিনীতে অপেশাদার সব সেনারা ছিল। যেমন : মুচি, কসাই, চাষী শ্রেণির লোকেরা বেশি পরিমাণে ছিল। তারাই ক্রুসেডের অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে নিকেইয়ে পৌঁছায় বলেই, কিলিজ আরসালানও তাদেরকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরবর্তী বছরে যখন আরসালান জানতে পারলেন যে ফ্রাঞ্জরা আবার আসছে- তিনি তখন মোটেও কোনো গুরুত্ব দেননি। কারণ, তিনি ভেবেছিলেন আগেরবারের মতো এবারও তিনি তাদেরকে সহজেই পরাস্ত করতে পারবেন। কিন্তু পরবর্তী বছরেই মূল যোদ্ধা অর্থাৎ নাইট এবং তীরন্দাজদের বাহিনীটি এল। আরসালান তার তীরন্দাজ বাহিনী নিয়ে তাদেরকে মোকাবেলা করলেন। কিন্তু নাইটরা আরসালান বাহিনীর সেই তীরকে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে বেশ ভালোভাবেই মোকাবেলা করল। যদিও সামনের পদাতিক কিছু সেনা সেই তীরের আঘাতে মারা গেল কিন্তু মূল সেনারা ভালোভাবেই বেঁচে গেল। যুদ্ধে তারা জয়ী হলো এবং আরসালানের শহরটি দখল করে নিল। আরসালান পালিয়ে গেলেন এবং অন্য এক জায়গায় গিয়ে তার আত্মীয়দের কাছে আশ্রয় নিলেন। এরপর নাইটদের বাহিনী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের একটি অংশ যায় এদেসার দিকে, আর বাকি অংশটি যায় ভূমধ্যসাগরীয় শহর আন্টিওকের দিকে।

বিপদের মুখে পড়ার পর আন্টিওকের রাজা বেপরোয়াভাবে দামেস্কের রাজার কাছে সাহায্য চাইলেন। তৎকালীন দামেস্কের রাজার নাম ছিল দাকুক। রাজা দাকুক সাহায্য করতে রাজিও ছিলেন, কিন্তু তিনি তখন নিজেই সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। কারণ, তার ভাই আলেপ্পোর রাজা তার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। তিনি এই সমস্যায় থাকার কারণে তার সেই সাহায্য পাঠাতে দেরি হয়। মসুলের রাজাও সাহায্য করতে রাজি হন কিন্তু তারও অন্য কিছু ঝামেলা ছিল। এই উভয় রাজা সময়মতো সৈন্য পাঠালে হয়তো ইতিহাস অন্য রকম হতো। কিন্তু বাস্তবতা হলো যখন তাদের সেনারা আন্টিওকের রাজাকে সহায়তা করার জন্য পৌঁছায় ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফলে তারা কোনো সাহায্য করার সুযোগ না পেয়ে আবার নিজ ভূমিতে ফিরে যায়। মুসলমানদের জন্য এই সময়গুলো ছিল ক্রুসেডের প্রাথমিক পর্ব। তখন একটার পর একটা শহর মুসলমানদের কাছ থেকে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। আন্টিওকের পতনের পর প্রতিশোধ হিসেবে নাইটেরা শহরে ঢুকে অনেক হত্যাযজ্ঞ চালায়। তারপর তারা আরও দক্ষিণে মারা শহরের দিকে তাদের অভিযান শুরু করে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

নিকেইয়ে এবং আন্তিওকের পতনের খবর পেয়ে মারা শহর আগেই বেশ ভীত অবস্থায় ছিল। তারাও জলদি তাদের ঘনিষ্ঠ ভাইদের কাছে সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠায়। কিন্তু তার সেই ভাইয়েরা মারা'র এই শাসকদের চেয়ে, পশ্চিমাদেরকেই বেশি পছন্দ করল। তারা ভাবল, পশ্চিমারা এসে আগে মারার শাসকদেরকে পরাজিত করুক, তারপর আমরা সুযোগ বুঝে শহরটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিবো। প্রতিবেশী শাসকদের এই ধরনের স্বার্থপর আচরণের কারণে মারার অধিবাসীদেরকে একাই ফ্রাঙ্কদের মোকাবেলা করতে হলো।

খ্রিষ্টান নাইটেরা এসে প্রথম মারা শহরকে অবরোধ করল যাতে শহরের অধিবাসীরা আটকা পড়ে যায় এবং এক সময়ে খাবারের সংকটেও পড়ে যায়। কিন্তু কৌশলটা তাদেরকেও ভীষণভাবে বিপদে ফেলল। কারণ, খাদ্যাভাবটা একসময় তাদেরকেও স্পর্শ করল। এটা স্বাভাবিকও ছিল। কারণ, তারা ছিল অনুপ্রবেশকারী আর এই এলাকাগুলোও তাদের খুব একটা পরিচিত ছিল না। তাই তাদেরকে কেউ খাবার দিয়ে সাহায্য করবে- তা ভেবে নেয়ার কোনো কারণ ছিল না।

অবরোধের কৌশলটা ফ্রাঙ্কদের জন্য মরণফাঁদ হয়ে ওঠল। তাই তারা মারা শহরে বার্তা পাঠাল। তারা সেখানকার মানুষকে আশ্বস্ত করল, যদি তারা শহরের প্রধান প্রবেশদ্বার খুলে দেয় এবং আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তারা তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। শহরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে শহরের দুয়ার খুলে দিলেন। কিন্তু এরপর খ্রিষ্টান নাইটেরা যা করল তা একাধারে জবাইয়ের তুলনায় অনেক বেশি নির্মম। মানবতার ইতিহাসে জঘন্যতম বর্বরতা দেখিয়েছিল সেই নাইটেরা। তারা মুসলমানদেরকে ধরে ধরে গরম পানিতে ফেলে দিত এবং স্যুপের মতো তাদেরকে সিদ্ধ করত। মুসলিম শিশুদেরকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়ে, বার-বি-কিউ -এর মতো করে খাওয়ার নিকৃষ্টতম ইতিহাসও তারা রচনা করে।

খ্রিষ্টানেরা অবশ্য বর্তমান সময়ে এসে দাবি করে যে তারা এসব করেনি এবং এগুলো সবই পরাজিত মুসলমানদের প্রোপাগান্ডা। তবে তা সত্য নয়। কারণ, শুধু আরব সূত্র থেকে নয়, ফ্র্যাংকিশদের কাছ থেকে আমরা যে ইতিহাস জানতে পারি তাতেও সেই বর্বরতার কথা রয়েছে। যেমন কায়েন এর রিডালফ, সেদিনের সেই সিদ্ধ পানিতে ফুটন্ত মুসলমানদের উপর রিপোর্ট লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'এমন নয় যে সেদিন আমাদের সৈন্যরা শুধু মৃত তুর্কি সেলজুকদের গোশত চিবিয়ে খেয়েছিল বরং তারা সেদিন কুকুর পর্যন্ত আহার করেছিল।' এই লাইনটিতে যে বিষয়টা আমার বেশি খারাপ লেগেছে তা হলো, সেলজুক তুর্কিদেরকে কুকুরের চেয়েও ছোট বলে কি ভয়াবহ অসম্মান করা হয়েছে। মুসলমানদের প্রতি সেই ফ্রাঙ্করা কি ভয়াবহ ঘৃণা পোষণ করত- এই ধরনের বর্ণনাগুলো তারই প্রমাণ দেয়। তারা আসলে মুসলমানদেরকে মানুষ বলেই মনে করত না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আশ্চর্য হলেও সত্য, এত নির্মমতার পরও তৎকালীন মুসলমান রাজ্যগুলো এক হতে পারেনি। হোমস শহরের রাজা বরং ফ্রাঙ্কদেরকে ঘোড়া উপহার দিলেন এবং পরামর্শ পাঠালেন যে, হোমস শহরে হাত না দিয়ে বরং তারা অন্য কোনো শহরকে দখল করে নিতে পারে। অন্যদিকে, ত্রিপোলির সুন্নি শাসকেরা তাদেরকে আমন্ত্রণ করলেন, যাতে তারা উভয়ে মিলে শিয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে জয় করে নিতে পারে। ফ্রাঙ্করা অবশ্য এই অনুরোধ বা পরামর্শ মানেনি বরং তারা উল্টো ত্রিপোলিকেই আগে দখল করে নেয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রথম ক্রুসেডাররা যখন এই অঞ্চলে পৌছাল, তখন মিসরের শাসক আল আফদাল বাইজেন্টাইন শাসককে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠিও পাঠিয়েছিলেন এবং সেই চিঠিতে তিনি ক্রুসেডারদের সাফল্যও কামনা করেন। মিসর এর আগে অনেক দিন ধরেই সেলজুক ও আব্বাসীয়দের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ছিল। তাই আল আফদাল মনে করেছিলেন, ফ্রাঙ্করা এই ব্যাপারে অর্থাৎ সেলজুক ও আব্বাসীয়কে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে তাকে সহায়তা করবে। তার এই ধারণাটি যে ভুল তা তিনি পরে বুঝতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কারণ, তার মিসরও তখন হাতছাড়া হওয়ার পথে। ফ্রাঙ্করা যখন আন্টিওক জয় করে, তখন প্রতিবেশী ফাতিমাইদ শাসক তাদেরকে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। যখন ফ্রাঙ্করা ত্রিপোলির বিরুদ্ধে অভিযান চালায়, তখন আল আফদাল এটাকে কাজে লাগিয়ে জেরুজালেমকে ফাতিমাইদের নিয়ন্ত্রণে আনার পরিকল্পনা করে। তিনি জেরুজালেমে ফাতিমাইদ গভর্নর নিয়োগ দেয় এবং ফ্রাঙ্কদেরকে জানায় এখন থেকে জেরুজালেম তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন। ফ্রাঙ্করা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে তার অধীনে থাকা জেরুজালেমে খ্রিষ্টানেরা সম্মানের সাথে তীর্থযাত্রায় আসার সুযোগ পাবে। কিন্তু ফ্রাঙ্করা পাল্টা চিঠিতে তাকে জানায় 'জেরুজালেম রক্ষায় তাদের কারও কোনো সাহায্যের দরকার হবে না। তারা জেরুজালেমকে নিরাপদে রাখার জন্য নয় বরং দখল করার জন্যই এসেছে।'

এরপর ফ্রাঙ্করা মোটামুটি নির্বিঘ্নেই একের পর এক শহর দখল করতে থাকে। তাদের বর্বরতা আর যুদ্ধ জয়ের ইতিহাস তখন মানুষের মুখে মুখে। তাই খুব কম শহরের মানুষই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সাহস দেখিয়েছিল। ছোট শহরগুলোর অধিবাসীরা নিজেরাই তাদের শহর ছেড়ে বড় শহরগুলোতে আশ্রয় নেয়। কারণ, বড় শহরগুলোতে প্রতিরক্ষা দেয়ালটি একটু উঁচু থাকে। জেরুজালেমের প্রতিরক্ষা দেয়ালটি একটু বেশি উঁচুই ছিল কিন্তু সেখানেও ফ্রাঙ্করা সেই একই চাল চালে যে, তোমরা শহরের দরজা খুলে দাও। আত্মসমর্পণ কর আমরা কারো কোনো ক্ষতি করব না। বলা বাহুল্য যে, সেবারও মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের বর্বর ফাঁদে পা দিতে কোনো ভুল করেনি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

জেরুজালেম দখল করে খ্রিষ্টান সেনারা যে পৈশাচিকতা দেখিয়েছিল, তা তাদের ইতঃপূর্বের সকল বর্বরতাকে ম্লান করে দেয়। একজন ক্রুসেডার তার জেরুজালেম জয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছে, 'রাস্তায় শুধু মানুষের কাটা মস্তক, হাত ও পার স্তূপ দেখা যেত। খ্রিষ্টানেরা এতটা নির্বিচারে জবাই করেছিল যে, তাদের পায়ের হাঁটু অবধি মানুষের রক্তে ডুবে গিয়েছিল।' অন্যদিকে, ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন জেরুজালেম জয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ক্রুসেডাররা মাত্র দুদিনে ৭০ হাজারেরও বেশি মুসলমানকে হত্যা করেছিল। এটা ছিল মুসলমানদের শহর কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শহরে একজন মুসলমানও আর জীবিত ছিল না'।

শহরে যে ইহুদিরা ছিল তাঁরাও এই নির্মমতায় স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা সবাই গিয়ে তাদের মূল উপাসনালয়ে (সিনাগগে) আশ্রয় নেয়। ক্রুসেডাররা সেই উপাসনালয়ের দরজাকে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে ভেতরের সবাইকে আগুন জ্বালিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে।

শহরের খ্রিষ্টানেরাও খুব একটা স্বস্তিতে ছিল না। কারণ, তাদের কেউই রোমান পোপ বা চার্চকে মানত না। তারা অনুসরণ করত প্রাচ্যের চার্চগুলোকে। বিশেষ করে গ্রিক, আর্মেনিয়ান, কপটিক বা নেস্তোরিয়ান ঘরানার খ্রিষ্টীয় রীতিনীতিকে অনুসরণ করত। অনুপ্রবেশকারী ফ্রাঙ্করা তাদেরকে চিহ্নিত করে প্রথমে আলাদা করে। তারপর তাদের সকলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে জোর করে অন্যত্র নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়।

ক্রুসেডারদের অবস্থান

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার বিষয়টা ফ্রাঙ্কদের জন্য নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে দেয়। বিজয়ী ক্রুসেডাররা জেরুজালেমকে নতুন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করে। ক্রুসেডাররা সেই সময়ে নতুন করে চারটি রাজ্য দখল করে। এগুলো হলো আন্টিওক, এডেসা, ত্রিপোলি এবং জেরুজালেম। তবে এগুলোর মধ্যে জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণটি তাদের জন্য অনেক বেশি সুখকর ও গর্বের বিষয় ছিল।

তবে নতুন এই চারটি ক্রুসেডার রাজ্য গঠন করার পর এগুলোকে নিয়ে এক ধরনের অচলাবস্থাও তৈরি হলো, যা পরবর্তী কয়েক দশক ধরেই জারি থাকে। এই সময়ে ক্রুসেডারদের সাথে বিভিন্ন মুসলমান গ্রুপের সংঘর্ষ ও বিবাদ জারি থাকে। বেশ কিছু যুদ্ধও হয়। এগুলোর কিছু যুদ্ধে যেমন ফ্রাঙ্করা জয়ী হয় আবার কিছু যুদ্ধে তারা পরাজিতও হয়। মুসলমানদেরকে বিপর্যস্ত করে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেরাও বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্করা নিজেদের মধ্যেও সংঘাতে জড়িয়ে যায়; ঠিক যেমনটি ইতঃপূর্বে মুসলমানদের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। অনেক সময় ফ্রাঙ্করা প্রতিবেশী মুসলমান শাসকদের সাথে আঁতাতও করে, যাতে করে তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রাঙ্কদেরকে পরাজিত করতে পারে।

যেমন একটি যুদ্ধে আন্টিওকের খ্রিষ্টান রাজা টানক্রেড মসুলের মুসলিম রাজা আমির জাওয়ালিকে মোকাবেলা করেন। সেই যুদ্ধে টানক্রেডের মোট সেনাদলের এক তৃতীয়াংশই ছিল তুর্কি মুসলিম সেনা। যাদেরকে টানক্রেড আলেপ্পোর মুসলিম শাসকের কাছ থেকে ধার নিয়েছিল। তৎকালীন আলেপ্পো শাসক আবার অ্যাসাসিন এবং ক্রুসেডার- উভয় গ্রুপের সাথেই সম্পর্ক রেখে চলতেন। অন্যদিকে, আমির জাওয়ালি যে বাহিনী গঠন করেছিলেন সেখানেও অনেক ফ্রাঙ্ক নাইটেরা ছিল, যাদেরকে তিনি এদেসার ফ্রাঙ্ক শাসক বালদউয়িনের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, উভয়েই ফ্রাঙ্ক ও ক্রুসেডার হলেও বালদউয়িনের সাথে টানক্রেডের ছিল দা-কুমড়োর সম্পর্ক।

অন্যদিকে, মুসলমানদের মধ্যেও কোনো ধরনের কোনো একতার ছিটেফোঁটাও ছিল না। অধিকাংশ মুসলমান ক্রুসেডারদের সাথে চলমান সংঘর্ষের মধ্যে আদর্শিক কোনো দায়বদ্ধতা খুঁজে পাচ্ছিল না। তাদের মনে হচ্ছিল, তারা মুসলমান হিসেবে নয়, ব্যক্তি হিসেবেই আক্রমণের শিকার হয়েছেন। তারা ফ্রাঙ্কদেরকে ভয়ংকর সংকট হিসেবে বিবেচনা করেন কিন্তু এর কোনো কারণ বা অর্থ বুঝতে ব্যর্থ হন। ফলে তারা অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েই সময় পার করেন। যেমনটা, ভূমিকম্প বা ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা করে থাকি।

এটা সত্য যে, জেরুজালেমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডাররা বর্বরতম গণহত্যা চালানোর পর কিছু কিছু মুসলিম নেতারা ক্রুসেডারদের আক্রমণকে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

একটি অবৈধ অনুপ্রবেশ হিসেবে বর্ণনা করে। একে ধর্মীয় যুদ্ধের মাধ্যমে মোকাবেলা করার কথা বলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নতুন করে জিহাদের ডাক দেন এবং জিহাদের তাৎপর্যগুলোকে বর্ণনা করে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। কিন্তু তা মুসলমানদের মধ্যে কোনো চেতনা জন্মাতে পারেনি, উত্তেজনাও বাড়াতে পারেনি। কারণ, অনেক বছর ধরে জিহাদের নামগন্ধ না শুনতে শুনতে তাদের ভেতরে এর আবেদনও অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছিল। তাই মুসলিম নেতাদের মুখে জিহাদের ডাক বরং অনেকের কাছেই খেয়ালি আহবান বলেই মনে হয়েছিল।

জিহাদ কথাটার প্রয়োগ মুসলমানদের মধ্যে কমে আসার একটা কারণ ছিল, ইসলামের দ্রুত প্রসারতা। ইসলাম একটা সময়ে খুব দ্রুত অগ্রসর হওয়ায়, অনেক বেশি সংখ্যক মুসলমানরা একটা সময়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে সরে যায়। কারণ, অনেক দিন ধরেই নতুন করে কোনো শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা করার প্রয়োজন পড়েনি। তা ছাড়া ইসলামের প্রথমদিকে একটা চেতনা ছিল যে, গোটা বহিঃদুনিয়ার বিরুদ্ধে ইসলাম। অর্থাৎ পৃথিবীর যে অংশটায় ইসলাম নেই, সেখানে যে অশান্তি অস্থিরতা, ইসলাম তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে। কালক্রমে সেই চেতনাটি পালটে গিয়ে ক্রুসেডারদের আগমনের সময়গুলোতে মুসলমানদের মধ্যে যে চেতনা বিদ্যমান ছিল তা হলো, 'চারপাশের দুনিয়া যেমন, ইসলামকে সে ভাবেই পালন কর।' ফলে ইসলাম তার বৈপ্লবিক চেতনা অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। মুসলমানদের কারও কারও মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে যেসব ধারণা বা স্মৃতি ছিল তা হলো নিছক প্রাপ্তির গল্প। যেমন কোনো যুদ্ধে মুসলমানরা কেনো রাজ্য জয় করেছিল, কি সম্পদ পেয়েছিল ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামের যে আদর্শিক চেহারা বা যে আদর্শকে কায়েম করার জন্য পূর্বসূরি মুসলমানরা বাতিলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তা ক্রুসেডের সমসাময়িক মুসলমানরা ভুলেই গিয়েছিলেন; অথচ সেটাই ছিল প্রকৃত ইসলাম।

মুসলমানদের মধ্যকার নানা বিভ্রান্তির বেড়াজালে যে গোটা উম্মাহ্র মধ্যেকার ঐক্যই বিনষ্ট হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। আর সেই কারণেই ফ্রাঙ্করা যখন এই এলাকায় তাদের নোংরা খেলা শুরু করল, তখন অনেক মুসলমানই তাদেরকে সহায়তা করেছিলেন। তবে সবাই যে স্বাচ্ছন্দ্যে এই সহায়তাটুকু জারি রেখেছিলেন তাও নয়। তবে অন্য সবার থেকে অ্যাসাসিনরা অনেক বেশি সক্রিয় ছিল। আর তাদের কার্যক্রম ছিল অনেকটাই পর্দার আড়ালে।

ক্রুসেড শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে হাসান সাবাহ সিরিয়াতে অন্য এক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দিয়ে তার বাহিনীর কার্যক্রম শুরু করেন। ক্রুসেডারদের কাছে সিরিয়া

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অঞ্চলের এই অ্যাসাসিন নেতাটি 'ওল্ড ম্যান অব দ্য মাউন্টেন' বা পর্বতশৃঙ্গের বৃদ্ধ পুরুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ক্রুসেড যখন শুরু হয় তখন অ্যাসাসিন ছাড়া আর যত ধরনের বা গোত্রের মুসলমান ছিল সবাই অ্যাসাসিনদের শত্রুতে পরিণত হয়। প্রতিটি ক্ষমতাসীনই তাদেরকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করে। শিয়া, সুন্নি, সেলজুক, তুর্কি, ফাতিমাইদ, আব্বাসীয় সবাই ছিল অ্যাসাসিনদের শত্রু। অন্যদিকে, ক্রুসেডাররা যখন এই এলাকায় আক্রমণ করে তখনো তাদের শত্রু তালিকায় ছিল এই শিয়া, সুন্নি, সেলজুক, তুর্কি, ফাতিমাইদ, আব্বাসীয়দেরাই। যেহেতু অ্যাসাসিন ও ক্রুসেডারদের শত্রু তালিকা মোটামুটি একই ছিল, অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য অনেকটা অভিন্ন ছিল। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই অ্যাসাসিনদের সাথে ক্রুসেডারদের একটি সখ্যতা গড়ে ওঠে।

ফ্রাঙ্কদের আক্রমনের পর এক শতাব্দী, এভাবেই চলে গেল। এর মধ্যে যতবারই মুসলমানদের মধ্যে কোনো একতা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ বা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, ততবারই অ্যাসাসিনরা সক্রিয় হয়েছে। সেইসাথে একতা সৃষ্টির জন্য যারা কাজ করছিলেন, তাদেরকে হত্যা করে তারা সেই প্রক্রিয়াটি ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে।

১১১৩ খ্রিষ্টাব্দে মসুলের গভর্নর একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। যেখানে আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার মুসলমান নেতারা দাওয়াত পান। এরা সকলে মিলে ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য যৌথ অভিযান নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সম্মেলনটি শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে, আয়োজক গভর্নর সাহেব একদিন মসজিদে যাচ্ছিলেন। তখনই এক ছদ্মবেশী ভিক্ষুক তার পিছু নেয়। সেই ভিক্ষুক গভর্নরের কাছে গিয়ে জামার আস্তিন থেকে এমন ভঙ্গিমায় হাত বের করে যাতে মনে হয় যে, সে ভিক্ষা চাইছে। কিন্তু আসলে সে ছুরি বের করে গভর্নরের শরীরকে আঘাত করতে করতে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে সেই ঐক্য সম্মেলনটি আর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

১১২৪ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাসাসিনরা তৎকালীন সময়ের দ্বিতীয় শীর্ষ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে হত্যা করে। যিনি কিনা ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য মুসলমানদেরকে আহবান জানিয়ে যাচ্ছিলেন। পরের বছর সেই অ্যাসাসিন গ্রুপের সদস্যরাই সুফির ছদ্মবেশ ধারণ করে আরও একজন জিহাদের বার্তা প্রচারকারীকে হত্যা করে।

১১২৬ সালে অ্যাসাসিনরা হত্যা করে আলেপ্পো আর মসুলের প্রভাবশালী রাজা আল বরসোকিকে। এই রাজা আলেপ্পো আর মসুলের মতো দুটো বড় শহরকে একত্রিত করে সিরিয়ার অভ্যন্তরে মুসলমানদের একটি বড় অংশকে একীভূত

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বরসোকি খুবই সতর্কতার সাথে চলাফেরা করতেন। তিনি জানতেন অ্যাসাসিনরা তাকে হত্যা করতে পারে তাই তিনি জামার নিচে বর্ম পরিধান করতেন। কিন্তু তাকে হত্যা করে ছদ্মবেশী সুফিরা। হত্যাকারীদের একজন তাকে বাগে পেয়েই অন্য হত্যাকারীদেরকে বলে 'ওর মাথায় আঘাত কর'। হত্যাকারীরাও জানত যে তিনি শরীরে বর্ম পরিধান করেন। তাই তারা তার গলাকে এফোড়-ওফোড় করে দেয়। বরসোকির হত্যাকাণ্ডের সাথে সাথে, তাঁর সন্তান সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নিয়ে নেন কিন্তু অ্যাসাসিনরা তাঁকেও হত্যা করে। এরপর মসুল আর আলেপ্পোর সিংহাসনের জন্য চারজন ব্যক্তি দাবি করে এবং এক পর্যায়ে তারা নিজেরাই ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যায়।

ক্রুসেডারদের সময়ে অ্যাসাসিনেরা এভাবেই অগণিত হত্যাকাণ্ড চালায়। অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড এমনও ছিল, সেগুলো যে অ্যাসাসিনরাই করেছে তা আর প্রমাণ করা যায়নি। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, সন্ত্রাসী গ্রুপরা একটা সময়ে গিয়ে আর সরাসরি হত্যায় জড়িত হয় না। এখনও এমন কিছু ঘটনা দেখা যায় যা, সেই সময়ে অ্যাসাসিনরা করত। যদি কোনো হত্যা তাদের পক্ষে যেত তাহলে তারা সরাসরি জড়িত না হলেও হত্যার দায় নিয়ে নিত। যদিও তারা তাদের হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন প্রমাণাদি বা তালিকা সংরক্ষণ করত। তবে বাইরের কেউ তা দেখার সুযোগ না পাওয়ায় সেই প্রমাণাদি সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। মঙ্গল জাতির যোদ্ধারা ১২৫৬ সালে অ্যাসাসিনদেরকে সম্পূর্ণরূপে যখন ধ্বংস করে, তখন তারা তাদের সব নথিপত্র নষ্ট করে দিয়ে যায়। ফলে আজ পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি যে অ্যাসাসিনরা আসলে কতগুলো হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করতে পেরেছিল। গল্পে আর কথনে জানা যায়, তারা একটা দীর্ঘ সময়ে ইতিহাসের ওপর আঁচড় দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তারা কেন ক্রুসেডারদেরকে সাহায্য করত তাও আর কখনো জানা যায়নি।

এক ঝাঁক মুসলিম নেতার মাধ্যমে ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠতে শুরু করল-যারা একজন আরেকজনের তুলনায় যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন। এদের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন তুর্কি জেনারেল জাঙ্গি। যিনি মসুল শাসন করেছিলেন। এরপর আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণও নিয়ে নেন এবং আরও অনেকগুলো শহর দখল করে নিজেকে সিরিয়ার একক শাসক হিসেবে দাবি করেন। তার শাসনটি ছিল বিগত ৫০ বছরের মধ্যে প্রথম একটি শাসন, যা একক শহরের রাষ্ট্রীয় গণ্ডির থেকে বেরিয়ে এসে একটি বহু শহরীয় রাষ্ট্রকাঠামো নিয়ে লেভান্ট অঞ্চলে (মেসোপোটামিয়া এবং মিসরের মধ্যবর্তী অঞ্চল) একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

জাঙ্গির সেনারা তাকে খুবই পছন্দ করত, কারণ তিনি আদতে নিজেই একজন সৈনিক ছিলেন। তিনি তার অধীনস্ত সৈন্যদের মতোই রুক্ষ ছিলেন। ওরা যা খেতো, তিনিও তাই খেতেন। তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের সত্যিকারের শত্রু হলো ফ্রাঙ্ক এবং সেকারণেই তিনি এই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালান। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তিনি শুরুতেই তার দরবার থেকে তোষামোদকারী ও দুষ্কৃতকারদেরকে বের করে দেন। এর পরপরই তিনি সেনাবাহিনী থেকেও নারী গুপ্তচরদেরকে বহিষ্কার করেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি গোটা সিরিয়া জুড়ে অসংখ্য তথ্যদাতা ও অপপ্রচারকারীকে নিয়োগ দেন, যাদের মাধ্যমে তিনি তার শাসনের গতিবিধি নির্ধারণ করতেন।

১১৪৪ সালে জাঙ্গি এদেসা জয় করেন। এই জয় তাকে মুসলিম বিশ্বের নায়কের মর্যাদা দেয়। এদেসা খুব বড় শহর ছিল না। কিন্তু এদেসা হলো সেই শহর যা ক্রুসেডাররা প্রথম এসে দখল করেছিল। তাই ক্রুসেডারদের হাত থেকে এটা পুনরুদ্ধার করায় মুসলমানরা যারপরনাই স্বস্তি পেল। এদেসা জয় করার পর ক্রুসেডারদের হাতে আর মাত্র তিনটি শহর থাকল। তার এই জয়ের খবর ইউরোপে পৌঁছে গেল এবং তারা হতাশায় নিমজ্জিত হলো। যদিও পশ্চিম ইউরোপের কিছু শাসক দ্বিতীয় ক্রুসেড করারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা আর সফল হতে পারেনি।

জাঙ্গি যেসব প্রচারকারীকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছিলেন, তারা জিহাদের বার্তা নিয়েই মুসলমানদেরকে এক করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্যক্তি জাঙ্গির চারিত্রিক সীমাবদ্ধতার কারণে তার দেয়া জিহাদের ডাকে মুসলমানদের এক হওয়ার প্রক্রিয়াতে তেমন একটা সাড়া মেলেনি।

তার ছেলে নুরুদ্দিন উত্তরাধিকারী হয়ে সিংহাসনে আসীন হয়। তার বাবার যেসব সীমাবদ্ধতা ছিল, সেগুলো থেকে নুরুদ্দিন অনেকটাই মুক্ত ছিল। নুরুদ্দিন একদিকে যেমন তার পিতার সামরিক দক্ষতা অর্জন করেছিল, ঠিক তেমনি সে ছিল একজন মার্জিত, কূটনৈতিক শিষ্টাচারবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি আলেমদেরকে ডেকে মুসলমানদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য ধর্মীয় ধারা (সুন্নি ইসলাম) অবলম্বনের পরামর্শ এবং জিহাদকে তাদের জীবণের মূল লক্ষ্য করার জন্য তাগিদ দেন। তিনি তার নিজের সম্পর্কে এমন একটি ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন, যেখানে মানুষ অনুভব করে যে নুরুদ্দিন জাঙ্গি কোনো অহংকারের বশে নয়, সম্পদ বানানোর জন্য নয় বা ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, বরং উম্মাহ্‌র জন্যই জিহাদে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি মুসলমানদের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মধ্যে উম্মাহ্'র চেতনাকে জাগ্রত করেন এবং জিহাদী কৌশলকে এমনভাবে প্রয়োগ করেন, যা তার জন্য সত্যিকারের একটি রাজনৈতিক বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। আব্বাসীয়দের

এক সময় এই মহান শাসকের চোখ পড়ে সালাহউদ্দিন ইউসুফ বিন আইউবের দিকে। যিনি সালাদিন নামেই ইতিহাসে বেশি পরিচিত হয়েছেন। সালাদিন ছিলেন নুরুদ্দিনের একজন শীর্ষ সামরিক জেনারেলের ভাতিজা। ১১৬৩ সালে নুরুদ্দিন সালাদিনের চাচাকে মিসর জয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ফ্রাঙ্কদের হাত থেকে মিসরকে উদ্ধার করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। জেনারেল মিসর যাওয়ার সময় নিজের ভ্রাতৃষ্পুত্রকে সাথে নিয়ে যান। তিনি বেশ সফলভাবেই মিসর জয় করেন। কিন্তু এর পরপরই তিনি ইন্তেকাল করেন। সালাদিন মিসরে তার স্থলাভিষিক্ত হন। প্রশাসনিকভাবে মিসর তখনও ফাতিমাইদ খলিফারাই শাসন করতেন। কিন্তু সত্যিকারের ক্ষমতা চলে এল সালাদিনের হাতেই। মিসরের খেলাফতের দরবারও সালাদিনকে নতুন উজির হিসেবে বরণ করে নিল। এটা যে তারা খুব ইতিবাচকভাবে নিয়েছিল তাও কিন্তু নয়। আসলে সালাদিনের বয়স ছিল তখন মাত্র ২৯ বছর। তাই তারা ধারণা করেছিল, অল্প বয়সের প্রভাবে ও অনভিজ্ঞতার কারণে সালাদিন অনেক ভুল করবেন এবং তাঁকে তারা ইচ্ছেমতো চালাতে পারবে।

সালাদিন যত দিন তার চাচার আওতাধীন ছিলেন তত দিন তিনি তার যোগ্যতার খুব কমটুকুই দেখিয়েছেন। যুদ্ধের প্রতি তার যে অদম্য আগ্রহ ও যোগ্যতা তার কোনো কিছুই সেই সময়ে তিনি প্রদর্শন করেননি। সালাদিন মিসরের দায়িত্ব নেয়ার পরপরই নুরুদ্দিন তাঁকে ফাতিমাইদ খেলাফতকে ধ্বংস করার আদেশ দিলেন। এই আদেশে সালাদিন ব্যথিত হলেন। কারণ, তখন যেই ফাতিমাইদ খলিফা মিসরে শাসন করছিলেন তিনি এমনিতেও শুধু নামেই শাসন করছিলেন। সালাদিন সেই খলিফার হাহাকারও বেশ বুঝতে পারতেন। তারপরও সালাদিন নুরুদ্দিনের হুকুম ঠিকই তামিল করলেন। তিনি এমনভাবে সেই ফাতিমাইদ খেলাফতের পতন ঘটালেন, খলিফা নিজেও বুঝতে পারেননি, কখন কী হয়ে গেল। এক জুমার দিন সালাদিন মসজিদে দাঁড়িয়ে আব্বাসীয় খেলাফতের পক্ষে দায়িত্ব নিয়ে ভাষণ দিলেন। কেউ তার ভাষণের কোনো প্রতিবাদ করল না। এভাবেই ফাতিমাইদ খেলাফতের পতন হয়ে গেল। সর্বশেষ ফাতিমাইদ খলিফা ভালোমতো কিছু বুঝে উঠার আগেই উপলব্ধি করলেন, তিনি খলিফা থেকে সাধারণ একজন নাগরিকে পরিণত হয়ে গিয়েছেন এবং তার রাজতন্ত্রেরও পতন ঘটেছে। তিনি ইন্তেকাল করার পর সালাদিন মিসরের একক শাসকে পরিণত হলেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

...শুরু হলো নিজের নেতার সাথে সালাদিনের দ্বন্দ্ব। নুরুদ্দিন সালাদিনকে বেশ ...বৈঠকে ডাকলেন, কিন্তু সালাদিন নানা অজুহাত দাঁড় করিয়ে ...লাতে অনুপস্থিত থাকলেন। কখনও বললেন, তার বাবা অসুস্থ, আবার ...বললেন তিনি নিজেই শারীরিকভাবে দূর্বল- এগুলো বলে তিনি নুরুদ্দিনের ...দেখা করা থেকে বিরত থাকলেন। সালাদিন এমনটা করছিলেন, কারণ তিনি ...নুরুদ্দিনের সাথে দেখা হলেই তাদের মধ্যে বিবাদের জন্ম হবে। কারণ, ...দিন সালাদিন নিজেই নুরুদ্দিনের চেয়ে বড় প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী হয়ে ...ছেন। নুরুদ্দিনের চেয়ে সালাদিন তখন অধিকতর বড় রাষ্ট্র শাসন করেন। আর ...জনগণের কাছেও তিনি নুরুদ্দিনের চেয়ে অধিক গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিত্বেও ...হয়েছেন। তাই তিনি নুরুদ্দিনের মৃত্যু পর্যন্ত জেনে বুঝেই তাঁর সাথে এক ...দূরত্ব তৈরি করলেন। নুরুদ্দিনের মৃত্যুর পর সালাদিন নিজেকে মিসর ও ...রিয়ার রাজা ঘোষণা করলেন। নুরুদ্দিনের কিছু কিছু ভক্ত অবশ্য সালাদিনের ...সমালোচনা করলেন, তারা তাঁকে বেঈমান বলেও আখ্যায়িত করলেন। কিন্তু তারা ...দিনের কোনো স্থানেই জায়গা করে নিতে পারেননি। কারণ, মুসলমানরা ...সালাদিনকেই তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করল।

সালাদিন ছিল একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব। তার ছিল তীব্র শ্রবণক্ষমতা ও সুচতুর ...দক্ষতা। যখন তিনি হাসতেন তার আশেপাশে আলোড়ন পড়ে যেত। তিনি ...সদকা করতেন। আচরণে ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। কিন্তু স্বভাবে ছিলেন ...সংযত। কেউ তার উপর জোর খাটাতে পারত না। তিনিও তার অধীনস্ত ...দের ওপরে জুলুম করতেন না। তিনি সামরিক নেতা হিসেবেও ভালো ছিলেন। ...র সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল এটাই যে, জনগণ তাঁকে প্রচণ্ড ভালোবাসত।

সালাদিন এতটাই নরম হৃদয়ের মানুষ ছিলেন যে, খারাপ কোনো সংবাদ পেলে ...অনেক সময়ই তিনি কেঁদে ফেলতেন। তিনি প্রায়শই আতিথেয়তা আর দয়াময়তার ...রাতে বের হতেন। একবার একজন ফ্রাঙ্ক মহিলা তার কাছে বিধ্বস্ত অবস্থায় ...এসে অভিযোগ করলেন যে, ডাকাতরা তার মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে ...এবং তিনি জানেন না এখন তিনি কী করবেন। সালাদিন তৎক্ষণাৎ সেই মেয়েকে ...খুঁজে বের করার জন্য সৈন্য পাঠালেন। তারা সেই মেয়েকে একটি দাসী বাজারে ...খুঁজে পেলেন এবং মেয়েটিকে সেখান থেকে কিনে নিয়ে তার মায়ের কাছে পৌঁছে ...দিলেন। মা-মেয়ে উভয়েই এরপরে ফ্রাঙ্ক ক্যাম্পে ফিরে যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে সালাদিন ছিলেন নান্দনিক মানসিকতার। নিজের ব্যাপারে ...তিনি ষোল আনাই উজাড় করে দিতে চাইতেন, তবে অন্যের কাছ থেকে ততটা ...প্রত্যাশা করতেন না। তিনি সত্যিকারার্থেই একজন ধার্মিক ছিলেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অ্যাসাসিনরা সালাদিনকে হত্যা করতে অনেক চেষ্টা করেছিল। পরপর দুবার তারা তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণও করেছিল। একবার তিনি মাথায়ও আঘাত পেয়েছিলেন তবে তিনি চামড়ার গলা বন্ধনী এবং মাথায় হেলমেট পড়ে থাকায় সেই যাত্রায় বেঁচে যান। এই দুই দফা আক্রমণের পর সালাদিন অ্যাসাসিনদেরকে সমূলে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অ্যাসাসিনদের মূল দুর্গও দখল করেন। কিন্তু তারপর...

কিছু একটা ঘটেছিল। আজ অবধি কেউ জানেনা সেদিন আসলে কি ঘটেছিল। কেউ কেউ বলে, তৎকালীন অ্যাসাসিনদের সিরিয়া শাখার প্রধান সিনান, সালাদিনের মামাকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। যেখানে সে হুমকি দেয়, যদি তাদের দুর্গের উপর থেকে অবরোধ প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে তার পরিবারের সকল সদস্যকে পর্যায়ক্রমে হত্যা করা হবে। অন্যদিকে, অ্যাসাসিনদের একটি সূত্র জানায় যে, সেদিন মধ্যরাতে যখন সালাদিন তাঁবুতে তার প্রতিরক্ষা বলয়ের মধ্যেই ঘুমুচ্ছিলেন তখন হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় এবং তিনি দেখতে পান একটি ছায়া তার তাবুর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল এবং তার বালিশের উপর একটি পিন দিয়ে একটি কাগজ লাগানো যাতে লেখা ছিল 'আপনি আমাদের ক্ষমতার আওতায়ই আছেন।' এই ঘটনাটার কোনো গ্রহণযোগ্য সূত্র পাওয়া যায় না। এমনও হতে পারে অ্যাসাসিনদের শক্তি সম্বন্ধে লোকমুখে যে ধারণা ছিল, তাকে আরও দৃঢ় করার জন্যই এই ধরনের গল্প ছড়ানো হয়েছে। যদিও অ্যাসাসিনদের কৌশল সালাদিনের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছিল এবং দুই দফা চেষ্টা করেও তারা সালাদিনকে হত্যা করতে পারেনি। বরং তাদের ব্যর্থতায় সালাদিনের দুর্জয় ও দুর্ভেদ্য ক্ষমতা ও শক্তিরই জয় হয়েছে।

সালাদিন এরপর খুব সতর্কতার সাথে পা ফেলেন। তার মানুষকে একতাবদ্ধ করার এবং শত্রুর সাথে সহৃদয় আচরণের মাত্রা এর পরবর্তী সময়ে আরও বেড়ে যায়। তিনি ক্রুসেডারদের হাত থেকে কোনো ধরনের রক্তপাত ছাড়াই, অধিকাংশ শহরই পুনরুদ্ধার করেন। এই শহরগুলোকে তিনি অবরোধ, অর্থনৈতিক চাপ এবং সমঝোতার কৌশলের মাধ্যমেই করায়ত্ত করেন। ১১৮৭ সালে যখন তিনি চূড়ান্তভাবে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হন। তখন তিনি শান্তিপূর্ণভাবে শহরের ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার জন্য ফ্রাঞ্জদের কাছে চিঠি পাঠালেন। সেই চিঠিতে তিনি বলেন, যেসব খ্রিষ্টানেরা তাদের সম্পত্তি নিয়ে চলে যেতে চায় তারা চাইলে যেতে পারবে। অন্যদিকে, যারা থাকতে চাইবে তারা থেকেও নিজ নিজ ধর্মকর্ম করতে পারবে। খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় স্থানগুলোকে নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং তীর্থযাত্রীরা যখন তখন আসতে ও যেতে পারবে। ফ্রাঞ্জরা এরপরও জেরুজালেমকে ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি। কারণ, জেরুজালেম ছিল তাদের জন্য আত্মসম্মানের স্থান।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই জেরুজালেমের জন্যই খ্রিষ্টানেরা ক্রুসেড করেছিল। তাই তারা এতো সহজে শহরের কর্তৃত্ব ছাড়তে চায়নি। সালাদিনের হাতেও আর কোনো উপায় থাকল না। তিনি জেরুজালেমকে অবরোধ করলেন এবং শহরটি দখল করে নিলেন। আর তারপরে তিনি জেরুজালেমের বাসিন্দাদের সাথে সেই আচরণই করলেন যা ইতোপূর্বে খলিফা উমর (রা.) করেছিলেন। তিনি কোনো গণহত্যা চালালেন না, কোনো জোর জবরদস্তিও নয়। বরং যাদেরকে আটক করা হয়েছিল তাদেরকেও মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়া হয়।

সালাদিনের এই মহত্বের পরও তাঁর জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের ঘটনাটি ইউরোপে খুবই নেতিবাচকভাবে প্রচার করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীনের ইউরোপের প্রভাবশালী রাজারা মিলে তৃতীয় ক্রুসেডের পরিকল্পনা করেন। এই রাজাদের মধ্যে একজন ছিলেন জার্মানির ফ্রেডরিক বারবারোসা-যিনি পবিত্র ভূমি জেরুজালেমের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়ার কিছু পরেই পানির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে ডুবে যান। আরেকজন ছিলেন ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ। তিনি অবশ্য পবিত্র ভূমিতে পৌঁছেছিলেন। আক্রে বন্দরও জয় করেন এবং তারপর বিপর্যস্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসেন। আর তৃতীয় জন ছিলেন ইংরেজ রাজা প্রথম রিচার্ড। যিনি জনগণের কাছে সিংহহৃদয় নামে পরিচিত ছিলেন। রিচার্ড খুব ভালো মানের যোদ্ধা ছিলেন, তাই তার সফল হয়েই ঘরে ফেরার খায়েশ ছিল। তিনি তার প্রতিশ্রুতির কিছুটা ব্যত্যয় ঘটান এবং যুদ্ধে জেতার জন্য যা প্রয়োজন তাই করেন। তিনি এবং সালাদিন প্রায় এক বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। রিচার্ড অবশ্য প্রধান যুদ্ধটিতে বিজয়ী হয়েছিলেন। এত কিছুর পর ১১৯২ সালে তিনি যখন চূড়ান্তভাবে জেরুজালেম অবরোধ করেন, তত দিন তাঁর শরীরে অসুস্থতা বাসা বাঁধে। এই খবর পেয়ে সালাদিন তাকে তাজা ফলমূল পাঠান এবং অপেক্ষা করছিলেন সেই সময়ের জন্য, যখন রিচার্ড বুঝবেন যে জেরুজালেম জয় করার মতো লোকবল তার হাতে আর নেই। আসলেই এক সময় রিচার্ড এই সত্যটা বুঝতে সক্ষম হন। শেষমেস রিচার্ড সালাদিনের সাথে কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে সমঝোতা করেন। চুক্তির মধ্যে ছিল মুসলমানরা জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণ করলেও খ্রিষ্টান উপাসনালয়গুলোকে নিরাপদে রাখবে। খ্রিষ্টানদেরকে শহরে বাস করতে ও নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মচর্চা করতে দেবে এবং খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীরা যখন তখন আসতে বা যেতে পারবে। তিনি যুদ্ধে আংশিক বিজয় লাভ করেছেন এবং বেশ কিছু সুবিধা আদায় করতে পেরেছেন, এই বার্তা নিয়ে রিচার্ড নিজ দেশে ফিরে আসেন। তিনি আরও দাবি করেন, তার কারণেই সালাদিন খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে নমনীয় হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো রিচার্ড সে বিষয়গুলোই আদায় করতে পেরেছিলেন, যেগুলো সালাদিন শুরু থেকেই দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই পরিণতির কারণে তৃতীয় ক্রুসেডের আশানুরূপ কোনো ফলাফল পাওয়া গেল না। ১২০৬ সালে খ্রিষ্টানেরা চতুর্থ ক্রুসেড করারও চেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা সেই ক্রুসেড নিয়ে পবিত্র ভূমি পর্যন্ত যেতেই পারেনি। কারণ, যাওয়ার পথেই বিভিন্ন শহর দখল করতে গিয়ে বিশেষ করে কন্সট্যান্টিনোপল পার হওয়ার সময় তারা নিজেদের চার্চগুলোকে পর্যন্ত কলুষিত করে ফেলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে ইউরোপে ক্রুসেডের গোটা চেতনাটাই মুখ থুবড়ে পড়ে আর এক সময় তা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়।

ইতিহাসবিদরা দুইশ বছরে সর্বমোট ৮টি ক্রুসেড হয়েছে বলে দাবি করেন। কিন্তু আদতে এর মধ্যে অনেকগুলো ক্রুসেডই হয়েছে, কেবল অভিযান শুরু করা আর ফিরে আসার মধ্যে। বরং কথাটা এভাবে বলা যায়, ক্রুসেডটি ২০০ বছর টিকে ছিল! এর মধ্যে তখনই কিছু নড়াচড়া হয়েছে যখন বেশ কয়েকজন রাজা মিলে কোনো একটা পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করেছেন। এই ২০০ বছরে ইউরোপিয়ানদের জন্য ক্রুসেড ছিল একটা চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিটি পরিবারেই প্রতিটি প্রজন্মের দুই-একজন ক্রুসেডে অংশ নিয়েছে। আবার তারা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসতে না আসতেই হয়তো আরেকটি ক্রুসেডের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

প্রথম ক্রুসেডের সময় নাইটদের অস্বাভাবিক বীরোচিত কর্মকাণ্ডের ফলে চারটি শহর খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। সেই সফলতার পর থেকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স বা জার্মানি সব সময় একদল সেনা প্রস্তুত রাখত। তারা যেকোনো সময় পূর্বদিকের পবিত্র ভূমিতে অভিযানে যেতে পারে। এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো মজুদ সৈন্য হিসেবে থাকতে থাকতেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। কেউ হয়তো তার জীবনের অল্প কয়েক বছর এই অভিযানে থাকার সুযোগ পেয়েছে, বেশ কিছু অর্থ সম্পদও বানিয়ে নিয়েছে এবং তাই নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। ক্রুসেডাররা বেশ কিছু পাথরের মজবুত দুর্গও বানিয়েছিল। কিন্ত সব কিছুর পরও পবিত্র ভূমিতে তারা কখনোই স্থায়ীভাবে থাকতে পারেনি, সেখানে তাদের অবস্থান সব সময়ই অস্থায়ী ছিল।

আজকের দিনে এসেও অনেক কট্টরপন্থী বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতির আলোকে সেই ক্রুসেডকে সভ্যতার সংঘাত হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আরব ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলমানরা কখনোই ক্রুসেডারদেরকে উন্নত সভ্যতা হিসেবে বিবেচনা করেনি। এমনকি তারা ক্রুসেডকে ইসলাম ও খ্রিষ্টানবাদের মধ্যকার সংঘাত হিসেবেও দেখেনি। বরং তারা একে স্বাভাবিক একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবেই দেখেছে। উসামা বিন মুংকিধ নামের এক

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আরব রাজকুমার ফ্রাঙ্কদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'ওরা পশুর মতো। মারামারি বা যুদ্ধ করতে পারা ছাড়া ওদের আর কোনো যোগ্যতাই নেই। পশুদের মধ্যে যেমন আক্রমণাত্মক বা আগ্রাসীভাব থাকে, তেমনি ওদের মাঝেও আছে। তাই হয়তো ওরা কিছু জায়গাতে সফলও হয়েছে'।

ক্রুসেডারদের ব্যাপারে মুসলমানরা এতটাই বিরক্ত ছিল যে, তারা পারলে বাইজেন্টাইদের প্রশংসা করেছে কিন্তু কোনো ক্রুসেডারের নয়। মুসলমানদের কাছে আল রোম (বাইজেন্টাইন) আর আল ফ্রাঙ্ক ছিল দুটো ভিন্ন জিনিস। মুসলিমরা ক্রুসেডের এই সংঘাতময় সময়টিকে ফ্রাঙ্ক ওয়ার বা ফ্রাঙ্কদের যুদ্ধ হিসেবেই আখ্যায়িত করে থাকে।

যেসব এলাকায় মুসলমানরা ফ্রাঙ্কদের আক্রমণ ও হুমকির শিকার হয়েছিল, সেসব এলাকার মুসলমানরা কখনো ফ্রাঙ্কদের আক্রমণগুলোকে তাদের ইসলামি চেতনা বা বিশ্বাসের উপর আঘাত হিসেবেও বিবেচনা করেনি। আর বাস্তবতা এমনই যে, যদিও ক্রুসেডাররা পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার মুসলমানদের জন্য একটি সংকটের কারণ ছিল, তথাপি তারা কখনোই মুসলিম বিশ্বে গভীরভাবে প্রবেশ করার চেষ্টা করেনি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ক্রুসেডারদের কোনো দল কখনো মক্কা বা মদিনার দিকে অগ্রসর হয়নি। ক্রুসেডাররা কখনো বাগদাদ (আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী)-কে অবরোধ করেনি কিংবা তারা কখনো ঐতিহাসিক পারস্য রাজ্যের ভেতরেও অনুপ্রবেশ করেনি। এর পাশাপাশি খোরাসান, বাক্ট্রিয়া এবং ইন্দুস উপত্যকায় যে মানুষেরা থাকত তারাও কোনোদিন ক্রুসেডারদের থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হননি। এমনকি তাদের অনেকেই ক্রুসেডারদের সম্বন্ধে জানতেনও না।

উপরন্তু পশ্চিম ইউরোপের বিষয়েও মুসলমানদের মধ্যে কোনো কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারেনি। কেউই জানতে চায়নি, ক্রুসেডাররা কারা, তারা কোথা থেকে এসেছে, কেনইবা এসেছে? ১৩ শতকের গোড়ার দিকে, ইহুদি থেকে মুসলমান হওয়া একজন ব্যক্তি যার নাম রাশিদ আল দীন ফাজলুল্লাহ, 'কালেকশন অব দ্য হিস্টোরিস' নামে একটি বই লিখেন। সেই বইটিতে তিনি চীনের ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, তুর্কিদের উপাখ্যান, ইহুদি ইতিহাস, ইসলামপূর্ব পারস্যের ইতিহাস, হযরত মোহাম্মাদ ﷺ-এর ইতিহাস, খেলাফতের ইতিহাস এবং ফ্রাঙ্কদের ইতিহাসকে সন্নিবেশিত করেন। তবে সেই বইটিতেও ফ্রাঙ্ক সম্বন্ধে যে আলোচনা পাওয়া যায় তা খুব একটা প্রমাণভিত্তিক নয়। এক কথায় বলতে গেলে, ক্রুসেডাররা ইসলামিক বিশ্বে তাদের খ্রিষ্টান সংস্কৃতির কোনো ভাইরাসই প্রবেশ করাতে পারেনি। প্রভাবটা পড়েছিল একেবারেই অন্যভাবে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সেই প্রভাবটি হলো, ক্রুসেডের কারণেই ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের জন্য লেভান্ট ও মিসর অঞ্চলের বিরাট বাজার খুলে যায়। যুদ্ধের সময়গুলোতে পশ্চিম ইউরোপের সাথে মধ্যে পৃথিবীর বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলে তখন থেকেই ইংল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রাচ্যের অনেক দ্রব্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়। বিশেষ করে ইউরোপের লোকেরা তখনই প্রথম প্রাচ্যের বাদাম, কালোজিরা, নানা ধরনের মসলা, সিল্ক, সুতিসহ নানা ধরনের কাপড় দেখার ও উপভোগ করার সুযোগ পায়।

আরব অঞ্চল থেকে নিজ ভূমিতে ফিরে গিয়ে স্থানীয় লোকদের কাছে ইউরোপীয় বণিকেরা, তীর্থযাত্রীরা এবং ক্রুসেডাররা কেবল যে মুসলিম বিশ্বের শান শওকত নিয়েই কথা বলত তা নয়। বরং আরও দূরের নানা অঞ্চল বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের নানা এলাকার কথাও তাদেরকে জানাত। এই গল্পগুলোই প্রচার হতে হতে ইউরোপিয়দের মাঝে এই না দেখা অঞ্চলগুলো সম্বন্ধে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করে। যার প্রভাব পরবর্তী বছরগুলোতে আরও স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়।

অন্যদিকে, মধ্যপৃথিবীতে যদিও ক্রুসেডের প্রভাব অনেকটাই ম্লান হয়ে পড়ছিল কিন্তু কেউই জানত না যে, তাদের জন্য আসলে আরও বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করছিল।

পূর্বদিক থেকে আক্রমণ

মঙ্গল জাতির জন্ম হয় মধ্য এশিয়ায়। সেই এলাকায় গাছ গাছালি কম, শুধু ছিল বিরাট ধু ধু প্রান্তর। মাটি ছিল শক্ত ধরনের আর নদীর সংখ্যাও ছিল অনেক কম। ভৌগলিক পরিবেশের কারণেই তাদের পক্ষে কৃষিকাজ করাটা বেশ কঠিন ছিল। তবে তারা মূলত ভেড়া, মেষ, ঘোড়া পালন করত। তাই মঙ্গলরা বেঁচেই থাকত গোশত, দুধ ও পনির খেয়ে। তারা গোবর পুড়িয়ে জ্বালানি তৈরি করত আবার পশুর দুধকেই প্রক্রিয়াজাত করে নেশাজাত পণ্য বানিয়ে, তা দিয়ে নেশা করত। বসবাসের জন্য তাদের কোনো একক শহর ছিল না। তারা সব সময়ই তাদের বসতি স্থানান্তরিত করত। অনেকটা তাঁবুর আদলে ঘর তৈরি করে তারা ঘুমাত। এই ধরনের তাঁবুগুলোর সুবিধা ছিল এগুলোকে যখন তখন খুলে ফেলা যেত এবং যেকোনো অবস্থায় সরেও পড়া যেত।

মঙ্গলদের সাথে ঐতিহাসিকভাবেই তুর্কিদের এক ধরনের নৈতিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক সাদৃশ্য ছিল। ইতিহাসবিদরাও প্রায়শই এই দুই জনগোষ্ঠীকে একত্রে তুর্কো-মঙ্গল জাতি হিসেবে অভিহিত করত। পার্থক্যটি ছিল মূলত অবস্থানগত দিক দিয়ে। তুর্কিরা একটু পশ্চিমের দিকে আবাস গড়ে আর মঙ্গল বসতি গড়ে পূর্বে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এর আগে বিগত কয়েকটি শতাব্দীতে এই ধরনের অনেকগুলো বেদুইন জাতিরা সফল কিছু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। আবার অনেকে নিগৃহীতও হয়েছিল। তাই গোত্রগুলোর মধ্যে যে নৈতিকতার বন্ধন ছিল, তা এরই মধ্যে অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্য থাকাকালীন সিয়াং-নু নামের তুর্কি-মঙ্গল গ্রুপ এতটাই ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল যে, তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য তৎকালীন একীভূত চীনা সাম্রাজ্যের প্রথম রাজাকে, দশ লাখ লোককে খাটিয়ে চীনের ঐতিহাসিক প্রাচীর রাতারাতি নির্মাণ করতে হয়েছিল। এই প্রাচীরের কারণে তারা প্রাচ্যে আর ঢুকতে না পারলেও পশ্চিমের দিকে ঠিকই অগ্রসর হয়। ইউরোপে যখন তারা প্রবেশ করে তখন তাদের নাম হয়ে যায় দ্য হুনস্। আত্তিলার অধীনে থেকেই তারা রোমের দিকে অগ্রসর হতে হতে একটা সময় বিলীন হয়ে যায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বেশ কিছু তুর্কি জাতি কিছু ঝামেলা করেছিল। একটা পর্যায়ে তাদেরকে দক্ষিণের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আরও পরে তারা গাজনাভিদ এবং সেলজুক হিসেবে মুসলিম সাম্রাজ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

মঙ্গলরা কয়েক শতাব্দী ধরে চৈনিক বিশ্বে তাদের প্রভাব জারি রাখে। চীনা রাজ পরিবারগুলোও নানা ধরনের ভর্তুকি দিয়ে তাদেরকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে। কখনো কখনো চীনা নেতৃত্ব মঙ্গলদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে বিবাদ লাগিয়েও ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে।

৫৬০ হিজরির দিকে (১১৬৫ খ্রিষ্টাব্দ) মেধাবী ও তেজদীপ্ত তেমুজিন জন্ম নেন। ইতিহাসে এই ব্যক্তিই 'চেঙ্গিজ খান' নামে পরিচিত। পশ্চিমারা অবশ্য বলে জেংঘিস খান- যার অর্থ বিশ্বজনীন শাসক। তবে তার ক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রথম বিচ্ছুরণ ঘটে, তার বয়স ৪০ বছর হওয়ার পর।

চেঙ্গিজের পিতা মঙ্গলদের একটি গোত্রের নেতা ছিলেন। কিন্তু চেঙ্গিসের বয়স যখন মাত্র ৯ বছর তখন তিনি খুন হন। তার সমর্থকরা ছন্নছাড়া হয়ে যায়, আর তার পরিবারের উপরও কঠিন সময় নেমে আসে। বেশ কয়েক বছর চেঙ্গিজ, তার মা আর ছোট ভাইবোনেরা মিলে বনে বাঁদাড়ে পালিয়ে থাকেন এবং বন্য ফল খেয়েই জীবন ধারণ করেন। তার বাবার হত্যাকারীরা জানত, যদি চেঙ্গিজ বেঁচে থাকে তাহলে সে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। আর সেই কারণেই তারা চেঙ্গিজকে হন্য হয়ে খুঁজতে থাকে। ফলে গোটা শৈশবটাই চেঙ্গিজকে পালিয়ে বেড়াতে হয়। একবার তিনি ধরাও পড়েছিলেন, কিন্তু কোনো রকমে শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে আসেন। তার জীবনের একমাত্র অভিপ্রায় ছিল তার পিতার হত্যাকারীদেরকে শাস্তি দেয়া।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

চেঙ্গিসের সাথে ঘটনা পরিক্রমায় নোকার্স নামক কিছু ব্যক্তিদের সাথে সখ্যতা হয়। পারসিয়ান ভূখণ্ডে এই মানুষগুলোর সাথে চেঙ্গিসের দেখা হয়েছিল। নোকার্স মানে ভাড়াটে সহযোগী। কিন্তু চেঙ্গিসের সময়ে এদেরকে বলা হতো কমরেড। এই নোকার্সরা একক কোনো গোত্রের অধিভুক্ত ছিল না। তাদের মধ্যেও বিভাজন ছিল। কিন্তু তাদেরকে এক করে রাখার কৃতিত্ব কেবল চেঙ্গিজ খানের। এভাবে বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে ব্যক্তি ক্যারিশমায় এক জায়গায় নিয়ে আসতে আসতে কালানুক্রমে চেঙ্গিজ খান এমন একটি সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তি তৈরি করেন, যার প্রতি সকল গোত্রই আনুগত্য প্রদর্শন করে। ফলে তিনি গোটা মঙ্গলকে একক একটি জাতির কাঠামো দিয়ে নিজেই তার নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে নেন।

৬০৭ হিজরিতে (১২১১ খ্রিষ্টাব্দে) চেঙ্গিজের নেতৃত্বে মঙ্গলরা চীনের সুং রাজ্যে হামলা চালায় এবং তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ৭ বছর পর ৬১৪ হিজরিতে (১২১৮ খ্রিষ্টাব্দে) চেঙ্গিজের মঙ্গলরা মধ্যপৃথিবীর সীমানায় প্রবেশ করে।

সেই সময়ে মধ্য পৃথিবীর অবস্থাও বেশ অন্যরকম ছিল। সেলজুকরা মুসলিম বিশ্বকে জয় করার পর অন্যান্য তুর্কি গোত্রের লোকেরাও সেখানে আসে এবং নানাভাবে তুর্কিদের বিজয়ের নিশান প্রদর্শন করতে শুরু করে। তারা রাজ্যের সব বড় বড় স্থাপনা ও অর্জনগুলোকে নিজেদের মতো করে বানিয়ে নেয়। ঠিক এ রকমই একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ট্রানজোজিয়ানা নামক একটি এলাকায়। যা বেশ বড় একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে পৌছানোর ইঙ্গিতও দিচ্ছিল। সেই রাজ্যটিকে তখন বলা হতো খোরাজাম-শাহর রাজ্য। রাজ্যের রাজা আলাউদ্দিন মোহাম্মাদ নিজেকে খুবই উঁচু মানের সামরিক নেতা মনে করতেন। তার আত্মঅহংকারের জায়গা থেকে তিনি মঙ্গলদেরকে খুব ভালোমতো শিক্ষা দিতে চাইলেন। সেই পরিকল্পনা মোতাবেক তিনি মঙ্গলদের আশ্রয়ে থাকা ৪৫০ জনের একটি বণিক দলকে দিয়েই তার খেলা শুরু করলেন। তিনি প্রথমে সেই বণিকদেরকে গুপ্তচর হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। একজন বাদে তাদের সবাইকে হত্যা করলেন এবং তাদের মালামাল কেড়ে নিলেন। ইচ্ছে করেই তিনি একজনকে হত্যা করেননি, যাতে সে বেঁচে ফিরে গিয়ে চেঙ্গিজের কাছে এই খবরটি দিতে পারে। আসলে আলাউদ্দিন ইচ্ছে করেই বিপদ ডেকে আনতে চাইছিলেন।

মঙ্গল নেতা চেঙ্গিজ খবরটি পেয়ে তিনজন দূতকে আলোচনা করার জন্য, আলাউদ্দিনের কাছে পাঠালেন। খুব সম্ভবত এটাই শেষ বার, যখন আমরা ইতিহাসের পাতায় চেঙ্গিজকে এতটা সদয় দেখতে পাই। কিন্তু আলাউদ্দিন বিরাট ভুল করে বসলেন। তিনি চেঙ্গিজের এই সদয় আচরণকে পাত্তা না দিয়ে তার একজন দূতকে হত্যা করলেন। আর বাকি দুজনকে তাদের মুখে দাড়ি তুলে ফেলে, ফেরত পাঠালেন। সেই সময়ে, কারও মুখের দাড়ি তুলে নেয়ার

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মতো অপমান আর কোনো কিছুতে হতো না। আলাউদ্দিন নিজেও এটা জানতেন কিন্তু তিনি ইচ্ছে করেই এই অন্যায় আচরণটি করেছিলেন। কারণ, তিনি চাইছিলেন চেঙ্গিজের সাথে যুদ্ধ করতে আর অবশেষে এরই ফলে ৬১৫ হিজরিতে (১২১৯ খ্রিষ্টাব্দে) শুরু হয় সেই ঐতিহাসিক বিপর্যয়।

আমরা প্রায়শই মঙ্গল হোলোকাস্ট এর কথা শুনি। আর সেই কথা শুনলেই আমাদের চোখে ভেসে উঠে অসংখ্য নির্যাতিত মানুষের আর্তনাদ আর গগনবিদারী চিৎকার। আসলে হরূড আর কিছু নয়, এটা একটা তুর্কি শব্দ যার অর্থ হলো মিলিটারী ক্যাম্প। সত্যি কথা বলতে কী, মঙ্গলদের হাতে যে অনেক বিশাল সেনাবাহিনী ছিল, তা কিন্তু নয়। তারা মূলত যুদ্ধগুলোতে জয়লাভ করেছে কারণ তাদের সামরিক কৌশল ভালো ছিল। তাদের মধ্যে এক ধরনের উম্মাদনা ও গতি ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের মধ্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও এর ব্যবহার বেশি ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যখন তারা কোনো শহর অবরোধ করত, তখন তারা অবরোধ আরোপের জন্য খুব ভালো মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত; যেগুলো তারা চীন থেকে সংগ্রহ করেছিল। তারা খুব উন্নতমানের ধনুক ব্যবহার করত। মঙ্গলদের ধনুকগুলোতে কয়েক স্তরের কাঠ আঠা দিয়ে লাগানো থাকত। ফলে সভ্য জগতের অন্যান্য দেশে যেসব ধনুক ব্যবহার করত তার তুলনায় মঙ্গলদের ধনুকগুলো অনেক বেশি মজবুত ছিল। মঙ্গলরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করত। আর তাদের ঘোড়ায় চড়ার দক্ষতা এতটাই বেশি ছিল, যারা তাদের দেখেছে তারা অনেকেই মনে করত যে মঙ্গলরা বোধ হয় অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক ঘোড়া। তাদের ব্যবহৃত ঘোড়াগুলো অতিরিক্ত দ্রুতগামী আবার আকারেও অনেকটা ছোট। ফলে মঙ্গল সেনারা পা দিয়েই ঘোড়াটাকে বাগে নিয়ে রাখতে পারত। তারা ঘোড়ার একটি সাইডে ঝুলে থেকে ঘোড়ার পেটের নিচ দিয়ে তীরও ছুঁড়তে পারত। ফলে বাস্তবতা এমনই ছিল যে ঘোড়াগুলো তাদের জন্য এক ধরনের প্রতিরক্ষা বর্ম হিসেবেও কাজ করত। মঙ্গলরা দিনরাত সব সময় ঘোড়ার চড়তে পারত, ঘুম আসলে ঘোড়ার জীন ধরেই ঘুমিয়ে যেত। তাই কোনো একটি শহর জয় করার পর কোনো ধরনের বিশ্রাম না নিয়ে তারা এত দ্রুত আরেকটি শহরে আক্রমণ করতে যেত যে, মনে হতো তাদের গায়ে কোনো আলৌকিক শক্তি এসে ভর করেছে। কিছু কিছু সময় মঙ্গলরা তাদের বাহিনীতে খালি ঘোড়াও বহন করে নিয়ে আসত, যাতে দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে তাদের সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশি। আসলে এটা তাদের এক ধরনের যুদ্ধ কৌশল ছিল।

৬১৫ হিজরির যুদ্ধে (১২১৯ খ্রিষ্টাব্দে) আলাউদ্দিন মোহাম্মাদ তার পক্ষে চেঙ্গিজ খানের চেয়ে বেশি সৈন্য জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা বেশি হলেও তা তার পক্ষে ভালো কোনো ফলাফল আনতে পারেনি। চেঙ্গিজ সেই বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং আলাউদ্দিন কোনো রকমে জান নিয়ে পালিয়ে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যান। এরপর খাওয়ারিজমিতে তুর্কিস সেনাদের মধ্যে আর যে কয়জন সেনা জীবিত ছিল, তারাও একটু পশ্চিমে সরে গিয়ে গুন্ডাবৃত্তি শুরু করে। সেখানকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। তাদের কর্মকাণ্ডে ক্রুসেডাররা বরং উপকৃত হয়। চেঙ্গিজ খান অক্সাস নদীর তীরবর্তী ট্রানজোজিয়ানা এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং বোখারার মতো বিখ্যাত শহরকে ধ্বংস করে ফেলে। এই বোখারাতেই ঘটনার দুই শত বছর পূর্বে পারসিয়ান সাহিত্যের নবজাগরণ ঘটেছিল। চেঙ্গিজ খান এরপরে প্রাচীন শহর বালখকেও ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। বালখ শহরটি পরিচিত ছিল 'শহরায়ণের মাতা হিসেবে'। চেঙ্গিজ খান শহরটি শুধু ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হননি, এই শহরের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরিটাকে দখল করে গোটা লাইব্রেরিটাকেই অক্সাস নদীতে ডুবিয়ে দেন। যার ফলে কয়েক হাজার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি পানিতে ভেসে যায়।

তারপর তিনি অগ্রসর হন খোরাসান এবং পারস্যের দিকে। এই দুই শহরে মঙ্গলরা স্রেফ গণহত্যা চালায়। এই গণহত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে মুসলিম ইতিহাসবিদ সায়ফি হেরাভি বলেন, মঙ্গলরা যখন নিশাপুর শহরে প্রবেশ করে তখন তারা আনুমানিক ১৭ লাখ ৪৭ হাজার মানুষকে হত্যা করে। তারা সেখানকার শুধু মানুষ নয় বরং কুকুর বিড়ালকে পর্যন্ত হত্যা করে। পার্শ্ববর্তী হেরাত শহরে মঙ্গলদের গণহত্যায় প্রায় ১৬ লাখ মানুষ মারা যায়। পারসিয়ান ইতিহাসবিদ জুযজানির মতে হেরাতে ২৪ লাখ মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল। তবে এই সংখ্যা অতিরঞ্জিত। কারণ, হেরাত বা নিশাপুরে সেই আমলে এতো লোক বসবাসই করত না। ফলে এত বেশি খুন হওয়ার কারণও নেই। তবে অগণিত নিরীহ মানুষ যে চেঙ্গিজ বাহিনীর হাতে মারা পড়েছিল তাতেও কোনো সন্দেহ নাই।

মোঙ্গলরা যখন মুসলিম বিশ্বে প্রবেশ করে তখন অনেক মুসলমানই তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে পালিয়ে যায়। অবশ্য তাদের এ ছাড়া কিছু করারও ছিল না। আর এই সুযোগে মঙ্গলরা মাইলের পর মাইল আবাদী জমি, শস্য পুড়িয়ে ফেলে। তাদের বর্বরতার উদ্দেশ্য ছিল যাতে এসব নিপীড়নের কাহিনী মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, এটাও তাদের একটি যুদ্ধ কৌশলেরই অংশ ছিল। তাদের প্রত্যাশা ছিল এসব গল্প শুনে আশেপাশের শহরগুলোর মানুষেরাও ভয়ে সরে পড়বে। ফলে তারা বড় কোনো যুদ্ধ ছাড়াই এই শহরগুলো দখল করে নিতে পারবে।

যেমন : তারা আফগানিস্তানের একটি শহর দখল করেছিল যেটি আজকের দিনে এসে শারি ঘোলঘোলা হিসেবে পরিচিত। এখনও এই শহরে গেলে আপনি বালি আর কাঁদার স্তুপ দেখতে পাবেন। এগুলোর ভেতরে অসংখ্য লাশেরও সমাধি রয়েছে। এটাই বাস্তবতা যে মঙ্গলরা যখন হেরাতের মতো বড় বড় শহরগুলো দখল করে নিচ্ছিল তখন সেখানকার অনেক মানুষই পালিয়ে কয়েকশ মাইল দূরে চলে গিয়ে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। শারি ঘোলঘোলাতে যত

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কবর রয়েছে তার সবগুলোই এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের নয়। বরং এর নিরঙ্কুশই হলো সেই শরণার্থীদের কবর, যারা এতো দূরে এসেও মঙ্গলদের নৃশংসতার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি।

কেউ আসলে জানে না, সেই সময়গুলোতে কত লোক মারা গেছে। কারও পক্ষে তো যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লাশ গণনা করাও সম্ভব হয়নি। তবে সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও লাশের স্তূপ দেখে সহজেই ধারণা করা যায়, মুসলমানদের ওপর সেই সময় মঙ্গলরা কতটা ভয়ানক গণহত্যা চালিয়েছিল। এর আগে সেলজুক বা তুর্কিদের ব্যাপারেও আমরা বর্বরতার কথা শুনেছি। তবে মঙ্গলদের বর্বরতা আর পাশবিকতা অতীতের সকলকেই ছাড়িয়ে যায়।

সংখ্যা নিয়ে কম বেশি হলেও ঘটনার সত্যতা নিয়ে কোনো বির্তক নেই। ৬৫৮ হিজরিতে (১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে) দুটি ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। একটি হলো বাগদাদে আর অন্যটি দিল্লিতে। এই দুটো জায়গাতেই বর্বরতার ভয়ংকর উপাখ্যান সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে জানা যায়। দুজন ইতিহাসবিদ বিষয়টি নিয়ে লিখে গেছেন। তারা কেউ কাউকে চিনতেন না তবে তারা মোটামুটি একই সময়ে কাজ করেছেন। তারা দিল্লি থেকে বাগদাদে চষে বেড়িয়ে মানুষের কাছ থেকে শুনে এই বর্ণনাটি রচনা করেছেন।

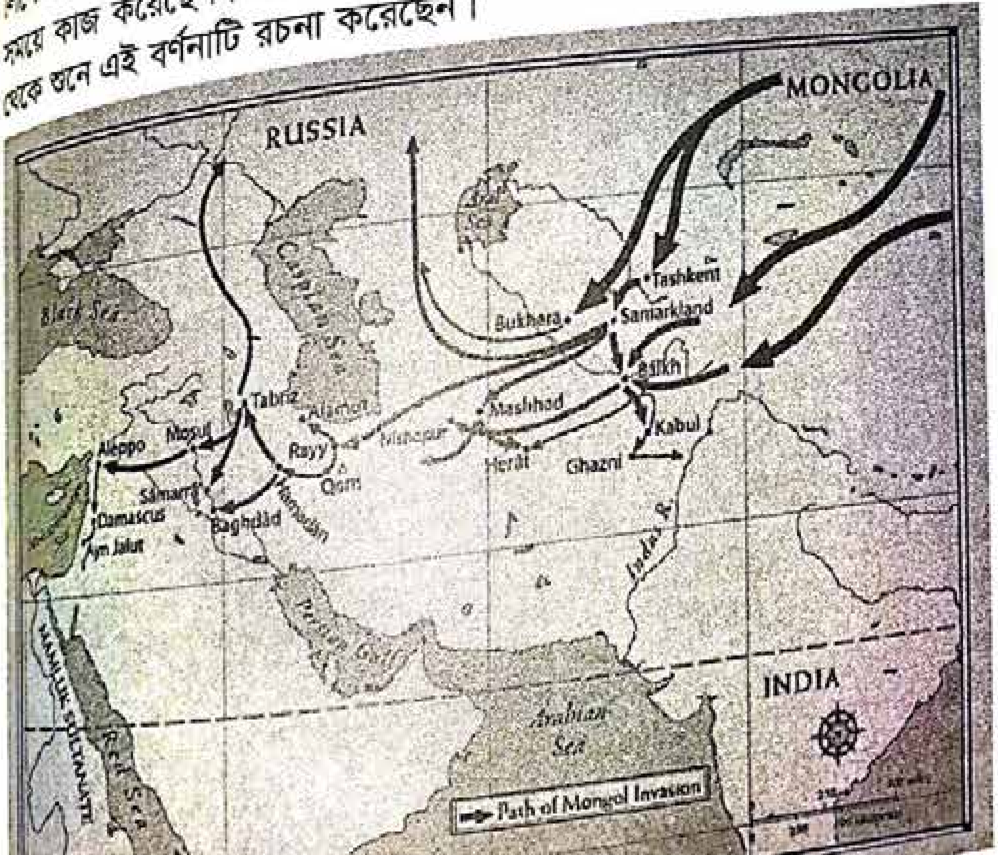

মুসলিম বিশ্বে মোঙ্গলদের আক্রমণ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যখন মঙ্গলরা পারস্য আক্রমণ করে তখন অন্য অনেক কিছুর সাথে প্রাচীনতম খাল কানাতকেও ধ্বংস করে। পারস্যের মতো নদীহীন অঞ্চলে এই খালের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এটা ছিল তাদের জীবনের স্পন্দন। কিছু কিছু খালকে অবকাঠামোগতভাবেই নষ্ট করা হয়, কিছু অংশে বালি ভরাট করা হয়। এমনভাবে কাজটি করা হয় যে, খালটি খনন বা সংস্কারের আর কোনো উপায় ছিল না। আরব ভূগোলবিদ মঙ্গলদের আক্রমণের কয়েক বছর পূর্বে পশ্চিম ইরান, উত্তর আফগানিস্তান এবং অক্সাস নদীর তীরবর্তী প্রজাতন্ত্র নিয়ে লিখে গেছেন। তার বর্ণনায় তখন এই জায়গাগুলো ছিল উর্বর ও প্রসারমান। আর মঙ্গলদের আক্রমণের পর একই জায়গা রীতিমত মরুভূমিতে পরিণত হয় এবং এখনও এলাকাটা সে রকম মরুভূমিই আছে।

মঙ্গলদের সব ধ্বংসাত্মক কাজের দায় নেয়ার জন্য চেঙ্গিজ খান অবশ্য দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন না। তিনি ৬২৪ হিজরিতে (১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্যটি তার পুত্র ও নাতিদের মাঝে ভাগ হয়ে যায়। তারা এরপরও হোলকাস্ট চালায়। মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রগুলোর দায়িত্ব পড়ে চেঙ্গিসের নাতি হালাকুর হাতে। যেহেতু চেঙ্গিসের মৃত্যুর সময়ও গোটা মুসলিম বিশ্ব মঙ্গলরা জয় করতে পারেনি, তাই হালাকু দায়িত্ব নিয়েই সেখান থেকেই কাজ শুরু করে; যেখানে তার দাদা চেঙ্গিজ খান শেষ করেছিলেন।

মঙ্গলদের হোলকাস্ট শুরু হয় ৬৫৩ হিজরিতে (১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে) যখন হালাকু পারস্য অতিক্রম করছিলেন। পথিমধ্যে আলামুত নামক এলাকার একজন বিচারক মঙ্গল খানকে অভিযোগ করেন যে, তাকে সব সময় কাপড়ের নিচে বর্ম পরে থাকতে হয়। কারণ, কাছেই অ্যাসাসিনদের ঘাঁটি হওয়ায় তিনি আশঙ্কা করেন, তাকে ওরা যেকোনো সময় হত্যা করতে পারে। এই অভিযোগকে যে হালাকু খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। তবে এই অভিযোগ পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই দুজন ফেদায়িন (অ্যাসাসিন এজেন্ট) সাধু-সন্ন্যাসীর বেশে এসে তাকে হত্যা করার চেষ্টা চালায়। সেই সময়ে তারা তার মুখের দাড়িও তুলে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। অ্যাসাসিনরা যে কাউকে হত্যা করতে পারত! কিন্তু এবার তারা এমন একটি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়, যারা যে কাউকেই নিঃশেষ করে দিতে পারে। হালাকু পশ্চিমের দিকে যে অভিযানের নিয়ত করেছিলেন তাকে একটু স্থগিত করে দিয়ে তিনি আলামুতের দিকে মনোযোগী হন। তারপর তিনি অ্যাসাসিনদের সাথে তাই করেন যা ইতঃপূর্বে মঙ্গলরা অন্যান্য জাতির সাথে করেছে। তারা অ্যাসাসিনদের দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। তাদের মূল ঘাঁটি ও কাঠামোকে ধ্বংস করেন, তাদের সব নথিপত্র নষ্ট করেন; তাদের লাইব্রেরিগুলোও পুড়িয়ে দেন। মুহূর্তের মাঝেই অ্যাসাসিন গ্রুপটি যেন একটি ইতিহাস হয়ে গেল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অ্যাসাসিনদেরকে নিশ্চিহ্ন করার পর হালাকু বাগদাদের দিকে মনোনিবেশ করেন। তবে আক্রমণের আগে তিনি সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফাকে হুমকি দিয়ে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রাশিদ আল দীন ফাজলুল্লাহর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, সেই চিঠিতে হালাকু খান আব্বাসীয় খলিফাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন 'অতীতের উপাখ্যান এখন আর বলে কোনো লাভ নেই। আপনি অবিলম্বে আপনার দুর্গগুলোকে ধ্বংস করুন। পরিখাগুলোর গর্ত ভরে দিন, রাজ্যের শাসনভার আপনার ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়ে, আপনি আমাদের কাতারে নেমে আসুন। যদি আমার প্রস্তাবগুলো আপনি না শুনেন, তাহলে প্রস্তুত হন। যখন আমি আমার সৈন্য নিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করব, তখন আপনি আকাশের নিচে আর জমিনের ওপরে যেখানেই থাকুন না কেন, আপনাকে খুঁজে বের করে হত্যা করব। এমনকি আপনার রাজত্বের একজন মানুষকেও বাঁচিয়ে রাখবো না। আপনার গোটা দেশ-রাজধানীকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিবো। যদি আপনার পূর্বসূরিদের জন্য আপনার কোনো মায়া থাকে তাহলে আমার কথাগুলো শুনুন।'

আব্বাসীয় খলিফা তখন যিনি ছিলেন তার হাতে তেমন কোনো ক্ষমতা ছিল না। এমনকি শক্তিশালী কোনো সেনাবাহিনীও ছিল না। তারপরও তিনি বাস্তবতা থেকে অনেকটাই দূরে ছিলেন এবং তার মধ্যে বেশ অহংকারও ছিল। তিনি হালাকুকে পাল্টা চিঠি পাঠালেন অনেকটা এই ভাষায়। 'হে যুবক, তুমি মাত্র জীবনের সোনালি মুহূর্তে পৌঁছেছ আর তাই সারা জীবন টিকে থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছো। তুমি মনে করছো যে তোমার নেতৃত্বই সবচেয়ে শক্তিশালী। তোমার হাতে হয়তো কৌশল, যোগ্য সৈন্য সবই আছে কিন্তু তাই দিয়ে তুমি কীভাবে আকাশের তারাকে ধরবে? তোমরা কি জানোনা, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধনী-গরিব, কম বয়সী বা বেশি বয়সী যত মানুষ আল্লাহকে ভয় পায় এবং আল্লাহর ইবাদত করে তারা সবাই আমার শাসন ও আমার সেনাবাহিনীর আওতায় আছে? যখন আমি আমার খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়া রাজ্যটাকে নিয়ে আবার কাজ শুরু করব, তখন সবার আগে আমি ইরানকে শায়েস্তা করব, তারপর তুরানকে। এভাবে পুরো অঞ্চলটাকেই আমি আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবো।'

বাগদাদে আক্রমণ শুরু হয় ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারি বা মতান্তরে ২০ ফেব্রুয়ারি। বাগদাদকে মঙ্গলরা শুধু জয় করেছিল বিষয়টা তেমন নয়। জয় করা তো কোনো বিষয়ই নয়। মঙ্গল সেনাদের প্রতি আদেশ ছিল যাতে তারা তাদের এত দিনের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে শাসক পরিবারের রক্ত ঝরাতে সচেষ্ট হয়। সেই আদেশ মোতাবেক তারা খলিফা ও তার পরিবারের সব সদস্যকে কার্পেটে পেঁচিয়ে মৃত্যু গহবরে ফেলে দেয়। তারা কার্যত বাগদাদের একজন মানুষকেও

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

জীবিত রাখেনি। মুসলিম ইতিহাসবিদরা জানান, বাগদাদে ৮ লাখ মানুষকে এক দিনে হত্যা করা হয়। হালাকু নিজে অবশ্য এতটা দাবি করেনি। পরবর্তী সময়ে তিনি ফ্রান্সের রাজাকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি দাবি করেন যে, বাগদাদে তিনি ও তার বাহিনী দুই লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। হত্যার শিকার যত সংখ্যক মানুষই হউক না কেন, গোটা বাগদাদ তখন আসলেই দাউ দাউ করে জ্বলছিল। সকল হাসপাতাল, লাইব্রেরি, স্কুল, মাদরাসায় তারা তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। সভ্যতার সোনালি যুগের যত চিহ্ন, যত নিদর্শন সবই যেন হারিয়ে যায় নিমিষেই, মুহূর্তের মাঝেই।

একটি মাত্র দেশ যারা মঙ্গলদের মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পেরেছিল তারা হলো, মিসর। আর কোনো জায়গাতেই মঙ্গলদেরকে হারাতে পারেনি।

মঙ্গলরা যখন এসব হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে তখনো সালাদিনের বংশধরেরাই মিসর শাসন করছিলেন। কিন্তু ১২৫৩ সালে তাদের রাজত্বে বেশ কিছু সমস্যা ও সংকট দেখা দেয়। সিংহাসনের চারিপাশে অমাবশ্যার কালো রেখা ধীরে ধীরে যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠছিল। এরই মাঝে একদিন রাজা মারা যান। সেই সময়ে তিনি স্পষ্ট ও যোগ্য কোনো উত্তরাধিকারীও রেখে যেতে পারেননি। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী সাজার-আল-দুর সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে নেন। কিন্তু তারপর শুরু হয় অভিজাত দাস-সেনা গ্রুপ মামলুকদের খেলা। তারা কৌশলে তাদের একজন সদস্যকে সুলতানার সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। ফলে রাজার স্ত্রী সুলতানা হিসেবে থাকলেও কলকাঠি মূলত নাড়ছিলেন সেই মামলুক সদস্যই।

হালাকু বাগদাদকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পর দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু মিসরের বিখ্যাত মামলুক জেনারেল জাহির বাইবার্স হালাকুকে থামিয়ে দেন। দুই পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়, আয়ান জালুত নামক স্থানে। ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে মামলুক জেনারেল বাইবার্স অপ্রতিরোধ্য হালাকুকে বীরত্বের সাথে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে মামলুক মুসলমানদের বিজয়ের কারণ হলো এবারই প্রথম তারা একটি অস্ত্র ব্যবহার করেছিল, যা ইতঃপূর্বে কেউ করেনি। তা হলো হাতে তৈরি কামান। মূলত এটা দিয়েই তারা মঙ্গলদের পরাস্ত করেন।

আবার ফিরে আসি কায়রো অধ্যায়ে। এক দিন গোসলের সময় সাজার-আল-দুর এবং তার স্বামী গোসলে থাকা অবস্থায় একে অপরকে হত্যা করে। এরই মধ্যে আয়ান জালুতের যুদ্ধে জয়লাভের কারণে মামলুক জেনারেল বাইবার্স অবস্থানও বেশ সম্মানজনক অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। রাজা-রানি দুজনে খুন হয়ে যাওয়ায় তাই বাইবার্স নিজেই রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়ে নিলেন এবং তিনি মামলুকদের একটি নতুন রাজতন্ত্র চালু করলেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আগেও বলা হয়েছে যে, মামলুকরা ছিল মূলত ক্রীতদাস। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল বংশোদ্ভূত। তাদেরকে অনেক অল্প বয়সে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হতো এবং এরপর তাদেরকে সব ধরনের সামরিক প্রশিক্ষণও দেয়া হতো। মধ্য পৃথিবীর ইতিহাসে মামলুকদের হাতে তাদের মনিবদের হত্যা এবং নতুন রাজতন্ত্র চালুর ঘটনা কম ঘটেনি। তবে বেবার্স যে রাজতন্ত্রটি চালু করেছিলেন তা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন।

এটাকে ঠিক পুরোপুরি রাজতন্ত্র বলা যাবে না। কারণ, রাজতন্ত্রের প্রধান নিয়ম হলো পিতার থেকে সন্তানের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে তা হয়নি। এই রাজতন্ত্রের আওতায় যখন একজন সুলতান মারা যান, তখন মামলুকদের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী মহল তাদের মধ্য থেকে একজনকে সুলতান হিসেবে নির্ধারণ করত। সুলতান যখন দেশ চালাতেন সেই একই সময়ে মামলুকদের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী মহলে নিয়মিত নতুন নতুন মামলুক সদস্যদের পদোন্নতি হতো এবং তা হতো তাদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। এই নীতিনির্ধারণী কমিটিটি খুবই শক্তিশালী ছিল। কারণ, সবাই জানত এরই মধ্যে থেকে যেকোনো একজন আগামী সুলতান হবেন। তাই সে সময়ের মিসরটি একক কোনো পরিবার দ্বারা শাসিত হয়নি। বরং মেধার ভিত্তিতে গড়ে উঠা একটি মামলুক কমিটি দিয়ে শাসিত হয়েছে। সেখানে কোনো পরিবারতন্ত্র ছিল না; ছিল মেধাতন্ত্র আর তা যথেষ্ট সফলও হয়েছিল। যার কারণে মামলুকদের হাতে থাকা অবস্থায় মিসর আরব বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ও নেতৃত্বদানকারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

যদিও মঙ্গলরা বেশ হিংস্রতা ও বর্বরতার সাথে মুসলিম বিশ্ব দখল করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা ভিন্নভাবে মঙ্গলদেরকে জয় করেছিল। তারা যুদ্ধ করে মঙ্গলদের কাছ থেকে ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেয়নি। বরং তারা মঙ্গলকে জয় করেছে ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে। প্রথম ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়াটি শুরু হয় ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে। হালাকু একজন উত্তরাধিকারী যার নাম টোড মংকে। তিনি নিজে শুধু ইসলাম গ্রহণ করেননি বরং নিজেকে সুফি হিসেবেও ঘোষণা দেন। এর পরপরই পারস্যে অনেকগুলো মুসলমান মামলুক শাসকের আবির্ভাব আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই। ১২৯৫ সালে মাহমুদ ঘাজান পারস্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। তিনি ছিলেন একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি শিয়া মতবাদে ধর্মান্তরিত হন। তার অনুসারীরাও তার মতোই শিয়া হয়ে যায়। তার বংশধরেরা পারস্যে দ্বিতীয় মুসলিম খান নামে একটি ভিন্নধারার রাজতন্ত্র চালু করেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইসলামে দাখিল হওয়ার পর এক ভাষণে ঘাজান তার অনুসারীদেরকে স্থানীয় জনগণকে সহায়তা করার আহবান জানা। তিনি বলেন আমি পারস্যের কৃষক সমাজকে রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব নেইনি। আমার সুযোগ থাকলে আমি তাদেরকে দেখে নিতাম। আমরা সবাই মিলে তাদেরকে লুট করে নিতাম। কিন্তু যেহেতু আমি এখন শাসনভার পরিচালনায়, তাই বিষয়টা এখন ভিন্ন। আপনারা যদি এসব কৃষকদের কাছে চাঁদাবাজি করেন, তাদের লাঙ্গল কেড়ে নেন, বীজ কেড়ে নেন, তাদের ফসল লুটপাট করেন তাহলে আপনারা ভবিষ্যতে কী করবেন, কী খাবেন? আপনারা অনেকেই অনেক সময় স্ত্রী বা সন্তানকে আঘাত করেন। কিন্তু তা করেন তাদেরকে ভালোবাসেন বলেই। এই কৃষকেরাও সে রকম। তারাও আপনার আমার মতোই মানুষ।

এই ধরনের কথা চেঙ্গিজ খান বা হালাগু কারও কাছ থেকেই ইতঃপূর্বে শোনা যায়নি। মঙ্গল হোলোকাস্টের আবহের মধ্যে ঘাজানের এই কথাগুলো যেন স্বস্তির পরশ। কারণ, তার এই ধরনের কথাবার্তা ইঙ্গিত করে যে ইসলাম ও সভ্যতা আবারও যেন জীবন ফিরে পেতে যাচ্ছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১০. পুনরুত্থান
(৬৬১-১০০৮ হিজরি) ১২৬৩-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ

মঙ্গল হোলোকাস্টকে কোনোভাবেই ইউরোপের অন্ধকার যুগের সাথে তুলনা করা যায় না। এটা ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়নি বা ধীরে ধীরে শেষও হয়নি। এটা ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু ভীষণ রকমের শক্তিশালী একটি বিস্ফোরণ। যেমনটা ঘটেছিল ইউরোপে ১৪শ শতাব্দীতে ব্ল্যাক ডেথের ঘটনার পর। অথবা সাম্প্রতিক সময়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে যা ঘটেছে, তার সাথে সেই বিস্ফোরণটির তুলনা করা যায়।

ইতিহাসবিদ বার্নার্ড লিওয়ীস তার বর্ণনায় দাবি করেন যে 'মঙ্গলরা আসলে ততটা খারাপ ছিল না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে তারা গোটা শহরকে ধ্বংস করেছে আবার এটাও ঠিক যে যখন তারা শহরগুলোকে ছেড়ে গেছে তখনো তারা ইনট্যাক্ট অবস্থায়ই ছেড়ে গেছে।' তার এই যুক্তিটি মুসলিম বিশ্বের ক্ষেত্রে আংশিক প্রযোজ্য। কারণ, মঙ্গলরা খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে ইসলামিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। মঙ্গলদের যে শাসক পারস্য শাসন করার সুযোগ পান তিনি খুব দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করে পরে আবার খান রাজতন্ত্র নামে দ্বিতীয় আরেকটি রাজতন্ত্র চালু করেন। এভাবে ইসলামে প্রবেশ করায় মঙ্গলরা বরং মুসলিম বিশ্বে অনেকগুলো নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটায়।

এই কথাগুলো খুবই বাস্তব। বিংশ শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধের সাথেও মঙ্গলদের বর্বরতাকে মেলানো অমূলক নয়। মঙ্গলদের হাতে কত লোক মারা গেছে এটা যেমন নিশ্চিত করে বলা যায় না ঠিক তদ্রূপ বিশ্বযুদ্ধগুলোতেও কত লোক মারা গেছে তাও বলা যায় না। তবে উভয়ক্ষেত্রেই অসংখ্য লোক মারা গেছে এটা ঠিক। এই কথাও ঠিক যে যুদ্ধের ভয়াবহতায় রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স বা ব্রিটেনে অনেক ধ্বংসযজ্ঞও হয়েছে। কিন্তু এই দেশগুলো খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে আবার কিন্তু গড়েও উঠেছে। এখনকার বাস্তবতায় এই দেশগুলোকে দেখলে সহজেই তো বুঝা যায়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

চেঙ্গিজ খান এবং তার উত্তরসূরিরা গণহত্যাটিকে যুদ্ধের কৌশল হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন, বর্বরতা হিসেবে নয়। তারা কিছু শহরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন এটা ঠিক। তবে তা করেছেন যাতে এই ধ্বংসযজ্ঞের ভয় দেখিয়ে অন্য আরও কয়েকটি শহর যুদ্ধ ছাড়াই তারা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারেন। এই পর্যবেক্ষণ দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে যে, মঙ্গলরা তাদের দিক থেকে রক্তপাত পরিহার করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে।

এটাও সত্য যে, চেঙ্গিজ বা হালাকুর মতো বিখ্যাত মঙ্গল নায়কেরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের বংশধর তৈমুর লং এর চেয়ে ভালো ছিল। উল্লেখ্য, তৈমুর লং চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে মধ্য এশিয়ায় আবির্ভূত হন এবং স্মরণাতীতকালের নৃশংসতম গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালান। তৈমুর ছিলেন চেঙ্গিজ খানের নৃশংসতার একজন যোগ্য প্রতিনিধি ও প্রতিচ্ছবি।

তৈমুরের কাছে নৃশংসতা যুদ্ধের কোনো কৌশল ছিল না। বরং তিনি নিজের আনন্দের জন্য এসব অন্যায় বর্বর কাজগুলো করতেন। তৈমুর যে শহরই দখল করতেন সেই শহরের প্রবেশদ্বারের মুখে নিহত মানুষদের মাথা দিয়ে উঁচু স্তূপ তৈরি করতে আনন্দ পেতেন। তিনি পরাভূত শহরের বন্দিদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতেন, আর দু-একজন যদি বেঁচেও যেতেন তাহলে তিনি উঁচু টাওয়ারের ওপর থেকে তাদেরকে মাটিতে ফেলে দিয়ে হত্যা করতেন। তৈমুর লং এশিয়া মাইনর অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে তার এই বর্বরতম কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তার ধ্বংসযজ্ঞের পর দিল্লির রাস্তায় রাস্তায় এত লাশ পড়েছিল এবং সেগুলো পড়ে থাকতে থাকতে এমনভাবে পঁচে গিয়েছিল যে, দুর্গন্ধের কারণে কয়েক মাস সেই শহরে কেউ বসবাসই করতে পারেনি। তার নৃশংসতা ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে ঠিকই কিন্তু এর খুব একটা তাৎপর্য নেই। কারণ, তিনি এই কাজটা, অহেতুক এবং কোনো প্রয়োজন ছাড়াই করে গেছেন। ব্যাপারটি ছিল এমন যে তিনি এলেন, দেখলেন, নির্বিচারে হত্যা করলেন, তারপর মারা গেলেন এবং তার পরপরই বিশাল সাম্রাজ্যটি দুমড়ে মুচড়ে পড়ে গেল। এরপর আর কেউই তাকে কখনো সেভাবে স্মরণ করল না।

চেঙ্গিজ খানের বাকি বংশধরদের ব্যাপারে খুব একটা জানা না গেলেও এটাই বাস্তবতা যে, তার অনেক বংশধরের চেয়ে তিনিই (চেঙ্গিজ) তুলনামূলক ভালো ছিলেন। কিন্তু এটা কোনোভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই, মঙ্গলদের বিজয়াভিযানের ভীষণ রকম গুরুত্ব ইতিহাসের পটভূমিতে বিদ্যমান।

কেননা, প্রথমত মঙ্গলদের এই বিজয়াভিযানের কারণেই মুসলিম ধর্মতত্ত্ব বেশ কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে আজকের সময়ে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এসেও আমরা হিমশিম খাচ্ছি। সংকটটা মূলত এজন্যই তৈরি হয়েছে যে, মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকেরা, পণ্ডিতেরা এমনকি সাধারণ মুসলমানরাও একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ভেবে গেছেন যে ইতঃপূর্বে বদর, খন্দক, তাবুকসহ বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানের সামরিক অভিযানের সফলতাই প্রমাণ করে যে কুরআনের ওহির বার্তা সঠিক। যদি তাই হয় যে, যুদ্ধে জয়ী হওয়া মানে ঐশ্বরিক বাণী সঠিক তাহলে যুদ্ধে হেরে যাওয়া কি ইঙ্গিত বহন করবে?

মুসলমানরা এত ভয়াবহ পরাজয় অতীতে আর কখনো মোকাবেলা করেনি, পৃথিবীর কোথাও না। এমনকি এমন দুঃসহ বিপর্যয় তারা কখনো দুঃস্বপ্নেও দেখেনি। ইতিহাসবিদ ইবনে আল আথির মঙ্গলদের বর্বরতাকে এমন একটি মারাত্মক বিপর্যয়ের সাথে তুলনা করেছেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসের শুরু থেকে আর কখনোই দেখা যায়নি এবং পৃথিবী ধ্বংসের আগে আর কখনো এ রকম কিছু ঘটবে না বলেও তিনি ধারণা করেছেন। আরেকজন ইতিহাসবিদ মঙ্গলদের ধ্বংসযজ্ঞকে কিয়ামতের সাথে তুলনা করেছেন। অপর আরেকজন ইতিহাসবিদ বলেছেন, মঙ্গলদের নিকটে মুসলমানদের পরাজয়ে প্রমাণীত হয়, আল্লাহ মুসলমানদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে পরিত্যাগ করেছেন।

ক্রুসেডারদের তো তাও একটা ধর্মীয় পরিচয় আছে। তারা ছিল খ্রিষ্টান। কিন্তু মঙ্গলদের তো বলার মতো কোনো পরিচয়ও নেই। তাদের বিজয়গাঁথাগুলো সকল ধর্মতাত্ত্বিকদের হিসেবকে পাল্টে দেয় এবং সাধারণ জনমানুষের বিশ্বাসের জায়গায় ধ্বস নামিয়ে দেয়। বিশেষ করে বাগদাদের পতনের পর গোটা মেসোপোটামিয়া অঞ্চলেই প্রবল আস্থার সংকটের জন্ম হয়। যে মুসলমানরা নিজেদেরকে বিশ্বজনীন সম্প্রদায় হিসেবে দাবি করত, সাদামাটা একটি অজানা জাতিগোষ্ঠীর কাছে তাদের নাকাল হয়ে যাওয়াটা অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। তাদের মধ্যে প্রশ্নও দেখা দেয়, মুসলমানদের আসলে কি সমস্যা হয়েছে যে তারা এমন বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গেল?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো অবস্থানে ছিলেন সিরিয়ান আইনবিদ ও বিচারক ইবনে তাইমিয়া। তার পরিবারের আদি বাড়ি ছিল হারান নামক এলাকায়। যেটা মূলত আজকের সিরিয়া, ইরাক এবং তুরস্কের সীমানায় অবস্থিত। মঙ্গলরা এই এলাকায়ও তাদের গণহত্যা চালায়। তাই হালাকুর আক্রোশ থেকে বাঁচার জন্য তাইমিয়ার পরিবার নিজ এলাকা ছেড়ে দামেস্কে চলে আসেন। সেই সময়ে তাদের কাছে অল্প কিছু বই ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ইবনে তাইমিয়া বড় হন সেই দামেস্কেই। তিনি ইসলামি শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেন। তার মেধা ছিল খুব ভালো, তাই তিনি অল্প সময়েই সফলতা লাভ করেন এবং বিভিন্ন ইস্যুতে ফতোয়া এবং ধর্মীয় মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মানুষ যখন খুব আতঙ্কে থাকে, তখন তার খুব কট্টরপন্থী সিদ্ধান্ত বা মতামতেরই প্রয়োজন হয়। ইবনে তাইমিয়া এমন একটি সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। একথা ঠিক মঙ্গলদের হাতে মুসলমানদের পরাজয় নিয়ে অন্য অনেকের মতোই তাইমিয়া বা তার পরিবারও খুব পেরেশানীতে ছিলেন এবং প্রতিনিয়ত কারণ অনুসন্ধান করছিলেন। আর সেই চিন্তা-চেতনাই হয়তো তাকে ধর্মীয় নানা বিষয়ে শক্ত অবস্থান নিতে ও স্পষ্ট মতামত দিতে অনুপ্রাণিত করে। তার সিরিয়াও মঙ্গলদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ক্রুসেডারদের দ্বারারও কোণঠাসা হয়ে পড়ায় ইবনে তাইমিয়া সিরিয়াতেই অনেক লোক পেয়ে গেলেন, যারা আসলে তার কাছ থেকে এসব সংকটের ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করে। যদি সেই সময়ে সেখানে ইবনে তাইমিয়া না আসতেন, তাহলে এই জনতা হয়তো অন্য কাউকে তাঁর জায়গাতেই বসানোর চেষ্টা করত।

ইবনে তাইমিয়া মূলত তিনটি মূল ইস্যুতে কথা বলেন। প্রথমত তিনি বলেন, ইসলামে কোনো ভুল নেই, সংকট নেই, সীমাবদ্ধতা নেই। ওহিতেও কোনো মিথ্যা নেই। আর মুসলমানদের বিজয়গাঁথার মাধ্যমে ওহির সত্যতা যাচাই করারও কোনো সুযোগ নেই। সমস্যা যদি থেকে থাকে তাহলে তা হলো মুসলমানদের নিজেদের সমস্যা। তারা প্রকৃত ইসলামের অনুশীলন করা বন্ধ করে দিয়েছে বলেই আল্লাহ তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছেন। আর আবারও যদি মুসলমানরা বিজয়ীর আসনে আসীন হতে চায় তাহলে তাদেরকে কুরআনের কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং নতুন আবিষ্কৃত সব ধরনের চিন্তাধারা, ব্যাখ্যাকে পরিত্যাগ করতে হবে। মুসলমানদেরকে সরাসরি হযরত মোহাম্মাদ ﷺ এবং তার সাহাবিদেরকে অনুসরণ করতে হবে। তাদেরকে নীতি নৈতিকতার কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে মানতে হবে যে, প্রাথমিক যুগে যেসব নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল সেটাই সবচেয়ে ভালো ও কল্যাণকর।

দ্বিতীয়ত ইবনে তাইমিয়া প্রচার করেন যে, প্রতিটি মুসলমানের জিহাদ করা নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। নামাজ, রোজা, কুরবানির মতো ইবাদতের পাশাপাশি তাকে জিহাদও করতে হবে। আর ইবনে তাইমিয়ার কাছে জিহাদের সংজ্ঞা ছিল তরবারির ব্যবহার। তিনি মনে করতেন প্রতিটি মুসলমান জন্মসূত্রেই একজন সেনা। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, আগে যারা কুরআনের বাণীগুলোকে অনুধাবন করেছেন তাদের সবাই সব ভালো কাজে শরীক হতেন না। আবার সব খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য সকলেই চেষ্টা করেছেন তাও নয়। কেউ কেউ হয়তো শত্রুকে নিজ ভূমি থেকে তাড়ানোর জন্য যুদ্ধ করেছে, কেউ হয়তো জালিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে আবার কেউ করেনি। ইবনে তাইমিয়া বলেন জিহাদের এই আংশিক প্রয়োগটা সঠিক ছিল না। কারণ, জিহাদ মানে সক্রিয়ভাবে লড়াই করা। শুধু কারও জীবন বাঁচানোর জন্য নয় বরং মুসলমানদের সংখ্যা ও প্রভাব বাড়ানোর জন্যেও জিহাদের কোনো বিকল্প নেই।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইবনে তাইমিয়া নিজেও মঙ্গলদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছেন। যদিও এরই মধ্যে সেই মঙ্গলরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাই সেই প্রশ্নও উঠেছিল যে মুসলমান হয়ে অন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করা কতটা ঠিক? ইবনে তাইমিয়া বলেছিলেন, ধর্মান্তরিত মঙ্গলদের বিরুদ্ধেও লড়াই করাটা ঠিক। কারণ, তারা সত্যিকারের মুসলমান নয়। তিনি খ্রিষ্টান, ইহুদি, সুফি এবং শিয়াদেরও সমালোচনা করেন। তিনি একবার কোথা থেকে যেন শুনেছিলেন যে, একজন খ্রিষ্টান নবি মোহাম্মাদকে ﷺ নিয়ে বাজে কথা বলেছে। তারপর তিনি এবং তাঁর সঙ্গী মিলে সেই খ্রিষ্টানকে খুঁজে বের করে বেত্রাঘাতও করেছিলেন।

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ইবনে তাইমিয়ার সেই কট্টরপন্থী অবস্থানও সেই সময়ের আলোকে জরুরি ছিল এবং সে কারণে তিনি বেশ সমর্থনও পেয়েছিলেন। তিনি বলতেন মঙ্গল হোক বা ক্রুসেডার- ইসলামের শত্রুর মোকাবেলায় মুসলমানদের ঐক্য জরুরি। তাই সকলকে ইসলামের একক মতাদর্শের আলোকে একতাবদ্ধ করে তিনি যুদ্ধে নামার জন্য আহবান করেন। যখন নিজেদের রাজ্য বহিঃশত্রুর আক্রমনের শিকার হয় তখন এই ধরনের ডাক দেয়া ছাড়া কোনো বিকল্প পথও খোলা থাকে না।

যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা অপরিহার্য- ইবনে তাইমিয়া সেই তালিকাকেও নতুন করে সংশোধিত করেন। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ লোক, ধর্মত্যাগী ও সাম্প্রদায়িক লোকদের বিরুদ্ধেও জিহাদ করাকে তিনি সমর্থন করেন। তিনি এই তালিকায় সেসব মুসলমানদেরও অন্তর্ভুক্ত করেন যারা ইসলামে কোনো রূপ সংশোধনী আনতে চেষ্টা করেছে। কিংবা কুরআন ও হাদিসের ভিন্ন ব্যাখ্যা করে নতুন করে বিভাজন সৃষ্টি করেছে।

ইবনে তাইমিয়া কখনোই স্বীকার করেননি, তিনি শরিয়তের অন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজের ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছেন। তিনি সব সময়ই দাবি করতেন যে, তিনি ইসলামের অযাচিত ব্যাখ্যাগুলোকে নস্যাৎ করছেন এবং মুসলমানদেরকে কুরআনের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কারণ, তিনি মনে করতেন, একমাত্র কুরআন ও হাদিসই প্রকৃত জ্ঞানের উৎস কারণ, কেবল এগুলোই মানবিক কোনো ব্যাখ্যা বিবৃতির উর্ধ্বে।

কেউ কেউ বলেন প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িক লোকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার উদাহরণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল না। হযরত মোহাম্মাদ ﷺ এবং তার সাহাবিরা একজন মানুষ মুসলমান হওয়ার পরে তাকে মুসলমান হিসেবেই দেখতেন। মুনাফিকদের বিষয়টা ভিন্ন। তবে কোনো ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আসলেই তারা তাকে গ্রহণ করতেন। সে কেমন মুসলমান তা যাচাই করতেন না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইবনে তাইমিয়া এসব কথাকে মানতে পারেননি। তিনি বলতেন, মুসলমান হওয়ার একটাই রাস্তা। প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো সেই রাস্তার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা এবং তাকে অনুসরণ করা। এর ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর সুযোগ নেই, কারণ ইসলাম কী তা কুরআনে স্পষ্ট করেই লেখা আছে।

ইবনে তাইমিয়া মুসলমানের চূড়ান্ত উৎকর্ষতা খুঁজে বেরিয়েছেন, আল্লাহর রাসূলের সেই সঙ্গীদের মাঝে, যারা আল সালাফ আল সালিহীন হিসেবে গণ্য হয়েছেন। আর সেই কারণেই তার দর্শন বা চিন্তাধারা ভারতবর্ষে এবং উত্তর আফ্রিকায় সালাফিজম হিসেবে পরিচিত হয়েছে। আজও এই সালাফী মতবাদের অস্তিত্ব রয়েছে। মুসলমানদেরকে অনেকেই এই নামে অভিহিত করে। মূলত এই সালাফী চিন্তাধারার জন্মই হয়েছিল মঙ্গল হোলোকাস্ট পরবর্তী সংকট থেকে।

ইবনে তাইমিয়ার মাঝারি সংখ্যক অনুসারী ছিল অর্থাৎ অনেক বেশি অনুসারী ছিল তা নয়। সাধারণ মানুষেরা তাকে খুব যে মান্য করত তাও কিন্তু নয়। কারণ, তিনি সেসব মুসলমানকে শাস্তি দিতেন, যারা ইসলামের চেতনার মধ্যে আবার মাজার পূজার মতো তাগুতি চেতনা প্রবেশ করায়। শাসক শ্রেণিও তাকে কম পছন্দ করত। কারণ, ইমাম তাইমিয়া বিদ্যমান শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও অস্বীকার করেছিলেন। একবার আলেমদের একটি গ্রুপ তার সাথে আলোচনায় বসতে চাইলে ইমাম তাইমিয়া তাদেরকেও প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তাইমিয়া অভিযোগ করেন যে, এসব আলেমরা কুরআনের যথেচ্ছা ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্মীয় আলোচনায় বসার যোগ্যতা ও বৈধতা দুই হারিয়েছেন। কিন্তু একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে ইবনে তাইমিয়াও খুব বেশি আগাতে পারলেন না। তাকে ঘিরে অনেক ধরনের ধর্মীয় বিতর্কও সেই সময়ে দেখা দেয়। একটা পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ তাকে কারাবন্দি করলেন। এরপর থেকে তিনি একটা বড় সময় কারাগারে কাটান। এমনকি তিনি কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

ইবনে তাইমিয়া ইসলামের কোনো কাঠামো বা রূপরেখা দিয়ে যাননি। এমনকি তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইসলাম নিয়েও তেমন একটা কিছু বলেননি। ইসলামের নামেই অসংখ্য চিন্তাধারা আছে, নানা ধরনের মানসিকতাও বিদ্যমান। তৎকালীন সময়ের আলেমরা যে কারণে ইবনে তাইমিয়ার উপর ক্ষীপ্ত ছিলেন, ঠিক একই কারণে আবার অনেকেই তাকে পছন্দও করত। ইমাম তাইমিয়া আব্বাসীয় আমলের প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার ইবনে হাম্বলের চিন্তাধারাকে লালন করতেন। ইমাম হাম্বলও সেই সময়ে অহেতুক যুক্তি ও মানবিয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। ইমাম হাম্বল কুরআনের সাহিত্যিক পাঠকে বেশি পছন্দ করতেন। ইমাম তাইমিয়াও তাই। এই দুই ব্যক্তিরই একই ধরনের মেজাজ ছিল। সেইসাথে এ দুই ইসলাম বোদ্ধাকেই তাদের স্বতন্ত্র এবং কট্টর চিন্তা চেতনার জন্য জেলে থাকতে হয়েছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সত্যের সাথে সাহস যখনই মিশেছে তখনই তা একটি ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। উপস্থাপক বিল মাহের নেটওয়ার্ক টিভি শুরু করেছিলের এই মর্মে যে, এলিভেনে যারা বিমান হাইজ্যাক করেছিল প্রকৃতপক্ষে তারা আসলে সাহসী। এটা মানুষের একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি যে, যারা খারাপ কাজ করে তাদের কোনো ইতিবাচক চারিত্রিক গুণাবলিকে তারা স্বীকৃতি দিতে চায়না। এসব বিতর্কিত আলোচনার কারণে মানুষের মনেও নানা ধরনের ভাবনার তৈরি হয়েছে। কিছু মানুষ আবার বিশ্বাস করে যে, কাপুরুষ কখনো সত্য কথা বলতে পারে না তেমনি সাহসী লোকও কখনো মিথ্যা বলতে পারে না। আর এই বিশ্বাসের জায়গা থেকেই ইমাম হাম্বল ও ইবনে তাইমিয়া উভয়েই উপকৃত হয়েছেন।

ইবনে তাইমিয়া চার হাজার ছোট পুস্তিকা বা প্যামফ্লেট এবং ৫শ বই লিখেছিলেন বলে জানা যায়। এই বইগুলোর মাধ্যমে তিনি কিছু বীজ বোপন করে গিয়েছিলেন। সেই বীজ থেকে হয়তো একবারেই ফল পাওয়া যায়নি কিন্তু এটা কখনো বিলীনও হবে না। তার ভাবনাগুলো যুগের পর যুগ ইসলামি সংস্কৃতির মোড়কেই টিকে ছিল এবং এখনো আছে। হয়তো কখনো এই ভাবনাগুলো থেকেই নতুন কোনো আন্দোলন বা চেতনার বিকাশ ঘটবে বলে ইবনে তাইমিয়ার প্রত্যাশা ছিল। বাস্তবিকই তা হয়েছিল, তবে তার জন্য সাড়ে চারশ বছর অপেক্ষাও করতে হয়েছিল।

মোঙ্গল হোলকাস্টের প্রভাবে আরেকটি জিনিসও আবির্ভূত হয়েছিল, যা সালাফী দর্শনের চেয়েও জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পায়। তা হলো সুফিবাদের পুনরায় উত্থান। ইবনে তাইমিয়ার আক্ষরিক ও সঙ্কুচিত দর্শনের বিপরীতে এই দর্শনটি ছিল উদারমুখী। আর নান্দনিক সুফিবাদীদেরকে ইবনে তাইমিয়া অগ্নিপূজারী অনুপ্রবেশকারীদের মতোই অপছন্দ করতেন। কারণ, ইবনে তাইমিয়া মনে করতেন, অবিশ্বাসীরা হলো ইসলামের বহিঃশত্রু, তারা ইসলামকে বাইরের থেকে আঘাত করে। আর সুফিবাদ হলো ইসলামের ভেতরগত শত্রু! যারা প্রতারণাপূর্ণভাবে ক্রমশ উম্মাহ্‌কে দুর্বল করে ফেলছে এবং ইসলামের যে একক দার্শনিক চিন্তাধারা তাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

সুফিজমের ধরনটি ছিল বৌদ্ধবাদ এবং হিন্দু রহস্যবাদের মতোই। সুফিরা ছিল এমন ধরনের সাধক যারা ধর্মের ভেতরকার আমলাতন্ত্রকে মোটেও পছন্দ করত না। তারা ইবাদতগুজারির মধ্যে দিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চাইত। সুফিসাধকদের সবারই একটি সাদৃশ্যপূর্ণ চিন্তাধারা থাকে। তারা সকলেই জানে যে তারা কোনো জায়গাটিতে পৌছতে চায়, কিন্তু ভিন্নতাটা দেখা যায় সেই মনজিলে পৌছানোর ধরণ নিয়ে। যখনই কোনো সাধকের স্রষ্টাকে পাওয়ার

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

চেষ্টার খবর বাইরে জানাজানি হতো, তখনই অসংখ্য একই মানসিকতার লোক সেই সাধকের কাছে গিয়ে ভিড় করত। সেই সাধকের ব্যক্তিগত ক্যারিশমাকে কাজে লাগিয়ে স্রষ্টাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করার চেষ্টা করত। আর এভাবেই বিখ্যাত সাধকদেরকে কেন্দ্র করে সুফি ব্রাদারহুড বা সুফি ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে। ফলে একদল অনুসারীকেও দেখতে পাওয়া যায়, যারা সাধকের নির্দেশনামতোই তার আশপাশে থাকে, বসবাস করে এবং কাজ করে। আর সেই অনুসারীরা সাধকদেরকে শায়খ বা পীর হিসেবে অভিহিত করে। আরবি শায়খ শব্দ বা পারসিয়ান পীর শব্দের অর্থ একই আর তা হলো বৃদ্ধ মানব।

সত্যি কথা বলতে কি, এসব পীর বা শায়খদের খুব কম সংখ্যক অনুসারীরাই নিজেদের যোগ্যতাবলে সুফি সাধক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। একজন শায়খ ইন্তেকাল করলে সেই পদবিটি উত্তরাধিকার সূত্রে তার কোনো একজন সাগরেদ বা অনুসারী পেত এবং এরপর থেকে সে অন্যদেরকে নির্দেশনা দিয়ে যেত। কোনো কোনো অনুসারী আবার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে কোথাও চলে যেত এবং নিজেই একটা সম্প্রদায় চালু করত। তারা তাদের গুরু সাধকদের বার্তাই প্রচার করত কিন্তু অনুসারী বানাতো নিজের নামে। এভাবেই সুফি ভ্রাতৃত্ববোধের জায়গাটি কালক্রমে সুফিধারায় পরিণত হয় এবং আল্লাহকে সাধনা করার সেই রহস্যময় তাত্ত্বিক ধারাটি সরাসরি ওস্তাদ থেকে আবির্ভূত হয়ে সাগরেদদের মধ্যে প্রবেশ করে, সেভাবেই আগাতে থাকে।

সুফিধারাটি পরবর্তীকালে আরও অনেক জনপ্রিয় শায়খও উপহার দেয়। সেসব শায়খেরা বিভিন্ন জায়গায় তাদের মুরিদদেরকে (শিষ্য) কাজে লাগিয়ে খানকা শরিফও প্রতিষ্ঠা করে। খানকা শরিফ হলো সাধকদের বসবাসের স্থান। যেখানে পর্যটকরাও বিশ্রাম নিতে পারে এবং আগন্তুকদের জন্য নানা ধরনের আরামদায়ক ব্যবস্থাপনা থাকে। ইতিহাসে দেখা যায়, খ্রিষ্টানেরা মধ্যযুগে গোটা ইউরোপ জুড়ে ধর্মীয় সন্নাসতন্ত্র চালু করে। তার ভিত্তিতে অসংখ্য আখড়া নির্মাণ করেছিল, যেখানে অনেক মানুষ তাদের মূল পেশা ছেড়ে দিয়ে এসে তারপর ধর্মীয় সাধনা শুরু করেছিল। ঠিক তেমনি সুফিবাদটিও ইসলামের সন্নাসতন্ত্র হিসেবেই ক্রমশ যেন রূপ লাভ করে যার আওতায় অসংখ্য মাজার ও খানকাহ তৈরি হয়ে যায়। সেই খানকাহ-মাজারকেই ভিত্তি করেও অসংখ্য মানুষের রুজি রোজগারেরও ব্যবস্থা হয়ে যায়।

তবে খ্রিষ্টান সন্নাসতন্ত্রের থেকে ইসলামের সুফিবাদ একটা মৌলিক জায়গা থেকে অনেকটাই ভিন্ন ছিল। সেটা হলো খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা যাজক হয় বা ধর্মীয় সন্নাসী হয় তাদেরকে অনেক ধরনের নিয়ম কানুন মান্য করতে হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সেখানে সুফি ভ্রাতৃত্ববোধের ধারাটি অনেকটাই উদার এবং সহজ। এখানে মূলত পরস্পরের সান্নিধ্য ও সাহচর্যকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। বাহির থেকে আরোপিত নিয়ম বা বিধানকে সুফিবাদে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয় না, মানাও হয় না।

আরেকটা পার্থক্যও আছে। খ্রিষ্টানদের এই যাজকতন্ত্র বা সন্ন্যাসতন্ত্রটি পার্থিব জীবনকে ত্যাগ করার পরামর্শ দেয়। এর কারণ হলো খ্রিষ্টানেরা সব সময়ই ব্যক্তির শুদ্ধতাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে 'অরিজিনাল সিন' বা মৌলিক পাপটি সম্পাদন করার কারণে যেকোনো মানুষ জন্মসূত্রেই অপরাধী হয়েই পৃথিবীতে আসে। তারা এটাও বিশ্বাস করে যে স্বর্গে প্রথম দুই মানব-মানবী নিজেদের লিঙ্গের ভিন্নতা আবিষ্কার করার কারণে শাস্তি হিসেবে এই নশ্বর পৃথিবীতে এসেছে, যেখানে তার দেহটি কারাঅন্তরীণ অবস্থায় থাকতে থাকতে একটা সময় মৃত্যুবরণ করবে।

খ্রিষ্টান যাজকেরা তাই ব্যতিক্রম। এই নশ্বর পৃথিবী থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার জন্যই একদল মানুষ যাজক হিসেবে কাজ করে। তাদের সমস্ত সাধনা আর ত্যাগ স্বীকারের মূল লক্ষ্য হলো নিজেদের শরীরকে শাস্তি দেয়া, কারণ শরীরকেই তারা মূল সমস্যা বলে মনে করে। তারা কামভাব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে আর খ্রিষ্টানেরা মনে করে যে আধ্যাত্মিক সাধনাই হলো নিজেকে যৌনতার দাসত্ব থেকে মুক্ত রাখার একমাত্র উপায়।

অন্যদিকে, ইসলাম শুধু ব্যক্তি বিশেষের উৎকর্ষতায় বিশ্বাস করে না বরং একটি গোটা সম্প্রদায়কে সত্য ও সঠিক পথে রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়। ইসলাম বলে পাপের দায় থেকে বাঁচার জন্য নয় বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে, তাঁর দাস হিসেবেই আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। ইসলাম বলে প্রতিটি মানুষ জন্মসূত্রে নিষ্পাপ। এরপর এই দুনিয়াতে আমলের উপর তাদের পরিণতি নির্ভর করে। কেউ ভালো কাজ করে সুন্দরভাবে ইবাদত করে উৎকর্ষতার চরম শিখরে পৌঁছে যেতে পারে, আবার কেউ বা খারাপ কাজ করে নিজেকে নিচু থেকে নিচু স্তরেও নামিয়ে নিতে পারে। যারা সুফিবাদের অনুসরণ করে তারা পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নয় বরং উৎকর্ষতার উচ্চ অবস্থানে যাওয়ার জন্যই এই পথে আসে। তারা শরীরকে শাস্তি দেয়ার জন্য সাধনা করে না বরং আল্লাহকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার জন্য সাধনা করে। উদাহরণ হিসেবে রোজার কথা বলা যায়। সুফিরা রোজা নিজের শরীরকে কষ্ট দেয়ার জন্য রাখে না বরং তারা শরীরের উপর তার এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য রোজা রাখে। তারা কামভাবের সাথে আধ্যাত্মিকতাকে মেলায় না বা তারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ারও কারণ দেখতে পায় না। ইসলামের যারা সত্যিকারের সুফি ছিলেন, ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে তারাও রিজিকের প্রয়োজনে ব্যবসা করতেন, কেনা-বেচা করতেন, বিয়ে করতেন, ছেলে মেয়ে মানুষ করতেন এবং প্রয়োজনে যুদ্ধেও যেতেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সর্বাবস্থায়ই সুফি সাধকেরা প্রথম জমানার মুসলিম নায়কদেরকে নিয়ে প্রশংসা করতে গিয়ে নানা ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করত। যেমন উদাহরণ হিসেবে একটা ঘটনার কথা বলা যায়। ঘটনাটি একজন যুবক পর্যটককে নিয়ে যিনি একজন বৃদ্ধ লোককে হত্যা করার দায়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন। নিহতের সন্তান সেই যুবকের বিরুদ্ধে খলিফার দরবারে হত্যার অভিযোগ নিয়ে আসে। পর্যটক যুবকটিও হত্যার দায় স্বীকার করে। কিন্তু তার জন্য সে প্রাণভিক্ষা চাইতে অস্বীকার করে। সে যেহেতু একটা জীবন কেড়ে নিয়েছে তার বিনিময়ে সেও তার তার জীবন বিলিয়ে দিতে রাজি হয়। কিন্তু সে এজন্য তিন দিন সময় চায়। সে জানায় তার কাছে একজন ইয়াতিম ছেলে আছে যার দায়-দায়িত্ব তার ওপরই। সেই ইয়াতিম উত্তরাধিকার সূত্রে যা পাবে তা সে একটি জায়গায় গর্ত করে পুঁতে রেখে দিয়েছে। এই তিন দিনে সেই উত্তরাধিকারের সম্পদগুলো সেই যুবকটি ইয়াতিম ছেলেকে বুঝিয়ে দিবে। কিন্তু যদি সে কাজটি না করেই মারা যায় তাহলে ঐ ইয়াতিমটা একটা কানাকড়িও পাবে না ফলে সে অসহায় অবস্থায় পড়ে যাবে। যুবকটি ওয়াদা করে সে যাবে এবং তিন দিনের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করে ফিরে আসবে এবং তারপর সে তার জন্য নির্ধারিত মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নিবে।

খলিফা তার প্রস্তাবে রাজি হন। কিন্তু এই শর্তে যে, তার একজন জামিনদার থাকবে যে কিনা গ্যারান্টি দেবে যদি যুবকটা ফিরে না আসে তাহলে যুবকের পরিবর্তে সেই ব্যক্তিই শাস্তিটি ভোগ করবে।

এই শর্ত যুবকটাকে নার্ভাস করে দেয়। কারণ, সে এই এলাকার কাউকেই চিনে না, এখানে তার কোনো স্বজনও নেই। তাই কোনো কি লোক এই অপরিচিত যুবকের জামিনদার হয়ে অহেতুক শাস্তি পেতে চাইবে?

সেই সময়ে রাসূলের ঘনিষ্ঠ সাহাবি আবুজর (রা.) সেই যুবকের জামিনদার হতে চাইলেন। ফলে যুবকটি তিন দিনের জন্য চলে যাওয়ার সুযোগ পেল।

কিন্তু তিন দিন পার হলেও যুবকটা আর ফিরে এল না। কেউ তাতে খুব একটা অবাক হলো না, কিন্তু সকলেই রাসূল ﷺ-এর সাহাবি আবু জরের (রা.) জন্য দুঃখ করল। কারণ, অচেনা-অজানা এক লোকের জন্য রাসূলের এই ঘনিষ্ঠ সাহাবিকে হয়তো জীবনটা দিতে হবে। জল্লাদ আবু জর (রা.)-কে জবাই করার জন্য উদ্যত হচ্ছে ঠিক তখনই ধুলো/ময়লা ভরা একটি ঘোড়া চালাতে চালাতে সেই যুবকটিকে আসতে দেখা গেল। তার পুরো শরীর ঘামে ভিজে একাকার। সে এসেই চিৎকার করে বলতে লাগল- আমি দুঃখিত, আমি দুঃখিত, আমার দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আমি চলে এসেছি, তাই এবার আপনারা আমার শিরশ্ছেদ করুন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারা যুবকটিকে বলল, 'তুমি তো মুক্তি পেয়েছিলে, ইচ্ছে করলেই পালিয়ে যেতে পারতে। কেন তুমি ফিরে এলে?

যুবকটি উত্তরে বলল, আমি এসেছি, আমি কথা রেখেছি। কারণ, আমি একজন মুসলমান। আমি কীভাবে কাউকে এই কথা বলার সুযোগ দিব যে মুসলমানরা ওয়াদা দিলে তা রাখে না।

সমবেত জনতা এবার হযরত আবু জরকে (রা.) প্রশ্ন করলেন, আপনি কি এই যুবককে চিনতেন? আপনি কি জানতেন যে, সে প্রতিশ্রুতি রাখার ব্যাপারে খুবই দায়িত্ববান? এই জন্যই কি আপনি তার জামিনদার হতে চেয়েছিলেন?

আবু জর (রা.) উত্তর দিলেন, না। আমি জীবনে কখনো এই যুবককে দেখিনি। কিন্তু আমি কেন কাউকে এই কথা বলার সুযোগ দিব যে, মুসলমানদের মধ্যে কোনো সহানুভূতি নেই, মানবিকতা নেই। তাই আমি তার জামিনদার হয়েছিলাম।

এসব ঘটনা দেখে নিহত সেই বৃদ্ধের পরিবার-পরিজনরা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। এবার তারাই আবেদন করলেন দয়া করে ঐ যুবককে শাস্তি দেবেন না। আমরাইবা কেন অন্য কাউকে এই কথা বলতে সুযোগ দিব যে, ইসলামে ক্ষমার আর কোনো অনুশীলন নেই?

এই ধরনের ঘটনাবলি ইসলামের সুফি সাধকদের বার বার অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছে।

অটোম্যান (আনুমানিক ৭০০- ১৩৪১ হিজরি)

যদিও সুফিবাদের এই ধারাটি গোটা মুসলিম জাহানেই ছড়িয়ে পড়েছিল তবে এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা যায় এশিয়া মাইনর অঞ্চলে, যা আনাতোলিয়া নামে পরিচিত ছিল। এই ভূখণ্ডতেই পরবর্তী সময়ে আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্রটি গড়ে উঠে আর মঙ্গল অধ্যায়ের পর এখান থেকেই ইসলামের পুনর্জাগরণ শুরু হয়।

এশিয়া মাইনরে সুফিবাদের ধারাটি বণিক ও শিল্পী শ্রেণির কিছু অনুসারীর সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যায় যাদেরকে সেই সময়ে আখি (ফতোয়ার তুর্কি ভাষ্যরূপ) হিসেবে অভিহিত করা হতো। নতুন এই ধারাটি সময়ের অনিশ্চয়তার মোড়কে অনেকগুলো সাধারণ গল্পগাঁথাকে চাপা দিয়ে যায়। জনগণও কিছু বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা আর সেভাবে অনুভব করছিল না। এশিয়া মাইনর এলাকাটি তুর্কি মুসলমান আর ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের সীমানা হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই ঝঞ্ঝামুখর অবস্থায় পড়েছিল। এর আগে সেলজুক আর বাইজেন্টাইনরাও এই ভূখণ্ডকে কাটাছেঁড়া করেছে, এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে যুদ্ধ করেছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

একবার অবশ্য একজন সেলজুক রাজকুমার এই এলাকায় মোটামুটি স্থিতিশীল একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। তখন এটাকে বলা হতো রুমের সুলতানাত (রুম হলো রোমের আরবি ভাষ্যরূপ)। কিন্তু ক্রুসেডাররা এই এলাকায় প্রবেশ করার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়। এর উপর সেলজুকরা নিজেদের মধ্যেও বিবাদে জড়িয়ে পড়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়।

ক্রুসেডারদের প্রভাব যখন কমতির দিকে, সেই সময়েই অবশ্য বেশ কয়েকজন তুর্কি রাজকুমার পূর্ব এশিয়া মাইনর এলাকাটি কম বেশি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন। কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণও খুব শক্ত কিছু নয়। হালকা ধরনের নিয়ন্ত্রণই ছিল। অন্যদিকে, বাইজেন্টাইনের প্রভাব ছিল পশ্চিম এশিয়া মাইনর এলাকায়। তবে সেখানে তাদেরও যে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল তাও কিন্তু নয়। সব মিলিয়ে সেই সময়ে গোটা এশিয়া মাইনরটি এক ধরনের অস্থিরতায় ডুবেছিল। এশিয়া মাইনরে তখন খ্রিষ্টান ও মুসলমান-উভয় ধর্মাবলম্বীরাই থাকত। তবে শাসন করার পর্যায়ে আসলে কেউই ছিল না।

মঙ্গলদের উত্থানের কারণে তুর্কিদের সাধারণ ভবঘুরে গোত্রগুলো মধ্য এশিয়া থেকে বিতাড়িত হতে বাধ্য হয়। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পালিয়ে বেড়ায় যতক্ষণ না তারা এশিয়া মাইনরে এসে পৌঁছায়। এখানে এসে তারা ঘরের মতো প্রশান্তি অনুভব করে। এখানে কেন তারা স্থির হলো? এর উত্তর হলো এই ভবঘুরে বা যাযাবর টাইপের মানুষগুলো আইনের অনুপস্থিতিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত। কারণ এই যাযাবরেরা ছিল স্বায়ত্বশাসিত। নিজেদের মন মতোই তারা চলত। তাদের নিজস্ব নেতা ছিল, আইনও ছিল। এর বাইরে সরকার বা প্রশাসন থেকে কোনো আইন চাপিয়ে দেয়া হলে তারা অস্বস্তি অনুভব করত। যেহেতু এশিয়া মাইনরটি বিশৃঙ্খল একটি অবস্থায় ছিল তাই তারা যেখানে সেখানে নির্দ্বিধায় চলাচল করতে পারত। খাবারের প্রয়োজন হলে যেকোনো জায়গা থেকেই তারা প্রাণীও সংগ্রহ করে খেতে পারত।

খ্রিষ্টানরাও তখন এই অনিশ্চিয়তাভরা অঞ্চলটিতে বসবাস করত। তবে ছোট খাট শহরে বা গ্রামেই তাদের আবাস ছিল। কিন্তু তখন এমন কোনো সরকার ছিল না যারা তাদেরকে চলাচলের সময় সড়কে নিরাপত্তা দিতে পারবে। কিংবা কারও বাড়িঘরে ডাকাতি হলে সাহায্য করার মতো পুলিশও ছিল না, অথবা যদি কারও বাড়িতে আগুন লাগতো, ঝড় বা বন্যা হতো তখন সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসার মতো কোনো ত্রাণ বা সহযোগী সংস্থাও ছিল না। তাই প্রত্যেকেই যতটুকু সাহায্য পেত তা তার নিজ গোত্র বা সম্প্রদায়ের থেকে, আর সবচেয়ে ভালো যাদের সাহায্য পাওয়া যেত তারা হলো ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে থাকা সুফি সাধকদের।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যেহেতু সুফিবাদটি এই এলাকাতেও বেশ প্রগাঢ়ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তাই নানা ধরনের রহস্যময় কথাবার্তাও চতুর্দিক থেকে আসতে শুরু করে। কিছু আসে পারস্য থেকে, কিছু আসে পারস্যের আরও পূর্বের কোনো অঞ্চল থেকে। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দরবেশ। এরা আধ্যাত্মিক সাধনাকে নির্বিঘ্ন করার জন্য দরিদ্রতাকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতেন। তারা কোনো কাজ করতেন না বিধায়, নিদারুণ কষ্টে দিন কাটাতেন। তথাপি তারা এভাবেই কর্মহীন জীবন বেছে নিতেন, যাতে তারা পুরো সময়টাই আল্লাহর ধ্যান করেই পার করতে পারেন।

এসব রহস্যময় ভবঘুরে লোকগুলোর অধিকাংশই একটু খামখেয়ালি মানসিকতার ছিলেন। আপনি যদি দরিদ্রতাকে মেনে নিতে পারেন বা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন চালাতে পারেন, তাহলে একটা লাভ আছে। আর তা হলো আপনি মানুষের ভিড় থেকে দূরে থাকতে পারবেন। যাহোক, এই ভবঘুরে সাধকদের মধ্যে একজন ছিলেন কালেন্দার। তিনি শহর থেকে শহরে তার অনুসারীদেরকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তারা উচ্চ শব্দে ড্রাম বাজাতেন, স্লোগান দিতেন, গান গাইতেন, চিৎকার করতেন এবং মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন। একই সঙ্গে তাদেরকে জিহাদ করার জন্য উৎসাহ দিতেন। কালেন্দার এবং তার অনুসারীদের চুল ছিল এলোমেলো, তারা খুব নোংরা ও অগোছালো কাপড় চোপড় পড়তেন। তাদের কারণে সমাজে কিছুটা শান্তি বিঘ্নিত হতো। তবে এটাও ঠিক, তাদের মাধ্যমে নানা ধরনের যুগান্তকারী চিন্তারও উদ্ভব হয়েছে। আর আরেকটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো যেখানেই কালেন্দার যেতেন, সেখানেই যেন কীভাবে কীভাবে একটি কালেন্দারি ভ্রাতৃত্ববোধও তৈরি হয়ে যেত।

কালেন্দারের মতো উগ্র সাধককে মোকাবেলা করার জন্য তখন আরেকজন সাধকেরও জন্ম হয়েছিল। তার নাম বেকতাশ। তিনি অবশ্য অনেকেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তার মধ্যেও কিছুটা সমস্যাকর বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু ভালোগুণ যেটা ছিল তা হলো, তিনি কালেন্দারের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করতেন না। তিনি ছিলেন আলেম শ্রেণির প্রিয় সুফি সাধক।

এরপরে আসে মেভলেভি দরবেশের ট্রেন্ড- যা কিনা অনেক বুদ্ধিজীবী ও রসপণ্ডিতদেরও খুব পছন্দ ছিল। তারপর উত্থান হয় জালালুদ্দিন নামের এক কবির। জালালুদ্দিন মূলত জন্মেছিলেন আফগানিস্তানের বালখ এলাকায়। এই কারণে তিনি জালালুদ্দিন আল বালখি নামেই প্রথমদিকে পরিচিত ছিলেন। চেঙ্গিজ খান যখন ক্রমশ একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হয়ে উঠছিল, জালালুদ্দিন তখনো নেহায়েত এক কিশোর। তার পিতা কীভাবে যেন আগে থেকেই সমূহ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিপদের সম্ভাবনা টের পেয়ে যান। তাই তিনি বালখ থেকে তার পরিবারকে নিয়ে আরও পশ্চিমে রুমির সুলতানাতের দিকে চলে যান। আর এই কারণেই জালালুদ্দিনকে বিশ্বের সবাই জালালুদ্দিন রুমি হিসেবেই চিনে থাকেন।

রুমি তার পড়াশোনা শুরু করেন তার পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে। এক সময় তিনি নিজেই সেই স্কুলে পড়াতেও শুরু করেন। তিনি শিক্ষক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি চিরায়ত বেশ কিছু ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বর্ণনা করেন যার কারণে সমাজে তার সম্মান অনেক বৃদ্ধি পায়। তার কিছু ছাত্র-সাগরেদও সেই সময় তৈরি হয় যারা তার লেকচারগুলো শুনত এবং প্রতিটি শব্দ নোট করে রাখত।

এরপরই মূলত রুমির জীবনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাটি ঘটে। রুমি একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ করে সেই সময় এক ময়লা পোশাক পড়া আগন্তুক তার ক্লাসে প্রবেশ করে। সেই ভিখারি ধরনের আগন্তুকটি একেবারে শেষ বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়েন এবং নানা ধরনের কথা বার্তা বলতে থাকেন। তিনি চিৎকার করে গান গাইছিলেন। এতে রুমির লেকচার দিতে সমস্যা হচ্ছিল। লোকটাকে দেখতে উম্মাদের মতো লাগছিল। রুমির ছাত্ররা তার আচরণে ক্ষীপ্ত হয়ে তাকে ধরে ক্লাসের বাইরে রেখে আসতে চাইছিল কিন্তু রুমি তাদেরকে থামালেন এবং নিজেই সরাসরি ঐ আগন্তুককে প্রশ্ন করলেন, তিনি কেন এখানে এসেছেন, তিনি আসলে কী চান?

সেই আগন্তুক উত্তর দিলেন, 'আমি শামস-ই-তাবরিজ। আমি এখানে তোমার জন্যই এসেছি।'

এরপর পরই ছাত্রদেরকে পুরোই অবাক করে দিয়ে রুমি সঙ্গে সঙ্গে তার বইটি বন্ধ করে ফেললেন এবং বললেন যে আমার শিক্ষকতা জীবনের এখানেই ইতি। এই ব্যক্তি হলেন আমার শিক্ষক। এই কথা বলেই শামসকে নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যান এবং এরপর অনেক দিন আর ফিরে আসেননি।

জালালুদ্দিন এবং সেই শামস ছিলেন আসলে অবিচ্ছেদ্য। তারা খুবই আবেগতাড়িত হয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত ছিলেন। তবে তা ছিল পুরোপুরি আধ্যাত্মিক লেভেলের একটি সম্পর্ক। রুমি শামস এর দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে এরপর থেকে তার নিজের কবিতাগুলোও সেই শামসের নামেই দস্তখত করতেন। তাই এই সময়ে তিনি যেই কবিতাগুলো লিখেছিলেন তা 'দ্য ওয়ার্কস অব শামস-ই-তাবরিজ' বা শামস-ই-তাবরিজের কবিতাসমগ্র নামে পরিচিত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

শামস এর সাথে দেখা হওয়ার আগে রুমি একজন সম্মানীয় লেখক ছিলেন যার লেখাগুলো হয়তো পরবর্তী ১০০ বছর টিকে থাকত। কিন্তু শামসকে দেখার পর রুমি আসলে বিশ্ব সাহিত্য ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্যময় কবিতে পরিণত হন, যা তাকে এখনও অবধি বাঁচিয়ে রেখেছে।

অবশেষে, অনেক বছর পর শামস আবারও রহস্যজনকভাবে গায়েব হয়ে যান। তার রুমি তখন এক হাজার পৃষ্ঠার একটি কবিতা রচনা করেন যার নাম ছিল 'মসনবী মানায়ী'। ইংরেজিতে একে বলে 'দ্য স্পিরিচুয়াল ম্যানুসক্রিপ্ট' আর বাংলায় বলা যায় আধ্যাত্মিকতার পাণ্ডুলিপি। এই বইটির শুরুর দিকে রুমি একটি প্রশ্ন তুলেছেন তা হলো, 'বাঁশি দিয়ে এতটা সুরেলা ধ্বনি বের হয় কিন্তু কেন এই সুরগুলো সব সময় দুঃখময় থাকে?' এরপর তিনি নিজেই তার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেন, বাঁশিটি যেই নলখাগড়া থেকে তৈরি করা হয় তা হয়তো কোনো নদীর তীরে অযতনে পড়ে থাকে। সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে এসে বাঁশি বানানো হয়। কিন্তু আসলে এভাবে বাঁশিটিকে তার শিকড় অর্থাৎ নলখাগড়া গাছ বা চিরচেনা নদীর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়। তাই বাঁশি দিয়ে যেই আওয়াজটা বের হয় তা সব সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয় কারণ বাঁশি আসলে সব সময় তার শিকড়ের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত থাকে।

এরপরে রুমি যে ৩০ হাজার ছন্দময় পদ্য লিখেছিলেন সেগুলো মূলত এমনভাবে তিনি লিখেছিলেন যার প্রতিটি পরতে পরতে আসলে ধর্মীয় চেতনা বিদ্যমান। তিনি মানুষকে সেই শিকড় ছেড়া বাঁশির সাথে তুলনা করে বার বার সেই কবিতাগুলোতে সেই আলোচনাই করেছেন, কীভাবে মানুষ আবার তার শিকড়ের সাথে বন্ধনে জড়াতে পারে। রুমি আজও টিকে আছেন, বিশেষ করে ইংরেজি ভাষী লোকের কাছে তো তিনি আরও বেশি জনপ্রিয়। তার বইগুলো, সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক কাজগুলোর বিশ্বের বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং সেগুলো এখনও বিশ্বের অনেক জায়গাতেই বেস্ট সেলার হিসেবে বিক্রি হচ্ছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সুফিবাদের ভেতরে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা সকল শ্রেণির, সকল চিন্তার এবং সকল রুচির মানুষকেই আকর্ষণ করত। এমনকি সুফিজম প্রথম বড় আকারে তৎকালীন যাযাবর শ্রেণির একটি বিরাট অংশকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসে। এই ভবঘুরে গোত্রগুলোও তাই সুফিজমের প্রভাবে ইসলামের ধর্মীয় বিধি বিধান জানার আগেই বরং ইসলামের আবেগীয় চেতনাগুলো সম্পর্কে বেশি জানার সুযোগ পায়। সুফিবাদটি জড়িয়ে ছিল সবার সাথেই। শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে, বণিক সমিতির সাথে, কৃষক ও

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

খেটে খাওয়া চাষীদের সাথে এমনকি সামরিক দলগুলোর সাথেও সম্পৃক্ত হয়েছিল। এক কথায়, সুফিবাদ ছিল একমাত্র বিষয় যা বহুভাগে বিভক্ত পৃথিবীর সকল বিভাজনের সাথেই মাকড়সার জালের মতোই জড়িয়ে ছিল।

কিছু কিছু সুফি সাধকেরা অবশ্য ফুতুয়াহ চিন্তাধারার দিকে বেশি ঝুঁকে ছিল। শেষমেশ তাদেরকে গাজি দর্শনের দিকেই টেনে নিয়ে যায়। গাজি বলতে বুঝানো হতো 'দরবেশ যোদ্ধা'। গাজিদেরকে দেখতে ক্রুসেডের সময় আসা খ্রিষ্টান নাইটদের মতোই মনে হতো। তবে নাইটদেরকে যেমন পোপরা নিয়োগ ও আদেশ করত, ইসলামে তেমন কোনো পোপের অস্তিত্ব না থাকায় গাজিরা নিজেরাই নিজেদের দ্বারা আদিষ্ট হতেন। তবে তারা কিছু ক্যারিশমাটিক শায়খদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন। তারা মাথায় পাগড়ি পড়তেন, গায়ে আলখাল্লা পড়তেন এবং গ্রুপের সদস্য হিসেবে নিজেদেরকে পোশাকে একটি ব্যাজ পরিধান করতেন। তারা নতুন করে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী চালু করেন যেমন মাথা নিচু করে সম্মান জানানো। আর সেই সাথে তারা নানা ধরনের হস্তশিল্প বা রহস্যময় কোনো পুরোনো জিনিসের ধ্বংসাবশেষও তাদের সঙ্গে রাখতেন।

গাজি গ্রুপের সদস্যরা খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোর আশেপাশেই ক্যাম্প করে থাকতেন। যাতে, তারা সুযোগ মতো সাহসকিতার কোনো নিদর্শন দেখাতে পারেন বা খ্রিষ্টান কোনো এলাকা জয় করে সত্যের সীমানাকে আরও প্রসারিত করতে পারেন। তৎকালীন সময়ে বেশ বড় একটা সংখ্যক মানুষ গাজি গ্রুপে নাম লিখিয়েছিলেন। সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যেই তারা তখন বাইজেন্টাইন রাজ্যের সীমানাঘেঁষা বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করতেন। এই অঞ্চলগুলোতে অভিযান চালানোর সুবিধা ছিল, জায়গাগুলো অফিসিয়ালী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হলেও কার্যত সেখানে বাইজেন্টাইনদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তাই সেসব জায়গায় অভিযান চালালে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। হতো তাই। যখনই কোনো গাজি সর্দার কোনো অঞ্চলকে তার নিয়ন্ত্রণে মনে করতেন তখনই তিনি সেই অঞ্চলকে আমিরাত, আর নিজেকে সেই আমিরাতের আমির হিসেবে ঘোষণা করতেন। আমির হলো একটি শব্দ যাকে ইসলামিক পরিভাষায় কমান্ডার বা সেনাপতি বলা যায়। কিন্তু এখন অবশ্য আমীরের ব্যাখ্যা পাল্টে গেছে। অনেক মুসলিম দেশেই এখন আমির শব্দটি দিয়ে রাজা বা যুবরাজকে বুঝানো হয়।

এভাবে পূর্ব আনাতোলিয়ার সীমানা জুড়ে অনেক বড় অঞ্চল জুড়ে গাজিদের অনেকগুলো আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিস্থিতিতে বাইজেন্টাইন শাসকেরা নিজেদেরকে আরও গুটিয়ে নেন এবং তারা এরপর একটু একটু করে পশ্চিমের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দিকে সরে যান। যেহেতু গাজিরা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে সরে গেল, তাই গাজিরাও তাদের সাথে সাথে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত আমিরাতগুলোকে ছেড়ে আরও পশ্চিমের দিকে সরে গেল। কারণ, তাদের মাথায় শুধু বাইজেন্টাইনদের সাথে যুদ্ধ করে ছোট ছোট অঞ্চলকে জিতে নেয়ার চিন্তাই ঘুরপাক খেত।

একটা সময় গিয়ে পশ্চিমে সরে যাওয়ার সেই চেষ্টা থামিয়ে দিতে বাইজেন্টাইনরা বাধ্য হলো। কারণ তারা যেতে যেতে কন্সট্যানটিপোলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলি। গাজিরাও একেবারে তাদের নাকের কাছে পৌঁছে গেল। দুই পক্ষ পরবর্তী ৫০টি বছর শুধু আনাতোলিয়াতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করে গেল। এভাবে একদিকে এই সীমানা অঞ্চলটিতে যেমন গাজিদের শক্তি বৃদ্ধি হলো কিন্তু পূর্ব দিকে নিজেদের তৈরি করে আসা আমিরাতগুলোতে তাদের অবস্থান হয়ে গেল নাজুক। অন্যদিকে, আনাতোলিয়ার পশ্চিম প্রান্তের সীমানা জুড়েই নতুন করেই একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলো।

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন হালাকু বাগদাদকে জয় করেন, সেই বছরই আনাতোলিয়ার এক গাজি পরিবারে উসমান নামে একটি বালক জন্ম নেন। ওসমানের বংশধরদেরকে বলা হতো উসমানিস। পশ্চিমারা এই ওসমানিসকে অটোম্যান হিসেবে অভিহিত করে। আর এই অটোম্যানরাই নতুন সেই সাম্রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করে।

এ রকম নয় যে, ওসমান নিজেই সেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি কেবল আনাতোলিয়াতে একটি দুর্ভেদ্য এবং শক্তিশালী গাজি আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার পূর্বসূরি ছিলেন মধ্য এশিয়ার এক যাযাবর গোত্রীয় লোক যারা মঙ্গলদের ভয়ে মধ্য এশিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। এই পূর্বসূরির জন্য ঘোড়াই ছিল প্রাসাদ আর ঘোড়ার আসনই ছিল সিংহাসন। কারণ, তিনি জীবনের বড় অংশই শুধু পালিয়েই বেড়িয়েছেন। যেখানে রাত হতো সেখানেই ঘোড়া থেকে নেমে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। ফলে একটা সময়ে গিয়ে তিনি যখন স্থির হন, তখনো তিনি তার পরবর্তী প্রজন্মকে যুদ্ধ করে টিকে থাকার বিদ্যাই শিখিয়েছেন।

অটোম্যানরা যখন ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠে তখন তারা অন্য গাজি রাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে। কিছু রাজ্য তারা দখল করে, কিছু রাজ্যকে আবার কিনে নেয়। আর এসব পরাজিত গাজি রাজ্যগুলোর আমীরেরা গ্রহণ করে জমিদার বা সামন্ত হয়ে টিকে থাকেন। তখনো তাদের কিছুটা প্রভাব প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল কিন্তু বাস্তবে তারা নিজেরাই তখন শক্তিশালী অটোম্যানদের অধীনস্ত হয়ে পড়েন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উত্থান পতনের খেলায় একটা পারিবারিক রাজতন্ত্রকে নানা ধরনের সংকট মোকাবেলা করতে হয়। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে অটোম্যান রাজবংশকে কিছুটা সৌভাগ্যবানই বলতে হয়। এই রাজতন্ত্রের অনেক শাসকই বেশ দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন, অনেকেই ছিলেন বেশ যোগ্য ও সক্ষম। এদেরই মধ্যে একজন ছিলেন প্রথম মুরাত, যিনি কৃষ্ণসাগর পার হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। তার শাসনামলে (১৩৫০-১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) অটোম্যান রাজতন্ত্রের ঘোড়ায় চড়ে শাসন কাজ করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে এল। কারণ, তখনই অটোম্যানদের ইতিহাসে প্রথম কোনো রাজধানী, প্রথম কোনো প্রাসাদ, একটি আমলাতন্ত্র, একটি কর কাঠামো ও কর কৌশল এবং একটি রাজকোষ প্রতিষ্ঠিত হলো। অটোম্যান শাসকেরা ইসলামিক সভ্যতার একটি বাহ্যিক কাঠামো প্রণয়ন করল। যদিও বলাই বাহুল্য যে তাদের কিছু কার্যক্রম বাইজেন্টাইনদের এত দিনের কার্যকৌশলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণই ছিল।

আরেকজন অটোম্যান শাসক ছিলেন প্রথম বায়জিদ (১৩৮৯-১৪০২)। যিনি 'দেভশ্রিমে' নামক একটি কর্মসূচি চালু করেছিলেন। যার আওতায় খ্রিষ্টীয় ইউরোপ থেকে ছোট ছোট বালকদেরকে নিয়ে এসে তাদেরকে মুসলিম হিসেবে বড় করে একপর্যায়ে তাদেরকে সাহসী ও বেপরোয়া সৈন্যে রূপান্তরিত করা হয়। অতীতে মামলুকদের যেভাবে তৈরি করা হয়েছিল এটা ছিল সেইরকমই একটি প্রক্রিয়া। মামলুকরা ছিল তুর্কিশ গোত্রীয়, যাদেরকে আরব বা পারস্য দরবারের ছায়ায় কাজে লাগানো হয়। আর এগুলো ছিল খ্রিষ্টান বালক যাদেরকে তুর্কি দরবারে কাজে লাগানো হলো। 'দেভশ্রিমে' প্রকল্পের আওতায় যেই সৈন্যদেরকে তৈরি করা হয় তাদেরকে বলা হতো 'জানিসারি'- শব্দটি এসেছে তুর্কি শব্দ 'ইয়েনি সেরি' থেকে যার অর্থ হলো নতুন সেনা।

বায়জিদের জানিসারিরা তাকে পূর্বসূরি সামন্ততন্ত্রের একচ্ছত্র প্রভাব থেকে মুক্ত করে। কারণ, মধ্য এশিয়া থেকে আসা গাজিরাই তখনো পর্যন্ত বায়জিদের পদাতিক সেনা হিসেবে কাজ করত। কিন্তু জানিসারিরা এসে এমন একদল পেশাদার সৈন্য সরবরাহ করে যারা যোগ্যতার সাথে বায়জিদ বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।

বায়জিদ তার পূর্বসূরি অটোম্যান শাসকের রেকর্ডকে অতিক্রম করে ইউরোপের আরও গভীরে প্রবেশ করেন। তাকে মোকাবেলা করার জন্য ফ্রান্স ও হাঙ্গেরির শাসক মিলে একটি যৌথবাহিনী গঠন করেন। কিন্তু ১৩৯৬ সালে তৎকালীন নিকোপলিস বা আজকের বুলগেরিয়াতে অনুষ্ঠেয় যুদ্ধে বায়জিদ সেই যৌথবাহিনীকেও পরাজিত করেন। এর ফলে অটোম্যান আমির এখন সত্যি

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সত্যিই একটি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতিতে পরিণত হলেন। বায়জিদ এরপর আমিরের পদবি পরিত্যাগ করে নিজেকে সুলতান পদবিতে অভিহিত করতে শুরু করেন। তিনি নিজেকে দার-আল-ইসলামের প্রধান নির্বাহী হিসেবেও দাবি করেন। যা কিনা খলিফার ধর্মনিরপেক্ষ সংস্করণ। তার সামরিক অভিযানগুলো ছিল বেশ সফল। তিনি এক বছর পশ্চিমে অভিযান চালালে পরের বছর পূর্বে অভিযান চালাতেন। কারণ, শুধু ইউরোপ নয়, গাজিদের আমিরাতগুলোকেও তিনি টার্গেট করেছিলেন যাতে মুসলমানদের আদি সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্রস্থলটি তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। একসময় আশেপাশের সব অঞ্চলের মানুষ তাকে 'বজ্রপাত' নামেও অভিহিত করতে শুরু করে।

একসময় সেই সফলতারও পরিসমাপ্তি ঘটে। পূর্বের দিকে এক অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে বায়জিদ তার থেকেও দুর্ধর্ষ এক যোদ্ধার সাথে পরিচিত হন, যার নাম তৈমুর লং। বায়জিদের কাছে হেরে যাওয়া গাজি সামন্ততন্ত্রের লোকেরাই তৈমুরকে আনাতোলিয়াতে ডেকে পাঠান। তারা অটোম্যানদের কাছে সার্বভৌমত্ব হারিয়ে খুবই ক্ষিপ্ত ছিলেন। তাই তারা তৈমুরকে বার্তা পাঠালেন এই বলে যে, বায়জিদ ইউরোপের পেছনে অনেকটা সময় দিচ্ছে এবং বায়জিদ এরই মধ্যে খ্রিষ্টধর্মেও দীক্ষিত হয়েছে। তৈমুর লং ছিলেন খুবই নির্মম ও হিংস্র একজন মানুষ। অন্যদিকে, তৈমুর আবার নিজেকে একজন জ্ঞানপিপাসু সেবক ও ইসলামের রক্ষক হিসেবেও তৈরি করেছিলেন।

১৪০২ সালে আনকারায় তৈমুর ও বায়জিদ মুখোমুখি লড়াইয়ে লিপ্ত হন। দুজনই ছিলেন ভয়ংকর হিংস্র অবস্থায়। তবে শেষ পর্যন্ত জয় হয় অধিক হিংস্রতার। তৈমুর নিজেকে বায়জিদের চেয়ে বেশি নির্মম হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন। তিনি অটোম্যান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। বায়জিদকে কারাবন্দি করেন এবং তাকে পশু রাখার একটি খাঁচায় আটকে রাখেন। এরপর তাকে পশুর মতো টেনে হিঁচড়ে মধ্য এশিয়ার ইহুদি অধ্যুষিত এলাকা সমরখন্দে নিয়ে যান। বায়জিদ এই গোটা ঘটনাটায় এতটাই অপমানিত হন যে তিনি এক পর্যায়ে আত্মহত্যা করেন। বায়জিদের সন্তান সাম্রাজ্যের বাকি অংশটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

পরিস্থিতিটা তখন এমন ছিল যে, অটোম্যান শাসন বোধহয় শেষই হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যে, তারা তুর্কিশ অন্য সব গোত্রের মতোই একটি গোত্র যারা ফোঁস করে জ্বলে উঠে আবার হঠাৎ করেই নিভে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অটোম্যানরা ছিল ভিন্ন জাতের। উসমান থেকে বায়জিদ পর্যন্ত তাদের শাসনকালে তারা যে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

শুধু নতুন সাম্রাজ্য বা দেশ জয় করেছিল তা নয়, বরং তারা একটি নতুন ধরনের সামাজিক ধারাও সৃষ্টি করেছিল। তৈমুরের কাছে পরাজয়ের পর তারা তাদের সম্পদগুলোকে ভিন্নভাবে সামনে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করল। আনকারা যুদ্ধের কিছুদিন পরই তৈমুর মারা যান। সাথে সাথেই তার সাম্রাজ্যটি ছোট হয়ে শেষ পর্যন্ত পশ্চিম আফগানিস্তানের একটি জায়গায় এসে স্থির হয়। অন্যদিকে, অটোম্যান সাম্রাজ্যটি শুধু পুনরুদ্ধারই হয়নি বরং তা নতুন করে বিকশিত হতে শুরু করে।

১৪৫২ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্য সাফল্যের উচ্চশিখরে পৌঁছে যায়, যখন সুলতান মুহাম্মাদ (বিকৃত হয়ে মেহমেত নাম জনপ্রিয় হয়) শাসনভার গ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ উত্তরাধিকার সূত্রে সাম্রাজ্যকে ভালো অবস্থায় পেয়েছিলেন। কিন্তু তার একটি সংকট ছিল। তিনি ছিলেন মাত্র ২১ বছর বয়সী! আর তার চারিপাশে বয়স্ক অনেকগুলো লোক শাসক হওয়ার লোভে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিল। তারা প্রত্যেকেই মনে করছিল যে, মেহমেতের চেয়ে তারা ভালো সুলতান হতে পারতেন। মুহাম্মাদ জানতেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বিদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে শাসক হিসেবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে অনেক কাঠখড় পোহাতে হবে।
তাই তিনি কন্সট্যানটিপোল বিজয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

কন্সট্যানটিপোল বিজয়টা তত দিন সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে যতটা বড় ছিল তার চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার ছিল, মানসিক আস্থা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর ক্ষেত্রে। কারণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকেই শহরটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম।

পশ্চিমাদের কাছে তখনো কন্সট্যানটিপোল থেকে অগাস্টাস ও জুলিয়াস সিজারের রোম পর্যন্ত একটি সীমারেখা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে টিকে ছিল। খ্রিষ্টানরা এই কন্সট্যানটিপোলকে তখনো পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী মনে করত। পরবর্তী সময়ে ইতিহাসবিদরা যারা রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তরের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছিলেন, তারাই এই অঞ্চলটিকে নতুন নামকরণ দিয়েছিলেন। বাইজেন্টাইনরাও নিজেদেরকে রোমান বলেই দাবি করত এবং তাদের শহরকেও (কন্সট্যানটিপোল) নয়া রোম হিসেবেই বিবেচনা করত।

অন্যদিকে, মুসলমানদের কাছে কন্সট্যানটিপোলের গুরুত্ব ছিল আরেক রকম। একবার প্রিয়নবি হযরত মোহাম্মাদ ﷺ বলেছিলেন, মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় আসবে তখনই যখন তারা কন্সট্যানটিপোল জয় করতে পারবে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইসলামের তৃতীয় শতকে আরব দার্শনিক আল কিন্দি অনুমান করেছিলেন, যে মুসলমানের হাত দিয়ে কন্সট্যানটিপোল জয় হবে তার মাধ্যমে আবার ইসলামের নতুন করে উত্থান শুরু হবে এবং তিনিই পরবর্তীকালে বিশ্ব শাসন করবেন। অনেক ইসলামিক পণ্ডিতেরাই মনে করতেন যে, কন্সট্যানটিপোল বিজয় করবেন ইমাম মাহদী সেই রহস্যময় পুরুষ কিয়ামতের আগে দিয়ে যার আবির্ভূত হওয়ার কথা রয়েছে। এসব বিভিন্ন মিথ চালু থাকায় সব মিলিয়ে মেহমেতের কাছে মনে হয়েছিল, তিনি যদি একবার কন্সট্যানটিপোল বিজয় করতে পারেন তাহলে গোটা বিশ্ব তাকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করতে শুরু করবে।

সেই সময়ে অটোম্যানদের সাথে যারা কাজ করতেন তার মধ্যে একজন ছিলেন হাঙ্গেরির প্রকৌশলী আর্বান। তিনি ছিলেন কামান বিশারদ। তখনো সব জায়গায় কামানের ব্যবহার সেই অর্থে শুরু হয়নি। সুলতান মুহাম্মাদ আর্বানকে আরও উন্নতমানের একটি কামান নির্মাণের আদেশ দিলেন। সেই মোতাবেক আর্বান কন্সট্যানটিপোল থেকে ১৫০ মাইল দূরে একটি ঢালাই কারখানা নির্মাণ করলেন। তিনি এমন একটি কামান বানাতে সক্ষম হলেন যা ২৭ ফিট লম্বা এবং আকারেও এত বড় যে একজন মানুষ অনায়াসে তার ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যেতে পারত। কামানটিকে সেই সময়ে বলা হতো 'বাসিলিক' যা এক মাইল দূর থেকে ১২শ পাউন্ড ওজনের গ্রানাইড স্টোনের গোলাটিকে নিক্ষেপ করতে পারত।

এই বাসিলিক কামানটি সব সময় এত বড় ছিল যে যুদ্ধের ময়দানে একে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য ৯০টি গরু এবং ৪ শতাধিক মানুষের প্রয়োজন হতো। তা ছাড়া কামানটি এত বিশাল ছিল যে, একে বারুদ ভরতে ৩ ঘণ্টা সময় লাগত। আর একবার গোলা নিক্ষেপ করার পর এটা এতো ভয়ংকরভাবে পিছনে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসত যে অসংখ্য মানুষ এর আঘাতে বা পিষ্ট হয়ে মারা যেত। তা ছাড়া এক মাইল থেকে ছোড়া গোলা যে সব সময় অব্যর্থভাবে টার্গেটে পৌছাবে তাও নয়। এতদস্বত্বেও এই কামানটি নিয়ে অটোম্যানরা এগিয়ে যেতে চাইলো কারণ, এটা যত বড় না সামরিক সম্পদ তার চেয়ে অনেক বড় একটা প্রতীকী সম্পদ। এই কামানটি তৈরি করায় সারা বিশ্বে অটোম্যানদের ভিন্নরকম একটি ইমেজ তৈরি হলো এবং সকলেই জেনে গেল যে অটোম্যানদের কাছে এমন কামান আছে যা আর কারও কাছেই নেই। বাসিলিক ছাড়াও অটোম্যানদের কাছে ছোটখাট অনেকগুলো কামানও ছিল। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তৎকালীন সময়ে অটোম্যানরাই ছিল প্রযুক্তিগতভাবে সবচেয়ে অগ্রসর সেনাবাহিনী।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

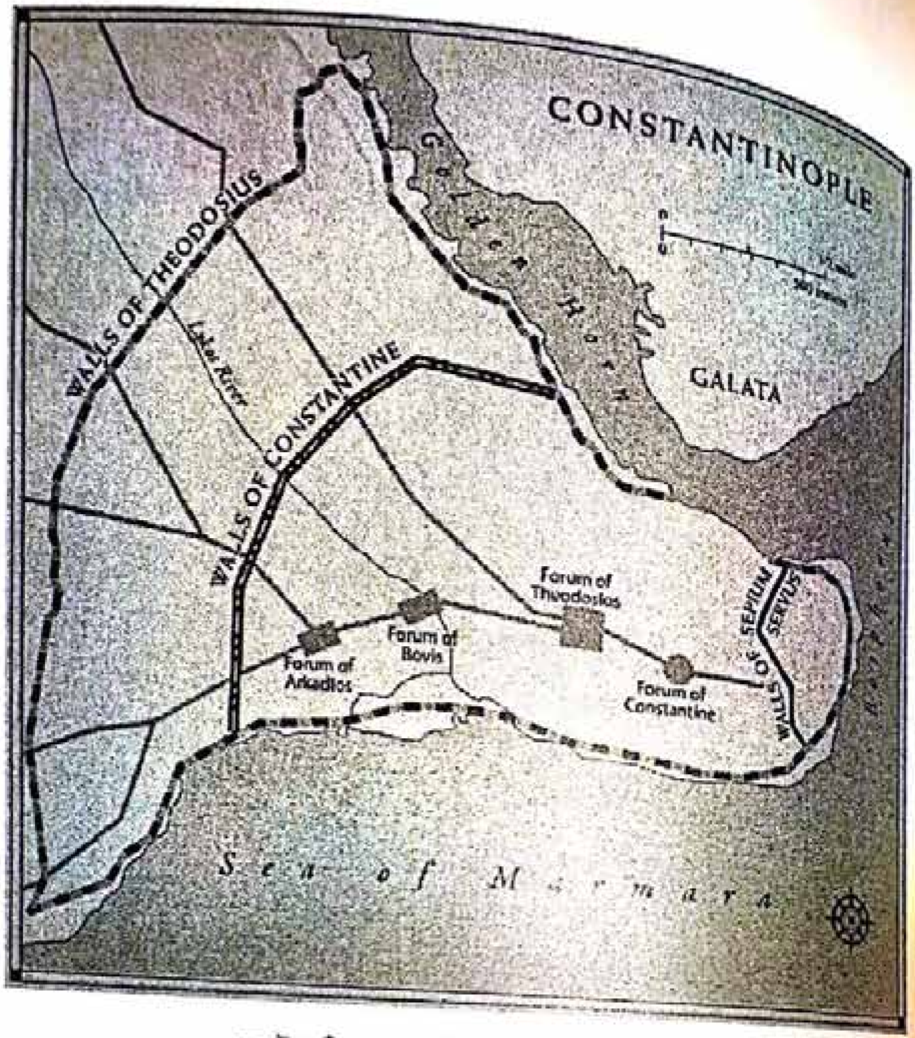

কন্সট্যানটিপোল : পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য নগরী

অটোম্যানরা কন্সট্যানটিপোল শহরটিকে ৫৪ দিন ধরে ঘেরাও করে রাখে। কিন্তু কন্সট্যানটিপোলটি ছিল আসলে একটি দুর্ভেদ্য শহর। এটি একটি ব-দ্বীপ আকারের ভূমির ওপর অবস্থিত ছিল। শহরটির আকৃতি ছিল অনেকটা গন্ডারের শিং-এর মতন। শহরটির একদিকে ছিল বসফোরাস প্রণালি আর অন্যদিকে ছিল মারমারা সাগর। সাগরের দিকটায় তারা একটি সমুদ্র প্রাচীর তৈরি করেছিল। যার আড়াল থেকে বাইজেন্টাইন সেনারা সমুদ্রে যেকোনো শত্রুপক্ষীয় জাহাজে বোমা নিক্ষেপ করতে পারত।

আর শহরের স্থলভাগটি ছিল আরও সুরক্ষিত। গোটা অন্তরীপে সমুদ্রের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত তারা কয়েক স্তর বিশিষ্ট পাথরের দেয়াল নির্মাণ করেছিল। প্রতিটি দেয়ালের আবার নিজস্ব পরিখা ছিল। প্রতিটি পরিখা ছিল প্রশস্ত আবার প্রতিটি দেয়াল ছিল তার আগের স্তরের দেয়ালের চেয়ে মোটা। সবচেয়ে ভেতরের দিকে যে দেয়ালটি ছিল তা ছিল ৯০ ফুট উঁচু এবং ৩০ মিটার পুরু। যখনই কেউ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই দেয়ালটি অতিক্রম করতে চাইত, বাইজেন্টাইনরা তাদের দিকে একটি অস্ত্র নিক্ষেপ করত যাকে সেই সময় 'বাইজেন্টাইন ফায়ার' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। এটা ছিল মূলত আঠালো ধরনের একটি বিস্ফোরক, যা গুলতি সদৃশ একটি কামান থেকে নিক্ষেপ করা হতো। যখনই এটা কোথাও গিয়ে পড়ত, তখন তা ফেটে গিয়ে ভেতরের জিনিসটা ছিটে শত্রুদের সবার গায়ে লেগে যেত। আর এই অস্ত্রের পদার্থটি এমনই এক জিনিস ছিল যা পানি দিয়েও নেভানো যেত না। আসলে এটা ছিল নাপালাম বা বোমায় ব্যবহৃত থকথকে ধরনের পেট্রোল।

অটোম্যানরা ৫৪ দিন ধরেই টিকে থাকল, তারা কামান থেকে গোলা বর্ষণও অব্যাহত রাখল, জানিসারিরাও তাদের কৌশল জারি রাখল। অটোম্যান সেনাবাহিনীটি ছিল সকল দেশ, জাতি ও গোত্রের একটি অভূতপূর্ব সমন্বয়। সেখানে আরব ছিল, পারসিয়ানরা ছিল, এমনকি ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টানও ছিল। তারা সকলে মিলে কন্সট্যানটিপোলের দুর্গের ওপর হামলা চলমান রাখল। কিন্তু তারা সফলতা পেল খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে। তৃতীয় স্তরের সবচেয়ে কঠিন দুর্ভেদ্য দেয়ালটির একটি ছোট দরজা কে যেন বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তুর্কিদের একটি গ্রুপ সেই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল, তারা আশেপাশের এলাকাটিও শত্রুমুক্ত করে কেল্লার বাইরে থাকা সৈন্যদের জন্য বড় একটি দরজা খুলে দিতে সক্ষম হলো। মুহূর্তের মধ্যেই হাজার হাজার অটোম্যান সেনা পঙ্গপালের মতো শহরের ভেতরে প্রবেশ করল এবং পরিণতিতে দুর্ভেদ্য কন্সট্যানটিপোল শহরের পতন ঘটে গেল।

মুহাম্মাদ তার সৈন্যদের কন্সট্যানটিপোলকে নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য মাত্র ৩ দিন সময় দিলেন। তিনি চাইছিলেন তার সেনারা যেন শহরটাকে লুট বা ধ্বংস না করে বরং সংরক্ষণে মনোযোগী হয়। কারণ, তিনি কন্সট্যানটিপোলকেই নিজ সাম্রাজ্যের রাজধানী করতে মনস্থির করেছিলেন। সেই সময় থেকেই কন্সট্যানটিপোল শহরটির নাম পরিবর্তন হয়ে ইস্তাম্বুল রাখা হয়। যদিও তা কার্যকর হতে পরবর্তী এক শতক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর কন্সট্যানটিপোল জয়ের পর থেকেই সুলতান মুহাম্মাদকে অভিহিত করা হয়, 'মুহাম্মাদ আল ফাতিহ' হিসেবে।

একটাবারের জন্য একটু ভেবে দেখুন, যদি কন্সট্যানটিপোল শহরটিকে মুসলমানরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে জয় করতে পারত তাহলে কী হতো। যদি বাগদাদ না হয়ে কন্সট্যানটিপোল হতো আব্বাসীয়দের রাজধানী, তাহলে কৃষ্ণসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত গোটা এলাকা থাকত মুসলমানদের হাতে। মুসলিমরা তখন গ্রিস ও ইতালিতে এবং স্পেনিশ ও ফরাসি উপকূলে নিয়মিত নৌ অভিযাত্রা করতে পারত, যেগুলো পরে ইউরোপিয়ানরা পরিচালনা করেছিল। এভাবে মুসলমানরা জিবরালটার প্রণালি ও আটলান্টিক সাগর পাড়ি

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দিয়ে পৌঁছে যেত ইংল্যান্ডে। আর নৌপথের এসব অভিযাত্রার পাশাপাশি মুসলমানরা যদি স্থলপথেও সাফল্য পেত তাহলে তো বলাই বাহুল্য, গোটা ইউরোপকেই হয়তো আমরা মুসলমান সাম্রাজ্য হিসেবে পেয়ে যেতাম।

কিন্তু বাস্তবে তা আর হয়নি। খেলাফতে রাশেদার প্রাথমিক যুগের পর তত দিনে ৭শ বছর পার হয়ে গিয়েছে। ইউরোপ একটা সময় যেমন দরিদ্রতার কষাঘাতে পিষ্ট ছিল, তত দিনে তারাও সেই জায়গা থেকে অনেকটাই সরে এসেছে। ইউরোপ তখন সমৃদ্ধির পথে যাত্রা শুরু করেছে। আইবেরিয়ান উপদ্বীপে ততদিনে ক্যাথোলিক রাজতন্ত্ররা অবশিষ্ট মুসলমানদেরকেও তাড়া দিয়ে আফ্রিকার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর কলম্বাসকে পাঠিয়ে দিয়েছে নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করার জন্য। অন্যদিকে, বেলজিয়ামে ব্যাংকিও কাঠামো দাঁড়িয়ে গিয়েছে, ডাচরাও ব্যবসা বাণিজ্যে ভালো করতে শুরু করেছে। ইতালিও রেনেসাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড একটি কাঠামোপূর্ণ জাতিরাষ্ট্র গঠনের পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। কন্সট্যানটিপোল বিজয়টা অটোম্যানদের জন্য নতুন অনেক অভিযান চালানোর সুযোগ করে দিলেও, ইউরোপও এমন কোনো অবস্থানে ছিল না, শক্তি প্রয়োগ করেই সেখানে কিছু করে ফেলা যাবে। সেই মুহূর্তে অবশ্য কেউই নিশ্চিতভাবে জানত না যে কার উত্থান হচ্ছে আবার কার পতন হচ্ছে। তবে অটোম্যানরা কন্সট্যানটিপোল জয় করায় মুসলিম বিশ্বের একটি বড় অংশে ইসলামের উত্থান বেশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

ইস্তাম্বুল যখন জয় করা হয় তখন সেখানে মাত্র ৭০ হাজার লোক বসবাস করত। তাই মুহাম্মাদ কর হ্রাস করে এবং সম্পত্তি অধিকার প্রদানের মতো কিছু আইন প্রণয়ন করলেন, যাতে শহরটি রাজধানী হিসেবে জলদি জনপ্রিয়তা পায়। মুহাম্মাদ আবারও কন্সট্যানটিপোলে কোনো রাজ্য জয় করা সংক্রান্ত ইসলামের প্রাথমিক বিধানগুলো চালু করলেন। সেই বিধান অনুযায়ী অমুসলিমরা তাদের ধর্মচর্চার সকল স্বাধীনতা উপভোগ করবে। তারা সম্পত্তি ভোগ ও ক্রয় করতে পারবে তবে তাদেরকে একটি জিজিয়া কর প্রদান করতে হবে। তার এই সিদ্ধান্তে সকলেই সহযোগিতা করল। ফলে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই ইস্তাম্বুল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক গ্রুপের সমন্বয়ে একটি বৈচিত্র্যময় শহরে পরিণত হলো।

অটোম্যানদের সাম্রাজ্য তখন এমন একটি ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত যার অংশ ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকেই পড়েছে। বিশ্বে সেই সময়ে অটোম্যানদের হাতেই তখন সবচেয়ে বড় শহর। অটোম্যানরা তাদের শাসনের প্রথম ১৫টি যুগে একটি নতুন ধারার সামাজিক কাঠামো প্রণয়ন করল। সেই সমাজে বেদুইন, যাযাবর, চাষী, আদিবাসী যোদ্ধা, রহস্যময় সাধক, নাইট, শিল্পী, বণিকশ্রেণী এবং অন্যান্য বহু

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

...লোক সৌহার্দপূর্ণভাবে বসবাস করত। সমাজটি এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে প্রত্যেক পেশার লোকই অপর পেশাকে গুরুত্ব দিত এবং একজনের কোনো ঘাটতি দেখা দিলে অন্যজন সেটা পুষিয়ে দিত। এ রকম সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যটি সেই ...আগে কখনোই দেখা যায়নি। সেইসাথে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পর আজ ...আর কোথাও দেখাও যায়নি। বর্তমান মার্কিন সমাজও বিভিন্ন পথের, পেশার ...ধর্মের সহাবস্থানকে স্বীকার করে, তবে সেখানে সম্প্রীতির এখনও অনেক অভাব।

...করে বলতে গেলে অটোম্যান সাম্রাজ্যটি দুইটি বড়ভাগে বিভাজিত ছিল। ...শাসক শ্রেণি বলতে একটি জনগোষ্ঠী ছিল, যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ...যারা বিধিবিধান প্রণয়ন করত, যুদ্ধ করত। আর আরেকটি অধীনস্থ গ্রুপও ...যারা উৎপাদন করত এবং কর পরিশোধ করত। তবে অটোম্যান সাম্রাজ্যে ...সাধকদেরকেও সঠিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়। ফলে মানুষেরা বিভিন্ন পথে ...চিন্তার থাকলেও, তারা একই সাধকের অধীনে সাধনা করার সুযোগ পেত। ...অটোম্যান সাম্রাজ্যটি ছিল অনেকগুলো কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা। প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় (এদেরকে মিল্লাত বলা হতো) ছিল স্বায়ত্তশাসিত এবং তারা তাদের ...গোত্রীয় ধর্মীয় অধিকার, শিক্ষা, দান-সাদাকা এবং সামাজিক ...কাণ্ডগুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতে পারত।

...ইহুদিরা ছিল একটি স্বতন্ত্র মিল্লাত। তারা ইস্তানবুলের প্রধান রাব্বি দ্বারা ...হতো। ইহুদিদের সংখ্যা ও প্রভাব বেশ ভালোই ছিল, কারণ, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে ইহুদিরা অটোম্যান ...রাজ্যে এসে প্রবেশ করেছিল। বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের অনেক ইহুদি ...শাসকের দমন পীড়ন থেকে বাঁচতে, অটোম্যান রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আবার ক্রুসেডের সময়ে ইংল্যান্ডও অনেক ইহুদিকে বহিষ্কার করেছিল ...অটোম্যান রাজ্যে এসে ঠিকানা খুঁজে পায়। স্পেনেও অনেক ইহুদি নিপীড়নের ঘটনা ঘটে আর সেসব নিপীড়িত ইহুদিদেরও আশ্রয়স্থল হয়ে যায় এই অটোম্যান রাজ্যই।

...গোড়া সম্প্রদায়টি ছিল আরেকটি মিল্লাত, যার নেতৃত্বে ছিল ...কনস্ট্যানটিপোলের প্যাট্রিচার্চ। এই প্যাট্রিচার্চ সাম্রাজ্যের সকল স্লেভিক খ্রিষ্টানদের ...একমাত্র নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ছিলেন। অটোম্যানরা ইউরোপে তাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখায় এই স্লেভিক খ্রিষ্টানদের সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

...পাশাপাশি ছিল আর্মেনিয়ান মিল্লাত। এরা খ্রিষ্টান হলেও গ্রিকদের থেকে ভিন্ন ছিল। কারণ, গ্রিস ও আর্মেনিয়ার চার্চরা একে অন্যর ধর্মদর্শনকে বিভ্রান্তকর মনে করত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্রতিটি মিল্লাতের একজন করে নেতা থাকতেন এবং সেই নেতা রাজদরবারে থাকার সুযোগ পেতেন। তিনি সুলতানের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেতেন। সুলতানও সেই প্রতিনিধির মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অভিযোগ জানার চেষ্টা করতেন। সে হিসেবে বলতে গেলে মুসলমানরাও অন্য আর দশটি মিল্লাতের মতোই একটি মিল্লাত ছিল। তাদেরও একজন নেতা ছিল যাকে শায়েখ-আল-ইসলাম হিসেবে অভিহিত করা হতো। এই পদটি বায়জিদ তৈমুর লং এর কাছে পরাজিত হওয়ার দিনকয়েক আগে সৃষ্টি করেছিলেন। শায়েখ-আল-ইসলাম শরিয়াত অনুযায়ী আইনি কাজ করতেন। তিনি একদল মুফতির প্রধান হিসেবে কাজ করতেন যারা আইনের ব্যাখ্যা দিতেন। শায়েখ-আল-ইসলাম বিচারকদেরও তত্ত্বাবধান করতেন। সেই সাথে তারা সেসব মোল্লাদেরকেও পরিচালনা করতেন, যারা শিক্ষক হিসেবে যুবকদেরকে ইসলাম শিক্ষা দিতেন এবং আশেপাশের এলাকায় ধর্মীয় আচারাদি ও উৎসবগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতেন।

যদিও শরিয়াতই সেই সময় অটোম্যান সাম্রাজ্যের একমাত্র বিধিবদ্ধ আইন ছিল না। এর পাশাপাশি সেখানে সুলতানের কোড বা আইনও ছিল। এই কোডটি দিয়েই সেই সময়ে প্রশাসনিক বিষয়াবলী, কর আদায় কার্যক্রম, বিভিন্ন মিল্লাতের মধ্যে সমন্বয় এবং শাসক শ্রেণি ও অধীনস্ত শ্রেণিসহ বিভিন্ন শ্রেণিকুলের মধ্যেও সমন্বয় করা হতো।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের পরিচালনা পদ্ধতি আসলে খুবই জটিল ছিল। যেমন, আইনি সকল প্রক্রিয়া, আইনজীবী, আমলা এবং বিচারকেরা সবাই আবার ছিলেন প্রধান উজিরের নিয়ন্ত্রণে। প্রধান উজির আবার প্রাসাদতন্ত্র পরিচালনা করতেন। সুলতানের পর এই প্রধান উজিরই ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাবান।

তৃতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কে ছিলেন? শায়েখ-আল-ইসলাম সকল ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ আইনগুলোকেও পর্যালোচনা করার সুযোগ পেতেন। যদি তিনি দেখতেন যে, এই আইনের কোনোটা ধর্মের সাথে বা শরিয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে তাহলে তিনি ভেটো দিতে পারতেন। আর ভেটো পড়লেই আইনটিকে আবার আইনসভায় সংশোধন করার জন্য পাঠানো হতো।

শায়েখ-আল ইসলাম সুলতানের পরামর্শেই কাজ করতেন। আবার সেটা পরামর্শ আসত সুলতানের কোডের মাধ্যমে। যা আবার পরিচালনা করতেন প্রধান উজির। কিন্তু কোনো বিষয় নিয়ে যদি প্রধান উজির ও শায়েখ আল ইসলামের মধ্যে দ্বিমত হতো, তাহলে বেশ বড় সংকটের সৃষ্টি হতো। সে রকম হলে সুলতানকেই হয়তো চেক এবং ব্যালান্স করে পরিস্থিতি সামাল দিতে হতো।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সুলতানকে আরেকটি বিষয় নিয়ে প্রায়ই চেক এবং ব্যালান্স করতে হতো। তা হলো বায়জিদ প্রবর্তিত 'দেভশ্রিমে' প্রকল্প। প্রাথমিক যুগে এই প্রকল্পটি মামলুক সিস্টেমের মতোই একটা পদ্ধতি ছিল। মামলুকদের মতো জানিসারিদেরকেও শাসকের দেহরক্ষী হিসেবেই প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসে জানিসারিদের কাজ ও দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পায়।

এর কারণ ছিল জানিসারিদের সবাই যে শেষ পর্যন্ত সৈন্য হচ্ছিল তাও নয়। এদের অনেকেই প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করে। কেউ কেউ সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ পায়। সুলতানও জানিসারিদেরকে তার সরকারি প্রশাসনের বড় পদগুলোতে, সেনাবাহিনীতে এবং নৌবাহিনীতে নিয়োগ দিতে শুরু করেন। তিনি জানিসারিদেরকে বড় বড় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বও অর্পণ করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিখ্যাত স্থপতি সিনানের কথা। তিনি বড় ডোম, ছোট ছোট মাসরুম ডোম এবং কিনারে পেন্সিলের মতো আকৃতিতে মিনার দিয়ে মসজিদ নির্মানের সূচনা করেন। তিনিও একজন জানিসারি ছিলেন।

প্রথমদিকে জানিসারিতে যেসব ছেলেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হতো, তারা খ্রিষ্টান পরিবার থেকেই আসত। কিন্তু মুহাম্মাদ সুলতান দায়িত্ব গ্রহণের পর এই বিষয়টাকে আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। সে কারণে অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা যেকোনো পরিবার, (সেটা মুসলমান বা অমুসলমান, ধনী, গরিব যাই হউক না কেন,) থেকেই এই দাসতন্ত্রে যাওয়ার প্রথা চালু হয়। এটা নামে দাসতন্ত্র হলেও শেষ পর্যন্ত এই শ্রেণির লোকেরাই অটোম্যান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সম্মানীয় শ্রেণিতে পরিণত হয়।

দেভশ্রিমে প্রকল্পের মাধ্যমে অটোম্যানরা সমাজের নয়া অভিজাত শ্রেণি তৈরি করেন। জানিসারিদের বিয়ে করা অথবা বৈধ সন্তান জন্ম দেয়ার অনুমতি ছিল না। তাই তারা অভিজাত হলেও তাদের কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না। আসলে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের সম্ভাবনাময় যুবকদেরকে সংগ্রহ করে তাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যোগ্য বানিয়ে, তাদেরকে সাম্রাজ্য পরিচালনার বিভিন্ন কাজে লাগানো হতো। জানিসারিদের এই ক্ষমতায়নের ফলে তারা মধ্য এশিয়া থেকে উঠে আসার পূর্বসূরি অভিজাত তুর্কি শ্রেণির অনেক দায়িত্ব কমে যায়। আসলে এর মাধ্যমে অটোম্যান সুলতান তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকেই দুর্বল করার চেষ্টা করছিলেন। তবে ক্ষমতা কমে গেলেও এই অভিজাত শ্রেণিটি শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় ভূমির মালিক এবং সর্বোচ্চ করদাতা হিসেবেই টিকে ছিলেন।

তবে ভূমির মালিক নামে হলেও কার্যত এই মানুষগুলোর অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। কারণ, বাস্তবতা হলো সুলতানই ছিলেন তার সাম্রাজ্যের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সকল ভূখণ্ডের মালিক। তিনি হয়তো কাউকে কিছু জমি লিজ দিতে পারতেন বা কোনো পছন্দের লোককে ট্যাক্স ফার্ম বা টিমার (তুর্কি শব্দ) দায়িত্ব দিতে পারতেন। টিমার বলতে এমন জমি বুঝানো হয় যেখানে চাষীরা থাকে, আবাদ করে, কিন্তু সেই জমির একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি থাকেন। টিমারের মালিক সেই জমির জন্য চাষীদের থেকে কর আদায় করতে পারতেন। যারা ট্যাক্স ফার্মার হিসেবে সুযোগ পেতেন তারা তাদের জমির ওপর থাকা কৃষক বা চাষীদের কাছ থেকে যথেচ্ছা কর আদায় করতে পারতেন। আর বিনিময়ে তাদেরকে সরকারের রাজকোষে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা পরিশোধ করতে হতো। সরকারের নির্ধারিত খাজনার বাইরে তারা যা আদায় করতে পারত পুরাটাই তারা নিজেদের জন্য রেখে দিতে পারত। আর তারা কীভাবে চাষীদের কাছ থেকে করটা আদায় করবে, তা নিয়েও কোনো নিয়ম ছিল না। তারা যেকোনো উপায়ে সেই কর আদায় করার ক্ষমতা রাখত। সরকারের খাজনাটি ট্যাক্স ফার্মারের আদায় করা করের ওপর নির্ভর করত না। নির্ভর করত কতটা জমি তার নিয়ন্ত্রণে আছে তার ওপর। যদি কোনো জমি থেকে অপ্রত্যাশিত ফসল উৎপাদন হতো, তাহলে তার ফায়দা পেত সেই ট্যাক্স ফার্মাররা, সরকার নয়। অন্যদিকে যদি ফসল ভালো না হতো, তাহলে চাষীকে চাপের ওপর রাখা হতো। অনেক সময় তাকে সরিয়ে অন্য চাষীকেও ফসল উৎপাদন করারও সুযোগ দেয়া হতো।

যেকোন একটি সফল অভিযানের পর সুলতান তার কীর্তিমান জেনারেলদেরকে টিমার উপহার দিতেন। নতুন বিজিত এলাকা ছাড়া এত টিমার সুলতান কোথায় পাবেন? তাই অনেক ক্ষেত্রেই একজনের কাছ থেকে সুযোগ কেড়ে নিয়ে আরেকজনকে হয়তো টিমারের দায়িত্ব দেয়া হতো। টিমার হারিয়ে যাওয়ার মানেই হচ্ছে, এটা উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। আজ একজন পাচ্ছে তো কাল আরেকজন। ফলে সমাজে অর্থের তারল্যতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ গতিশীল হয়ে ওঠে।

ওপরের বর্ণনা শুনে অনেকের মনে হতে পারে, ট্যাক্স ফার্মারের যখন এত সুবিধা তখন তিনি নিশ্চয়ই চাষীদের ওপর জুলুম করে বেশি হারে কর আদায় করতেন। কিন্তু বাস্তবতা মোটেও তেমন ছিল না। টিমারের মালিকেরা যা খুশি করতে পারতেন না। কারণ, কৃষকদের আবার যেকোনো অন্যায় আচরণের বিপরীতে শরিয়া কোর্টে যাওয়ার সুযোগ ছিল। শরিয়া আদালতটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন কাঠামোর সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যা উলামারা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতেন। উলামা হওয়ার প্রক্রিয়াটি মোটেও সহজ ও সংক্ষিপ্ত ছিল না। যদি কোনো পরিবার চিন্তা করত যে তাদের সন্তানকে উলামা বানাবে, তাহলে তাদেরকে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

একই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হতো যা দিয়ে অন্য উলামারাও গেছেন। উলামা হওয়ার প্রক্রিয়াটি এতটাই দীর্ঘতর যে যতদিনে একজন ব্যক্তি উলামা হয়, ততদিনে তার সামাজিক ও পারিবারিক সকল সম্পর্ক অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ততোদিনে উলামাদের সাথে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক হয়ে যায়। তাই পরিবারের শিকড়ের চেয়ে উলামাদের স্বার্থ বা ধর্মীয় মূল ভিত্তিগুলোকে ধরে রাখা তখন তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়।

তবে এত কিছুর পরও অটোম্যান আমলে মুসলমানদের জীবনের মধ্যে ইসলামিক চেতনা যে খুব ভালো পরিমাণেই ছিল তা কিন্তু নয়। সাধারণ জনগণের মাঝে সুফিবাদ ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। অধিকাংশ মুসলমানই সুফিবাদের কোনো-না-কোনো ধারার সাথে সম্পৃক্ত থাকার দাবি করত। আর এভাবেই সুফি ভ্রাতৃত্বটাও ধীরে ধীরে মজবুত হয়ে ওঠে। অটোম্যান সাম্রাজ্যে অধিকাংশ সাধারণ মানুষই সুফি হয়ে গিয়েছিল তাও নয়। তবে সমাজে কুসংস্কার, মাজার, দরগাহ, তাবিজ, কবজ, মন্ত্র ইত্যাদির প্রসার অনেকটা বৃদ্ধি পায়।

এই সুফিবাদের ধারাগুলো বণিক ও হস্তশিল্পীদের সাথে বিশেষভাবে জড়িয়ে ছিল। তারা একে অপরকে আখি বা ভাই বলে সম্বোধন করত। আখি নামের এই সামাজিক জোটগুলো স্বায়ত্তশাসিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করত। তারা তাদের সদস্যদের মান নির্ধারণ করত। নতুন ব্যবসাকে নিবন্ধন প্রদান করত। বাকি বকেয়া আদায় করত। ঋণ সুবিধা দিত। বয়স্কদের পেনশন দিত। জানাজা, কবর ও দাফনের খরচ সরবরাহ করত। স্বাস্থ্যসেবায় সহযোগিতা করত। বৃত্তি প্রদান করত। নানা ধরনের মেলা, ভুড়িভোজ এবং বিনোদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। প্রতিটি ধারার আলাদা আলাদা গুরু, পরামর্শক, শায়েখ এবং আন্তরাজনৈতিক কৌশল ছিল। কোনো সদস্যের কোনো অভিযোগ থাকলে তিনি সংশ্লিষ্ট ধারার শীর্ষ ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হতেন। যেমন এখনকার সময়ে শ্রমিকেরা তাদের অভাব অভিযোগ মেটানোর জন্য লেবার ইউনিয়নের দ্বারস্থ হয়। প্রয়োজন হলে তখন সেই শীর্ষ ব্যক্তিরা তাদের সদস্যদের পক্ষে আইনি লড়াইয়ে সহযোগিতা করতেন। আবার বিভিন্ন ধারার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সঠিকভাবে তাদের কাজ করছেন কিনা সেটা আবার রাষ্ট্র নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তত্ত্বাবধান করত।

তদ্রূপ প্রতিটি হস্তশিল্পীরা একটি নির্দিষ্ট সংঘের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এদের অনেকে আবার ভিন্ন ভিন্ন বা একই সুফিধারার সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সুফিসদস্যরা যদি কখনো একে অপরের সাথে বা অন্য কোনো ব্যবসায়ী বা পর্যটকের সাথে মিলে কিছু করতে চাইত, তাহলে সুফি ভ্রাতৃত্ব কমিটি তাদেরকে সাহায্য করত। আখি এবং সুফি ভ্রাতৃত্ব ফোরাম মিলে আসলে হাসপাতাল, সরাইখানা বা পর্যটকদের আপ্যায়ন ও খাতির যত্নের বিষয়টা তদারকি করত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আপনি তৎকালীন অটোম্যান সাম্রাজ্যের যেদিকেই তাকাবেন, বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় একই রকমের বহুবিধ কাঠামো দেখতে পাবেন। প্রতিটি বিষয় ছিল একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত। এতটা সম্পৃক্ততা খুবই ভালো যদি ভারসাম্য রক্ষা করা যায় এবং সকল ফ্যাক্টর যদি ভালোভাবে একই সাথে কাজ করে। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরে যখন অটোম্যান রাজ্যটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন এই বহুভাগে বিভক্ত সামাজিক কাঠামোগুলো অটোম্যান শাসনের জন্য বোঝায় পরিণত হয়।

আর বিষয়টা এমন জায়গায় ধ্বসে যায় যে, কাঠামোর কোনো একটা জায়গায় কোনো সমস্যা হলে গোটা সিস্টেমটাই অকার্যকর হয়ে যায়। কারণ, একটা পয়েন্টে সংকট হলে অন্য সব পয়েন্টগুলো তার সাথে সম্পৃক্ত থাকুক বা না থাকুক, তারাও ভীষণ রকমভাবে নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হয়। তবে অটোম্যান সাম্রাজ্যে এই সমস্যাগুলো হয় আরও পরের দিকে। আমরা ১৬শ শতাব্দীর যে সময়ের কথা বলছি, তখন অটোম্যান সাম্রাজ্য বেশ ভালোভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

পূর্বদিকে অটোম্যানরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, তা বাধাগ্রস্ত হয় সাফাভিদের কারণে। কিন্তু দক্ষিণে তারা ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল এবং একটা পর্যায়ে তারা ভারত মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পুরোনো আরব সাম্রাজ্যের গোটা এলাকাটাই পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তারপর তারা মামলুকদেরকে পরাজিত করে মিসর জয় করে। এরপর আরও পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকান উপকূল বরাবর অগ্রসর হয়।

১৬শ শতাব্দীতে অটোম্যান সুলতান সুলাইমান দ্য ম্যাগনেফিশেন্টের আমলে অটোম্যান সাম্রাজ্য বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। সেই সময়ে অটোম্যানরা ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকেই সাফল্যের গাঁথা রচনা করে। তারা রোম ও মক্কা উভয় নগরীতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কায়রো ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। সব মিলিয়ে সেই সময়ে অটোম্যান সাম্রাজ্যের আকার যত বড় হয়, এত বড় একক সাম্রাজ্য আজ অবধি বিশ্বে আর দেখা যায়নি। একটা সময়ে অটোম্যান সুলতানরা নিজেদেরকে খলিফা হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করেন, আর এর বিরোধিতা করার মতো তখন কেউ ছিল না। তা ছাড়া সেই সময়ে এসে খলিফা উপাধিটি একটা সম্মানজনক উপাধি ছাড়া আর কোনো প্রভাবও রাখতে পারছিল না। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে অটোম্যানদের খলিফা উপাধি নেয়ার ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, এই প্রথম মুসলিম কোনো শাসক একই সাথে দুটো উপাধি ধারণ করতে শুরু করলেন। একটা হলো খলিফা আর অন্যটি হলো সুলতান। সাধারণ যেকোনো মুসলমানের দৃষ্টিতে দেখলে এই ঘটনাটি ইঙ্গিত করে যে, ইসলাম আরও অগ্রসর হচ্ছে এবং উম্মাহ আবারও বিশ্বজনীন একটি সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার দিকেই যাচ্ছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দ্য সাফাভিদ (৯০৬-১১৩৮)

ইসলামে খলিফা এবং সুলতানই কেবল বিশ্বজনীন ইসলামি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সহায়ক উপাধি নয়। আরও অনেকগুলো উপাধিরও অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমন ইমাম, যেটা শিয়া সম্প্রদায়রা ব্যবহার করত। আমরা সেখান থেকেই পারস্যে সাফাভিদের অস্তিত্বকে অনুধাবন করতে পারব। এই সাফাভিদরা হলো সেই সম্প্রদায়, যারা অটোম্যানের মতো শক্তিশালী বাহিনীকে রুখে দিয়েছিল।

সাফাভিদরা খুবই অদ্ভুতভাবে ক্ষমতায় এসেছিল। তাদের ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যাবে, মঙ্গলদের উত্থানের সময়ই একটি সুফি ধারার মধ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পারস্যে সেই ধারাটি বিকশিত হয় শায়েখ সাফি আল দীনের মাধ্যমে। আর এই শায়খের অনুসারীরাই পরবর্তীকালে সাফাভিদ নামে পরিচিত হয়।

সাফাভিদদের পরপর ৩টি প্রজন্ম অন্য আরও সাধারণ সুফি দর্শনধারার মতোই পরিচালিত হয়। এই সাফাভিদরা প্রথম দিকে ছিল শান্তিপ্রিয় ও অরাজনৈতিক। তারা সব সময় আধ্যাত্মিকতার দিকে মনোনিবেশ করত এবং দুনিয়াবী গোলযোগ ও ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চাইত। কিন্তু একটা সময় এই ধারাটি পাল্টে যায়। কিন্তু সাফাভিদদের তৃতীয় শায়েখ ইন্তেকাল করার পর তার ছেলে যখন নতুন শায়েখ হন, তার মৃত্যুর পর তার ছেলে, তার মৃত্যুর পর তার ছেলে। এভাবে একটি আধ্যাত্মিক ধারার গ্রুপটি শেষ পর্যন্ত একটি পারিবারিক উত্তরাধিকারের রূপ ধারণ করে।

দ্বিতীয়ত, একটা সময়ে গিয়ে এই ধারার শায়েখদের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা জন্ম লাভ করে। শায়েখরা একটা পর্যায়ে এমন একটি অভিজাত শ্রেণির সাথে সম্পর্ক তৈরি করেন, যারা শুধু আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতাই সাধন করতে চাইত, তা নয়। বরং তারা মার্শাল আর্টও খুব ভালো জানত। এই ধরনের লোকগুলোকেই শায়েখরা তাদের দেহরক্ষী হিসেবেও নিয়োগ দেন। একটা পর্যায়ে তারা আলাদা একটি সামরিক গোত্র হিসেবেও বিকাশ লাভ করে।

সাফাভিদ দেহরক্ষী হিসেবে নিজেদেরকে আলাদা রাখার জন্য এই যোদ্ধা সদস্যরা সব সময় লাল রংয়ের টুপি পরিধান করত। এজন্য তাদেরকে বলা হতো কিজিলবাস। তুর্কি এই শব্দটির মানে হলো লাল মস্তক। যে টুপিগুলো তারা পরিধান করত সেগুলোতে ১২টি ভাঁজ করা যেত। এটা মূলত সাফাভিদদের চিন্তাধারার সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হিসেবে পরিগণিত হয়। ১২টি ভাঁজ ছিল ১২ ইমামের সম্মানে। অর্থাৎ সেখান থেকেই বুঝা যায় যে সাফাভিদরা শিয়া মতাদর্শে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আগেই বলা হয়েছে, শিয়ারা এক ধরনের ধর্মীয় কর্তৃত্বকে মান্য করে যাদেরকে তারা ইমাম হিসেবে অভিহিত করে। শিয়াদের চোখে এই ইমামেরা হলেন পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। একই সময়ে পৃথিবীতে একজনের বেশি ইমাম থাকতে পারে না। আর সত্যিকারের যিনি ইমাম হবেন, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বংশধর হবেন। যিনি হযরত ফাতেমা (রা.) ও হযরত আলির (রা.) ধারাতে পৃথিবীতে আগমন করবেন।

ইমামের পদবিটিতে উত্তরাধিকারের একটি ব্যাপার আছে। কোনো ইমাম ইন্তেকাল করার সময় তার একাধিক সন্তান থাকলে, পরবর্তী সময়ে একটি মতবিরোধের অবকাশ থাকত। যেকোনো একজন সন্তান সত্যিকারের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারবেন। এই ধরনের একটি মতবিরোধ থেকেই পঞ্চম ইমামের পর একটি বিভাজন সৃষ্টি হয়। যাকে বলা হতো জায়দিস (পঞ্চমী)। আর ৭ম ইমামের পর আরেকটি বিভাজনের সৃষ্টি হয়, যেখান থেকে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

বাকি শিয়ারা সবাই হযরত আলি (রা.) থেকে শুরু করে ১২ ইমামকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু ১২ নং ইমামটি একেবারে কিশোর অবস্থায় নিখোঁজ হয়ে যান। যারা শিয়া নন তারা মনে করেন, সেই ১২ নং ইমামকে আসলে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু শিয়ারা তা মনে করে না। তারা মনে করেন এই ইমামটি অদৃশ্য হয়ে আছেন। এই তত্ত্বটি শিয়া দর্শনে আগে কখনো শোনা যায়নি। তারা মনে করেন যে ১২ নং ইমাম এমন অবস্থায় আছেন, তাকে সাধারণ মানুষেরা আর দেখতে পাচ্ছে না।

মূলধারার শিয়ারা এই ১২নং ইমামকে গুপ্ত ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করেন। শিয়ারা মনে করেন, গুপ্ত ইমাম সব সময়ই জীবিত আছেন এবং সেই গুপ্ত ইমামের সাথে আল্লাহর নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে ; তিনি অদৃশ্য অবস্থাতেই বিশ্বকে নির্দেশনা ও নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যায় না, কীভাবে এই ইমাম গুপ্ত অবস্থায় আছেন। তিনি কি ছদ্মবেশে আছেন, নাকি চেহারা পাল্টে আছেন, নাকি কোনো গুহায় লুকিয়ে আছেন! তাকে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাবে না। গুপ্ত হয়ে থাকার বিষয়টি এমন একটি রহস্যময় বিষয় যাকে জাগতিক কোনো সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা অবান্তর।

শিয়ারা বিশ্বাস করেন কিয়ামতের আগে সেই ১২তম ইমাম পুনরায় ফিরে আসবেন এবং তার আগমনের মধ্যে দিয়েই মুসলমানরা চূড়ান্ত উৎকর্ষতা অর্জন করবে। এর পরপরই কিয়ামত হবে। সকল মৃতদেহ কবর ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে এবং দুনিয়াতে যে যেই মানের কাজ করেছে তার ওপর ভিত্তি করেই তাকে জান্নাত বা জাহান্নাম দেয়া হবে। এই ১২তম ইমামকে শিয়ারা ইমাম মাহদী

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

হিসেবে অভিহিত করে। সুন্নিরাও ইমাম মাহদীর আগমনকে বিশ্বাস করে, তবে শিয়াদের মতো ভাবনা থেকে নয়। বর্তমানে ইরানে আমরা যে মূলধারার শিয়া দেখি তারা সবাই এই ইমাম মাহদীর ব্যাপারে এই ধরনের চিন্তাই পোষণ করে।

পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে সাফাভিদরাও এই মতাদর্শকেই বিশ্বাস করতে শুরু করে। আর সেই কারণেই তারা ১২ ইমামের সাথে সংগতি রেখে ১২ ভাঁজের পাগড়ি পড়া শুরু করে। সেই সময়ে এই সাফাভিদদের নেতৃত্ব এমন কেজন শায়েখ দিচ্ছিলেন, যিনি ক্ষমতালিপ্সু ছিলেন এবং তার নিয়ন্ত্রণে একটি বৃহৎকিছু সেনাবাহিনী ছিল। আর অধীনস্ত সেই সেনারা তাকে যে শুধু কমান্ডার বা সেনাপতি ভাবত তাই নয়, বরং তাদের বিশ্বাসটা এমন ছিল যে এই শায়েখই হলেন তাদের বেহেশতে প্রবেশ করার একমাত্র বৈধ উসিলা।

এই রাজনীতিঘেঁষা সাফাভিদ গ্রুপটি এক ধরনের সামাজিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছিল। পারস্যদের যে ভূখণ্ডটা ছিল তা একবার পিষ্ট হয় চেঙ্গিস খানের হাতে, পরে আরেকবার ধ্বংস হয় তৈমুর লং-এর হাতে। এরপর পারস্য ভূখণ্ডটি ছোট ছোট ভূমিখণ্ডে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। যা আসলে তুর্কির বিভিন্ন গোত্রপ্রধান দ্বারা শাসিত হতো। তুর্কির এই গোত্র প্রধানদের সকলেই ছিল সুন্নি। শিয়ারা তখনো পারসিয়ানদের কাছে ভিনগ্রহের মানুষ। কিন্তু পারস্যে যখন আরবের আধিপত্য বেড়ে যায়, তুর্কিরা ভূখণ্ডটি দখল করে নেয়, তখন পরিস্থিতিটি পাল্টাতে শুরু করে। আর মঙ্গলদের বর্বরতার সময় তাদেরকে প্রতিরোধের যে আন্দোলনটি হয়, সেখানে সাফাভিদ নাম নিয়ে শিয়ারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সাফাভিদদের এহেন কার্যক্রম স্থানীয় যুবরাজকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়।

১৪৮৮ সালে যুবরাজ সাফাভিদদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেন। তিনি সাফাভিদ ধারার প্রধানকে হত্যা করেন। আরও ঝুঁকি কমানোর জন্য তিনি সেই গোত্র প্রধানের বড় সন্তানকেও হত্যা করেন। তিনি হয়তো ইসমাইল নামের গোত্র প্রধানের ছোট ছেলে (যে কিনা তখন মাত্র দুই বছর বয়সী ছিল)- তাকেও হত্যা করতেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কিজিলবাসরা এই ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং তাকে গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখে। তার কয়েক মিনিট পরেই সেই ছেলের খোঁজে রাষ্ট্রনিযুক্ত খুনীরা এসেছিল। কিন্তু তারা তাকে পায়নি।

জটিল এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী ১০ বছরে সাফাভিদরা গোপনে সংগঠিত হতে থাকে। ইসমাইলও লোকচক্ষুর অন্তরালেই বড় হতে থাকে। মূলত সে একটার পর একটা সেফ হাউজে লুকিয়েই এই সময়গুলো পার করে। এই গোটা সময় জুড়েই কিজিলবাসরা তাকে আগলে রাখে। কারণ, তারা এই বালককেই নিজেদের ধারার মূল ব্যক্তি হিসেবে মনে করত। তারা এই বাচ্চাটাকে সম্মান

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

করত এবং বিশ্বাস করত যে তার মধ্যে কোনো অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। এই ধরনের সম্মাননা পেলে একটি বয়ঃসন্ধিতে থাকা ছেলের কি রকম অনুভূতি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কারণ, তার শৈশবের স্মৃতি মোটেও সাধারণ কোনো মানুষের মতো ছিল না। তাকে সর্বদা মরনের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হতো। আবার একই সাথে একদল লোক গভীরভাবে ভালোবেসে তাকে ঘেরাও করে রাখত। তারা আবার তার কথা আদেশ নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে মান্য করত। ফলে বাচ্চাটি নিজেই নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং সেই কারণে ছোটবেলা থেকেই সে খুবই মেধা ও দৃঢ়তার স্বাক্ষর রেখেছিল।

১২ বছর বয়সে পৌছানোর পর ইসমাইল কিজিলবাসের সহায়তায় তার গুপ্তাবস্থা থেকে বেরিয়ে এল। সে খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেই যুবরাজকে সরিয়ে দিল, যে কিনা ইতঃপূর্বে তার পিতাকে হত্যা করেছিল। অন্য যে কয়জন যুবরাজ ছিল তারা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হলো। ভেবে দেখুন ১২ বছরের একটি বালককে যদি এভাবে শক্তিমান যুবরাজরা কাবু করতে না পারে তাহলে সে কতটা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে!

হলোও তাই। ১৫০২ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে ইসমাইল নিজেকে ইরানের শাহান শাহ হিসেবে দাবি করল। শাহান শাহ উপাধির অর্থ হলো রাজার রাজা। এর আগে সাসানিদরাও এই উপাধি ব্যবহার করেছে। আর তারও আগে পারস্য রাজতন্ত্রের আমলেও এই উপাধির অস্তিত্ব ছিল। খলিফা ও সুলতান উপাধি বর্জন করে তার পরিবর্তে নতুন উপাধি গ্রহণ করার মাধ্যমে ইসমাইল মূলত আরব এবং তুর্কি ধারাটিকেই বর্জন করে পারস্যকেন্দ্রিক নতুন একটি ধারা সূচনা করার ইঙ্গিত দেয়। ইরানবাসীকে সেই চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তিনি বহু আগে লেখা পারস্য কবি ফেরদৌসির শাহনামা মহাকাব্যের কথা আলোচনায় নিয়ে আসেন। যাতে ইরানিরা তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে থাকতে পারে। অনেকেই মনে করেন যে ইসমাইলের শরীরের আসলে সাসানিদ বংশেরই রক্ত প্রবাহিত ছিল।

এরপর ইসমাইল নিজের রাজ্যকে আশেপাশের প্রতিবেশী রাজ্যগুলো থেকে আলাদা রাখার জন্য ১২ ইমামের শিয়া দর্শনকে রাষ্ট্রধর্ম করার ঘোষণা দেয়। তার নিয়ন্ত্রণে কিছু ব্যক্তি ছিল যারা প্রকাশ্যে ইসলামের প্রথম যুগের তিন খলিফাদের (আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা.) সমালোচনা করত। ইসমাইলের রাজ্য ঘোষণা দেয় যে, হযরত আলি (রা.) ছিলেন নবি মোহাম্মাদ ﷺ-এর একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী। আর হযরত আলির (রা.) পর তার পরিবারের ধারায় যে ইমামরা এসেছেন তারাই কেবল প্রকৃত ধর্মীয় দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইসমাইলের লোকজন একথাও প্রচার করতে শুরু করে, ইসমাইল যে শুধু সাসানিদ গোত্রের বংশ প্রতিনিধি তাই নয় বরং সে হযরত আলিরও (রা.) বংশধর। তারা প্রচার করে যে ইসমাইলের সাথে অদৃশ্য ১২তম ইমামের নিয়মিত যোগাযোগও আছে। এমনকি কারও কারও কাছে এমনও জানা যায়, ইসমাইল নিজেকে ১২তম ইমাম দাবি করার মতো পর্যায়েও পৌঁছে গিয়েছিলেন। এটা ভাবার মতো তার কারণও ছিল। কারণ, মাত্র দুই বছর বয়সে সে যেভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে এবং যেভাবে লুকিয়ে থেকেও যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে বড় হয়েছে, তা সাধারণভাবে ঘটার কোনো কারণ নেই।

ইসমাইল ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা না ভেবেই তার রাজ্যের ধর্মদর্শনের বার্তা দিয়ে অটোম্যান সাম্রাজ্যে দূত পাঠায়। তার দূত অটোম্যান সুলতানকে শিয়াবাদে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য এবং একই সঙ্গে ইসমাইলকে ঐশ্বরিক নেয়ামতপ্রাপ্ত নেতা হিসেবেও মেনে নেয়ার জন্য আহবান জানায়। অন্যদিকে, ইসমাইল তার নিজ রাজ্যে সুন্নি মতাবলম্বীদের ওপর প্রচুর দমন নিপীড়ন ও অত্যাচার শুরু করেন। সুন্নিদের একটি বড় অংশ ইসমাইলের কার্যক্রমে তাকে উন্মাদপ্রায় মনে করে এবং জীবন বাঁচানোর জন্য অটোম্যান সাম্রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এর বাইরে যে কয়জন সুন্নি অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে হয় কারাগারে পাঠানো হয় না হয় হত্যা করা হয়।

অন্যদিকে, অটোম্যান সুলতান সেলিম আবার তার রাজ্যে শিয়াদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন শুরু করেন। তাই একদিকে যেমন পারস্য থেকে সুন্নিরা পালিয়ে অটোম্যানে ঢুকছিল ঠিক বিপরীতভাবে শিয়ারাও অটোম্যান সাম্রাজ্য ছেড়ে পারস্যে প্রবেশ করছিল। গোটা প্রক্রিয়াটি পারস্যে শিয়াদের একটি শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে সাহায্য করছিল। আর সাফাভিদরাও শিয়াদেরকে পারস্য সংস্কৃতির সাথে আত্মস্থ করানোর জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। শিয়াদের অন্তর্ভুক্তি আর পারস্য জাতীয়তাবাদই হয়ে উঠে নতুন সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি। আর সেখান থেকেই আজকের আধুনিক ইরান প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

সাফাভিদরা সেই সময় থেকেই তাজিয়াকে জাতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করতে শুরু করে। তাজিয়া হলো একটি শোক মিছিল যেখানে শিয়ারা কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসাইনের (রা.) শাহাদাতের জন্য মাতম করে। তাকিয়া খানা নামের এক ধরনের দালান থেকে এই মিছিলগুলোর সূচনা হতো। আরবি মহররম মাসের ১০ তারিখে শিয়ারা এই জায়গাগুলোতে উপস্থিত হয়ে মিছিল শুরু করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখনও এই চর্চা বিদ্যমান। এই মিছিল এবং এই দিবসকে কেন্দ্র করে শিয়ারা কারবালার ঘটনাগুলোকে আলোচনা করে। যে যতটা জানে তা অপরকে জানায়। এভাবে বছরের পর বছর ধরে চর্চা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

হওয়ায় শিয়াদের গোটা সম্প্রদায়ের কাছে কারবালার সেই ঘটনা এখন অত্যন্ত সুপরিচিত হয়েই টিকে আছে। তারা মাতমের মাধ্যমেও নিজেদের আফসোস ও কষ্ট প্রকাশ করে। এসব মিলিয়েই তাজিয়া মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। একসময় আর তাকিয়া খানাতে আবদ্ধ না রেখে গোটা আয়োজনটি রাজপথে অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। সাফাভিদ রাজ্যে এরপর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ কিছু পেশাদার মঞ্চকর্মী নিয়োগ করা হয়, যারা বিভিন্ন স্থানে কারবালার ঘটনাটার মঞ্চায়ন করত ফলে মানুষের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে এই ঘটনাগুলো গেঁথে যেত।

ইসমাইলের বয়স যখন ২৭ হলো তখন তার আত্মবিশ্বাস আর আত্মঅহংকারে ভাটা পড়ল। কারণ, সেই সময়েই তার রাজ্যে অটোম্যানরা প্রবেশ করল। ইসমাইলও অটোম্যানদের মোকাবেলায় এগিয়ে গেলেন এবং তাবরেজ শহরের নিকটে চালদিরান নামক একটি জায়গায় দুইপক্ষ যুদ্ধে মিলিত হলো। অটোম্যানদের কাছে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। সাফাভিদরা মনে করেছিল তাদের হাতে আরও উন্নত অস্ত্র রয়েছে। কারণ, তাদের কাছে আছে সেই পুরোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের আনুকূল্য এবং স্বর্গীয় নেয়ামতপ্রাপ্ত নেতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা অটোম্যানদের আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে হেরে গেল। ইসমাইলের বাহিনী সেলিমের সৈন্যদের কাছে পরাজিত হলো। ইসমাইলও প্রায় নিহত হয়েই গিয়েছিলেন। অটোম্যান সুলতান সেলিম এরপর রাজধানী তাবরেজ দখল করেন।

চালদিরানের এই যুদ্ধটি হাস্টিংস যুদ্ধের মতোই ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, হাস্টিংস যুদ্ধের পরপরই ইংল্যান্ড একটি নতুন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইতিহাসবিদ চালদিরানকে অটোম্যানদের বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি ড্র বা অমীমাংসীত ফলাফল। কারণ, সেলিম তাবরেজকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। সেই বছর যখন শীত এল তখন সেলিম আনাতোলিয়ার আরও গহীনে আশ্রয় নেন এবং তার পরের বছর পারস্যরা তাবরেজকে পুনরায় দখল করে নেয়। দখলটা তারা এমনভাবে করে যাতে, ভবিষ্যতে আর কোনো দখলদার তাবরেজের দিকে হাত বাড়ানোর সাহস না করে। যাহোক, চালদিরান যুদ্ধের কারণে অটোম্যান আর সালাভিদ রাজ্যের মাঝে একটি সীমান্ত তৈরি করা হয়। যখন এই দুটি রাজ্য আলাদা দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয় তখনো এই সীমানারেখা বিদ্যমান ছিল। আজ অবধি ইরান ও তুরস্কের মধ্যে এই সীমান্তটি রয়েছে।

চালদিরান থেকে ইসমাইল একজন ভগ্ন হৃদয়ের মানুষ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তিনি তার নিজের পরিচয় নতুন করে খুঁজতে শুরু করেন। তিনি তার জীবনের বাকি কয়টা বছর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

নির্জন অবস্থায় পার করেন। এই সময়ে অসংখ্য ধর্মীয় কবিতাও রচনা করেন। তবে ইসমাইলের গড়া রাজ্য তার হতাশাজনক অবস্থায় কোনো সংকটে পড়েনি বরং তা উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কারণ, তারা এর পরের দিনগুলোতে আরও বেশ কয়েকজন যোগ্য শাসককে পেয়েছিল।

সীমানা চালু হওয়ার পর অটোম্যান ও সাফাভিদদের মধ্যকার রেষারেষি কমে আসে এবং তারা উভয়েই তাদের সুবিধার্থে নানা রকমের ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে। সাফাভিদ অটোম্যানদের তুলনায় বরাবরই ক্ষুদ্র ও কম শক্তিশালী রাজ্য ছিল। কিন্তু যেহেতু তাদের গোটা জাতির ধর্মবিশ্বাস একই ছিল এবং সাফাভিদের মধ্যে জাতিগত নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী তেমন একটা ছিল না, তাই সাংস্কৃতিকগতভাবে সাফাভিদরা অত্যন্ত একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি ছিল।

পারস্য সাম্রাজ্যটি যে সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌছায়, এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। ইসমাইলের দৌহিত্র শাহ আব্বাস দ্য গ্রেটের আমলে যিনি ৪২ বছর সফলতার সাথে রাজ্য শাসন করে ১৬২৯ সালে ইন্তেকাল করেন। আব্বাসের সেনাবাহিনী ছিল সমৃদ্ধ, কারণ তাদের হাতে সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও কামান ছিল। আর তার আমলেই ইরান বস্ত্রখাতে, সিরামিক খাতে, পোশাক উৎপাদনে এবং কার্পেট ব্যবসায় উৎকর্ষতা লাভ করে। আর ইরানের উৎপাদিত এসব জিনিসপত্র পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকা ও ভারতেও রফতানি হতো।

চিত্রাঙ্কনে নান্দনিকতা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের একটা সেরা অর্জন। পারস্যরাই প্রথম ফুল দিয়ে এবং জ্যামিতিক সীমারেখার ব্যবহার করে চিত্রকলা শুরু করেন- যা পারসিয়ান মিনিয়েচার নামে পরিচিতি পায়। আজ কুরআনের আয়াতকে শিল্পসম্মতভাবে লেখার জন্য মুসলিম বিশ্বে যে ক্যালিওগ্রাফির প্রচলন হয়েছে, সেটাও পূর্ণতা পায় এই পারস্যেই। পারসিয়ান মিনিয়েচার এবং ক্যালিওগ্রাফি- এই দুটি সেরা শিল্প কলার ব্যবহার পাওয়া যায় মহাকবি ফেরদৌসির শাহানামায়। যা একজন সাফাভিদ রাজার সম্মানে রচিত হয়েছিল। এই বইতে ২৫৮টি চিত্রকল্প এবং বিভিন্ন শিল্পীর লেখা ৬০ হাজার ক্যালিওগ্রাফিক লাইন ছিল।

সাফাভিদদের উন্নত সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্থাপত্যেও। তারা অটোম্যান সাম্রাজ্যের মতো মিনার ও গম্বুজ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে নি। বরং তারা ঝকমকে মোজাইক দিয়ে মসজিদ নির্মাণ শুরু করে, যার কারণে সাফাভিদদের বানানো মসজিদগুলোকে দূর থেকে দেখলে মনে হতো মসজিদ থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হচ্ছে।

যদি স্থাপত্যকে সাফাভিদদের সবচেয়ে উন্নত কাজ বলে মনে করা হয়, তবে শহরের দালানকোঠাগুলোও তাদের আরেকটি উদ্ভাবনী শক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অটোম্যানদের হাত থেকে শহরগুলোকে বাঁচানোর জন্য সাফাভিদরা প্রায়শই তাদের রাজধানীকে পরিবর্তন করত। আর প্রতিবারই তারা এমনভাবে নতুন শহরটাকে গড়ত, যাতে তারা এখানেই আরাম করে বসবাস করতে পারে। তাই সাফাভিদ নির্মিত প্রতিটি শহরই ছিল নান্দনিকভাবে অসাধারণ। ১৫৯৮ সালে যখন তারা ইসফাহানকে রাজধানী করার সিদ্ধান্ত নেয়,তখন শাহ আব্বাস নতুনভাবে এই শহরটিকে গড়তে শুরু করেন। তিনি পুরো এলাকাটিকেই অলংকার আর মনি মানিক্য দিয়ে ভরে তোলেন। নির্মাণ কাজ শেষ হলে দেখা যায়, সেখানে দেখার মতো সব পাবলিক স্কয়ার বা খোলা ময়দান, বাগান, মসজিদ, ম্যানশন, ব্রিজ, প্রাসাদ রয়েছে যার একটি অপরটির সাথে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে সংযুক্ত। পর্যটকরা পরবর্তী সময়ে এই শহরকে নিয়ে একটা প্রবচন চালু করেন যেটা হলো 'ইসফাহান নিসফি জাহান'। ইংরেজিতে বলা হয় ইসফাহান, হাফ দ্য ওয়ার্ল্ড। প্রবচনটার তাৎপর্য ছিল এই যে, যদি কেউ তার জীবদ্দশায় একবারও ইসফাহান পরিদর্শন করতে না পারে, তাহলে সে হয়তো পৃথিবীর অর্ধেকই দেখতে পাবে না।

অটোম্যান ও সাফাভিদদের মধ্যে অনেক দিক দিয়ে ভিন্নতা থাকলেও, কিংবা তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে শত্রুতা থাকলেও, সভ্যতার অগ্রগতির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বেশ কিছু মিলও ছিল। সেদিক দিয়ে বিচার করলে তারা আসলে তেমন একটা ভিন্নও ছিল না। যেমন এখনকার সময়ে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের মধ্যকার অবস্থা। কোনো পর্যটক যদি ইস্তাম্বুল, থেকে ইসফাহান বেড়াতে যেত বা ইসফাহান থেকে ইস্তাম্বুল- তাহলে তার কাছে উভয় সাম্রাজ্যের এলাকাকেই কাছাকাছি উন্নত মনে হতো। এখানে এটাও বলা দরকার যে, এই দুটি সাম্রাজ্য অনেকটা একই সময়েই বিকশিত হয়েছে। আরও চমকপ্রদ তথ্য হলো, শুধু এই দুটি নয়, একই সময়ে আরেকটি মুসলিম সাম্রাজ্যও তখন শক্তিশালী অবস্থানে ছিল, আর তা হলো মোঘল সাম্রাজ্য। মোঘলদের সাম্রাজ্যটি বার্মা থেকে শুরু করে ভারত হয়ে আফগানিস্তানের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোঘলদের এই সীমানা শেষ হওয়ার পর থেকেই সাফাভিদদের সীমানা শুরু হয়েছিল।

মোঘল সাম্রাজ্য (৯০০-১২৭৩ হিজরি)

মোঘলরা সম্পদ ও শক্তির দিক থেকে অটোম্যানদের মতোই ছিল। বর্তমানে বিশ্বে যত লোক আছে তার শতকরা ২০ ভাগ তৎকালীন মোঘল সাম্রাজ্যাধীন এলাকাতেই বসবাস করত। মোঘল সাম্রাজ্যের সেই এলাকাটি ভেঙে বর্তমানে ৫টি রাষ্ট্র হয়েছে। যথা: আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ এবং বার্মা।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যেই ব্যক্তিটি এই বিশাল সাম্রাজ্যটি গঠন করেন, তিনি ছিলেন শাহ ইসমাইলের একেবারে সমসাময়িক; তার নাম বাবর (জহিরুদ্দিন মোহাম্মাদ বাবর)। বাবর শব্দের মানে হলো বাঘ। আর প্রকৃতপক্ষেই তিনি সাফাভিদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সেই কিশোর বালকের (ইসমাইল) চেয়ে বেশি সফল ছিলেন।

বাবর নিজেকে চেঙ্গিস খান এবং তৈমুর লং-এর বংশধর হিসেবে দাবি করেন। এই দুই রক্তের প্রবাহ মিলে আসলেই কি মারাত্মক জিনিস হতে পারত তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে বাবর তার বংশপরিচয়কে খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং এটাই তাকে জীবনভর সম্মুখপানে ছুটতে অনুপ্রাণিত করেছে। তার বাবা ফারঘানা নামক ছোট্ট একটি রাজ্য শাসন করতেন। ফারঘানা ছিল আজকের আফগানিস্তানের উত্তরে অবস্থিত একটি এলাকা। বাবরের বাবা ১৪৯৫ সালে ইন্তেকাল করার পর তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভ করেন। বাবরের বয়স তখন মাত্র ১২ বছর।

১২ বছরের বালক কীভাবে একটি রাজ্য চালাবে! ফলে যা হওয়ার তাই হয়। তিনি তার রাজ্য হারান। কিন্তু তিনি তাতে দমে যাননি। পুনরায় সংঘঠিত হয়ে তিনি সামারখন্দের (তৈমুর লং এর রাজধানী) মতো ঐতিহাসিক স্থান জয় করেন। কিছুদিন পর তিনি সামারখন্দের কর্তৃত্ব হারান। তিনি এরপর পিতার শাসিত রাজ্য ফারঘানা যান এবং সেটাও অর্জন করেন। পরে তিনি মাত্র ২৪০ জন সেনা নিয়ে সামারখন্দ জয় করেন কিন্তু সেবারও তিনি সামারখন্দকে ধরে রাখতে পারলেন না। বাবর যখন ১৮ বছরে পৌছান, তার মধ্যেই তিনি দুটি রাজ্য দুই বার জয় করে দুবার হারিয়েও ফেলেছেন। শুধু তাই নয় জীবনের সেই কঠিন মুহূর্তগুলোতে তিনি মা, বোন আর অল্প কিছু অনুসারী নিয়ে আফগানিস্তানের পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে বেড়িয়েছেন। এভাবে তিনটি বছর বাবর আর তার সঙ্গীরা উদ্দেশ্যহীনভাবে পালিয়ে ছিলেন। আর এই সময় তিনি নতুন রাজ্য খুঁজছিলেন যেটা শাসন করে তিনি তার নামের আগে রাজা বা সম্রাট উপাধিটি আবারও সংযুক্ত করতে পারবেন।

এটা সহজেই ধারণা করা যায়, একটা অল্প বয়স্ক বালক যখন দিনের পর দিন পালিয়ে বেড়ায় এবং এই কঠিন পরিস্থিতিতেও যখন সে তার সাথে তার তুলনায় বয়স্ক অনেকগুলো মানুষ এবং একদল সৈন্যকে নিজের নিয়ন্ত্রণে ধরে রাখতে পারে, তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু অন্যরকম বিষয় ছিল। বাবর শারীরিকভাবে শক্তিশালী একজন মানুষ ছিলেন। বলা হয় তিনি নাকি তার দুই হাতে দুই মানুষকে নিয়ে ঝরনার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে পারতেন। বাবর তো কঠিন মানুষ ছিলেনই তবে একই সঙ্গে বাবর ভীষণ রকম নান্দনিক এবং রোমান্টিক মানুষও ছিলেন। তিনি যখনই যেখানে অভিযান পরিচালনা করেছেন

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সেই কাহিনিগুলো আবার ডায়রীতে লিখে রাখতেন। পরবর্তী সময়ে সেই ডায়েরী অবলম্বনেই তার জীবনকাহিনি রচনা করা হয়। যা তুরস্কের সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ক্লাসিক হিসেবে বিবেচিত হয়। পরে তার দৌহিত্র এই জীবনকাহিনিকে পারস্য ভাষায় অনুবাদ করে এবং সেখানেও এটা ভীষণরকম সমাদৃত হয়। সেই বইতে বাবর নিজেকে প্রচণ্ড সৎ হিসেবে দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, যুদ্ধে হারলে তিনি কান্না করতেন কারণ এতে তিনি নিজেকে সামলে উঠতে পারতেন। তাহলে বুঝা যায় যে তিনি কোন টাইপের মানুষ ছিলেন। তিনি বইতে তার বিয়ে নিয়েও কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রচণ্ড চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। তিনি দুই সপ্তাহে বড়জোড় একবার স্ত্রীকে দেখতে যেতেন। এ রকম আরও অনেক সত্য তিনি অবলীলায় সেই বইতে উল্লেখ করেছেন।

বাবর সেই বইতে লিখেছেন যে, পাহাড়ে পালিয়ে থাকা অবস্থায় একদিন তিনি এবং তার সঙ্গীরা একটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে নিচের উপত্যকায় চমৎকার একটি শহর দেখতে পান। তিনি তাৎক্ষণিকভাবেই সেই শহরের প্রেমে পড়ে যান। শহরটি ছিল আফগানিস্তানের বর্তমান রাজধানী কাবুল। বাবর দাবি করেন যে কাবুলের লোকেরা তৎকালীন শাসককে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। তাই তারা বাবরকে তাদের রাজা হওয়ার জন্য অনুরোধ করে। কথাটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তা নিশ্চিত হওয়া যায় না, তবে এটা ঠিক আজ অবধি বাবরের জন্য কাবুলের মানুষের ভালোবাসা বিদ্যমান রয়েছে। তিনি যে পাবলিক গার্ডেন বানিয়েছিলেন তা আজও দৃষ্টিনন্দন একটি পার্ক হয়ে টিকে আছে। আর তার কবরকে মানুষেরা পবিত্র মাজার হিসেবে এখনও সম্মান করে।

বাবর ১৫০৪ সালে কাবুলের রাজা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে এত দিনে বাবরের একটি ঠিকানা হলো। তিনি আবারও সামারখন্দ জয় করার চিন্তা করলেন কিন্তু পরে আবার সেই চিন্তা থেকে সরে এসে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যেদিকে ইতঃপূর্বে তুর্কি-মঙ্গলরা সফল অভিযান পরিচালনা করেছিল। যাহোক, বাবর মাত্র ১০ হাজার সেনা নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন। দিল্লির সুলতান তাকে মোকাবেলা করার জন্য পানিপথে এলেন এবং তার হাতে তখন এক লাখ সৈন্য। ১০ হাজার সৈন্য কীভাবে এক লাখ সেনার সাথে যুদ্ধে লড়বে? এর ওপর দিল্লির সুলতানের বাহিনীতে ১ হাজার হাতিও ছিল। বাবরের এত কিছু ছিল না। কিন্তু তার হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। এই আধুনিক সমরাস্ত্র দিয়েই তিনি দিল্লির সুলতানের সেকেলে সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং দিল্লির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। অটোম্যান এবং সাফাভিদদের মতো মোঘলরাও তাদের সৈন্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কারণ, তাদের কাছে ছিল অগ্নিবর্শা এবং যে তীরগুলো তারা ছুঁড়ত, সেখানে বুলেট ও কামানের বারুদ লাগানো থাকত। ফলে মোঘল হলো তৃতীয় মুসলিম সাম্রাজ্য, যাদের কাছে গান পাউডারের মতো আধুনিক প্রযুক্তিও ছিল।

সাফাভিদদের মতো মোঘলরাও বেশ দীর্ঘ সময় সফলতার মধ্যে থাকে। কারণ, তাদেরও অনেক যোগ্য শাসক ছিল। মাত্র ৬ জন শাসক মিলে প্রথম দুইশ বছর সফলভাবে পার করেন। এই ৬ জনের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন আবেগপ্রবন, রোমান্টিক এবং শৈল্পীক। এদের মধ্যে ৩ জনের সামরিক জ্ঞান বা কৌশল ছিল অনন্য সাধারণ। এদের মধ্যে একজন আবার প্রশাসক হিসেবে দুর্বল থাকলেও, তার স্ত্রী নুরজাহান পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ানোয় তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। নুরজাহানকে সফল যেকোনো মোঘল শাসকদের সাথেই তুলনা করা যায়। তিনি ছিলেন সফল একজন নারী উদ্যোক্তা, একজন কবি এবং শিল্প ও সাহিত্য অনুরাগী। তিনি খেলাধুলাও পছন্দ করতেন। সেই সময়ের রাজনীতিবিদদের মধ্যে চতুরতা ও কৌশলের দিক থেকে নুরজাহান ছিলেন অন্যতম।

প্রথম দুইশ বছরের ৬ জন মোঘল শাসকের মধ্যে একজন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিলেন, তিনি হলেন বাবরের পুত্র। তিনি মাতাল ছিলেন এবং তার পিতা তাকে যে বিশাল সাম্রাজ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তা মাত্র ১০ বছরে খুইয়ে ফেলেন। তখন তিনি আফগানিস্তানের বিভিন্ন পাহাড়ের বাঁকে পালিয়ে বেড়াতেন। তার স্ত্রী আবার একটি ছেলের জন্ম দিয়েছিলেন যিনি 'আকবর দ্য গ্রেট' হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। আকবর ছিলেন তার সময়ের সবচেয়ে সফলতম শাসক-যার অবস্থান তুলনা করা যায় ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথের সাথে। আকবরের বয়স যখন মাত্র ১২ বছর তখন তার পিতার হারানো সাম্রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করেন। এর কিছুদিন পরের কথা। আকবরের বাবা এক দিন লাইব্রেরির একেবারে শীর্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ করেই তিনি আযান শুনতে পেলেন। মুহূর্তেই তার মধ্যে যেন কি ঘটে গেল তিনি ভাবলেন তার জীবনটায় তিনি বৈপ্লবিক সংস্কার করবেন। তিনি পীর হিসেবে জীবন শুরু করার মনব্রত নিয়ে খুব দ্রুততার সাথে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। এমন সময় তিনি দুর্ঘটনাবশত সিঁড়ি থেকে পড়ে যান এবং আকবরকে সেই কিশোর বয়সেই সিংহাসনে বসতে বাধ্য হন।

আকবর তার দাদার জয়করা এলাকাগুলোকে পুনরায় উদ্ধার করেন, সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারণ করেন এবং গোটা রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এসব অর্জনই আকবরকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আকবর নিছক একজন সাম্রাজ্য জয়ী ছিলেন না, তিনি তার চেয়েও আরও বড় কিছু সংস্কারমূলক কাজ করে গেছেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তিনি প্রথমে তার সাম্রাজ্যের দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করলেন। তিনি দেখলেন খুব অল্প সংখ্যক মুসলমানই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুকে শাসন করতে চাইছে। তা ছাড়া মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর লুটতরাজ, হত্যাসহ আরও নানা ধরনের অত্যাচার করে থাকে। আর নিপীড়নের এই ধারাটি শুরু হয়েছিল আরও ৫ শতাব্দী আগে, যখন গজনভীর সুলতান মাহমুদের রাজত্বকাল ছিল। আকবর এই ধারাকে রহিত করেন 'সুলাহকুল' নামক একটি ট্রেন্ড দিয়ে। সুলাহকুল শব্দের নামে বিশ্বজনীন ধৈর্যশীলতা। নিজের নিয়তকে আরও বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য তিনি একজন হিন্দু নারীকে বিয়ে করেন এবং তাদের দুজনের প্রথম সন্তানকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী করার ঘোষণা দেন।

আকবর তার সাম্রাজ্যের সকল সরকারি পদে মুসলমানের সাথে সমানুপাতে হিন্দুদেরকে নিয়োগ দেন। এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের অনেক পবিত্র স্থান ছিল। সেগুলো ভ্রমণ করতে যখন হিন্দু তীর্থযাত্রীরা আসতেন তখন তাদেরকে কর দিতে হতো যা ইতঃপূর্বের মুসলিম শাসকেরা চালু করে গিয়েছিলেন। আকবর সেই করটাও বাতিল করে দেন। এমনকি ইসলাম অমুসলিমদের জন্য যে জিজিয়া কর ধার্য্য করার কথা বলে, আকবর তাকেও নাকচ করে দেন। তার পরিবর্তে তিনি একটি ভূমি কর প্রথা চালু করেন যা সাম্রাজ্যের সকল নাগরিককে একই অনুপাতে প্রদান করতে হতো। সেই নাগরিক মুসলমান হোক বা অমুসলমান, ধনী হোক বা গরিব- তাদেরকে একই হারে সেই ভূমিকর পরিশোধ করতে হতো। তিনি তার সেনাদেরকে শুধু ইসলাম বা মুসলমানদের নয় বরং সকল ধর্মের সব পবিত্রস্থানগুলোকে সংরক্ষণ ও পাহারা দেয়ার জন্য আদেশ দেন।

আকবর তার পূর্বসূরি মোঘল রাজাদের চালু করা অভিজাত সামরিক তন্ত্রকে বাতিল করে দেন। তার পরিবর্তে তিনি একটি প্রশাসনিক পদ্ধতি চালু করেন, যেখানে প্রতিটি কর্মকর্তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মেয়াদ পর্যন্তই কাজ করার সুযোগ পাবে। মেয়াদ ফুরোলে সেই কর্মকর্তাকে হয় চাকরি পরিবর্তন করে নতুন কোনো চাকরিতে ঢুকতে হবে, অথবা বদলী হয়ে অন্য কোনো স্থানে যেতে হবে। আকবরই প্রথমবারের মতো মেয়াদের বিষয়টা প্রণয়ন করেন। কারণ, ইতঃপূর্বে কারও দায়িত্বের কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট না থাকায় অসংখ্য আঞ্চলিক ক্ষমতাশালীর জন্ম হয়েছিল। যার ফলে রাজ্য পরিচালনায় নানা ধরনের সংকটও সৃষ্টি হয়েছিল।

মুসলিম ঘরে জন্ম নেয়ায় আকবর নিজেকে মুসলমান দাবি করতেন ঠিকই, তবে অন্য ধর্মের ব্যাপারেও তার ব্যাপক আগ্রহ ছিল। আকবর প্রায়ই তার

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দরবারে নানা ধরনের ধর্মীয় বিতর্কের আয়োজন করতেন। সেখানে তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, জৈন, জুরুথুষ্ট্র এবং বৌদ্ধদের প্রতিনিধিদেরকে ডাকতেন এবং মনোযোগের সাথে তাদের বক্তব্য শ্রবণ করতেন। এক পর্যায়ে আকবরের মনে হয়, প্রতিটি ধর্মের কিছু সত্য বিষয় আছে, আবার কোনো ধর্মেরই সকল বিষয়ই সত্য নয়। তাই তিনি সকল ধর্মের থেকে ভালো ভালো বিষয়গুলোকে নিয়ে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেন। তিনি তার নাম দেন 'দ্বীন-ই-ইলাহি'। এই ধর্মের মূল বার্তা ছিল আল্লাহ একক এবং তিনি সকল ক্ষমতার একমাত্র আঁধার। দ্বিতীয়ত, এই গোটা বিশ্বজগৎ একই সুতোয় বাঁধা এবং তা একজন শক্তিশালী স্রষ্টার কথাই প্রতিফলিত করে। তৃতীয়ত, প্রতিটি মানুষের ধর্মের প্রথম চাহিদা হলো সে কখনো অন্য কারও অনিষ্ট করবে না, ক্ষতি করবে না। চতুর্থত, প্রতিটি মানুষের উচিত নিজেকে উন্নত ও উৎকর্ষ জীবনযাপনের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা। আকবরের মতে, নবি মোহাম্মাদ ﷺ সেই মানের একজন আদর্শ, শিয়াদের ১২ ইমামও অনুকরণীয় আদর্শ। আকবর অবশ্য নিজেকেও এই মানের আদর্শ ব্যক্তি হিসেবেই দাবি করতেন।

নিজের ধর্মকে ভালো অবস্থানে নেয়ার জন্য এবং জনপ্রিয় করার জন্য আকবর একটি নতুন শহরই নির্মাণ করলেন। লাল রং এর বেলেপাথর দিয়ে ফতেহপুর সিক্রি নামক এই স্থানটি মরুভূমির পাদদেশে গড়ে ওঠে। এই শহরের অন্যতম একটি আকর্ষণ ছিল প্রাণভেট দশক হল- যেটি মূলত একটি লম্বা ঘর যার সিলিং অনেক উঁচু এবং রুমে একটিমাত্র আসবাবই থাকবে। সেখানে একটি লম্বা পিলার ছিল। আকবর সেই পিলারের একেবারে উপরে বসতেন। সেই উচ্চ ব্যালকনিতে থেকেই আকবর ভাষণ দিতেন এবং দরবারের অন্য সদস্য এবং সাধারণ শ্রোতারা নিচে মাটিতে থেকে সেই ভাষণ শুনতেন।

এটা আকবরের বিরাট যোগ্যতা, নতুন ধর্ম চালু ও প্রচার করার পরও কেউ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। (নোট: মুজাদ্দিদে আলফে সানি আকবরের ধর্মের প্রতিবাদ এবং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন।) অবশ্য তার সেই ধর্মটি খুব সফলতা পায়নি। কারণ, মুসলমানরা তার মধ্যে যেমন পরিপূর্ণ ইসলামের স্বাদ পায়নি তেমনই হিন্দুরাও তার মধ্যে হিন্দুত্বকে খুঁজে পায়নি। শেষ পর্যন্ত ফতেহপুর সিক্রি শহরটি টিকে থাকতে পারেনি। শহরের সকল জলজ উৎস শুকিয়ে গিয়েছিল এবং শহরটিও একটা সময়ে গিয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে।

আকবরের ধর্ম যেমনই সাড়া পাক না কেন, মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় একতা আনার চেষ্টা দীর্ঘদিন আগে, সেই বাবরের সময় থেকেই শুরু হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিশেষ করে সুফিরা এই ব্যাপারে বেশ সক্রিয় ছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নানক শাহীর কথা। ১৪৯৯ সালে এই নানক শাহী ঘোষণা করেন যে, 'হিন্দু বা মুসলমান বলে আসলে কিছু নেই।' যদিও নানক হিন্দু ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি আসলে সুফিবাদের সাধনা করতেন। তার গোটা জীবন ধরেই তিনি হিন্দুত্ববাদের অন্যতম নীতি বর্ণপ্রথাকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি গুরুমুখী বিদ্যার আদলে আধ্যাত্মিক সাধনার চর্চা শুরু করেন। গুরু নানক শাহীর অনুসারীরা নিজেদেরকে শিখ বলে দাবি করে, যা এই অঞ্চলে নতুন একটি ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এই গুরু নানকেরই আরেকজন সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন কবির নামের একজন কবি। যিনি প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি একজন হিন্দু বিধবার সন্তান হলেও বড় হয়েছেন, মুসলমানদের মধ্যেই। তিনি 'আত্মার ভালোবাসার' ওপর অনেকগুলো কবিতা রচনা করেন, যা হিন্দুত্ববাদ ও সুফিবাদ উভয়কেই সমালোচনা করে। তার সেই কবিতাগুলো আজও টিকে আছে।

এভাবে মোঘল সাম্রাজ্যের গ্রামে ও লোকালয়ে নানা ধরনের কবি এবং তাদের আবেগময় কবিতার প্রসার দেখা গেলেও রাজ দরবারের কবিরা মূলত পারস্য ভাষার কবিতার স্টাইলে কিছুটা জটিল ও রহস্যময় ঢংয়ে কবিতা লিখতেন। অন্যদিকে, মোঘল চিত্রশিল্পীরাও পারসিয়ান মিনিয়েচার এবং শাহনামার মতো মহাকাব্যগ্রন্থের স্টাইলে নানা ধরনের নান্দনিক ও সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম রচনা অব্যাহত রাখেন।

মোঘল আমলের স্থাপত্যও ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল। তারা অটোম্যানদের আভিজাত্য আর সাফাভিদদের আলোকময় কারুকার্য- দুটোকেই বিভিন্ন স্থাপত্য নির্মাণে ব্যবহার করেছিল। পঞ্চম মোঘল সম্রাট শাহজাহান এই ক্ষেত্রে ছিলেন সবচেয়ে এগিয়ে। তিনি ন্যায়বিচারক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তবে আজকের দিনে এসে মানুষ যত না তাকে তার রাজনৈতিক ও সামরিক অর্জনগুলোর জন্য স্মরণ করে, তার চেয়ে অনেক বেশি স্মরণ করে তাজমহলের জন্য। যেটা তিনি তার স্ত্রী মমতাজের স্মরণে নির্মাণ করেছিলেন। শাহজাহান সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার কিছুদিন পরই মমতাজ মারা যান। সেই শোকে নতুন এই সম্রাট পরবর্তী ২০টি বছর ধরে অসংখ্য শ্রমিককে কাজে লাগিয়ে এই তাজমহল নির্মাণ করেন। বলা হয়ে থাকে, তাজমহল পৃথিবীর সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকা। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা বা মাইকেল এ্যাঞ্জেলো সিস্টিন চ্যাপেলের মতোই বিশ্বজুড়ে পরিচিত এই তাজমহল। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো হলো,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

শাহজাহান তার সাম্রাজ্য চালানোর পাশাপাশি প্রতিদিন এই নির্মাণ কাজটি তদারকি করতেন। অসংখ্য স্থপতি ও শিল্পী মিলে কাজটা করলেও শাহজাহান শত ব্যস্ততায়ও কাজটি তদারকি করতে ভুলতেন না। বরং তার এতটাই নান্দনিক ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল যে, যেকোনো নির্মাণ শ্রমিক বা স্থপতি কোনো ভুল করলে সেটা কখনোই তার নজর এড়াত না।

শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব ছিলেন শীর্ষ মোঘল সম্রাটদের মধ্যে সর্বশেষ। তার নান্দনিকতা, শিল্প, গান, কবিতা কোনো কিছুর প্রতি তেমন একটা আকর্ষণ ছিল না। তার পূর্ব পুরুষেরা মুসলমান ও হিন্দুদের সহাবস্থানের নামে যেসব ধারা চালু করেছিল, সেগুলো নিয়ে তিনি খুবই বিরক্ত ছিলেন। তার পিতার রাজত্বের শেষের দিকে একবার তিনি শাহজাহানের সাথে একটি যুদ্ধে যান এবং সেখানেই তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বৃদ্ধ শাহজাহানকে নির্জনে একটি ঘরে আটকে রাখেন, যেখানে শাহজাহান তার বাকি জীবনটা কাটান। সেই ঘরে কেবল একটি মাত্র জানালা ছিল যেটা অনেক উঁচুতে থাকায় তিনি ঠিকমতো সেই জানালা দিয়ে বাইরের জগৎটিও দেখতে পেতেন না। তার মৃত্যুর পর নিরাপত্তারক্ষীরা তার সেই ঘরের দেয়াল থেকে একটি আয়না উদ্ধার করে। আয়নাটি দেয়ালের এমন জায়গায় লাগানো ছিল যার মাধ্যমে শাহজাহান বিছানায় শুয়ে থেকেও ঘরের উঁচু জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যটি দেখার চেষ্টা করতেন। আর একটি জিনিসই সেই আয়নায় ধরা পড়ত আর তা হলো তার স্ত্রীর ভালোবাসায় যে অন্যান্য সাধারণ স্থাপনাটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন- তাজমহল।

আওরঙ্গজেবের মূল স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল ইসলামের মৌলিক রূপকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তিনি তার প্রপিতামহ আকবরের মতোই যোগ্য সামরিক নেতা ছিলেন। আকবরের মতো তিনি ৪৯ বছর রাজ্য শাসন করেন। লম্বা সময় শাসন করায় তিনি উপমহাদেশে নানা ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানোরও সুযোগ পান।

প্রপিতামহ আকবর যেসব বিষয় চালু করেছিলেন আওরঙ্গজেব তার শাসনামলে তার সবগুলোই বিলুপ্ত করেন। তিনি জিজিয়া কর পুনর্বহাল করেন। হিন্দুদের ওপর বিশেষ কর আরোপ করেন। তার নিরাপত্তা বাহিনী যারা ছিল, তারা বেশ কিছু হিন্দু স্থাপনাও ধ্বংস করে। তিনি সরকারি দায়িত্বগুলো থেকে হিন্দুদেরকে অপসারণ করেন এবং দক্ষিণের স্বায়ত্বশাসিত হিন্দু শাসক রাজপুতের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যাতে গোটা অঞ্চলটিকে মোঘল সাম্রাজ্যের আওতায় নিয়ে আসতে পারেন এবং ধর্মীয় বোদ্ধাদেরকে নিয়ে একটি আলেম সম্প্রদায় গড়ে তুলতে পারেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আওরঙ্গজেব শিখদেরকেও বিতাড়িত করতে শুরু করেন। গুরু নানকের অনুসারীরা শান্তিপ্রিয় ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেবের দমন-পীড়ন শিখদেরকে যোদ্ধায় রূপান্তরিত করে দেয়। বাস্তবতা এমনই ছিল যে, প্রতিটি ধার্মিক শিখের কাছেই তখন তলোয়ারের মতো বিশাল আকৃতির ছুরি থাকত, যাতে তারা অতর্কিত আক্রমণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

মোগলদের শেষ সম্রাট যদিও একটু কট্টরপন্থী ছিলেন, তথাপি এই কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, এই মোঘলেরা তার আমলেই ইতিহাসের সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌছে যায়। ১৬০০ সালের দিকে এসে মোঘলরা ছিল বিশ্বের ৩টি বৃহৎ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি এবং তাদের ক্ষমতা ও শক্তিও ছিল প্রচণ্ড।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি ১৬০০ সালের দিকে এমন ছিল যে, যদি কোনো পর্যটক ইন্দোনেশিয়ার কোনো দ্বীপ থেকে ভ্রমণ শুরু করে বঙ্গভূমিতে আসে, ভারত পার হয়, অক্সাস নদীর উত্তরে আরও কিছুটা এগিয়ে হিন্দু কুশে পৌছায়, সেখান থেকে যদি আবার পারস্যে আসে, মেসোপোটামিয়া ও এশিয়া মাইনর হয়ে যদি বলকানের দিকে আগায়, তারপর যদি কৃষ্ণসাগর পাড়ি দিয়ে ককেশাস অঞ্চলে গিয়ে পৌছায় কিংবা দক্ষিণে যদি আরব হয়ে মিসর পর্যন্ত পৌছে যায় কিংবা তারও পশ্চিমে মরক্কো অবধিও যায় তাহলে সে এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে একই সভ্যতারই (মুসলিম) ছায়া দেখতে পাবে। যেমন আজকের দিনে এসে কেউ যদি সানফ্রান্সিসকো থেকে লন্ডনে যায় কিংবা গোটা ইউরোপ ঘুরে বেড়ায় তাহলেও সে যেন একটি একক সভ্যতার (খ্রিষ্টান) দেখা পাবে। হয়তো দেশভেদে আমেজটা একটু ভিন্ন হবে এই যা। অর্থাৎ সে যখন জার্মানি যাবে তখন খ্রিষ্টীয় সভ্যতা পেলেও একটু জার্মান ফ্লেভার পাবে, ঠিক একইভাবে সুইডেনে গেলে সুইডিশ ছোয়া পাবে। এভাবে ব্রিটেনে বা নেদারল্যান্ডে গেলেও একই।

একথা ঠিক যে সপ্তদশ শতাব্দীর সেই পর্যটক মুসলিম সাম্রাজ্যে ঘুরে বেড়ালে, সে হয়তো নানা ধরনের স্থানীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি, অনেক ধরনের ভাষা দেখতে পেত। কিংবা তাকে হয়তো বিভিন্ন সময় প্রশাসনিক অনুমতি নেয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সার্বভৌম শক্তির শরণাপন্ন হতে হতো। কিন্তু বাস্তবতা ছিল এটাই যে, যেখানেই সে যাক না কেন সে কিছু জিনিস অবশ্যই একই রকম দেখতে পেত। সেই সময়ে বিদ্যমান তিনটি বড় মুসলিম সাম্রাজ্যেই কিছু বিষয় খুবই সাধারণ ছিল। যেমন তুর্কিদের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা বেশি ছিল। এমনকি পারস্যে যে সাফাভিদরা ছিল তারাও নৃতাত্ত্বিকভাবে ছিল তুর্কি এবং তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল কিজিলবাস।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সপ্তদশ শতাব্দীতে তিন ইসলামি সাম্রাজ্য

সেই রকম কোনো পর্যটক যদি আসলেই এই অঞ্চলে তৎকালীন সময়ে ঘুরতে আসতেন তাহলে হয়তো আরও দেখতে পেতেন, এই সাম্রাজ্যের সকল শিক্ষিত মানুষের মাঝেই পারস্য ভাষা ও সংস্কৃতি জানার একটি আগ্রহ রয়েছে। প্রতিটি জায়গায় তিনি আজান শুনতে পেতেন, নামাজ পড়ার সুযোগ পেতেন। আর বিশাল এই সাম্রাজ্যে যেখানেই তিনি ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন সেখানে আরবি দোয়া আর আরবি শ্লোকও নিশ্চিতভাবে শুনতে পেতেন।

এই তিনটি সাম্রাজ্যে কিংবা সাম্রাজ্যের বাইরে সীমান্তবর্তী এলাকা ইন্দোনেশিয়া বা মরক্কোতেও যদি তিনি যেতেন তাহলে সীমানা ভিন্ন হলেও তিনি দেখতে পেতেন, সমাজ কাঠামো এবং সামাজিক রীতি নীতি অনেকটা একই। এই অঞ্চলগুলো মুসলিম সাম্রাজ্যের নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে অবস্থান করলেও নিয়মকানুন ও পদ্ধতি অনেকটা একই ছিল। প্রতিটি সমাজেই আলেম সমাজের একটি শক্তিশালী অবস্থানও লক্ষণীয় ছিল। তারা সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে সুফিবাদ ও সাধকের দেখাও মিলত। সমাজে বণিক শ্রেণি ও ব্যবসায়ীদের অবস্থান ভালো ছিল, তবে তাদের স্ট্যাটাস সরকারি কর্মকর্তাদের তুলনায় নিচে ছিল। আমলারা সেই সময়ে সমাজে ভিন্ন একটি উচ্চবর্গীয় শ্রেণি হিসেবেই অবস্থান করতেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উন্মুক্ত স্থানগুলোতে নারীর দেখা খুব কমই মিলত। ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল এই এলাকায় আসলে, প্রাণভেট (ব্যক্তিগত) এবং পাবলিক (জনগণের সামনে উন্মুক্ত) বিষয়গুলোর মধ্যকার বিভাজন খুব স্পষ্টতই চোখে পড়ত। নারীরা সেই সময়ে ব্যক্তিগত জগৎটার ভেতরেই থাকত আর বহির্জগৎ বা জনগণের সামনে উন্মুক্ত জগৎটা পুরোটাই ছিল পুরুষদের নিয়ন্ত্রণে।

কোনো মার্কেটে বা কারও বাসায় বেড়াতে গিয়ে যদি জনসম্মুখে কোনো নারীকে দেখতে পাওয়াও যেত, তখন তারা এমন পোশাক পরিধান অবস্থায় থাকত, যাতে মুখটি ঢাকা থাকে এবং শরীরকে বাইরের থেকে বুঝা না যায়। যদি কোনো মেয়েকে মুখ খোলা অবস্থায় দেখা যেত তাহলে ধরে নেয়া হতো যে, সেই মহিলাটা নিম্ন শ্রেণির কেউ! হতে পারে সে একজন চাষী অথবা গৃহভৃত্য বা শ্রমিক। মহিলারা যাই পরুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই তাদের হাত, বাহু, পা বা বুকের কোনো অংশ অনাবৃত রাখা যেত না। তারা মাথাটাও কাপড়ের টুকরা দিয়ে ঢেকে রাখত।

অন্যদিকে, মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পুরুষদের পোশাক ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তবে কিছু জিনিস ছিল কমন। পুরুষদের মাথাও আবৃত রাখত। তারা টাইট পোশাক নয় বরং ঢিলেঢালা পোশাক পড়ত। আর তাদের এমন কোনো পোশাক পরার নিয়ম ছিল না যা পড়ে নামাজের সময় রুকু বা সিজদা দিলে তাদের উরুসন্ধি পেছনের কারও কাছে প্রতীয়মান হয়।

গোটা সাম্রাজ্যে ক্যালিওগ্রাফির ব্যবহার ও প্রচলন ছিল উল্লেখযোগ্য মানে। সাম্রাজ্য ঘুরে বেড়ালে একটু পর পর গ্রাম চোখে পড়ত। প্রতিটি লোকালয়ের নিজস্ব বাজার ছিল। প্রতিটি শহরে দৃষ্টিনন্দন মসজিদ ছিল। মসজিদগুলোতে সুউচ্চ মিনার ও গম্বুজ ছিল। সেগুলো মোজাইক টাইলস দিয়ে নানা ধরনের ডিজাইন বা নকশাতে সমৃদ্ধ ছিল।

আরেকটি বিষয়, যদি বাহির থেকে আসা কোনো পর্যটক এই মুসলিম সাম্রাজ্যে এসে এখানকার কোনো নাগরিকের সাথে কথা বলতো, তাহলে আবিষ্কার করত তাদের উভয়েরই ঐতিহাসিক বিষয়াবলী সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা একই রকম। যেমন তারা দুজনেই ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধারাটি জানত। অর্থাৎ আদম (আ.), দাউদ (আ.), মুসা (আ.), নূহ (আ.)সহ অন্যান্য নবিদের সম্পর্কে উভয়েরই জানা ছিল। তারা দুজনই শুধু হযরত মোহাম্মাদ ﷺ নয় বরং তার ওফাতের পরে খোলাফায়ে রাশেদা অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) উমর (রা.) উসমান (রা.) এবং আলি (রা.) সম্পর্কে জানত। যদিও এই খলিফাদের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ব্যাপারে তাদের চিন্তাভাবনা বা মতামত ভিন্ন হতে পারে। তারা উভয়েই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি সম্পর্কে জানত। যেমন তারা আব্বাসিয় যুগ, স্বর্ণযুগ এগুলো সম্বন্ধে ধারণা রাখত আবার মঙ্গলদের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞান ছিল পরিষ্কার।

১৬০০ সালের বাস্তবতা এমন ছিল যে অনেকেই মনে করত মুসলিম সাম্রাজ্য আর তাদের আশেপাশের এলাকাগুলোকে নিয়েই পৃথিবী। এই প্রসঙ্গে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসবিদ মারশাল হজসন বলেন, 'ষোড়শ শতাব্দীতে যদি মঙ্গল গ্রহ থেকে কোনো পর্যটক পৃথিবীতে নেমে আসতেন তাহলে তার মনে হতো যে গোটা পৃথিবীই বোধ হয় মুসলমান হয়ে গেছে'।

তবে এটা সঠিক মূল্যায়নও নয়। কারণ, মুসলমানদের সেই গৌরবোজ্জ্বল অবস্থান আসলে তত দিনে হুমকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, কারণ এরই মধ্যে ইউরোপিয়ান সভ্যতার উত্থান শুরু হয়ে গিয়েছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১১. ইউরোপের তৎকালীন অবস্থা
(৬৮৯-১০০৮ হিজরি) ১২৯১-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ

সর্বশেষ যে ক্রুসেডারটি মুসলিম বিশ্বে টিকে ছিলেন, তিনিও মিসরীয় মামলুকদের তাড়া খেয়ে ১২৯১ সালে পালিয়ে চলে যান। কিন্তু ইউরোপের ক্রুসেডের এই চেতনা পরবর্তী অনেক বছর ধরেই বিদ্যমান ছিল। রোমের চার্চ থেকে নিয়মিতভাবে কিছু সামরিক আবার কখনো কখনো কিছু ধর্মীয় কৌশল প্রণয়ন করে বা কিছু উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়ার মাধ্যমেই আসলে এই চেতনাটাকে টিকিয়ে রাখা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় টেম্পলারদের কথা। এরা একটা সময়ে এসে ইউরোপের প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। অন্যদিকে, রোডস দ্বীপপুঞ্জের দায়িত্ব পান নাইটেরা। পরবর্তী সময়ে তারা তাদের ঘাঁটি স্থানান্তরিত করেন মাল্টায়। সেখান থেকেই তারা ভূমধ্যসাগরে ভাসমান বিভিন্ন মুসলিম জাহাজগুলোতে লুটতরাজ চালাত। অন্যদিকে, টিউটোনিক নাইটেরা প্রুসিয়ার রাজ্যের অনেকটা অংশ জয় করে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। আর এদের সবার মাথায়ই ক্রুসেডিয় প্রভাবটাই বিদ্যমান ছিল।

ইউরোপিয়ানরা অবশ্য পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বে আরও বেশ কিছু অভিযান চালানোর চেষ্টা করে। তবে সেই অভিযানগুলো ছিল খুবই ক্ষুদ্রাতিকৃতির আর সেগুলো কোনো ভালো ফলাফলও নিয়ে আসতে পারেনি। তখন সামরিক অভিযান হলেই তাকে ক্রুসেড নাম দেয়ার একটা প্রবনতাও ইউরোপের মধ্যে দেখা যেত। এই প্রবণতাটি মূলত রোমান পোপের কারণেই শুরু হয়। পোপ এই ক্রুসেড নামটি ব্যবহার করে খ্রিষ্টানদেরকে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করতেন। যেমন বালটিক অঞ্চলের অগ্নিপূজারী ক্রীতদাসদের দমন করার অভিপ্রায়ে উত্তরে একটি ক্রুসেড পরিচালনা করা হয়। একইভাবে ফ্রান্সেও খ্রিষ্টানদেরই আরেকটি ধারা আলবেরিয়ানদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান চালানো হয়-

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

একেও বলা হয় ক্রুসেড। আলবেরিয়াতে ক্রুসেড ১৪৯২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আর এই ক্রুসেড চলা অবস্থায়ই খ্রিষ্টানেরা গ্রানাডা থেকে মুসলমানদের নিঃশেষ করতে সক্ষম হয়।

ক্রুসেডীয় চেতনা এবং প্রাচ্যে নতুন করে অভিযান পরিচালনা করার অভিপ্রায়, ইউরোপিয়দের মধ্যে বিদ্যমান থাকার পেছনে ধর্মীয় কারণ ছাড়াও আরেকটি বড় কারণ ছিল। আর তা হলো, ইউরোপিয়ানদের পছন্দসই কিছু খাবার ভারত এবং তার আশেপাশের দ্বীপেই পাওয়া যেত। ইউরোপিয়ানরা তখনকার সময়ে এই অঞ্চলটিকে বলতো ইন্দিস। ইউরোপিয়ানদের পছন্দসই অনেক কিছুই তখন ভারতে পাওয়া যেত যার মধ্যে অন্যতম হলো, সুস্বাদু চিনি। মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়াতে পাওয়া যেত জিরা, কালো জিরা, নানা ধরনের বাদাম এবং বিভিন্ন ধরনের মসলা। মধ্যযুগের ইউরোপিয়ান বাবুর্চিরা যে খাবারগুলো রান্না করতেন সেখানে তারা নানা ধরনের মসলা ব্যবহার করতেন, এমনকি মিষ্টান্ন তৈরিতেও তারা মসলা প্রয়োগ করতেন।

সমস্যাটি পরবর্তী সময়ে গিয়ে আরও ঘনীভূত হয়। কারণ, যদিও বলা হচ্ছিল, ক্রুসেডটা চালানো হচ্ছে মূলত সুস্বাদু উপকরণ মজুদ করার জন্যই। কিন্তু কার্যত এখানেও অনেক ধরনের গোপন খেলা চলছিল। ক্রুসেডের গোটা প্রক্রিয়া থেকে একটু কৌশল করে ইউরোপিয়ান বণিকদেরকে সরিয়ে রাখা হয়। ইউরোপিয়ানরা মিসর থেকে শুরু করে আজারবাইজান পর্যন্ত একটি বেল্ট নির্মাণ করেন, ফলে সাধারণ খ্রিষ্টান বনিকেরা তা অতিক্রম করে গিয়ে নিজেরা সরাসরি ব্যবসা করতে পারত না। তাদেরকে মুসলমান মধ্যস্বত্বভোগীদের সাথেই লেনদেন করতে হতো।

এটা সত্য যে, এই কঠিন সময়েই মার্কো পোলো চীন ভ্রমণ করেছিলেন। তবে তা ছিল একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। ইউরোপিয়ানরা মার্কো পোলোর এই অভিযানের খবরটি জানতে পেরে খুবই অবাক হয়েছিল, এমনকি অনেকেই একে বিশ্বাসও করতে পারেনি। তারা মার্কো পোলোর বিখ্যাত বই 'দ্য মিলিওনস' এর অনেক তথ্যকেই মিথ্যা ও গাঁজাখুরী মনে করে।

মুসলমানরা সেই সময় কৃষ্ণসাগরের পূর্ব উপকূলীয় এলাকাটি নিয়ন্ত্রণ করত। ককেশাস পর্বতমালা ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে, কাস্পিয়ান উপকূলও ছিল তাদেরই হাতে। মুসলমানরা সে সময়ে লোহিত সাগর এবং লোহিত সাগরে পৌছানোর সকল রাস্তা নিয়ন্ত্রণ করত। ইউরোপিয়ানরা তাই ভারতীয় উপমহাদেশের পণ্য পাওয়ার জন্য সিরিয়া ও মিসরের মুসলিম ব্যবসায়ীদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হতো। একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, মুসলমান ব্যবসায়ীরাও খ্রিষ্টানদের এই সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিত এবং যতটা পারা যায় চড়া দামে পণ্য বিক্রি করত। কারণ, ক্রুসেডের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অভিজ্ঞতার কারণে খ্রিষ্টানদের ওপর তাদের অসন্তোষ ছিল। আবার একথাও ঠিক, ইতঃপূর্বে খ্রিষ্টানেরা মুসলমানদের নিধনে মঙ্গলদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। তাই খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে অসন্তোষ হওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিকও ছিল না।

কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসায়ীরা তখন কী করত?

আসলে পশ্চিম ইউরোপেই ক্রুসেডের চেতনাটা প্রকৃত অর্থে বিকশিত হচ্ছিল। মুসলমানরা বিশ্ববাণিজ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করছিল ঠিকই, কিন্তু এরই মাঝে কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানদের লোকচক্ষুর অন্তরালে পশ্চিম ইউরোপিয়ানরা সমুদ্র অভিযানে বিরাট পারদর্শিতা অর্জন করে ফেলে। ক্রুসেড পরবর্তী সময়ের খ্রিষ্টানেরা বিশেষ করে ভাইকিংসরা উত্তরের দিক থেকে অনেকগুলো সফল সমুদ্র অভিযান সম্পন্ন করে। তারা তাদের ড্রাগন আকৃতির নৌকায় চড়ে উত্তর আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছে গিয়েছিল। আরেকটি দল পৌঁছে গিয়েছিল ইংল্যান্ডে। উত্তরের এই মানুষগুলো যারা নর্থম্যান হিসেবে পরিচিত ছিল তারাই একটা পর্যায়ে নরম্যান নামে অভিহিত হতে শুরু করে। আবার এদেরই একটা অংশ ফ্রান্স উপকূলে পৌঁছে যায়। সেখানে যে এলাকাটাতে তারা বসবাস করতে শুরু করে সেটা তাদের নরম্যান নামানুসারে নরম্যানডি নামে পরিচিত হয়।

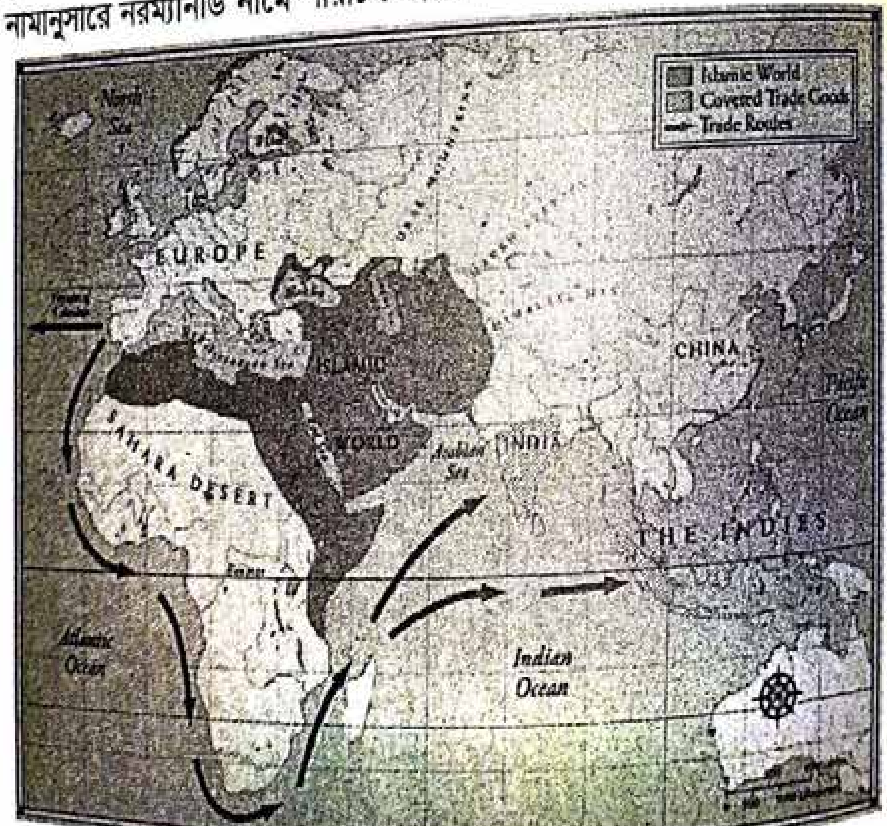

ইউরোপিয়দের অনুসন্ধান : ভারত যাত্রার সামুদ্রিক পথ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

শুধু ভাইকিংসরাই এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল তাই কিন্তু নয়। সে সময়গুলোতে যেই স্ক্যানডিনিভিয়ান দেশগুলো থেকে দক্ষিণ ইউরোপে যারা নিয়মিত যাতায়াত করত, তারা প্রায়ই সকলেই প্রচণ্ড ঝড়, ঘুর্নি বাতাস আর আটলান্টিকের উঁচু ঢেউকে মোকাবেলা করে জাহাজ চালানোর বিদ্যাটি শিখে গিয়েছিল। আর এভাবেই পশ্চিম ইউরোপিয়ানরা সাগরকেই তাদের বাড়ি ঘর বানিয়ে ফেলেছিল। আর এভাবে সমুদ্র পথে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করার পর একটা পর্যায়ে গিয়ে ইউরোপিয়ান বেশ কিছু শাসকেরা ইউরোপ থেকে পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে নিয়মিত যাতায়াত এবং এই এলাকাগুলোতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উপায় খুঁজছিল। একই সঙ্গে যেহেতু এই অঞ্চলে মুসলমানদের প্রভাবটি বেশি তাই তারা অন্য কোনো উপায়ে বা এই এলাকাগুলোকে এড়িয়ে অন্য কোনো পথে সরাসরি সমুদ্রপথে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌছানোর জন্যেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

এই প্রচেষ্টায় যিনি প্রথম বড় আকারের ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হন তিনি হলেন, পর্তুগালের প্রিন্স হেনরি। তাকে হেনরি দ্য নেভিগেটর বা নৌ অভিযাত্রী হেনরি নামেও ইতিহাসে অভিহিত করা হয়। যদিও তিনি নিজে সরাসরি কোনো সমুদ্র যাত্রায় অংশ নেননি। প্রিন্স হেনরি পর্তুগালের তৎকালীন রাজার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা তিনি ছিলেন তৎকালীন পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের একজন। তিনি দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে আফ্রিকায় পৌছানোর লক্ষে অনেকগুলো নৌ যাত্রা পরিচালনার ব্যয় বহন করেন। হেনরির চিঠি ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখে বুঝা যায়, তিনি নিজেকে অন্যান্য খ্রিষ্টান রাজার মতো বিবেচনা করতেন না। বরং তিনি নিজেকে একজন ক্রুসেডার হিসেবে সর্বদাই বিবেচনা করতেন এবং মুরদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়লাভ করে সত্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করার স্বপ্ন দেখতেন।

তার টাকায় যারা নৌযাত্রা করছিল তারা একটা সময়ে নতুন একটা জায়গা আবিষ্কার করেন। সেখানে তারা কালো চামড়ার অসংখ্য মানুষকে খুঁজে পান। এই কালো চামড়ার মানুষগুলোকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে তারা বেশ মুনাফাও অর্জন করেন। ফলে প্রিন্স হেনরি আর্থিক লাভের খোঁজে দাস ব্যবসা শুরু করেন এবং তিনি নৌঅভিযাত্রী হেনরির তুলনায় ক্রীতদাস ব্যবসায়ী হেনরি হিসেবে বেশি পরিচিতি লাভ করেন। ক্রীতদাস ব্যবসার পাশাপাশি হেনরির অভিযাত্রীরা দক্ষিণে অভিযান করে আরও বেশ কিছু লাভজনক ব্যবসায়িক উপাদান খুঁজে পান যেমন স্বর্ণবর্জ্য, উট পাখির ডিম, মাছের তৈল প্রভৃতি। এর ফলে ক্রুসেডের স্বপ্নে বিভোর থাকা হেনরি আর্থিক নানা প্রনোদনাতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। সেই মোহ তাকে নিত্য নতুন ভূমি আবিষ্কারের নেশায় ফেলে দেয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইউরোপিয়ানদের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারটি হয় ১৪৯২ সালে যখন ক্রিস্টোফার কলম্বাস আটলান্টিকে পাড়ি জমান। ভারতে যাওয়ার পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য তিনি অভিযানটি শুরু করলেও, মূলত তিনি পৌঁছে যান আমেরিকায়। তার অভিযানটির খরচ যোগান খ্রিষ্টান রাজা ফার্ডিনান্ড ও রানি ইসাবেলা। যারা আলবেরিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালনা করেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে স্পেনে একটি একক খ্রিষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

যখন কলম্বাস হিসপানিওলা নামক ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান তখন তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি বোধ হয় ইন্দিসেই পৌঁছে গেছেন। যখন তার ভুলটি জানাজানি হলো, তখন ভারতের পূর্বাঞ্চলের জায়গাটিকে ডাকা হয় ইস্ট ইন্ডিস আর ক্যারিবিয়ানে পাওয়া এই দ্বীপগুলোকে নাম দেয়া হয় ওয়েস্ট ইন্ডিস। খুব কম সংখ্যক মুসলমানই কলম্বাসের এই বিরাট আবিষ্কারটি সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। ১৫৭০ সালে এসে অটোম্যান মুসলমানরা সারা বিশ্বের ম্যাপ তৈরি করার সময় এই আবিষ্কার এবং আমেরিকার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু তত দিনে স্প্যানিশরা মেক্সিকোতে নতুন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। আর ইংরেজ, ফরাসি আর অন্যান্য ইউরোপিয়ান জাতিগোষ্ঠী আরও উত্তরের দিকে নতুন নতুন স্থান আবিষ্কার করা এবং সেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে অভিযান শুরু করে দিয়েছে।

অন্যদিকে, এরই মধ্যে মধ্য পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তের মুসলমানরা বুঝতে পেরেছিল যে খ্রিষ্টানেরা আসলে কী করতে চাইছে। মুসলমানরা এর বহু শতাব্দী আগে থেকেই মালয়েশিয়া আর ইন্দোনেশিয়ায় ব্যবসা করছে। সেই সুযোগে বহু মুসলমান ব্যবসায়ী এই মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে সুফিবাদ এবং ইসলাম ধর্মের অন্য আরও কিছু বিষয় নিয়ে দাওয়াতি কাজ করছিল। ফলে ইউরোপিয়ানরা এসব অঞ্চলে যাওয়ার বহু আগেই মুসলমানদের একটি প্রভাব সেখানে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

তবে পর্তুগিজ, স্প্যানিশ, ইংরেজ, ওলন্দাজ বা উত্তর ইউরোপিয়ান অন্য জাতিগুলোর সমুদ্র অভিযানে সফলতা পাওয়ার আগে থেকেই দক্ষিণ ইউরোপিয়ানরা সাগরে নিজেদের পারদর্শিতা প্রমাণ করেছিল। তাদের সভ্যতা সৃষ্টিই হয়েছিল সমুদ্র অভিযানকে ভিত্তি করে, যা তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রোমান ও গ্রিকদের কাছ থেকে লাভ করেছিল। আর তারও আগে ক্রিটানস এবং ফোনেশিয়ানদের মধ্যেও এই নৌঅভিযাত্রার ইতিহাসটি খুঁজে পাওয়া যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে জেনোভেস (ইতালির জেনোয়া শহরের নাগরিক) এবং ভেনেটিয়ান্সরা (ইতালির ভেনিস শহরের নাগরিক) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যবসা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বেশ কিছু বড় নৌ অভিযান পরিচালনা করে। এই দুই শহরের নাগরিকেরা পানির উপরে যুদ্ধ করতেও পারদর্শী ছিল। বিশেষ করে ভেনেটিয়ান্সরা কন্সট্যানটিপোলে খুব ভালোভাবেই ব্যবসায় জেঁকে বসেছিল। অটোম্যানরা কন্সট্যানটিপোল জয় করার পর যখন তারা শহরটিকে ইস্তাম্বুল হিসেবে নামকরণ করে, তারপর সেই শহরে ভেনেটিয়ান্সরা বাণিজ্যিক অফিস চালু করেছিল এবং তা খুব সফলতার সাথেই পরিচালনা করছিল।

ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ব্যবসায় ভালো করায় ইতালিতে প্রচুর পরিমাণে টাকা আসতে থাকে। আর সেই টাকাতে ইতালির বড় বড় শহরগুরো বিশেষ করে ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, মিলান অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তৎকালীন ইতালিতে যার হাতে টাকা থাকত সেই সবচেয়ে বেশি সম্মান পেত। জমি জমা বা অন্য কোনো সম্পদ নয়, টাকা দিয়েই মানুষের স্ট্যাটাসটি নির্ধারিত হতো। ফলে ব্যবসায়ীরা সমাজের নতুন অভিজাত শ্রেণি হিসেবে আবির্ভূত হয়।। ফ্লোরেন্সের মেদিসিস বা মিলানের এসফোরজার মতো পরিবারগুলো নতুনভাবে শক্তিমান পক্ষ হিসেবে পরিচিত হয়। তারা পুরোনো সামন্ত জমিদার বা সামরিক অভিজাত পরিবারগুলোর স্থান দখল করে নিল। সকল অর্থ, উদ্যোক্তাসুলভ চালিকাশক্তি, শহুরে বৈচিত্র্যতা, সার্বভৌম কাঠামো যেন একই সাথে একই সময়ে প্রাচুর্য, উচ্চতম অবস্থান, এবং সুনাম লাভের জন্য বেপরোয়া হয়ে ওঠল। এ রকম দৃশ্য ইতিহাসে দ্বিতীয়বার দেখা যায়নি।

আজকের দিনে যাদেরকে আমরা মেধাবী চিত্রকর বা হস্তশিল্পী বলি, তারা তখন থাকলে অনেক বেশি অর্থ রোজগার করতে পারতেন। কারণ, সেই সময়টাতে শিল্প ও সংস্কৃতির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। একটি বনেদী ব্যক্তি বা পরিবার তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য শিল্পকলার নানা খাতকে ব্যবহার করতেন। আর সেই কারণেই ডিউক, কার্ডিনাল এমনকি পোপেরা পর্যন্ত নিজেদের হাতে এইসব মেধাবী শিল্পীদেরকে রাখার জন্য নানাভাবে তোষামোদি করত। তাদের অনেকেই লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বা মাইকেল এঞ্জেলোর থেকে কাজ পাওয়ার জন্য তাদেরকে নানা ভাবে প্রলোভনও দেখাত। এটা এই জন্য নয় যে, এসব শিল্পীর কাজগুলো খুব মানসম্পন্ন ছিল। তা তো ছিলই তবে পাশাপাশি এই শৈল্পিক কাজগুলো তখন খুবই আভিজাত্যের নিদর্শন ছিল। সেই সময়টাতে মূলত ইতালি চিত্রকলা, আবিষ্কার, নতুনত্ব এবং উদ্ভাবনের দিক থেকে উৎকর্ষতায় পৌছে গিয়েছিল। আর এই কারণেই আমরা একে ইতালিয় রেনেসাঁর যুগ বলে অভিহিত করি।

সেই সাথে বই অধ্যয়নের কাজটি নতুন করে জনপ্রিয়তা পায়। এর আগে ইউরোপে যে ডার্ক যুগ ছিল সে সময়ে শুধু পাদ্রিরা ছাড়া আর কেউ পড়তে পারত না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আর পাদ্রিরাও বাইবেল ছাড়া আর তেমন কিছু জানতনা। সেই সময়ে পাদ্রিরা ল্যাটিন ভাষাটি জানত, কারণ তারা এই ভাষাতেই উপাসনা করতেন। আর তারা মনে করতেন, ল্যাটিন হলো ঈশ্বরের ভাষা। তারা এও মনে করত, ল্যাটিন ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় উপাসনা করলে ঈশ্বর তা বুঝতে পারবেন না। তাই তারা অনেক আগে পৌত্তলিকদের লেখা ল্যাটিন ভাষার কিছু বইকে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, যাতে তার আদলে উপাসনা করতে পারেন। এ রকমই একজন পৌত্তলিক লেখক ছিলেন 'সিসেরো' যাকে ডার্ক যুগের পাদ্রিরা অনুসরণ করতেন। তারা সিসেরোর কাছ থেকে কোনো ভাষা শিখতেন না, কেবল তার উপাসনার ঢংটাই শেখার চেষ্টা করতেন। তাদের চেষ্টার কারণেই উপাসনা-অর্চনার ভাষা হিসেবে সেই অবধি ল্যাটিন ভাষাটি টিকে ছিল। আর এই পুরোনো বইগুলো কোনো চার্চে বা উপাসনালয়ের নিচে সুরঙ্গপথে বা গোপন কোনো রুমে সংরক্ষিত ছিল।

এরপরে ১২ শতকে গিয়ে যখন খ্রিষ্টান পণ্ডিতেরা মুসলিম আন্দালুসিয়াতে ভ্রমণ করতে যান তখন তারা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন যে, ল্যাটিন সকল অনুবাদই সেখানে আছে। শুধু তাই নয়, প্লেটো ও এরিস্টেটলের মতো গ্রিক দার্শনিকদের বইগুলোও মুসলমানরা আরবি ভাষায় অনুবাদ করে ফেলেছে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে এই বইগুলোকে টলেডো নামক একটি স্থানে প্রথমে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে বইগুলো গোটা পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আর সুরঙ্গপথ ছেড়ে বইগুলোর জায়গা হয় খ্রিষ্টীয় উপাসনালয়ের গ্রন্থাগারগুলোতে।

আন্দালুসিয়ায় আরবি ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের যে কাজগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোর অনেকগুলোই লিখেছেন ইবনে সিনা (ইউরোপিয়ানদের কাছে তিনি এভিসিনা নামে পরিচিত) এবং ইবনে রুশদ (ইউরোপিয়ানদের কাছে তিনি এভেরস নামে পরিচিত)। তারা মূলত এই বইগুলোতে গ্রিক দর্শনের সাথে ইসলামের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেছেন। খ্রিষ্টানদের এসব নিয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না। তারা মূলত মুসলমানদের কাছ থেকে গ্রিক দর্শন সম্বন্ধে জানার ও বুঝার চেষ্টা করে এবং নিজেরা কীভাবে তা খ্রিষ্টান ধর্মমতের সাথে সমন্বয় করে কাজে লাগাবে তা নিয়ে অনুসন্ধান করে। আর সেই গবেষণা করতে গিয়েই থমাস একুইনাস, ডানস স্কোটাসের মতো খ্রিষ্টান দার্শনিকের জন্ম হয়। এভাবে নিজেদের মতো করে আন্দালুসিয়ার মুসলমানদের থেকে ধার করা জ্ঞানটিকে খ্রিষ্টানেরা কাজে লাগায়। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য মুসলমানদের যে চেষ্টা ছিল তা সচেতনভাবেই পরবর্তী খ্রিষ্টান পণ্ডিতেরা অগ্রাহ্য করেন।

ইউরোপিয়ান পণ্ডিতেরা একসময় খ্রিষ্টীয় চার্চগুলোকে যাতায়াত শুরু করেন, কারণ সেখানকার লাইব্রেরিগুলোতে তারা অনেক বইয়ের সন্ধান পেতেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আর পরবর্তী সময়ে ছাত্ররাও সেই চার্চে যাওয়া শুরু করেন, কারণ সেখানে তারা তাদের শিক্ষকদেরকে পেতেন। শিক্ষকরা সেখানেই ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিত আর সে কারণেই চার্চগুলোকে কেন্দ্র করে একটি পড়াশোনার আবহ তৈরি হয়, যা একসময় ইউরোপের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখে। এ রকমই একটি প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র হলো প্যারিসের নটরডেম ক্যাথেড্রাল। ইতালির নেপলিসেও এ রকম আরেকটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে। এরপরই ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়। যখন সেখানকার পণ্ডিতদের মধ্যে নানা বিষয়ে দ্বিমত দেখা দেয় তখন সেই পণ্ডিতদেরই একটা অংশ অক্সফোর্ড থেকে বের হয়ে ক্যামব্রিজে চলে যায়। সেখানে তাদের মতো করে আরেকটি শিক্ষিত সমাজ তৈরির প্রচেষ্টা শুরু করে।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বা আদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা একসময় বুঝতে পারেন, পড়াশোনা শুরু করার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন হয় তা অনেক ছাত্রেরই নেই। তাই তারা বেশ কিছু কোর্স প্রণয়ন করেন, যার মাধ্যমে ছাত্ররা পড়াশোনা শুরু করার মতো যোগ্যতর হয়ে ওঠবে। সেই কোর্সগুলো চালু করা হয় বক্তৃতা, গ্রামার, যুক্তিবিদ্যার ওপরে। এসব কোর্স এর মাধ্যমে ছাত্রদেরকে শেখানো হতো কীভাবে পড়তে হয়, লিখতে হয় এবং ভাবতে হয়। যেসব ছাত্ররা এই প্রাথমিক কোর্সগুলো ভালোভাবে শেষ করতে পারত, তাদেরকে বলা হতো ব্যাকালুরেট। ল্যাটিন ভাষায় ব্যাকালুরেট মানে হলো সূচনাকারী। অর্থাৎ এই যোগ্যতা হওয়ার পরই তারা জ্ঞানের আসল বিষয়গুলো যেমন ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র কিংবা আইনশাস্ত্র পড়ার সুযোগ পাবে। এই ব্যাকালুরেটকে আজকের সময়ের কোনো লিবারেল আর্টস কলেজ থেকে চার বছরের গ্রাজুয়েশন করে বের হওয়া ছাত্রছাত্রীর সাথে তুলনা করা যায়।

যেহেতু ইউরোপে সম্পদের পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল, তাই অনেকের পক্ষেই তখন পড়াশোনা, গবেষণা, লেখালেখি বা চিত্রকলার মতো কাজগুলোতে দিনের পুরো সময়টি দেয়া সম্ভব হচ্ছিল। আর চিন্তা চেতনায় গ্রিক দর্শনের ছিটেফোটা ফেরত আসায় নব্য শিক্ষিত ইউরোপিয়ানদের মনন ও ভাবনাতেও নানা ধরনের নতুন চিন্তা এসে ভিড় করে। গ্রিক জাতির লোকেরা অবশ্য মানুষকেই সবকিছুর পরিমাপের মূল মানদণ্ড হিসেবে মনে করত। সেই সময়ে গ্রিক পৌত্তলিকেরা দেবতা বলতে অনেকগুলো দেব-দেবীর সম্মেলনকেই বুঝাতো। তাদের ভাষায় এসব দেবতারা সকলেই মানবিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং এসব দেব-দেবী একজন আরেকজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকত। গ্রিকদের সব সময় প্রাকৃতিক জগতের প্রতি আগ্রহ ছিল এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনাবলিকে বিশ্লেষণ করেই তারা প্রকৃতিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করত। এই কারণে যারা গ্রিক বইগুলো

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পড়ত, তারা এই পৃথিবীতে মানব জীবনের রহস্য উন্মোচন করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠত। রোমানদের পতনের পর থেকে মধ্যযুগে যে খ্রিষ্টানবাদের উত্থান হয় তা এই গ্রিক চিন্তাধারাকে পছন্দ করত না। কারণ, সেই চিন্তাধারাগুলো বস্তুজগৎকে শয়তানের আখড়া বলে মনে করে। তারা মনে করে এই পৃথিবীতে আসার এবং থাকার একমাত্র কারণ হচ্ছে পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। নতুন এসব মানবতাবাদী লোকেরা নিজেদেরকে কখনোই খ্রিষ্টানবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে নি। তারা আসলে নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী ছিল। চার্চের কর্মকর্তারা নতুন এই চিন্তাধারাগুলোকে তাদের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে।

সেই সময়ের খ্রিষ্টানবাদটি বিলুপ্তপ্রায় রোমান সাম্রাজ্যের কাঠামোর ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর তারা এমন একটা প্রশাসনিক কাঠামো এবং উত্তরাধিকারের বিধান প্রণয়ন করে, যা রোমান ইতিহাসের সাথে সংগতিপূর্ণ। সাম্রাজ্য কাঠামোর পতনের পরপরই খ্রিষ্টানবাদ সেই জায়গা দখল করে নেয় এবং সভ্যতার একমাত্র ধারক হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাইজেন্টাইন সম্রাট যিনি রাজকীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রধান ছিলেন তিনি আবার খ্রিষ্টান প্রশাসনিক কাঠামোরও প্রধান হিসেবে সামনে চলে আসেন। আগের সাম্রাজ্যের কাঠামোতে যেমন গভর্নররা সম্রাটের অধীনে কাজ করত ঠিক তেমনি নতুন খ্রিষ্টীয় সাম্রাজ্যে বিশপেরা ধর্মগুরুর আওতায় চলে আসেন। সম্রাট প্রায়শই বিশপদেরকে ডেকে কাউন্সিল অধিবেসন করতেন এবং মূলত সেখান থেকেই খ্রিষ্টান ধর্ম দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ প্রণীত হয়। নির্দিষ্ট বিরতি পর পর এই কাউন্সিল বৈঠক হতো, যেখানে তারা ধর্মীয় ধারাগুলো প্রণয়ন করতেন বা পুরোনো গুলো পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় আপডেট করতেন। আর সব ব্যাপারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতেন সম্রাট নিজেই, যিনি একই সঙ্গে ধর্মগুরুর দায়িত্বও পালন করতেন।

খ্রিষ্টানবাদ এবং রোম এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল যে, যখন সাম্রাজ্যটি বিভক্ত হয়ে যায় তখন তার প্রভাবে চার্চরাও বিভাজিত হয়ে পড়ে। পূর্বের দিকে সম্রাটরাই চার্চের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন কিন্তু পশ্চিমে আর সম্রাট পদবিটির কোনো অস্তিত্ব থাকে না। সেখানে ভূখণ্ডগুলো অনেকগুলো ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে যা ভূমির মালিকেরাই পরিচালনা করত। আর সেই কারণেই পশ্চিম ইউরোপে চার্চগুলো সাংস্কৃতিক সংহতির একমাত্র নিয়ামক হিসেবে টিকে যায়। যদিও এই অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বসবাস করত, আর তাদের সার্বভৌমত্বের বিষয়টিও আলাদা ছিল তথাপি এই চার্চগুলোর সুবাদেই তখনো এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে বেড়াতে যেত। এই চার্চগুলোকে বিভিন্ন ধরনের জাতিগোষ্ঠীর কাছেও একই রকম গ্রহনযোগ্য ও সার্বজনীন রাখার অভিপ্রায়েই চার্চের প্রশাসন ধর্মদ্রোহীতাকে তাদের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে এবং ধর্মদ্রোহীতাকে রোখার জন্য নানা ধরনের কার্যকৌশলও প্রণয়ন করে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ক্রুসেডের সমসাময়িক যুগে, পশ্চিম ইউরোপের চার্চ কর্মকর্তারা প্রায়ই ধর্মদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করত। যারাই প্রকাশ্যে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কথা বলতো তাদেরকেই তারা শুলে চড়িয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করত।

যেহেতু চার্চগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব খাটানো শুরু করে তাই রোমের বিশপও ক্রমাগতভাবে পশ্চিম ইউরোপের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যান। জনগণ একসময় তাকে পোপ বলে ডাকতে শুরু করে কারণ, তারা তাকে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের পিতা (পাপা থেকে পোপ) হিসেবে এরই মাঝে বিবেচনা করতেও শুরু করে দিয়েছিল। অন্যদিকে পূর্বের দিকে কন্সট্যানটিপোলের প্যাটরিয়ার্চ মূল ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। যদিও সেখানে আরও অনেক প্যাটরিয়ার্চ ছিলেন কিন্তু কন্সট্যানটিপোলের প্যাটরিয়ার্চ শীর্ষ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। পশ্চিমে পোপ অন্য সব বিশপের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ধারণ করতেন। ক্রুসেডের সময়ে ক্যাথোলিকরাও সেভাবে প্রচার করে, পোপ হলে অব্যর্থ ও অভ্রান্ত একজন ব্যক্তিত্ব।

এরই মধ্যে চার্চ প্রায় প্রতিটি লোকালয়ে পৌঁছে যায়। প্রতিটি গ্রাম, নগর, শহরে চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে পাদ্রিরা কাজ করতে শুরু করেন। যত দূরেই সেই লোকালয় বা চার্চ হোক না কেন, সেখানে রোমান চার্চের মতো একই ঢংয়ে একই ভাষায় প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হতো। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়গুলোতে চার্চ প্রশাসক ও পাদ্রিদের চেইন অব কমান্ড বিষয়টা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খুবই শক্তিশালী ভাবে। সাধারণ যেকোনো পাদ্রি জবাবদিহি করতেন তার উপরের বিশপের কাছে। বিশপেরা জবাবদিহি করতেন আর্চবিশপের কাছে। আর্চবিশপ জবাবদিহি করতেন কার্ডিনালের কাছে আর কার্ডিনাল করতেন পোপের কাছে।

কিন্তু ক্রুসেড ব্যর্থ হওয়ার পর এই পুরো চেইন অব কমান্ডটি ভেঙে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে সংস্কারপন্থীর জন্ম হয়, যারা চার্চের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে এসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন উইকলিফ সমস্ত চার্চ কর্মকর্তাদের হৃদয়কে ভেঙে দিয়ে খ্রিষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন। অথচ ইংরেজি ভাষাটি চার্চ প্রশাসকদের চোখে অশ্লীল ভাষা হিসেবে বরাবরই চিহ্নিত ছিল। তাই এই ভাষায় বাইবেলের অনুবাদটিকে কোনো মতেই মানতে পারেননি। কিন্তু কেন বাইবেলকে ইংরেজিতে নিয়ে আসা হলো। জন উইকলিফের মতে তিনি এই কাজটি করেছিলেন, যাতে সাধারণ মানুষেরাও বাইবেল পড়ার এবং বুঝার সুযোগ পায়। চার্চ কর্মকর্তারা অবশ্য কোনোভাবেই বুঝতে পারছিলেন না, যেখানে সাধারণ মানুষদের কাছে বাইবেলকে ব্যাখ্যা করার জন্য অসংখ্য পাদ্রি নিয়োজিত আছেন, সেখানে এই মানুষগুলোর আবার আলাদা করে বাইবেলকে বুঝার দরকারটা কী!

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উইকলিফ অবশ্য এতটুকু করেই থেমে থাকেননি। তার প্রচারনায় ধীরে ধীরে নতুন দাবি সংযোজিত হতে থাকে। তার দাবি ছিল, পাদ্রিদেরকে দরিদ্র হওয়া উচিত। আর চার্চগুলোর নিয়ন্ত্রণে যে বিশাল পরিমাণ জমি দখলে আছে, সেগুলো উদ্ধার করে জমিগুলোর একটি নিরপেক্ষ ও উৎপাদনমুখী ব্যবহার হওয়া উচিত। তার এই দাবি চার্চগুলোকে মারাত্মকভাবে আহত করে। উইকলিফের পক্ষে বেশ কিছু শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান রাজনৈতিক মহল ছিলেন, তাই তিনি তার জীবন পার করে স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর চার দশক পরে একজন পোপ মাটি খুড়ে তার কংকাল বের করেন এবং কঙ্কালটাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে নদীতে ভাসিয়ে দেন। ফলে বুঝাই যায় যে, গোটা বিষয়টা নিয়ে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তা মোটেও প্রশমন হয়নি।

উত্তেজনাটি প্রশমিত না হওয়ার একটা কারণ হল, উইকলিফের মৃত্যু হলেও তার সংস্কারমূলক চিন্তাভাবনার কোনো মৃত্যু হয়নি। বরং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও একই দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। তাদেরই একজন ছিলেন, জোহান হাস। তিনি ছিলেন ভবঘুরে ঘরানার একজন যাজক। তিনি বলতেন, প্রতিটি মানুষের তার নিজের ভাষায় বাইবেল পড়ার অধিকার রয়েছে। তিনি একটি বিরাট অনুবাদ প্রকল্পেও হাত দেন। চার্চগুলোর প্রথা অনুসরণকারী কর্মকর্তারা তার সাথে কথা বলেন। তাকে বুঝান যে, তিনি ভুলের মধ্যে আছেন এবং তার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করারও হুমকি প্রদান করেন। হাস এতে দমে না গিয়ে বরং সেই যাজকদেরকে বাইবেলের বিভিন্ন শ্লোক শুনিয়ে তার যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। হাস আরও দাবি করেন, চার্চ কাউন্সিলরা বাইবেলকে ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহার করছে। এই কথাটি সেই কট্টরপন্থী যাজকেরা কোনোভাবেই মানতে পারেনি। তাই তারা হাসকে গ্রেফতার করে এবং শুলে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। একই সঙ্গে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বাইবেলের যে কয়টি অনুবাদ করেছিলেন, তাও পুড়িয়ে দেয়া হয়। এই ছিল আদি যুগের খ্রিষ্টান ধর্ম সংস্কারকদের পরিণতি।

সংস্কারকদেরকে হত্যা করে এরপরও সংস্কারের চেতনাকে হত্যা করা যায়নি। উইকলিফ বা হাসের চিন্তাধারাগুলো পরবর্তী সময়ে আরও অনেকেই লিখতে শুরু করে যা কালানুক্রমে সাধারণ খ্রিষ্টানদের কাছেও পৌছে যায়।

একথা ঠিক যে, খ্রিষ্ট ধর্মের আমলাতান্ত্রিকতা চার্চগুলোকে শক্তিশালী অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। সেইসাথে গোটা ইউরোপ একটি একক সাংস্কৃতিক আবহে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এটাও ঠিক যে, ধর্মের আমলাতান্ত্রিকতা অসংখ্য মানুষকে স্বস্তি দিতেও ব্যর্থ হয়েছিল। ইউরোপের খ্রিষ্টানবাদের অকার্যকর হয়ে পড়ার বিষয়টি, প্রথম সামনে নিয়ে আসেন জার্মানির ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ মারটিন লুথার।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তিনি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপক ছিলেন। লুথার কোনো এক অন্যায় করার কারণে প্রকৃত পরিমাণ পাপবোধে ভুগছিলেন। কি অন্যায় করেছিলেন তিনি, তা মুখ্য নয়। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে তিনি ভাবতেন যে, তিনি এতটাই পাপীষ্ঠ যে নরকে যাওয়া ছাড়া তার আর বাঁচার কোনো উপায় নেই। খ্রিষ্টান ধর্মানুসারে পবিত্র পানি দিয়ে গোসল করলে তার সব পাপ ধুয়ে যাওয়ার কথা। তিনি তাও করলেন। কিন্তু তারপরও তিনি পাপবোধ থেকে মুক্তি পেলেন না। তিনি সকল চেষ্টাই করলেন। উপবাস করলেন, নিজেকে বেত্রাঘাত করে কষ্ট দিলেন, প্রতিদিন প্রার্থনায় অংশ নিলেন, অসংখ্যবার প্রায়শ্চিত্ত করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। যখন গির্জার যাজকেরা তাকে পবিত্র হিসেবে ঘোষণা করলেন লুথার সেই যাজকের কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি তার অন্তরের দিক থেকে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি অনুভব করছিলেন, তিনি এখনও বিশুদ্ধ হতে পারেননি। তিনি এটা অনুভব করছিলেন, কারণ পাপ বোধ তখনো তাকে আগের মতোই গ্রাস করেছিল।

তখনই একটি নতুন ভাবনা লুথারকে পেয়ে বসল। তিনি বুঝতে পারলেন তার মুক্তি কখনোই হবে না যতক্ষণ না তিনি নিজে বিশ্বাস করতে পারছেন, তিনি পাপমুক্ত হয়েছেন। যদি তার এই বিশ্বাসটি না আসে বা বিশ্বাসে কোনো কমতি থাকে, তাহলে যাজকেরা কি বললো বা তাকে কতবার পবিত্র বলে ঘোষণা দিল, তাতে তার কিছুই যায় আসে না। আর তিনি যদি বিশ্বাস করতে শুরু করেন, তিনি এখন পবিত্র! তাহলে যাজকেরা তাকে হাজারবার অপবিত্র বললেও তার কিছু আসে যায় না। তাহলে বিরাট একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জাগে, আর তা হলো যাজকদের প্রয়োজনটাইবা আসলে কী?

এই ভাবনা ক্রমশ আরও বিকশিত হলো। লুথার বুঝতে পারছিলেন, আত্মমুক্তি মাস শেষে বেতন পাওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। এটা হলো একটি উপহার। যা কেবল গ্রহণ করা যায়, অনুভব করা যায় আর তা করা সম্ভব নিরেট বিশ্বাস থেকে। এটা পুরোটাই আভ্যন্তরীণ হিসেব নিকেশ; মানসিকভাবে উপলব্ধি করতে হয়। বাইরের থেকে কিছু লোক দেখানো কাজ কর্ম করে সেই প্রাপ্তি অর্জন করা সম্ভব নয়।

এই অনুভূতিটি অর্জনের পর লুথার দেখলেন, তিনি মানসিক প্রশান্তি পাওয়ার যে প্রক্রিয়াটি উন্মোচন করলেন খ্রিষ্টান ধর্মযাজকেরা তার পুরো উল্টোটাই করছে। তারা তাদের ধর্মীয় আমলাতান্ত্রিকতাকে জারি রাখার জন্য কিছু কাজ আবিষ্কার করেছে এবং বলছে এর মাধ্যমেই মানুষেরা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে। আর এসব কাজের অনেকটাই অর্থের সাথে সম্পৃক্ত, ফলে সেই সুযোগে চার্চ এবং যাজকেরা অর্থশালী হয়ে ওঠছে। তিনি দেখলেন যাজকদের চেইন অব কমান্ড যা উপরে যেতে যেতে একেবারে রোমের চার্চ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, এদের সবাই একই ধরনের সমস্যার মধ্যেই ডুবে আছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

চার্চরা সেই সময়ে পাপ মোচনের মধ্যে যেসব প্রক্রিয়ার কথা বলতো, তার মধ্যে যেটি লুথারকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিল অর্থের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি পদ্ধতি বিষয়টি। এই প্রক্রিয়াটি এমন যে, চার্চরা দাবি করত যে তারা মানুষের পাপ মওকুফ করতে সক্ষম। কিন্তু এই জন্য তাদেরকে টাকা পয়সা বা মূল্যবান কোনো কিছু চার্চ এ প্রদান করতে হবে। এই চর্চাটি আসলে শুরু হয়েছিল ক্রুসেডের সময় থেকে। সেই সময়ে পোপ প্রচার করেছিলেন, যারা তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে তারা সকলে স্বর্গে যাবে। অর্থাৎ নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে ধর্মকে ব্যবহার করার যে কৌশল তা শুরু হয় তখনই। ক্রুসেড যখন শেষ হয়ে গেল, তখন গির্জাগুলো সরাসরি অর্থের বিনিময়ে পাপ মুক্তির ব্যবসা শুরু করল। আর সেখান থেকেই গোটা চার্চ প্রশাসন এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত আমলাতন্ত্রে দুর্নীতি প্রবেশ করল। আর লুথারের সময়ে এসে বিষয়টি এমন হয়ে যায় যে, পাপী ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে প্রায়শ্চিত্ত করে টাকা পয়সার বিনিময়ে তাদের স্বর্গে যাওয়ার নিশ্চয়তা কিনে নিতে পারত।

টাকার বিনিময়ে স্বর্গে যাওয়ার কৌশলটি নিঃসন্দেহে কুটকৌশল। আর লুথার মনে করতেন, পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার গোটা বিষয়টা যেহেতু মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান, তাই এখানে যাজকেরা একেবারে অন্যায়ভাবে টাকা পয়সা নিচ্ছেন। তারা মূলত ঈশ্বরকে ঘুষ দেয়ার নামে নিজেদের পকেট ভারি করছেন। তারা মধ্যস্বত্বভোগী সেজে ঈশ্বর আর মানুষের মাঝখানে একটি দরজার পাহারাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন! অথচ সেই দরজাটি খোলার বা বন্ধ করা- কোনোটিরই ক্ষমতা তাদের নেই। লুথারের কাছে তাই এই টাকা নেয়ার বিষয়টি শুধু দুর্নীতি ছিল না, বরং তিনি এটিকে চুরি এবং প্রতারণা মনে করতেন।

১৫১৭ সালের হ্যালোয়েন রজনীতে লুথার একটি ঐতিহাসিক কাজ করেন। তিনি উইটেনবার্গের একটি গির্জার দরজায় চার্চ প্রশাসনের দুর্নীতিকে ফাঁস করে তাদের বিরুদ্ধে ৯৫টি অভিযোগ সম্বলিত কিছু পোস্টার লাগান। লুথারের এই কাজটিতে রাতারাতি মারাত্মক প্রক্রিয়া হয়। আর এখান থেকেই প্রোটেস্ট্যান্ট নামক খ্রিষ্টান ধর্ম সংস্কার আন্দোলনটি শুরু হয়।

প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারটি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিল না। লুথার ধর্মীয় সংস্কারের এই পথটি উন্মোচন করার পর খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই চেতনাটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই নানা নামে একই আন্দোলন শুরু করল এবং নানা ধরনের ধর্মীয় ধারার সৃষ্টি হলো। প্রতিটি ধারারই তাদের মতো করে কিছু আদর্শিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে মোটামুটি চারটি বৈশিষ্ট্য খুব কমন ছিল। যথাঃ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

- আত্মমুক্তির বিষয়টি দৃশ্যমান হতে হবে। যিনি পাপ থেকে মুক্তি পাবেন তার অভিজ্ঞতাটি এমন হতে হবে যেন, তিনি এইমাত্র এবং এই স্থানেই আত্মমুক্তি ও প্রশান্তি লাভ করলেন।
- আত্মমুক্তির এই বিষয়টা হতে হবে কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়ায় কোনো লেনদেন থাকবেনা।
- স্রষ্টার সাথে মানুষের যে সম্পর্ক তার মাঝে অন্য কোনো লোকের কোনো প্রয়োজন নেই।
- মানুষের ধর্ম সম্পর্কে যা জানা প্রয়োজন তার সবই সে বাইবেল থেকেই পাবে। বাইবেল বুঝার জন্য তাদের ল্যাটিন ভাষা জানার কোনো দরকার নেই কিংবা চার্চ কাউন্সিলের মতামতের কোনো প্রয়োজন নেই বা কোনো পাদ্রি বা খ্রিষ্টীয় পণ্ডিতের কাছেও যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

কারও কারও মনে হতে পারে, খ্রিষ্টান ধর্মের প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারটি এমন একটি শূন্যতা ও অপ্রাপ্তি থেকে এসেছিল, যেটি কিনা ইতঃপূর্বে ইসলাম ধর্মে সুফিবাদের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাসে যেমন একজন গাজ্জালি এসে ইসলামের মূলধারার সাথে সুফিবাদের একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, পশ্চিমে খ্রিষ্টানদের মধ্যে তেমন কেউ আসেনি। আর সেই কারণেই পশ্চিমের খ্রিষ্টান ধর্মটি বিভক্তই হয়ে যায়।

আবার অন্যদিক থেকে দেখলে, প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের সাথে ইবনে হাম্বল বা ইবনে তাইমিয়ার সুফিবাদ বিরোধী আন্দোলনেরও কিছু সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। কারণ, এই দুই মুসলিম সাধকের মতো প্রোটেস্ট্যান্টরাও পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্ট ধর্মে যা সংযুক্ত হয়েছিল তাকে অবৈধ ঘোষণা করার চেষ্টা চালায়। তারাও খ্রিষ্টধর্মকে তার আসল উৎস অর্থাৎ বাইবেলের কাছেই ফিরে যাওয়ার কথা বলে।

কিন্তু এ রকম খুচরো হিসেব না করে যদি সামগ্রিকভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনটিকে বিবেচনা করা হয়, তাহলে বলতে হয় এ রকম কোনো ঘটনা আসলে ইসলামের ইতিহাসে ঘটেনি। প্রোটেস্ট্যান্টরা চার্চ ও পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু ইসলামে এ রকম কোনো চার্চ বা পোপেরই অস্তিত্ব নেই। পশ্চিমে যারা ক্যাথোলিক চার্চগুলোর বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন তারা নতুন করে অন্য কোনো চার্চ বা গির্জা বা ধর্মীয় বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সেই আন্দোলন করেননি। তারা মূলত ব্যক্তির ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তাদের সেই চাওয়া আসলে খ্রিষ্টানবাদের মূল দর্শন থেকে খুব একটা ভিন্ন কিছু ছিল না। কারণ, খ্রিষ্টানবাদও ব্যক্তিকে নিয়েই কথা বলে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিশেষ করে খ্রিষ্টান ধর্মও প্রতিটি মানুষের মুক্তিরই কথা বলে। কিন্তু ইসলামে এই ধরনের ব্যক্তি কেন্দ্রিক কোনো দর্শন নয়। ইসলাম সমসময় উম্মাহর পথ চলার বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের কথা বলে। সেই চেতনাকে বাদ দিয়ে কেউ যদি ইসলামের অধীনে থেকে ব্যক্তির একক ক্ষমতায়নের কথা বলে, তাহলে তা নিঃসন্দেহে ইসলামের মূল ভাবনা দর্শনের বিরোধী।

যাহোক, ব্যক্তির ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রোটেস্ট্যান্টরা যে আন্দোলন করে তা শেষমেশ এমন কিছু পরিণতি ডেকে নিয়ে আসে, যা ধর্মের নির্দিষ্ট গন্ডির ভেতরে আর আটকে রাখা যায়নি। প্রাথমিকভাবে প্রোটেস্ট্যান্টরা কিছু কিছু চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বললেও, একসময় বিষয়টা এমন হয়ে যায়, তারা যেন সকল চার্চেরই বিরোধী। একথা ঠিক যে, ১৬শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রোটেস্ট্যান্টরা মূলত ধর্মীয় বিভিন্ন অসংগতি নিয়েই কথা বলেছিল। আবার এটাও ঠিক যে, একজন মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্কটা কিরূপে থাকতে পারে তা নিয়েও নানা জনের নানা ধরনের সীমিত ধারণা থাকে। কারও আন্তরিক বিশ্বাস বা উদ্দেশ্য নিয়ে আরেকজন কখনোই সন্দেহাতীতভাবে কোনো মন্তব্য করতে পারেন না।

সম্ভবত মূল ধর্ম বিশ্বাসের যে নির্দিষ্ট কাঠামো তার বাইরে গিয়ে ভাবার কথা কোনো প্রোটেস্ট্যানই বলেনি। আর ব্যক্তি কীভাবে স্রষ্টার সাথে বোঝাপড়া করে তার পাপমোচন করবে সেটা নিয়েও প্রোটেস্ট্যান্টদের কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য ছিল না। প্রোটেস্ট্যান্টরা চাচ্ছিল, কারও মাধ্যমে না গিয়ে ব্যক্তি নিজেই স্রষ্টার সাথে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

মূলত এই ধরনের সংস্কারমুখী চিন্তা চেতনার জাগরনের প্রেক্ষাপটে ইউরোপিয়ানরা প্রাচীন গ্রিক চেতনাগুলোকে আবারও নতুন করে আবিষ্কার করতে শুরু করে। ফলে আবারও সেই ল্যাটিন ভাষায় লেখা পুরোনো ধর্মগ্রন্থগুলো বা অনেক আগে লেখা আরব দার্শনিকদের লেখাগুলোকে তারা আবারও পর্যালোচনা করতে শুরু করে। যেহেতু ব্যক্তির পাপ মোচনের দায়টি তার উপরেই পড়ে যায়, ফলে মানুষ আর ভিন্ন কোনো মানুষের কাছ থেকে সাহায্য না নিয়ে বরং প্রকৃতির কাছেই ফিরে যায় এবং প্রাকৃতিক নানা ঘটনাবলির মধ্যেই স্রষ্টাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে।

কিন্তু প্রকৃতির কাছে গেলেই কি সব উত্তর পাওয়া যায়? গির্জাগুলো তখনো বেশ শক্তিশালী অবস্থায়ই ছিল। তাই যখনই কেউ প্রকৃতির রেফারেন্সে নতুন কোনো চিন্তা আবিষ্কার করত তখনই এই প্রশ্নটি জাগতো যে এটা কীভাবে মূল ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সংগতিপূর্ণ? ধরা যাক কারও মাথায় চিন্তা আসলো, আমরা চারপাশে যা দেখি তা ওপর থেকে নিচে পড়ে কিন্তু নিচ থেকে কেন

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উপরে যায় না? এই ব্যপারে ব্যক্তি যেই মতামতটি দিত সেখানে গির্জাপন্থীরা এই প্রশ্নটি তুলতো যে, নতুন এই চিন্তাটি কীভাবে আমাদেরকে আরও ভালো খ্রিষ্টান হতে সাহায্য করবে?

এই টানাপোড়েন তখন সবক্ষেত্রেই ছিল। কোপারনিকাস প্রথম বলেন, পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘুরে। তখন এই প্রশ্নটি চলে আসে, ঈশ্বর তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানবজাতিকে যে পৃথিবীতে পাঠালেন সেই পৃথিবী কেন এভাবে ঘুরছে? এসব প্রশ্নের উত্তর আসলে দেয়া সহজ হয়, যদি ধর্মীয় ব্যাখ্যার গণ্ডির বাইরে গিয়ে ভাবা যায়।

অনেক চিন্তাশীলরাই মনে করেন, ধর্মের গন্ডির বাইরে গিয়ে একটা ব্যাখ্যা দেয়া মানেই ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং এই ধরনের চিন্তাশীলরা দাবি করেন, ধর্মবিশ্বাস হলো একটি বিষয় আর প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা হলো আরেকটি বিষয়। এই দুটো বিষয়কে এক করাকে এই চিন্তাশীল শ্রেণিটি সঠিক মনে করেন না। আর ধর্মের বাইরে গিয়ে এভাবে চিন্তা করার সুযোগটি ইউরোপিয়ানদেরকে নানা ধরনের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ তৈরি করে দেয়। তাই প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার হওয়ার পরবর্তী দুইশ বছর ইউরোপিয়ানরা বিশ্বকে নতুন চিন্তা ও ভাবনা দিতেও সক্ষম হয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ফ্রান্সিস বেকন ও রেনে দেসকার্তের কথা। তারা যেকোনো বিষয়ে তদন্ত ও ব্যাখ্যা দেয়ার এরিস্টোটলীয় পদ্ধতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়ার প্রচলন শুরু করেন। তারা এবং তাদের সমসাময়িক আরও কিছু ব্যক্তি মিলে বিশ্বজগতের একটি বাস্তবিক ধারণা (মডেল) প্রতিষ্ঠা করতেও সহায়তা করেন। এর আগে এ্যারিস্টোটল বলেছিলেন পৃথিবী মূলত সৃষ্টি হয়েছে বায়ু, পানি এবং আগুন দিয়ে। গ্যালিলিও ও দেসকার্তে মিলে সেই ধারণাকে বদলে দিয়ে পারমানবিক তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন। আর এই পারমানবিক তত্ত্বই আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি।

অন্যদিকে, মানুষের শারীরিক গঠন সম্বন্ধে প্রথম পরিপূর্ণ ধারণা দেন, আন্দ্রেয়াস ভেসালিয়াস। আর উইলিয়াম হার্ভে মানুষের শরীরের ভেতরে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেন। তারা দুজন এবং আরও কিছু ব্যক্তি মিলে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তি প্রস্তুত করেন। অন্যদিকে মাইক্রোঅর্গানিজম আবিষ্কার করেন এন্টোনিও ভ্যান লিউওয়েনহুক। আর এটাকে ভিত্তি করেই বিখ্যাত পাস্তুরের জীবাণু তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হয়।

থার্মোডায়নামিক্সের যেই চারটি আইন বা নিয়ম আমরা পেয়েছি তার সূচনা করে গিয়েছেন রবার্ট বোয়েল। উল্লেখ্য এই চারটি সূত্রকে কাজে লাগিয়েই যেকোনো শক্তির আঁধার থেকে শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আমাদের অবশ্যই স্মরন করতে হবে, সব বৈজ্ঞানিকের অন্যতম সেরা বৈজ্ঞানিক আইজাক নিউটনকে। তিনি ক্যালকুলাসের বিভিন্ন সূত্র আবিষ্কার করেছেন, ক্ষুদ্র বালুকনা থেকে শুরু করে ঘুর্ণায়মান গ্রহ পর্যন্ত সকল বস্তুর গতিবিদ্যার ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন, মাধ্যকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছেন এবং কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও প্রদত্ত ভাবনাগুলোকে আরও পরিণত করেছেন। তিনি আলোকছটা ও বর্ণালী রশ্মিকেও ব্যাখ্যা করে গেছেন। নিউটনের মতো এত বেশি বিষয় আর কোনো বিজ্ঞানী আবিষ্কার করতে পারেননি। আর তাই ইতিহাসে নিউটন অন্য সবার থেকে সব সময় একটু আলাদা উচ্চতায় থেকেছেন।

কিন্তু এখানে আসলে আরেকটা প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে চলে আসে। খ্রিষ্টান বিজ্ঞানীরা যেসব জিনিস আবিষ্কার করেছেন, তার অনেক কিছুই আরও বহু শতাব্দী আগেই মুসলিম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মানুষের শরীর যে চারটি হরমোনের সমন্বয়- গ্যালেনের এই তত্ত্বটি ১০ শতাব্দীতেই আল রাজি প্রত্যাখ্যান করে গেছেন। একাদশ শতাব্দীতে ইবনে সিনা গাণিতিকভাবে বস্তুর গতিবিদ্যা সম্পর্কে ধারণা দিয়ে গেছেন- যা ৬শ বছর পরে নিউটন আবিষ্কার করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ভেসালিয়াস আবিষ্কার করার প্রায় ৩শ বছর আগে ইবনে আল নাফিস মানুষের শরীরের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করেন। আলোর বিভিন্ন রং ও আলোকছটার বিষয়টি ইবনে আল হায়তাম আবিষ্কার করে গেছেন যিনি ১০৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। একই সঙ্গে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, তদন্ত ও পরীক্ষণের প্রক্রিয়াটিও বলে গেছেন যা অনেক পরে আবিষ্কার হওয়া নিউটন ও দেসকার্তের সাথে অনেকটাই মিলে যায়। মুসলমানরা অনেক আগেই পারমানবিক তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছেন, যার সূত্রটি তারা নিয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে। আর সৌরজগতের যেই মডেলটি খ্রিষ্টানেরা পরবর্তীকালে আবিষ্কার করে, সেটাও মুসলমানরা বলে গেছেন বহু আগেই। মুসলমানরা অবশ্য সেই ধারণাটি নিয়েছে, চাইনিজদের কাছ থেকে।

প্রকৃত সত্য হলো, এসব বিষয়ের সবই যে পশ্চিমারা আবিষ্কার করেছে তা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই তারা অনেক জায়গাগুলো নিয়ে ধারণা ও তথ্য সংগ্রহ করেছে। তারা সেই তথ্যগুলোকে আরও পরিণত করেছে এবং তখনই মানুষের সামনে সেগুলো প্রকাশ করেছে, যখন তারা সবগুলো তথ্যকে একসাথে নিয়ে একটি সমন্বিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে এটাকে দাঁড় করাতে পেরেছে। আর এসব তথ্যকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তারা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ব্যাপারগুলো পশ্চিমে হলো কিন্তু প্রাচ্যতে হলো না কেন?

এখন প্রশ্ন হলো, এই ব্যাপারগুলো পশ্চিমে হলো কিন্তু প্রাচ্যতে হলো না কেন? সম্ভবত এর একটা ব্যাখ্যা এ রকম যে, মুসলমানরা যখন তাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো করছিল ঠিক তখনই মুসলিম সাম্রাজ্যের কাঠামোটি ভেঙে পড়ছিল। ফলে সেগুলো আর সংরক্ষণ বা কাজে লাগানো যায়নি। আর খ্রিষ্টানরা তাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো তখনই শুরু করে যখন তাদের দীর্ঘদিনের অকার্যকর সামাজিক কাঠামোটি নতুন করে আবার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। একই সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কারটি হওয়ার কারণে এত দিন ধরে খ্রিষ্টান সমাজের ওপর গির্জাগুলোর যে একচ্ছত্র প্রভাব বিদ্যমান ছিল, তাও ক্রমশ হালকা হয়ে পড়ছিল। সেই সুযোগে মানুষের চিন্তা ও ভাবনার পথটি খুলে যাচ্ছিল আর ব্যক্তি তার ক্ষমতায়নের সুযোগ নিয়ে খোলা মনে ভাবার অবকাশ পায়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর ধর্মীয় সংস্কারটি একই সময়ে হওয়ায় ইউরোপিয়ানরা তাদের অর্জনগুলোকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর সুযোগ পায়।

এভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনটির কারণেই ইউরোপ অগ্রসর হয়ে যায়। কিন্তু এই ধর্মসংস্কারের পাশাপাশি সেই সময়ে আরেকটি বড় ঘটনাও ঘটেছিল। তা হলো, ঐ একই সময়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউরোপে জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই দুটি ঘটনা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কারণ, লুথার ও তার সঙ্গীরা- যারা গির্জাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন তারা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে ইউরোপের বিভিন্ন সম্রাটের অধীনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এসব সম্রাটেরাও দীর্ঘদিন ধরে পোপের সাথে নানা ধরনের মতবিরোধে লিপ্ত ছিলেন। তাই তারাও রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মনিরপেক্ষ একটি কাঠামোর পক্ষে অবস্থান নেন। এই ধর্মসংস্কারকে কেন্দ্র করে গোটা ইউরোপে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। এই সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৫৫৫ সালে, পিস অব আগসবার্গ নামক একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। বিবাদে লিপ্ত সকল পক্ষ তখন একটি ঐতিহাসিক চুক্তি করেন যেখানে বলা হয়, প্রতিটি রাজ্যের রাজা বা সম্রাটরাই একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পক্ষ যারা নির্ধারণ করবেন, তার রাজ্য রোমান চার্চের সাথে থাকবে নাকি খ্রিষ্টধর্মের নতুন সৃষ্ট ধারার সাথে থাকবে। আগসবার্গ ছিল অনেকটা সাময়িক যুদ্ধবিরতির মতো। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা অকার্যকর হয়ে যায়। ফলে ইউরোপ আবার একটি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে যা প্রায় ৩০ বছর স্থায়ী হয়। এই দীর্ঘ যুদ্ধটি অবশেষে শেষ হয় আরেক দফা চুক্তির মাধ্যমে যা সাক্ষরিত হয় ওয়েস্টফালিয়াতে, ১৬৪৮ সালে। নয়া এই চুক্তিতে আবারও পূর্ব স্বাক্ষরিত আগসবার্গ চুক্তিটি নিশ্চিত করা হয়। ফলে সব কিছুর পরে বলা যায় যে, সংস্কার আন্দোলনটি ইউরোপে যেমন ব্যক্তির ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করেছিল ঠিক একইভাবে একক ইউরোপের ধারণাটিকেও বিলুপ্ত করে দেয়। আর তারপর থেকেই চার্চ ও রাষ্ট্র উভয়েই আলাদা আলাদা পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের মতো করে শক্তিশালী হতে থাকে এবং উভয়ে মিলেই জাতীয়তাবাদের চেতনাকে মজবুত করতে থাকে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোর বীজ প্রথমে বোনা হয় ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে- কারণ, এই দুই দেশের সম্রাটেরা ১৩৩৭ সাল থেকে শুরু করে ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। পুরোটা সময় জুড়েই একটানা যুদ্ধ চলেছে তা নয়, তবে পুরো সময়টা জুড়েই শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে। এই যুদ্ধের আগে কাঠামোগতভাবে ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স বলতে কোনো কিছুই ছিল না। এগুলো ছিল এমন ভূখণ্ড যা কিনা কতগুলো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরিচালনা করত। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আবার একে অন্যের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। আর রাজ্য বলতে এমন অনেকগুলো ভূখণ্ডের সমাহারকে বুঝাত। আর সম্রাট বা রাজার দায়িত্ব ছিল কর আদায় করা এবং সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করা। এসব সম্রাট বা রাজারা একে অন্যের সাথে এমনভাবে যুদ্ধ করতেন, যেভাবে এখনকার সময়ের বাচ্চারা খেলনা নিয়ে খেলে। একই রাজার অধীনে অনেকগুলো ভূখণ্ড থাকত ঠিকই কিন্তু এসব ভূখণ্ডের বাসিন্দারা কখনোই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধটি অনুভব করত না।

তবে প্রায় ১০০ বছর ধরে যখন এই দুই জাতিরাষ্ট্র যুদ্ধ করল, তারপর তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এক ধরনের অনুভূতি তৈরি হলো। এর আগে সম্পর্ক না হওয়ার একটি বড় কারণ ছিল, ফ্রান্সের মানুষেরা কথা বলত ফরাসি ভাষায় আর ইংল্যান্ডের মানুষেরা কথা বলত ইংরেজি ভাষায়। ভৌগোলিকভাবে তারা যতই দূরে অবস্থান করুক না কেন, ফ্রান্সের লোকেরা সেই মানুষগুলোর সাথেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত যারা তাদের ভাষায় কথা বলত। অন্যদিকে, ইংরেজ সৈন্যরা যারা ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তাদের মধ্যেও একটা সময় পর ভ্রাতৃত্ববোধের জন্ম হয়, যা পরবর্তীকালে ইংরেজ নামক একটি পৃথক জাতির জন্ম দেয়।

শতবর্ষ মেয়াদী যুদ্ধটি মূলত হয়েছিল ক্ষমতাবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আর নাইটদের মধ্যে। এই যুদ্ধ চলাকালীন ইংরেজরা লম্বা ধনুকটির প্রচলন করে। পূর্বের তুলনায় এই ধনুকটি অনেক বেশি শক্ত এবং এগুলো প্রতিরক্ষা ব্যূহ বেধ করে শরীরে ঢুকে যেত।

যুদ্ধে এই নতুন ধরনের ধনুকের সামনে নাইটেরা মোটামুটি নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। ফলে যুদ্ধের পর তারা বেশ নাজুক অবস্থায় পড়ে। আগে যে সামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্থাগুলো ছিল সেগুলো মূলত ব্যক্তিগত যোগাযোগের নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই তৈরি হতো। কিন্তু সামন্তবাদের পতনের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এরপর যাদের হাতে টাকা ছিল শুধু তারাই যুদ্ধের জন্য সৈন্যদল প্রস্তুত করতে পারত। এই পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে রাজারা রাজ্যের অধিপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়ে যায়। কারণ, রাজাই ছিলেন টাকার বিনিময়ে সেনাদল নির্মাণের একমাত্র কার্যকর ব্যক্তি। রাজারা অবশ্য তাদের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অধীনে থাকা সম্ভ্রান্ত লোকদের মাধ্যমেই টাকা সংগ্রহ করত। একবার ইংল্যান্ডের রাজা এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে ডেকে নতুন ধরনের একটি সামরিক বৈঠক শুরু করেন, যার নাম দেয়া পার্লামেন্ট। ইংরেজ সম্রাটেরা একটা পর্যায়ে জনগণের কর আদায় প্রক্রিয়াকে বৈধতা দেয়ার জন্য এই পার্লামেন্টের ওপরই নির্ভর করতে শুরু করেন। আর সেভাবেই পর্যায়ক্রমে পার্লামেন্ট এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিকশিত হতে শুরু করে।

জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ছোট ছোট ভূখণ্ডগুলো আর এর শাসকেরাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সবার উপরে যিনি শাসক ছিলেন তিনি আসলে সরাসরি কিছুই করতেন না। তিনি মাঝের লোকদেরকে দিয়ে কাজ করাতেন। যখন তিনি কোনো আদেশ দিতেন, তা নিজেদের মতো করে নিচের দিকের ভূখণ্ডের মালিকেরা মানত। পুরো রাজ্যে যেহেতু নানা ভাষার লোক বসবাস করত, তাই রাজা মহাশয়ের আদেশটি নিচের দিকে যেতে যেতে এবং বহু ভাষায় অনূদিত হতে হতে অনেকটাই পাল্টে যেত। কিন্তু জাতিরাষ্ট্রে এ রকম হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এখানে সবাই কম বেশি একই ভাষায় কথা বলে। তা ছাড়া জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোতে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তাদের টিম থাকে, যারা পুরো রাজ্যের সব জায়গায় সব কিছুকে পরিচালনা করতে পারত। আর সেই কারণে জাতিরাষ্ট্রের রাজা কোনো আদেশ দিলে তা মোটামুটি অবিকৃতভাবে সব জায়গায় পৌঁছাত এবং সবাই তা মানার চেষ্টা করত।

এটা বলা বাহুল্য যে, ১৩৫০ বা ১৪০০ সালেই ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স আজকের কাঠামোতে পৌঁছায়নি। তবে যাত্রাটা শুরু হয়েছিল তখনই; উত্তর ইউরোপেও একই ধারা শুরু হয়। জাতিরাষ্ট্রের জন্মের কারণেই একটি একক সরকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচিত হয়, যে সরকার তার অধীনে থাকা সকল মতের, পথের ও সামর্থ্যের লোকদের জন্য কৌশল প্রণয়ন করতে পারে। এমন শাসন ব্যবস্থায়ও মানুষ নিজেদেরকে একটি পদ্ধতির অধীনস্ত দাস হিসেবেই মনে করবে। তবে সরকারের আওতায় তাদের অন্তত একটা সম্মানজনক অবস্থান থাকে যেহেতু এই পদ্ধতিতে তাদেরকে সিটিজেন বা নাগরিক বলা হয় এবং নাগরিকদের জন্য বেশ কিছু সুবিধাদি ও অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

এই দীর্ঘ আলোচনায় এটা প্রমাণ হলো যে, ক্রুসেডের পর ইউরোপিয়ানরা ইন্দিসে যাওয়ার জন্য যে সমুদ্র অভিযাত্রা শুরু করেছিল তা শেষ হয় ইউরোপে জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে, প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের পরিণতিতে 'ব্যক্তি' ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পরিণত হয়। ব্যক্তিবাদের উত্থান ও বিকাশ ঘটে এই সংস্কার আন্দোলনের কারণেই। ঠিক একইভাবে ব্যক্তিবাদ এবং সনাতন ধর্মীয় চেতনার দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানও বিকশিত হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১৪৮৮ সালে পুর্তুগিজ অভিযাত্রী বাথোলোমিউ ডিয়াজ ইউরোপিয়ানদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হন। তিনি আটলান্টিক উপকূল থেকে শুরু করে ভারতীয় মহাসাগরে পৌছান। এরপর অনেকেই তার দেখানো পথ ধরে এই পথে অভিযান পরিচালনা করে। ১৪৯২ সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাস আটলান্টিকের পশ্চিম উপকূল দিয়ে অভিযাত্রায় বের হন এবং দুটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেন। যা তখনো পর্যন্ত ইউরোপিয়ানদের কাছে অজানাই ছিল। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইউরোপিয়ানরা ঘনঘন-ই আমেরিকায় অভিযান পরিচালনা করতে শুরু করে।

যেহেতু কলম্বাসের আমেরিকা অভিযানটির খরচ স্পেন দিয়েছিল, তাই আমেরিকা থেকে প্রথম যে সম্পদের পাহাড়টি আসে তা স্পেনেই যায়। আর স্পেন সেগুলো পেয়ে কিছু সময়ের জন্য ইউরোপের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। স্পেন আমেরিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ নিয়ে এসে, নিজেদের দেশে ইচ্ছেমতো ব্যয় করেছে। ফলে ইউরোপের স্বর্ণবাজার পুরোপুরি ধ্বসে যায়। আর সেই ধ্বসের কারণেই স্পেনের অর্থনীতিও ভগ্নদশায় নিমজ্জিত হয়। তাই আবার কিছুদিনের মাঝেই স্পেন ইউরোপের সবচেয়ে দরিদ্র জাতিতে পরিণত হয়ে যায়।

আমেরিকার স্বর্ণ গোটা ইউরোপের অর্থনীতিকেই প্রভাবিত করে। এই ঘটনাটা যখন ঘটে তখন পশ্চিম ইউরোপে জাতি রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াটি বিকশিত হচ্ছিল। জাতিরাষ্ট্রের ধারণাটি এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল যে একেকটা জাতি যেন, একেকটা একক ব্যক্তির ন্যায় হিসেব নিকেশ করতে শুরু করেছিল। জাতিরাষ্ট্র হওয়ার আগে ইংল্যান্ডের কোনো ব্যক্তির পক্ষে ইংল্যান্ড একসময় ধনী হবে, এমনটা আশা করার কোনো উপায়ই ছিল না। জাতিরাষ্ট্র গঠনের আগে ব্যক্তি নিজেই বড়লোক হতে চাইত। সে বড় জোর তার এলাকায় নিজের অবস্থান বৃদ্ধি করতে চাইত বা নিজ এলাকার জন্য কিছু গড়ার চেষ্টা করত। কিন্তু তখন ইংল্যান্ড নামক কোনো বিষয়ের অস্তিত্বই ছিল না। তাই ইংল্যান্ডের প্রতি দরদ সৃষ্টি হওয়ারও কোনো অবকাশ ছিল না। যখন কোনো এলাকায় একদল মানুষ নিজেদেরকে একটি একক জাতি হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে, তখনই তারা কেবল এমন কোনো কৌশলের কথা ভাবতে পারবে, যা দিয়ে সেই জাতির উন্নয়ন বা মঙ্গল হবে। এমনই একটা কৌশলের নাম মার্কেন্টেলিজম।

মার্কেন্টেলিজম খুবই সহজ একটা কৌশল। এই নীতির মূল কথা হলো একটি জাতির অর্থনীতি সেভাবেই পরিচালিত হবে, যেভাবে একক একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি অনেক বেশি উপার্জন করে কিন্তু অনেক কম খরচ করে, সেই সম্পদশালী হয়। আর ব্যক্তির ক্ষেত্রে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

টাকার সবচেয়ে মূল্যবান চেহারা হলো স্বর্ণ। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি অনেক পরিমাণ স্বর্ণ যোগাড় করতে পারে, তাহলে তার আর কোনো চিন্তা নেই। একইভাবে পশ্চিম ইউরোপের মানুষেরা মনে করেছিল তাদের জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতি নির্ভর করে, কত বেশি স্বর্ন তারা নিয়ে আসতে পারে এবং কত কম তা খরচ করতে পারে তার ওপর। তাই তারা তাদের আশেপাশের বিভিন্ন মহলের কাছে পণ্য বিক্রি করে এবং তার বিনিময়ে স্বর্ণ কিনে আনে। তবে শেষ পর্যন্ত এই ধারণা তাদেরকে মোটেও লাভবান করেনি।

আপনি যদি অনেক পরিমাণ বিক্রয় করতে চান তাহলে আগে আপনাকে অনেক পরিমাণ সম্পদ বানাতে হবে। আর যদি কোনো কিছু না কিনে থাকতে চান তাহলে আপনার ঘরেই সব থাকতে হবে। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব? আপনি যদি শুধু বিক্রি করতে থাকেন কিন্তু বিনিময়ে কিছু না কেনেন, তাহলে ভারসাম্য কীভাবে হবে? কাঁচামাল কোথা থেকে আসবে? আর এভাবেই মার্কেন্টেলিজমের ধারণাটি জাতীয়তাবাদের সাথে মিলে যায়। জাতীয়তাবাদের ধারণাটি আবার ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। আবার প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনটি ব্যক্তিবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত- যা আবার রেনেসাঁর চেতনার মূল ভিত্তি। এর পাশাপাশি ছিল নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের অদম্য নেশা যা শুরু হয়েছিল ক্রুসেডের পরপরই।

ইউরোপে চিন্তাদর্শন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সকল উন্নতি, ১৬০০ সালের দিকে একসাথে শুরু হয়। একই সময়ে ইউরোপিয়ানরা সমুদ্র যাত্রায় ভীষণ পারদর্শীও হয়ে ওঠে। তারা জাতিরাষ্ট্র হিসেবেও বিকশিত হচ্ছিল। তাদের হাতে ছিল আমেরিকা থেকে নিয়ে আসা কাঁচা সোনা। আর প্রচুর পরিমাণ উদ্যোক্তাও সে সময়ে কাজ করছিল, যার কারণে অর্থনৈতিকভাবেও ইউরোপ অগ্রসর অবস্থানে ছিল।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ইউরোপের মতো সব বিবর্তন বা উন্নয়ন কোনোটা সম্বন্ধেই সমসাময়িক মুসলমানদের কোনো ধারণাই ছিল না। একই সময়ে ভারতবর্ষেও মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, পারস্যে সাফাভিদ সাম্রাজ্য ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল আর অন্যদিকে এশিয়া মাইনরে মেসোপোটামিয়া, লেভান্টে, মিসরে এবং উত্তর আফ্রিকায় অটোম্যানরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছিল।

আর এরপরে একটা সময়েই মুসলিম বিশ্ব আর খ্রিষ্টান বিশ্ব মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে। সেই আলোচনাগুলোই বিস্তারিতভাবে করা হবে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১২. পাশ্চাত্যের প্রাচ্যমুখী অভিযান
(৯০৫-১২৬৬ হিজরি) ১৫০০-১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ

১৫০০ সাল থেকে শুরু করে ১৮০০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপিয়ানরা কমবেশি বিশ্বের সব জায়গাতেই পৌঁছে যায় এবং নানা জায়গায় উপনিবেশও স্থাপন করে। কিছু কিছু স্থান তারা স্রেফ দখল করে নেয়। সেই ভূখণ্ডের আদি বাসিন্দাদেরকে সেখান থেকে ইউরোপিয়ানরা অন্যায়ভাবে উচ্ছেদও করেছিল। উত্তর আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া এহেন ভাগ্য বরণ করেছিল।

আবার কিছু কিছু এলাকায় তারা মূল বাসিন্দাদেরকে থাকতে দেয়, কিন্তু নিজেরা তাদের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। সেই এলাকার যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরও একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। আদি বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ ইউরোপিয়ানদের ক্রীতদাস হয়ে যায় আর বাকিরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোনো রকমে টিকে ছিল। উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকা আর সাব-সাহারা আফ্রিকা অঞ্চলের কথা বলা যায়। কারণ, সেখানকার মানুষগুলোর পরিণতি এমনটাই হয়েছিল।

আবার কিছু কিছু স্থানে, বিশেষ করে চীনে এবং ইসলামিক সাম্রাজ্যে ইউরোপিয়ানরা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। যেহেতু এই ভূখণ্ডগুলোতে আগে থেকেই সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই ইউরোপিয়ানরা এই অঞ্চলগুলোতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদেরকে একটু বেশি সংগঠিত, সম্পদশালী এবং প্রযুক্তিতে অগ্রগামী হিসেবে প্রদর্শন করে। যাতে স্থানীয় মানুষেরা অনুধাবন করে, ইউরোপিয়ানরা তাদের এই প্রতিষ্ঠিত পুরোনো সভ্যতার সাথেও খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। তবে ইউরোপিয়ানদেরকে নিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোতে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। একে তো ক্রুসেডের কারণে আগে থেকেই মুসলমানদের সাথে তাদের একটি উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তার ওপর তারা ঠিক সেই কৌশলেই মুসলিম সাম্রাজ্যের ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করে, যেরকম কৌশল অবলম্বন করে ইতঃপূর্বে তৎকালীন বড় ৩টি মুসলিম সাম্রাজ্য একটা সময়ে নিজেদের সফলতার শীর্ষে উঠে গিয়েছিল।

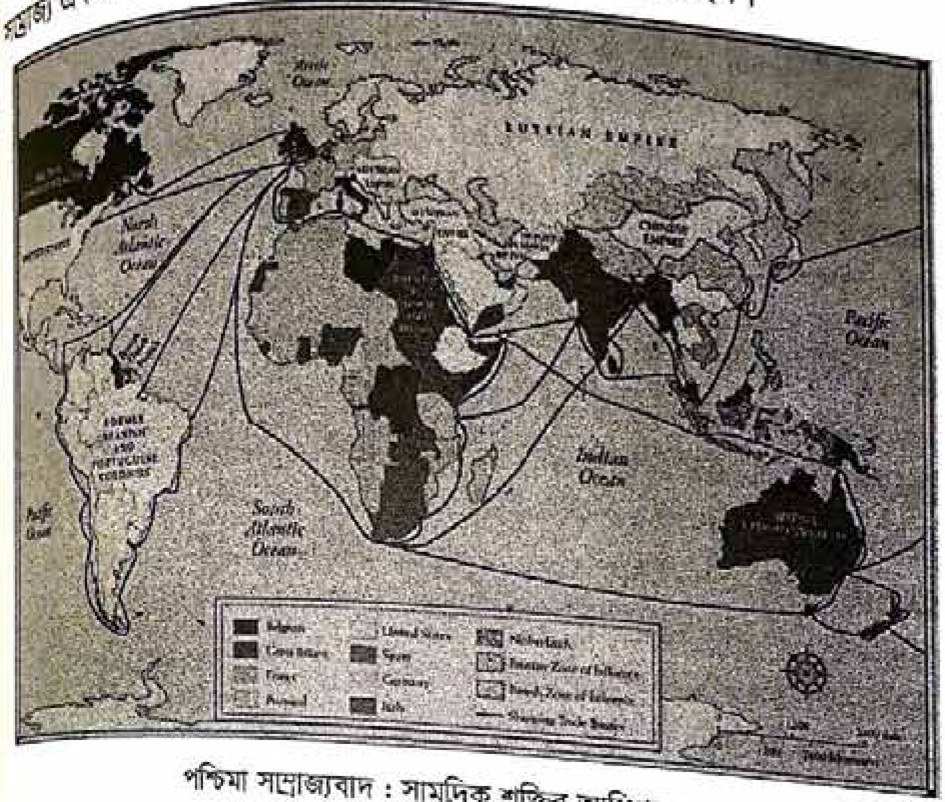

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ : সামুদ্রিক শক্তির আধিপত্য

একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া ভালো তা হলো, ইউরোপিয়ানরা যেভাবে মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছিল তাকে কোনোভাবেই সভ্যতার সংঘাত (ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন-৯০ সালের পরে যেই কথাটির প্রচলন অনেক বেশি করে শুরু হয়েছে) হিসেবে অভিহিত করা যাবে না। কারণ, ইউরোপিয়ানদের ঔপনিবেশিকতার সেই সময়গুলোতে ইউরোপিয়ান সভ্যতা একটিবারের জন্য ইসলামিক সভ্যতার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। বরং ১৫০০ সালের পরে ইউরোপিয়ানরা প্রাচ্যের মুসলিম জগতে এসেছিল মূলত ব্যবসায়ী হিসেবে। যেহেতু কোনো যুদ্ধও হয়নি, সামরিক অভিযানও হয়নি, তাহলে কেন মুসলমানরা সাধারণ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদেরকে হুমকি মনে করবে? ব্যবসা তো যুদ্ধের পুরো বিপরীত। কেউ আপনার সাথে ব্যবসা করতে আসছে এর অর্থই হলো সে আপনার সাথে যুদ্ধ নয় বরং শান্তি চায়।

আর এমনও নয় যে ইউরোপিয়ানরা সংখ্যায় অনেক বেশি মুসলিম বিশ্বে এসেছিল। ইউরোপিয়ানদের মধ্যে সমুদ্রপথে প্রথম ভারতবর্ষে পৌছান পুর্তুগিজ নৌ অভিযাত্রী ভাস্কো দা গামা। তিনি মাত্র ৪টি জাহাজ আর ১৭১ জন ক্রু নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। তারা ১৪৯৮ সালে ভারতের পশ্চিম উপকূলের কালিকাটে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অবতরণ করেন এবং সেখানকার স্থানীয় হিন্দু নেতার কাছে অনুমতি চান, যাতে তাদেরকে উপকূলীয় এলাকায় একটা ব্যবসা করার জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়। যেখানে বসে তারা কিছু জিনিস কেনাবেচা করবেন। স্থানীয় সেই হিন্দু নেতা সাথে সাথেই অনুমতি দিয়ে দিলেন। কেনইবা দিবেন না? যদি এই বিদেশি আগন্তুকেরা স্থানীয়দের কাছ থেকে কাপড়, কাঁচামাল বা চিনি কিনতে চায়, কোনো যুক্তিতে তিনি না করবেন? কারণ, স্থানীয় মানুষেরাও একইভাবে ব্যবসা করতে চাইছিল। কোনো মানুষ নিশ্চয়ই তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি না করে থাকতে চাইবে না? কারণ, পণ্য কেনাবেচার মধ্যেই তো মুনাফার বিষয়টা বিদ্যমান। জিনিস বেচা-বিক্রি না হলে লাভ হবে কীভাবে ?

এ রকম একটা ব্যবসায়ীর মুখোশ পড়ে আসায় ইউরোপিয়রা এসব অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে কোনো সমস্যায় পড়েনি। ইউরোপিয়ানরা বেশ পরে এসে মুসলমানদের কাছ থেকে বৈরী আচরণ পেতে শুরু করে। মুসলমানদের আরেকটি সীমাবদ্ধতা যা ছিল তা হলো, যদিও তারা এই বিশাল এলাকাকে নিজেদের এলাকা হিসেবে দাবি করত, তথাপি এই গোটা অঞ্চলের সব জায়গায় কিন্তু মুসলমানরা কাজ করতে পারেনি। অনেক এলাকা হয়তো যেনতেনভাবেই পড়েছিল। অথচ ইউরোপিয়ানরা এই একই এলাকায় আরও অনেক পরে এসেও, মুসলমানদের আগেই বেশ কিছু নতুন জায়গাকে নিজেদের মতো করে গড়ে নিতে সক্ষম হয়। যেমন উদাহরণ হিসেবে, ভারতগামী পুর্তুগিজদের কথা বলা যায়। এই পর্তুগিজরা স্থানীয় হিন্দুদের সহায়তা নিয়ে নিজেদের মতো করে একটি ছোট শহরও নির্মাণ করে ফেলে- যার নাম দেয়া হয় গোয়া। পুর্তুগিজদের হাতে বেচাকেনা করার মতো তেমন কোনো পণ্য ছিল না, তবে তাদের হাতে পণ্য কেনার মতো টাকা ছিল। আর যত দিন যাচ্ছিল, গোয়াতে নতুন নতুন পর্তুগিজ নাগরিকদের সংখ্যা বাড়ছিল যারা অনেক পরিমাণ টাকা নিয়ে সেখানে আসছিল। যেহেতু আমেরিকার স্বর্ণের বদৌলতে গোটা ইউরোপেই তখন টাকা পয়সার ছড়াছড়ি, তাই পর্তুগিজদের কোনো আর্থিক সংকট ছিল না। ফলে কালক্রমে গোয়া শহরটি ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের জন্য একটি স্থায়ী ঠিকানায় পরিণত হয়।

পরবর্তী সময়ে পশ্চিম ইউরোপ থেকে আরও বেশ কিছু বণিক ভারতবর্ষে আগমন করে। ফরাসিরা পণ্ডিচেরী নামক এলাকায় একটি ব্যবসায়িক কেন্দ্র বিনির্মাণ করে। আর ইংরেজরা ব্যবসায়িক কেন্দ্র খোলে মাদ্রাজে। ওলন্দাজরাও ভারতে এসেছিল। এসব ইউরোপিয়ানরা ব্যবসায় বাড়তি সুবিধা আদায় করার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রায়শই কলহে লিপ্ত হতো। তবে স্থানীয় ভারতীয় নাগরিকেরা এসব বিষয়কে আমলে নিত না। কেনইবা পাত্তা দিবে? মোঘল সম্রাট বাবর এবং তাদের বংশধরেরা ভারতবর্ষের উত্তরের দিকে বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আর সেটাই ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বড় আলোচিত ঘটনা। এর বাইরে কোথা থেকে কে এসে ব্যবসা করে কি লাভ লোকসান করল বা কারা ব্যবসা নিয়ে কলহ করল, এটা কীভাবে গুরুত্ব পাবে? আর সে কারণেই ১৬শ শতাব্দীতে ইউরোপিয়ানরা মুসলিম বিশ্বে তেমন কোনো ফ্যাক্টর হিসেবেও বিবেচিত হয়নি।

সকল ইউরোপিয়ানই যে মুসলিম বিশ্বে ব্যবসায়ী হিসেবে এসেছিল তাও কিন্তু নয়। কেউ কেউ আবার ব্যবসায় পরামর্শক এবং প্রযুক্তি বিষয়ক পরামর্শক হিসেবেও এসেছিল। যেমন ১৫৯৮ সালে রবার্ট শেরলে এবং এন্থনি শেরলে নামক দুই ইংরেজ ভাই পারস্যে এসেছিলেন। পারস্য তখন তার স্বর্ণযুগ পার করছে। তখন ক্ষমতায় ছিলেন সাফাভিদ শাসক শাহ আব্বাস। দুই ইংরেজ সহোদর পারস্যে এসে জানান তারা এখানে (পারস্যে) থাকতে চান। তারা পারস্য রাজাকে একটি আকর্ষণীয় প্রস্তাবও দেন। তারা পারস্য রাজার কাছে কামান এবং আরও কয়েক ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে চান। এই দুই সহোদর আরও জানান তারা পারস্যে থেকেই নতুন কেনা সেসব অস্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও কারিগরি সহায়তার কাজটিও করবেন। তারা আরও বলেন, তারা দুজন এবং তাদের মতো আরও কিছু লোক ইংল্যান্ড থেকে এসে পারস্যের সেনাবাহিনীকে এসব নতুন অস্ত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষণও প্রদান করবে। সেই সাথে নতুন নতুন সামরিক কৌশল এবং কোনো অস্ত্র ভেঙে গেলে কীভাবে তা জোড়া লাগানো যায়, সেসব বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেবে।

শাহ আব্বাস তাদের এই প্রস্তাব পছন্দ করলেন। কারণ, সাফাভিদরা তাদের অন্য প্রতিবেশীদের তুলনায় সামরিক দক্ষতায় পিছিয়ে ছিল। কিজিলবাসরা তখনো পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্র পছন্দ করত না। তারা তখনো পর্যন্ত তীর, ধনুক, বর্শা দিয়েই যুদ্ধ করত। আর সেকারণেই সাফাভিদরা চালদিরানের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। আর অটোম্যানরাও চালাকি করে এমন একটি কৌশল নিয়েছিল যে পারস্যে বাইরে থেকে অস্ত্রবাহী কোনো জাহাজই আসতে পারত না। তাই অনেক দূরের কারও কাছ থেকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ পাওয়ার এই লোভনীয় অফারটি পারস্য লুফে নিল। তাছাড়া ইংরেজরাও এখানে তাদের লাভটাই বেশি দেখছিল। উভয়পক্ষই কাজটিকে নিজ নিজ জায়গা থেকে লাভজনক মনে করায় কাজটি শেষ পর্যন্ত শুরু হলো। আর এভাবেই পারস্য সেনাবাহিনীতে ইউরোপিয়ানদের পরামর্শক হিসেবে কাজ করার সিলসিলাও শুরু হলো।

এটাও সত্য যে, মুসলমানদের সাথে ইউরোপিয়ানদের সকল কার্যক্রম যে শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছিল, তা নয়। অটোম্যান তুর্কিরা এর আগে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টানদের সাথে লড়াই করছিল। অটোম্যানদের পশ্চিম সীমান্তটি ছিল প্রাচ্য ও পশ্চিম জগতের মধ্যকার সীমানা। যা এই দুটি ভিন্নজগৎকে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আলাদা করে রেখেছিল। আর এই সীমানাকে কেন্দ্র করেই ছোট ছোট যুদ্ধ শুরু হয়। আবার কিছু কিছু জায়গায় ব্যবসা বাণিজ্যও হয়। কারণ, যে কয়টি স্থানে ইউরোপিয়ানদের সাথে অটোম্যানদের যুদ্ধ চলছিল সেসব যুদ্ধ বা সংঘাতও আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো বড় বা আহামরি টাইপের কোনো যুদ্ধ ছিল না। যুদ্ধটি হতো ভৌগোলিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। হয়তো এখানে দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে তার অল্প কয়েক মাইল দূরে হয়তো অন্য কারও মধ্যে ব্যবসাও হচ্ছে। ক্রুসেডের পর থেকে এই যুদ্ধগুলো আদর্শিক একটা রূপ পায়। অনেকেই এসব যুদ্ধকে খ্রিষ্টান বনাম মুসলমানদের মধ্যকার যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এসব যুদ্ধের বেশিরভাগই ছিল ভূখণ্ডের ওপর রাজার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। অটোম্যান সাম্রাজ্যে অনেক খ্রিষ্টান ও ইহুদি বসবাস করত, এমনকি তারা অটোম্যান সেনাবাহিনীতেও কাজ করার সুযোগ পেত। তারা যে অটোম্যান সাম্রাজ্যকে ভালোবেসে এই যুদ্ধ করত তাও নয়। এটা ছিল তাদের চাকরি। তাই টাকার জন্য তারা এই মুসলিম নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনীতে কাজ করত। আর এই কারণেই তাদের কার্যক্রম খুব একটা বেপরোয়া ধরনের ছিল না। আর সেই সহজতার সুযোগ নিয়েই অনেক জায়গাতেই আবার মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা মিলে ব্যবসা এবং বেচাকেনায় জড়িয়ে পড়েছিল।

১৭ শতাব্দীতে এসে শুধু ভেনেটিয়ান (ইতালির ভেনিসের নাগরিক) নয় বরং ফরাসি, ইংরেজ, জার্মানি, ওলন্দাজ এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান জাতিও মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে। আর তারা যে শুধু স্বর্ণ নিয়ে আসে তা নয়, বরং অস্ত্রসস্ত্রও নিয়ে আসে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এসব ইউরোপিয়ানদেরকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেয় যার কারণে আস্তে-আস্তে ধীরে-ধীরে বিশাল অটোম্যান সাম্রাজ্যটি একটি ভারি ওজনের জগদ্দল পাথরের মতো বোঝায় পরিণত হয়। ইউরোপিয়ানরা তাই তৎকালীন অটোম্যানকে 'ইউরোপের অসুস্থ মানুষ' হিসেবে অভিহিত করত। এই প্রক্রিয়াটি এতটাই ধীরে হচ্ছিল যে কেউ বিষয়টা সেভাবে ধরতেই পারেনি।

এক্ষেত্রে প্রথম যা বিবেচনা করতে হবে তা হলো এই প্রক্রিয়ায় আসলে কী কী ঘটেনি। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অটোম্যান সাম্রাজ্য কোনো বিজয়ী সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়নি। তাদের সামরিক শক্তি তখনো ভালো অবস্থায় ছিল। এমনকি এসব ঘটনার বহু বছর পরে যখন অটোম্যান সাম্রাজ্য মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌছে গিয়েছিল তখনো তাদের হাতে প্রতিপক্ষের ক্ষতি করার মতো যথেষ্ট সামরিক শক্তি বিদ্যমান ছিল। তার মানে সামরিক শক্তি থাকলেও অটোম্যানদের সার্বিক অবস্থা এতটাই নাজুক ছিল যে সেই শক্তিকে সম্ভাব্য শত্রুর বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর সুযোগ তাদের ছিল না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইতিহাসবিদরা দুটো সামরিক পরাজয়কে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের শুরু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যদিও তখনকার সময়ে তুর্কিরা হয়তো সেটা বুঝতেই পারেনি। একটা ছিল লেপান্তোর যুদ্ধ যা ১৫৭১ সালে সংঘঠিত হয়। এটা ছিল নৌ যুদ্ধ, যেখানে ভেনেটিয়ান এবং তাদের মিত্ররা মিলে অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভূমধ্যসাগরীয় নৌতরী গুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। অটোম্যানরা এই পরাজয়কে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে না করলেও ইউরোপিয়ানরা এই যুদ্ধবিজয়কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে। কারণ, তাদের চোখে এই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই তুর্কিদের দুঃসময় শুরু হয়।

ইস্তানবুলের তৎকালীর উজির এই পরাজয়কে মানুষের দাড়ি শেভ করার সাথে তুলে করেছিলেন। অর্থাৎ দাড়ি শেভ করে ফেলে দিলে যেমন নতুন দাড়ি গজায়, তাদের ধারণা ছিল এই পরাজয়ের ক্ষতিটাও তারা সেভাবেই পুষিয়ে নিতে পারবেন। হয়েছিলও তাই। এক বছরের মধ্যেই অটোম্যানরা ভূমধ্যসাগরে নতুন ৮টি নৌতরী প্রেরণ করেন যা আগের তুলনায় বড় ও কার্যকরী। মাত্র ৬ মাসের মধ্যে অটোম্যানরা আবারও ভূমধ্যসাগরের পূর্বপ্রান্ত জয় করেন এবং সাইপ্রাসকে দখল করে নেন।

তবে অটোম্যানরা লেপান্তো পরাজয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়ায়, তারা অনুধাবনই করতে পারেননি যে ইউরোপিয়ানরা জিতেছিল কেনবা কেনই বা তারা হেরে গেল? প্রকৃত বাস্তবতা হলো, ইউরোপিয়ানরা ভেতরে ভেতরে নৌ অভিযানে যে সক্ষমতা অর্জন করেছিল, তা অটোম্যানরা কখনো জানতেই পারেনি। কিন্তু মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপিয়ানদের নৌ সক্ষমতা আবারও দৃশ্যমান হয়। আর বিষয়টা এবার এতটাই সুস্পষ্ট এবং সংঘঠিত ছিল যে অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রতিরোধ করার মতো শক্তিও কারও ছিল না।

আরেকটি বড় সামরিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল লেপান্তোর যুদ্ধের অল্প আগে। যদিও তা অনেক পরে এসে চোখে পড়ে। অটোম্যানদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ছিল সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফেশেন্টের ভিয়েনা জয় করতে না পারা। ১৫২৯ সালে অটোম্যানরা ভিয়েনা শহরের দরজায় পৌছে যায়। কিন্তু সুলতান সুলেমান শহরটিকে অপ্রয়োজনে একটু বেশি সময় ধরে অবরোধ করে রাখেন। এরই মধ্যে আবার শীতকাল চলে আসে তাই সুলতান সেই যাত্রায় ভিয়েনা জয়ের চিন্তা থেকে সরে আসেন এবং পরের বার এসে জয় করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু পরের বারের সেই সুযোগ তার জীবনে আর আসেনি। কারণ, এরপর তিনি নতুন করে অনেকগুলো সংকটের মধ্যে পড়েন। ফলে তাঁর চিন্তাটি লক্ষ্যচ্যুত হয়। তৎকালীন অটোম্যান সাম্রাজ্যটি এতটাই বড় ছিল, আর এর সীমান্ত এতটাই দীর্ঘ ছিল যে, মনোযোগ কোথাও থেকে একটু সরে গেলেই দুর্ঘটনা ঘটে যেত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সুলতান যে ভিয়েনা জয় করতে পারলেন না, এটাকে তার কোনো সমসাময়িক কেউই দুর্বলতা বা ব্যর্থতা হিসেবেও বিবেচনা করেননি। ভিয়েনা জয়টি শেষ অবধি সুলতানের সম্ভাব্য কাজের তালিকায়ই থেকে যায়। যেন সুলতান একটু ব্যস্ত আছেন, সময় পেলেই তিনি ভিয়েনা জয় করে নেবেন। কিন্তু আসলে এমন কোনো দূরদর্শী ব্যক্তি তখন ছিল না যারা অনুধাবন করবেন, ভিয়েনা জয় না করায় আসলে অটোম্যান সাম্রাজ্যের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দিনও শুরু হয়ে যায়। এটা হয়তো প্রথাগত কোনো যুদ্ধে পরাজয় নয়। তবে ভিয়েনা জয় না করাটা হলো, সময়মতো গোলপোস্টে গোল না করতে পারার মতো ব্যর্থতা। যেই ব্যর্থতা পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী অটোম্যানদের ভুগিয়েছে।

ইতিহাসবীদেরা ভিয়েনা জয় করার ক্ষেত্রে সুলতান সুলেমানের ব্যর্থতাকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের ইতিহাসের পতনের অদৃশ্য সিড়ি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ, ভিয়েনা অভিযানের আগে সুলেমানের সাম্রাজ্য সফলতার চূড়ান্ত উচ্চতায় অবস্থান করছিল। আর যখন তিনি ভিয়েনা জয় করতে ব্যর্থ হলেন, এরপর থেকে তার সাম্রাজ্য আর কোনো সফলতা পায়নি। সাম্রাজ্যের সীমানাও আর বিস্তৃত হয়নি। এই সংকটটা অবশ্য তখনো বুঝা যায়নি, কারণ, ঐ সময় অটোম্যান সেনাবাহিনী বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করছিল। আর অনেকগুলো যুদ্ধের ময়দান থেকে তখনো কিছু ভালো খবর আসছিল।

প্রকৃতপক্ষে অটোম্যানরা সে সময় ছোট ছোট কিছু যুদ্ধে জয় পেলেও বড় কয়েকটা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। তবে হারজিতের এই সমীকরণটি তখন নয় বরং আরও অনেক পরে এসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ১৬শ শতাব্দীতে এসে অটোম্যান সাম্রাজ্যটি আস্তে আস্তে সঙ্কুচিত হতে শুরু করে। মূলত এই অটোম্যান সাম্রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিতই হয়েছিল স্থায়ী সম্প্রসারণবাদী নীতির ওপরে। অর্থাৎ সব সময় যুদ্ধে ব্যস্ত থাকা কিংবা রাজ্যের সীমানা বাড়ানোতে ব্যস্ত থাকলেই কেবল এই সাম্রাজ্যটি সঠিকভাবে কাজ করত এবং আভ্যন্তরীণ সমস্যা সংকটও কম হতো। এর বেশ কিছু কারণও ছিল।

প্রথমত সাম্রাজ্য সম্প্রসারণটি ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করার একটি কৌশল। তাই রাজ্যের সীমানা না বাড়লে রাজস্ব আদায়ও কম হতো।

দ্বিতীয়ত যুদ্ধটি ছিল এমন একটি বিষয় যা ভেতরের সব চাপ ও সংকটকে যেন নিরাপদে বের করে দিত। যেমন দেশের ভেতরে জোতদাররা যখন নিজেদের স্বার্থে কৃষকদেরকে উচ্ছেদ করত, তখন এসব কৃষকেরা ক্ষুধার্ত ও আশাহত অবস্থায় এখানে সেখানে না ঘুরে, বরং সেনাবাহিনীতে যোগদান করত। ফলে বঞ্চিত কৃষকদের ক্ষোভটাও প্রশমন হতো আর রাজ্যের প্রশাসনও নতুন করে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কোনো ঝামেলায় পড়ত না। সেনাবাহিনীতে যোগদান করলে বা যুদ্ধে গেলে তারা কিছু না কিছু পুরস্কার ও সম্মাননা পেত, যা দিয়ে তারা নিজ এলাকায় ফিরে ছোটখাট কোনো ব্যবসা চালু করার চেষ্টা করত।

সম্প্রসারণ বা যুদ্ধের প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে গেলে এই সমস্ত চাপ রাজ্যের ভেতরে চলে আসত। যেমন যারা কোনোভাবেই গ্রামে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিছু করে উঠতে পারত না বা জোতদারের চাপে যারা পিষ্ট হয়ে পড়ত, তারা আর কোনো উপায় না পেয়ে শহরে চলে আসত। এমনকি যদি তাদের অন্য কোনো দক্ষতা থাকত, তাও তারা কাজে লাগানোর সুযোগ পেতনা। কারণ, সকল কারখানা এবং মেশিনপত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করত মূলত সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো। আর তারা খুব কম সংখ্যক নতুন লোককেই কাজ দিতে পারত। তাই শহরে আসা অনেকেই শেষ পর্যন্ত কোনো কাজ যোগাড় করতে পারত না। সাম্রাজ্য নতুন করে আর সম্প্রসারিত না হওয়ায় এই ধরনের অনেক সংকটই অটোম্যান সাম্রাজ্যে সেই সময় সৃষ্টি হয়েছিল।

তৃতীয়ত 'দেভশ্রিম' নামক অভিজাত শ্রেণিটির জন্মই হয়েছিল রাজাকে বা সুলতানকে সেবা করার জন্য। তাদের লোক নিয়োগের একটি মাত্রই ক্ষেত্র ছিল তা হলো, সম্প্রসারিত নতুন এলাকা। কারণ, কোনো এলাকায় নতুন করে সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলেই, সেখান থেকে দাস খুঁজে নিয়ে এসে তাদেরকে যোগ্য করে তুলতেন। সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন সম্প্রসারিত না হওয়ায় এই অভিজাত শ্রেণিটিও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। জানিসারিদের বিয়ে করতে এবং উত্তরাধিকারী রেখে যেতে না পারাটা একটি বিরাট সীমাবদ্ধতা ছিল। এই কৌশলটা প্রণয়ন করা হয়েছিল সুলতানের সেবায় নিয়োজিত থাকা এই অভিজাত শ্রেণিতে যেন সব সময় নতুন নতুন যোগ্য মানুষ প্রবেশ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য। একই সাথে এই শ্রেণি থেকে যাতে কেউ রাজত্ব দাবি করতে না পারে বা সুলতানের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে না পারে- সেটা নিশ্চিত করাটাও এই ধরনের আইন করার বড় একটি কারণ। কিন্তু অটোম্যান সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ বন্ধ করে দেয়ার পর দেভশ্রিম সম্প্রদায়েও একটি অচলাবস্থা তৈরি হয়। কারণ, তারা নতুন সদস্য পাচ্ছিলোনা। এমতাবস্থায় জানিসারিরা বিয়ে করতে শুরু করে। ফলে তাদের সন্তানও হয়। আর সন্তানের জন্য বাবারা কি করবে এতো জানা কথাই। জানিসারিরাও চেষ্টা করে তাদের সন্তানদেরকে যাতে সবচেয়ে ভালো শিক্ষা এবং চাকরি নিশ্চিত করা যায়। এই কৌশল অবলম্বন করার পরপরই জানিসারিরা একটি স্থায়ী এবং উত্তরাধিকারী মূলক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। তবে এর ফলে সাম্রাজ্যের সাহস ও সক্ষমতা কমে যায়। কারণ, আগে জানিসারিতে একজন সদস্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য কাউকে দ্বিতীয়বার

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আর সদস্য বানানো হতোনা। নতুন সদস্য নিয়োগ করার ক্ষেত্রে সব সময়ই উত্তম পরিবারের যোগ্য ও দক্ষ সদস্যকে খোঁজা হতো। আর সেই যোগ্যতার নতুন ও নবিন সদস্য আগমনের ফলে জানিসারিরা সব সময় বুদ্ধি ও কৌশলে বস্তুনিষ্ঠ হতো। কিন্তু সম্রাজ্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জানিসারিতে আর ভালোমানের সদস্য নেয়ার সুযোগ হলো না। ফলে এই বাহিনীটিও ক্রমশ একটি গতানুগতিক বাহিনীতে পরিণত হয়।

জানিসারিদের এই সংকটের সাথে এক দশক আগে সুলতান সুলেমানের ভিয়েনা অভিযানের ব্যর্থতার বিরাট সম্পর্ক আছে। যদিও অনেকেই প্রাথমিকভাবে তা বুঝতে পারেনি। কারণ, যে জটিল পরিস্থিতিগুলোতে অটোম্যানরা আটকা পড়ল তার কারণগুলো এতটাই দূরবর্তী আর প্রভাবটাও এতো পরোক্ষ যে, অনেকে বুঝতেই পারবে না, অতীতের সেই ঘটনার রেশ ধরে বর্তমান সময়ের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি কীভাবে ঘটলো। অন্যদিকে, এসব সংকটের প্রকৃত কারণ, যাচাই না করে বরং একটি ধার্মিক গ্রুপ বলতে শুরু করল, সমাজে নৈতিকতার চর্চা না থাকায় এবং আদব কায়দার অভাব থাকায় এসব সংকটের জন্ম হয়েছে।

১৬৮৩ সালে অটোম্যানরা আবার ভিয়েনা জয় করার চেষ্টা করে এবং তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। ১৫৪ বছর আগে সুলতান সুলেমানও ভিয়েনা জয় করতে পারেনি। তবে আগের বারের ব্যর্থতার সাথে এবারের ব্যর্থতার যেটা মূল পার্থক্য ছিল তা হলো, এবারই প্রথম অটোম্যানদেরকে ইউরোপিয়ান যৌথ বাহিনীর মুকাবেলা করতে হয়। অর্থাৎ এই ১৫০ বছরে মুসলমানরা খুব সংঘঠিত হতে না পারলেও ইউরোপিয়ানরা ঠিকই নিজেদের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। সাধারণভাবে দেখলে অটোম্যানদের জন্য এটা দ্বিতীয়বারের মতো ভিয়েনা জয়ে ব্যর্থতা। কিন্তু এবার এসে অটোম্যান অভিজাত লোকেরা প্রথমবারের মতো বুঝতে সক্ষম হলো যে, আসলে তারা ধরাশায়ী হয়ে গেছেন এবং বড় ধরনের কিছু ভুল তারা আগেই করে ফেলেছেন।

এই উপলব্ধি তাদেরকে সামরিক শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করার ব্যপারে আরও প্রেরণা দেয়। তারা বুঝতে পারে যে তাদের সাম্রাজ্যের শক্তি ও সাহস নির্ভর করছে দক্ষ সৈন্য ও কার্যকরী অস্ত্রের ওপর। ফলে যেন তেন ভাবে সেনা সংখ্যা না বাড়িয়ে সেনাবাহিনীতে আরও বেশি সম্পদ ও অর্থ ব্যায় করতে শুরু করে যাতে সেনারা প্রতিপক্ষের সেনাদের তুলনায় আরও তৎপরভাবে কাজ করে। তবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকারের খরচ আরও অনেক বেড়ে যায়। আগে থেকেই খরচপাতি নিয়ে অটোম্যানরা বেশ চাপের মধ্যে ছিল। ফলে সামরিক খাতে খরচ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণে সার্বিকভাবে সরকারকে বেশ লোকসান গুনতে হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অটোম্যান প্রশাসনের চাপের মুখে থাকাটা স্বাভাবিকও ছিল। কারণ, বেশ কিছু আগে থেকেই ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীরা অটোম্যান এলাকায় ব্যবসা শুরু করে এবং সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে পুরোপুরি ওলট-পালট করে দেয়। লেপান্তোর যুদ্ধ নয়, ভিয়েনা অভিযানের ব্যর্থতাও নয়, কোনো সেনাবাহিনীও নয় বরং অটোম্যান সাম্রাজ্যকে কব্জা করে নিয়েছিল বাহির থেকে আসা ব্যবসায়ীরা।

বিষয়টা আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলি। অটোম্যান সাম্রাজ্যে প্রথম থেকেই সুফি সাধক ও অন্যান্য অভিজাত সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে যে গিল্ড বা সংঘ তৈরি হয়েছিল তারাই মূলত উৎপাদনমুখী সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করত। আর এসব সংঘরা অন্য সব কিছুর আগে সংঘের স্বার্থই বড় করে দেখতো এবং সংঘের সদস্যদের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করত। ধরা যাক, একটি সংঘের সাবান উৎপাদনের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আছে তাহলে আরেকটি সংঘের হয়তো জুতো উৎপাদনে একক আধিপত্য থাকত। তবে এসব কোনো সংঘই তার একচ্ছত্র আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে পন্যের দাম ইচ্ছেমতো বাড়াতে বা কমাতে পারত না। কারণ, কোনো পণ্যের দাম কতটুকু রাখতে পারবে, তার ক্ষেত্রেও প্রশাসন একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। অর্থাৎ সরকার জনগণের স্বার্থ দেখত, আর গিল্ড বা সংঘগুলো স্বার্থ দেখতো নিজ সদস্যদের। এভাবেই সব জায়গাতেই একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা ছিল।

যখন এই ভারসাম্যপূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে পশ্চিমারা ঢুকে গেল তখন পরিস্থিতি জটিল হয়ে গেল। তারা তাদের জুতো বা সাবান বেচার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠিত সংঘের কাছে গেলনা। রাষ্ট্র তাদেরকে ঐ গিল্ডদের কাছে যেতে দিলনা। ফলে তারা সরাসরি ক্রেতা বা বিক্রেতা খুঁজতে শুরু করল। পশ্চিমারা অটোম্যানদের কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনমত বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল বিশেষ করে উল, গোশত, চামড়া, কাঠ, তেল, ধাতব পণ্য কিনতে শুরু করল। সাধারণ অটোম্যানদের মধ্যে যেসব নাগরিকেরা মালামাল সরবরাহ করত তারাও কোনো সংঘের মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি নিজেরাই পণ্য বিক্রি করতে পারছিল বলে বেশ খুশিই ছিল। আর এহেন ব্যবসা দেখে অটোম্যান প্রশাসনও সন্তুষ্ট ছিল কারণ, তারা দেখছিল, এই পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের কারণে তাদের সাম্রাজ্যে অনেক স্বর্ণমুদ্রা প্রবেশ করছে।

ইউরোপিয়ানরা তখন সেসব পণ্যেরই ব্যবসা করত যা অটোম্যান গিল্ড বা সংঘগুলো করত। কিন্তু তাদের অফারটি আসলে লোভনীয় ছিল যেহেতু তারা স্বর্ণের বিনিময়ে পণ্য ক্রয় করত। অন্যদিকে, সরকার নির্ধারিত মুল্যের পরে যতটুকু লাভ করা যায় তাই নিয়েই ব্যবসা নিয়ন্ত্রক সংঘগুলোকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছিল। এই কারণে গোটা অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

একটা পর্যায়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেল যে, গিল্ডগুলো পণ্য উৎপাদনের মতো প্রয়োজনমত কাঁচামালও যোগাড় করতে পারছে না। কারণ, সব কাঁচামালগুলো বিদেশিরা কিনে নিয়ে সেগুলো ইউরোপে পাচার করে দিচ্ছিল। ফলে অটোম্যানদের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ধ্বস নামল।

অটোম্যান প্রশাসন সংকটটি বুঝতে পেরে তাদের নিজস্ব উৎপাদন করতে দরকার হয় এমন কিছু কাঁচামালের বিদেশে রফতানি নিষিদ্ধ করল। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের এসব আইন করে আসলে কাজের কাজ কিছু হয়না। কারণ, যখন সরকার উল রফতানি নিষিদ্ধ করল, সাথে সাথে অবৈধভাবে রফতানি শুরু হয়ে গেল। ফলে অটোম্যান সাম্রাজ্যে একটি বিরাট কালোবাজার সৃষ্টি হয়ে গেল। আর সেই কালোবাজারকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী একটি নব্য অভিজাত শ্রেণিও দাঁড়িয়ে গেল। যেহেতু নব্য এই অভিজাত শ্রেণিটি আইন অমান্য করেই টাকা পয়সার মালিক হয়ে গিয়েছিল, তাই তাদেরকে নিজেদের স্বার্থেই প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে ঘুষ দিয়ে চলতে হতো। ফলে অটোম্যান সাম্রাজ্যে দুর্নীতি ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দুর্নীতি ও ঘুষখোরদেরও একটি শ্রেণির উত্থান হয় যারা বেশ ক্ষমতাবানও বটে।

সার্বিকভাবে এ রকম একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যে, ঘরোয়া উৎপাদন না বাড়লেও অবৈধ ব্যবসার বদৌলতে অনেকের হাতে অনেক কাঁচা টাকা চলে আসলো। কিন্তু ফুলে ফেঁপে উঠা অটোম্যান নাগরিকেরা এই টাকাগুলো খরচ করার কোনো জায়গা পাচ্ছিল না। দেশের বাইরে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করার সুযোগও তাদের ছিল না। কারণ, প্রশাসন এটা পছন্দ করত না। তাই তারা তাই করতে শুরু করে যা আজকের দুনিয়াতে মাদক ব্যবসায়ীরা আমেরিকাতে গিয়ে করে। অটোম্যানরা বিভিন্ন বিলাসী পণ্য কিনে তাদের এই টাকা উড়াতে শুরু করে। এই বিলাসী পণ্য বলতে সেসব পণ্যই বুঝানো হতো, যেগুলো ইউরোপ থেকে আসছে। সরকারের নজরদারি থেকে বাঁচার জন্য এই লেনদেনগুলো করা হতো গোপনে। আর আগে থেকেই অটোম্যানদের ঘরোয়া উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় ইউরোপে শিল্প কল কারখানা খোলার পথটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাই ইউরোপিয়ানরা অটোম্যানদেরকে যেই স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে খুশি করছিল সময়ের ধারাবাহিকতায় আবার সেই স্বর্ণমুদ্রাই ইউরোপে ফিরে আসছিল।

উৎপাদন কমে যাওয়ায় এবং একই সঙ্গে বাইরে থেকে অনেক কালো টাকা অটোম্যান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করায় অর্থনীতিতে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এটা তখনই হয় যখন আপনার কাছে বাজারে থাকা পন্যের তুলনায় টাকা বেশি থাকে। আমি এই একই ধরনের পরিস্থিতি উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার প্রত্যন্ত কিছু অঞ্চলেও দেখেছি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ক্যালিফোর্নিয়ার সেই এলাকাগুলোতে কিছু লোক মারিজুয়ানার ব্যবসা করে অনেক টাকার মালিক হয়ে গেছে। আর সেই কারণেই ক্যালিফোর্নিয়ায় কোনো কার্যকরী অর্থনৈতিক কাঠামো না থাকলেও আপনি দেখবেন অনেকেই বিএমডব্লিউ গাড়ি হাঁকাচ্ছে। সাদামাটা বাড়িও মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হচ্ছে। কারণ, বাড়ির মালিক জানে যে এই চড়া দামে কেনার মতো কাস্টমারও সে পাবে।

যাহোক, কোনো দেশে মুদ্রাস্ফীতি হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নির্দিষ্ট আয়ের মানুষেরা। আমরা এখনকার সময়ে এসে নির্দিষ্ট উপার্জন বলতে কম উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদেরকে বুঝি। এখনকার সময়ে এসে অবশ্য পেনশন বা অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক সুযোগ সুবিধা চালু হয়েছে। তবে তৎকালীন অটোম্যান সাম্রাজ্যে এই ধরনের কোনো জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা ছিল না। পরিবারকেই তাদের বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষগুলোকে দেখভাল করতে হতো। আর অটোম্যান সাম্রাজ্যে নির্দিষ্ট উপার্জনকারী ব্যক্তি তারাই ছিল যারা বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারী বা আমলা। এই আমলারা নির্দিষ্ট উপার্জন করলেও অনেক বেশি টাকা উপার্জন করত।

কিন্তু যার হাতে অনেক টাকা আছে, সেও কখনো কখনো নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে যখন সে বুঝতে পারে তার কেনার সক্ষমতাটা কমে আসছে। ১৯২৯ সালে যখন মার্কিন পুঁজিবাজারে ধ্বস নামে, তখন অনেকগুলো ব্যাংক পথে বসে গিয়েছিল। অথচ তাদের ভল্টে তখনো মিলিয়ন ডলার অলসভাবে পড়েছিল। টাকা থাকলেও যদি তা কাজে লাগানোর সুযোগ না থাকে তাহলে টাকা আর কাগজের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। একইভাবে অটোম্যান সাম্রাজ্যেও প্রবলভাবে মুদ্রাস্ফীতি আঘাত করার পর এই বিরাট পয়সার মালিক সরকারি কর্মকর্তারাও বোঝে যে, তাদের এখন অনেক হিসেব করে চলতে হবে। কিন্তু তারা এই ধরনের নিয়ন্ত্রিত জীবন মোটেও পছন্দ করছিল না। তাই তারা যে যেই জায়গায় কাজ করত সেটাকে অন্য কোনোভাবে, অর্থাৎ বৈধ কিংবা অবৈধভাবে ব্যবহার করে উপার্জন বাড়ানোর চেষ্টা করছিল।

আসলে সেই সময়ে আমলারা সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ও আইনি কার্যক্রমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করত। কে সাম্রাজ্যে কাজ করতে পারবে আর কে করবে না-সেই অনুমতিও তারা দিত। আর নিজেদের এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে ষোলআনা ব্যবহার করে এই আমলারা। যদিও তাদের দায়িত্ব ছিল সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকারক কিছুকে কাজ করার অনুমতি না দেয়া কিন্তু এসব আমলারা কেবল নিজেদের আখের গুছানোর জন্য ঘুষের বিনিময়ে সেই অনুমতিগুলো দিয়ে দিতে শুরু করল। একটা সময়ে গিয়ে অটোম্যান সাম্রাজ্য এমন একটি নোংরা জায়গায় পৌঁছে গেল যে, তাদের গড়া নিয়ম কানুনকে কেউ আর পাত্তা দিত না। কারণ, সমাজে দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোরের সংখ্যাও যেমন বেশি ছিল, তেমনি সবাই সবাইকে চিনত। তাই যার যেখানে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বা যেই অফিসে কাজ, সে আগে খুঁজে বের করত সেই অফিসে কে ঘুষ খায়, বা তার পরিচিত কোনো লোক কেউ আছে কিনা- তারপর সেই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে দিয়েই সে তার কাজটি আদায় করে নিত।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সাম্রাজ্যের প্রশাসন সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন বাড়িয়ে দিল, যাতে করে তারা আর বাড়তি ঘুষ খাওয়ার লোভে না পড়ে। কিন্তু সাম্রাজ্যেও নীতিনির্ধারকদের কাছে সত্যিকারের উৎপাদনমুখী কোনো অবস্থা ছিল না। আর অতিরিক্ত বেতন দেয়ার মতো টাকাও ছিল না। কারণ, সাম্রাজ্যের পরিধি বা সীমানাও কোনোভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছিল না। তাই আগে যেমন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অধিকৃত এলাকা থেকে রাজস্ব এসে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা পড়ত, সেই ধারাবাহিকতাটাও একটা সময়ে এসে বন্ধ হয়ে যায়। আর সেই কারণেই বাড়তি বেতন, পেনশন এবং সেনাদের বেতন দেয়ার জন্য সরকারকে টাকা ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

আর যখনই কোনো রাষ্ট্রে অযাচিতভাবে টাকা ছাপাতে হয় তখনই সেখানে অবধারিতভাবেই মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায়। দুর্নীতি আর চোরাকারবারিকে বন্ধ করার জন্য অটোম্যান প্রশাসন যেই পদক্ষেপই নিচ্ছিল তা যেন উল্টো তাদের সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল। সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর থেকে সাম্রাজ্যের নীতিনির্ধারকদের ওপর আস্থা ও ভরসা কমে যায়। কোনো উপায় না পেয়ে একটা পর্যায়ে তারা বেশ কিছু পরামর্শক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যারা কিনা তাদের সমস্যাগুলোকে পর্যালোচনা করে কিছু কার্যকর সমাধান দেবে। মজার ব্যাপার হলো, এটা ছিল অনেকটা শেয়ালের কাছে মুরগী বরগা দেয়ার মতো। কারণ, অটোম্যানরা ইউরোপিয়ানদের কারণে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরামর্শক নিয়োগ দেয়, তারাও ছিলেন সেই পশ্চিম ইউরোপ থেকে আসা বিশেষজ্ঞদেরই একটা দল।

যদি ভালো কোনো পরামর্শক নিয়োগ দেয়া যেত তাহলে হয়তো সমস্যার একটা ভালো সমাধান পাওয়া যেত। কারণ, অটোম্যানরা যে সমস্যায় পড়েছিল তা ছিল তাদেরই হাতের কামাই। তাদের সাম্রাজ্যের তখন পতনপ্রায় অবস্থা অথচ শাসকগোষ্ঠীর আরাম আয়েশ আর বিলাসিতার কোনো কমতি ছিল না। রাজ্যের কর্মচারীদের বেতন দেয়ার টাকা নেই অথচ রাজ দরবারের বিলাসিতা, শান শওকত প্রতি নিয়ত যেন আরও বাড়ছিল। অথচ এসব বিলাসিতা পূর্বসূরি সফল অটোম্যান শাসক সুলতান মুহাম্মাদ বা সুলতান সুলেমানের মধ্যে সেইভাবে ছিল না।

অন্যায় বিলাসিতার একটা বড় উদাহরণ ছিল গ্র্যান্ড সেরাগোলিও, যেটা ছিল ইস্তানবুলে থাকা সুলতানের সবচেয়ে বড় হারেমখানা। মুসলিম শাসকদের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইতিহাসে এই ধরনের হারেমখানার অস্তিত্ব আগেও পাওয়া যায়। তবে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময় এসে এটা যেভাবে বিকশিত হয়েছিল, এ রকম আগে কখনোই হয়নি। শুধু চীনের মিং রাজবংশের শাসনামলের সময়ে এ রকম বর্ণাঢ্য হারেমখানার অস্তিত্বের খবর জানা যায়।

গোটা সাম্রাজ্যের আনাচে কানাচে থেকে মেয়েদেরকে এনে এই গ্র্যান্ড সেরাগোলিওতে রাখা হতো। যদিও যে রাজদরবারে বা রাজমহলে তারা কাজ করত তা ছিল জাঁকজমকতা আর প্রাচুর্যে ভরপুর, কিন্তু এই নারীদেরকে সবসময়েই খাঁচার মতো ছোট্ট একটা ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে হতো। শুধু মাঝে মাঝে এই নারীদেরকে দামি দামি অলংকার, কসমেটিকস ও সাজগোজ করার জন্য জিনিসপত্র পাঠানো হতো। হারেমখানার এসব নারীদের নিজেদের রূপচর্চা ছাড়া আর কোনো কাজই ছিল না। তারা গঠনমূলক কোনো কাজ করতে পারত না। কোনো কিছু বানাতে বা উৎপাদন করতে পারত না। কোনোভাবে কেউই এই বন্দিশালা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করতে পারত না। তারা ছিল বন্ধ ঘরের ভেতরে বন্দি।

ইসলামি শাসনের ইতিহাসে নারীদেরকে আলাদা করে রাখার ঘটনা নতুন নয়। সব আমলেই নারীদেরকে একটু আড়াল করে রাখার বা ঘরের ভেতরে লুকিয়ে রাখার কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে মজার ব্যাপার হলো এই চিত্রটি কিন্তু গোটা সমাজের সার্বিক চিত্র নয়। নারীদেরকে অন্দর মহলে রাখার এই বিষয়টা অভিজাত শ্রেণিতে বেশি দেখা যেত। সেই আমলেও গ্রামের দিকে গেলে হয়তো আপনি নারীকে পুরুষদের মতোই কৃষিকাজে ব্যস্ত দেখতে পেতেন কিংবা সড়কের পাশে পশু চড়াতে দেখতে পেতেন। শহরে এসেও আপনি নিম্ন মধ্যবিত্ত পর্যায়ের নারীদেরকে দেখতে পেতেন যারা বাজারে বেচাকেনা করত বা রাস্তায় হকারের কাজ করত। এমনকি মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু নারীকেও দেখা যেত যারা হয়তো কিছু পরিমাণ সম্পত্তিরও মালিক। কিংবা নিজেদের হয়তো ছোটখাট ব্যবসা আছে বা তারা হয়তো কিছু শ্রমিকও পরিচালনা করছেন। তবে যেসব নারীদেরকে উন্মুক্ত স্থানে দেখা যেত, তাদের ঘরের পুরুষদের জন্য অবশ্য সেটা খুব স্বস্তিদায়ক ছিল না।

সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত শ্রেণির লোকেরা তাদের পরিবারের নারীদেরকে সচেতনভাবেই ঘরের ভেতরে রাখতেন এবং তাদেরকে দিয়ে নানারকমের গৃহস্থালি কাজকর্ম সম্পাদন করতেন। আমার মতে এর দুটি কারণ হতে পারে। এক নারীরা বাইরে কাজ করছে এটা বাড়ির পুরুষদের জন্য অপমানজনক। কারণ, একজন পুরুষ সুস্থ থাকার পরও তার বাড়ির মেয়েদেরকে কাজ করতে হওয়াটা তখন শোভনীয় ছিল না। আরেকটি কারণও ছিল। হয়তো পুরুষেরা চাইত যে,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তাদের নারীদেরকে যেন বাইরের অন্য পুরুষেরা খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে না পারে। নারীরা বাইরে গেলেই অনেকের সাথে তাদের কথা বার্তা ও লেনদেন করতে হতো, ফলে অনেকেরই তাদের ওপর কুনজর পড়তে পারে। সে রকম সম্ভাবনাও যে ছিল না তা নয়। যাইহোক, সব মিলিয়ে সমাজের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই এমন ছিল যে নারীদেরকে চোখের আড়ালেই রাখতে হবে। এমনকি যেই নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েরাও বাইরে কাজ করত, তাদের ঘরের পুরুষ সদস্যরাও সব সময় একটা চাপে থাকত যাতে তাদের পরিবারের নারীদেরকে আর বাইরে যেতে না দেয়া হয়। আর যারা সামাজিক এসব চাপকে পাত্তা দিত না তাদেরকে আবার সমাজের চোখে ভালোভাবে দেখা হতো না।

একই অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছিল সুলতানের হারেমখানাতেও। প্রাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিশেষজ্ঞরা মনে করে হারেমখানাগুলো ছিল সুলতানদের শারীরিক চাহিদা মেটানোর একটি ক্ষেত্র। তাদের ব্যাখ্যায় মনে হয় যে হারেমখানায় সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত শুধু যৌন কার্যক্রমই হতো। কিন্তু সেটা আসলে অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যা। সুলতান ছিলেন একজন মাত্র ব্যক্তি, তিনি ছাড়া হারেমখানার ঐ নারীদেরকে আর কেউ দেখার সুযোগ পেত না। কিছু নিরাপত্তাকর্মী বা সেবক ঐ নারীদেরকে দেখতে পেলেও তারা ছিল শারীরিকভাবে অক্ষম। আচার আচরণে ছিল অনেকটা হিজড়াদের মত। পশ্চিমারা শুনলে হয়তো অবাক হবেন, সুলতানরা বিশ্রামের সময় পেলেও হারেমখানায় গিয়ে ব্যস্ত থাকতেন না। একজন হিজড়া সেবক বা নিরাপত্তাকর্মীর দায়িত্ব ছিল সুলতানের জন্য প্রতি রাতে একজন করে নারীকে বাছাই করা। আর সেই নারীকে সেই সেবক অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে বাছাই করে অন্ধকার নামার পরে নীরবে সুলতানের কামরায় রেখে আসত।

হিজড়া সেবকগুলো নির্বিঘ্নে হারেমখানা জগৎ এবং বাইরের জগতে যাতায়াত করতে পারত বিধায় তারাই হারেমে থাকা মেয়েগুলোর চোখ, কান ও হাতে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ হারেমের মেয়েরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে যতটুকু জানত, শুনত বা দেখত তা এই সেবকদের মাধ্যমেই। সুলতানের যারা সন্তান সন্তুতি ছিলেন তারাও ১২ বছর বয়স হওয়ার আগ পর্যন্ত হারেমেই বড় হতো। এর বাইরে তাদের সাধারণ মানুষদের সাথে কখনো মেশার সুযোগ হতোনা। তাই সাধারণ বয়ঃসন্ধিতে ছেলে মেয়েরা যেভাবে বড় হতো বা যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করত, সুলতানের ছেলেমেয়েরা তার থেকে অনেক দূরে থাকত। সুলতানের ছেলে যুবরাজ থেকে যখন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসার অবস্থায় পৌছাতো তত দিনে তারা একটি অসামাজিক প্রাণীতে পরিণত হতো! কারণ, তারা হারেম ছাড়া আর কোথাও সময় কাটাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করত না। তারা অনেক সময় হারেম ষড়যন্ত্রেরও স্বীকার হতেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

হারেমের আরেকটি বড় ষড়যন্ত্র এ রকম ছিল যে, একজন যুবরাজ সিংহাসনে আসীন হওয়ার পরও অন্য যুবরাজের মায়েরা আশায় বুক বেঁধে থাকতেন, হয়তো তাদের ছেলেও কোনো একদিন সিংহাসনে বসবেন। কারণ, কোনো মায়ের গর্ভের সন্তান সিংহাসনে বসলে সেই মায়ের অবস্থান অনেক সম্মানজনক ও গৌরবোজ্জ্বল জায়গাতে পৌঁছে যেত। সে কারণেই যুবরাজের মা এবং তার সঙ্গীরা মিলে তাদের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে হত্যা করার জন্য নানা ধরনের চেষ্টা তদবির চালাত। প্রাসাদের বাহিরে ও অন্দরে সবখানেই এই ষড়যন্ত্রের দেখা মিলতো। এতসব ষড়যন্ত্র অতিক্রম করে যে যুবরাজ সিংহাসনে বসতেন তিনি শুধু নিজেই বিজয়ী হতেন তা নয় বরং তার সঙ্গে থাকা হারেমের অন্য সব নারীরাও এবং তার সেবকেরা বিজয়ের স্বাদ পেত। অটোম্যান যুবরাজেরা এভাবেই তখন বড় হতেন। তারা নিজেরাও জানতেন, হয় তারা এই বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিতে পরিণত হবেন আর না হয় তারা পরিণত বয়সে পৌঁছানোর আগেই মারা পড়বেন।

এর ফলে যা ঘটে তা হলো, নানারকম ষড়যন্ত্রের কারণে দক্ষ যুবরাজেরা নিহত হন। আর অযোগ্য, চরিত্রহীন এবং অলস কিছু ব্যক্তি সুলতানের চেয়ারে বসার সুযোগ পান। তবে এই দুর্বল শাসকদের জন্যই যে অটোম্যান শাসনের অবসান হয়েছিল তা কিন্তু নয়। কারণ, তত দিনে প্রশাসনিকভাবে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু হয়ে গিয়েছিল তাই সুলতানকে এককভাবে আর সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে হতো না। সুলতানের যে রমরমা অবস্থান ও মর্যাদা ছিল, তা সুলতান দ্য ম্যাগনিফেশেন্ট মারা যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষয় হতে শুরু করে। আর সুলতানের জায়গায় উজিররা চলে আসেন অর্থাৎ নির্বাহী ক্ষমতার বেশিরভাগই উজিররা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন।

যদিও আলিশান দরবার এবং বিশাল হারেমখানা অটোম্যান সাম্রাজ্যের ক্ষতিই করছিল। কারণ, এটা চালাতে অনেক টাকা লাগত অথচ সেই অর্থে এখান থেকে ভালো কোনো ফায়দা পাওয়া যেত না। এমনকি কোনো সিদ্ধান্ত এই দরবার বা হারেমখানা থেকে আর আসত না। উজিররাই মূলত দরবারের সব নিয়মিত কাজ করত আর এই বিশাল স্থাপনার পেছনে অহেতুক খরচও করত। ফলে সার্বিকভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রম অনেকটাই ধীর ও শ্লথ হয়ে পড়েছিল।

শুধু অটোম্যানরাই যে সংকটে ছিল তা নয়। ১৬০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পারস্যের সাফাভিদও সংকটে পড়ে গিয়েছিল। ইউরোপিয়ানরা এই সংকটটাকে তাদের মতো করে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছিল। তবে বাস্তবতা হলো মূলত সাম্রাজ্যের ভেতরকার অন্তর্দ্বন্দ্ব আর কলহই এই সংকটের জন্ম দিয়েছিল। প্রথমত রাজতন্ত্র সংকটে পড়েছিল, রাজা আর যুবরাজদের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মাত্রাতিরিক্ত আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার কারণে। যখনই কোনো রাজা মারা যেত তখনই তার সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর মধ্যে মারামারি লেগে যেত। এসব পার হয়ে যে রাজা হতো তাকে অনেকটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা রাজ্যের দায়িত্ব নিতে হতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব নতুন রাজারা সেই সংকট কাটিয়ে ওঠার মতো যোগ্য ছিল না। ফলে সাম্রাজ্যের সোনালি দিন একসময় রূপালি দিনে পরিণত হলো। রূপালি দিন একসময় পরিণত হলো তামাটে দিনে। তারপর একসময় সাম্রাজ্য তার কর্দমাক্ত দুঃসময়েও পৌছে গেল।

যখন সাফাভিদরা প্রথম ক্ষমতায় এসেছিল, তারা শিয়াকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেয়ার মাধ্যমে ইসলামের একটি পারস্য সংস্করণ চালু করেছিল। এটা প্রথমদিকে তাদের জন্য ভালোই হয়েছিল কারণ, এটা গোটা জাতির ভেতরে একটি সংহতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। যা পারস্যকে একটি বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হতে সহায়তা করেছে। কিন্তু আরেকটা সমস্যাও তৈরি হয়েছিল। সাফাভিদরা শিয়াকে রাষ্ট্রধর্ম করায় তারা সুন্নিদেরকে অনেকটা একঘরে করে ফেলেছিল। তাই যখনই সিংহাসনের অবস্থা নড়বড়ে হয়ে গেল সেই বঞ্চিত সুন্নিরা সুযোগটা গ্রহণ করল এবং তারা বিদ্রোহ শুরু করল।

শিয়াকে রাষ্ট্রধর্ম করার আরেকটা খারাপ দিকও ছিল। এ রকম আনুকূল্য পাওয়ার সুবাদে শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পণ্ডিতেরা সাংঘাতিক রকমের আত্মঅহমিকায় আক্রান্ত হলো। বিশেষ করে মুজতাহিদরা যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরেই চলে গেল। মুজতাহিদ বলতে এমন পণ্ডিতদেরকে বুঝানো হতো, যারা মনে করেছিলেন যে তারা এতটাই বেশি জেনে গেছেন, এখন তারা নিজেরাই ধর্মীয় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতে পারবেন। এখন এই গ্রুপটিকে আয়াতুল্লাহ্ বলা হয়। এই শিয়া পণ্ডিতেরা হঠাৎ দাবি করে বসলেন, পারস্য যদি আসলেই শিয়া রাষ্ট্র হয় তাহলে রাজাকে তাদের অনুমোদন নিয়েই দেশ চালাতে হবে। কারণ, তারাই শুধু অদৃশ্য ইমামের (১২ নং ইমাম) প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলছেন। এসব পণ্ডিতের আবার মধ্যবিত্ত লোক বিশেষ করে কৃষক ও বণিকশ্রেণির ওপর সাংঘাতিক প্রভাব ছিল। এই পরিস্থিতিতে সাফাভিদ রাজারা উভয় সংকটে পড়ে যান। যদি তারা আয়াতুল্লাহদের দাবি মেনে নিয়ে তাদের কথামত দেশ চালান তাহলে, তাদের কোনো আধিপত্য আর থাকবে না। আয়াতুল্লাহরাই সব ক্ষমতার মালিক হয়ে যাবে। আর অন্যদিকে যদি তারা এই আয়াতুল্লাহদের দাবিকে সরাসরি অগ্রাহ্য করেন তাহলে তারা জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন দুই-ই হারাবেন।

রাজারা দ্বিতীয় উপায়টিই বেছে নিলেন অর্থাৎ তারা আয়াতুল্লাহদেরকে অগ্রাহ্য করলেন। কিন্তু যেহেতু তারা এর ফলে জনসমর্থন হারাচ্ছিলেন তাই তাদের টিকে থাকার ভিন্ন কোনো শক্তির সহযোগিতার দরকার ছিল। তারা সেনাবাহিনীর

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

শরণাপন্ন হলেন। কারণ, সেনাবাহিনী ছাড়া তাদের আসলে আর কারও কাছে যাওয়ার সুযোগও ছিল না। আর সাফাভিদ সেনাবাহিনীতে তখন প্রশিক্ষক ও পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করত পশ্চিম ইউরোপ থেকে আসা বিশেষজ্ঞরা। ফলে সাফাভিদ রাজা তার রাজত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে জনসম্পৃক্ত ইসলামি পণ্ডিতদেরকে পরাস্ত করার জন্য ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টানদের সাথে হাত মেলালেন। কিন্তু তাদের এই কৌশলটি মোটেও সঠিক ছিল না।

১৮ শতকে এসে সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব কলহ আরও জটিল আকার ধারণ করে। একপক্ষ প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে এবং নিজের শক্তি বৃদ্ধি করার স্বার্থে আরও বেশি ইউরোপিয়ান পরামর্শক ও ইউরোপিয়ান অস্ত্র আমদানি করে। এরপরে এমন একটা সময় চলে এল যে, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে একক কোনো বিজয়ী পাওয়া গেলনা। সিংহাসনের জন্য যারা সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তারা একেকজন একেকটি এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন। সাম্রাজ্যের এই টলমলে অবস্থা দেখে সুন্নি নিয়ন্ত্রিত প্রদেশগুলো আলাদা হয়ে গেল। বিশেষ করে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে আফগান ও উজবেক অঞ্চলটি নিজেরাই আলাদা রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করল।

ক্ষমতা নিয়ে এই ধোয়াশা অবস্থাটি পরিষ্কার হওয়ার পর দেখা গেল যে সাফাভিদের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। আজকের ইরান অঞ্চলটি ১৩১ বছর শাসন করে কাজার নামক একটি রাজবংশ। ইউরোপিয়ানরা তখনো এই অঞ্চলটিকে পারস্য বা পারসিয়া বললেও স্থানীয়রা তত দিনে একে ইরান হিসেবে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। কাজারের শাসনের আওতায় সাফাভিদের শেষ সময়কার সেই অস্থিরতাগুলো কিছুটা সঙ্কুচিত হয়। ইউরোপীয় পরামর্শকদের পাল্লায় পড়ে সেনাবাহিনী বেশ গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে যায়। আর উলামারাও সিংহাসনের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে বেশ বেকায়দায় ছিল। বিভিন্ন জায়গায় বিদেশিদের প্রভাব দেখে উলামারা বুঝলেন তারা এভাবে খুব একটা সুবিধা করতে পারবেন না। ফলে তারা ঐতিহ্যবাহী ইসলামিক সংস্কৃতির অভিভাবক হিসেবেই দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। এই কাজে তারা বরাবরের মতো নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সমর্থন পান। যারা তখনো রাজা ছিলেন তারা ছিলেন অলস, বখাটে, অদূরদর্শী এবং দুর্বল। এই সুযোগে ইউরোপিয়ানরা তাদেরকে নিজেদের ইচ্ছেমত ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

ইউরোপিয়ানরা কখনোই পারস্যে আক্রমন করেনি, দখলও করে নি। তারা এখানে এসেছিল পণ্য কেনা বেচার করার জন্যই। কিন্তু যখন কোনো জায়গার সব পদ্ধতি বা সিস্টেম ভেঙে পড়ে তখন সুবিধাবাদীরা সুবিধা নেবে, এটাই স্বাভাবিক। ইউরোপিয়ানরাও তাই করেছিল। তারা সমাজের যেখানেই ফাটল

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দেখতো সেদিক দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ত। তারপর নিজেরা কুবুদ্ধি করে সেই ফাটল ও বিভাজনকে আরও বৃদ্ধি করত যতক্ষণ না তারা পুরো পরিস্থিতিটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারত।

ইউরোপিয়ানরা অবশ্য খেয়াল করেনি, তারা পারস্যকে ক্রমাগতভাবে গিলে ফেলছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যেই তীব্র পরিচয় সংকট রয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল থেকেই পারস্যে লোক এসেছিল। পারস্যরা নিজেরাই যখন দুর্বল হয়ে গেল তখন তারা আর ইউরোপিয়ানদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ রইলো না। সমস্যাটা হলো তাদের নিজেদের মধ্যেই। ইউরোপিয়ানদের মধ্যেই এক অঞ্চলের লোকেরা আরেক অঞ্চলের লোকের বিরুদ্ধে লেগে গেল। ইংরেজ, ফরাসি, রাশিয়ান বা ওলন্দাজরা পারস্যের নেতৃত্বের শূন্যতার সুযোগ নিচ্ছিল এটা ঠিক। তবে তাদের মূল চেষ্টা ছিল যাতে অন্য ইউরোপিয়ানরা কেউ শাসন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিতে না পারে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাটি শেষ পর্যন্ত এসে রাশিয়া আর গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যেই জিইয়ে থাকল। আর প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই সংকটটি বুঝতে হলে সেই সময়ে প্রাচ্যে আরও যেসব ঘটনাগুলো ঘটছিল তা আমাদেরকে জানতে হবে। বিশেষ করে মোঘল সাম্রাজ্যের কাহিনি আমাদেরকে পর্যালোচনা করতে হবে।

মোঘল সাম্রাজ্যের শুরু থেকেই যে সংঘাতটি দেখা যায় তা ছিল মূলত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। আকবর দ্য গ্রেট অবশ্য এই সংঘাত সমাধানে তার মতো করে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তবে আওরঙ্গজেব এসে আবার আকবরের সব নীতিমালা বাতিল করে দেয়। মূল ধারার ইসলামি বিধান চালু করে, হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে এবং শিখদের মতো সংখ্যালঘুদেরকে নির্মূল করে দেয়ার চেষ্টা করে। তবে আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন দুর্দান্ত শাসক। তিনি যে শুধু তার সাম্রাজ্যকে এক করে রাখতে পেরেছিলেন তাই নয় বরং তিনি সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারণও করেছিলেন। সাম্রাজ্যের ভেতরকার যে বারুদ ও উত্তেজনা, তা তিনি বেশ ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন। যা আওরঙ্গজেব ছাড়া আর কোনো দুর্বল শাসক হলে কখনোই সম্ভব হতো না।

কিন্তু দুর্বল শাসকটি চলে আসলেন আওরঙ্গজেবের পরপরই। আর তার পরের জন আরও দুর্বল, তারপরের জন আরও। প্রথম দুইশ বছরে মোঘল সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিল মাত্র ৬ জন। আর পরবর্তী ৫০ বছরে ৮ জন সম্রাট সিংহাসনে বসেছিলেন। প্রথম ৬ জনের মধ্যে ৫ জনকেই ইতিহাস অসাধারণ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আর পরের ৮ জনের মধ্যে একজনও ইতিহাসে কোনো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করতে পারেননি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই ৮ জন দুর্বল সম্রাটের সময়ে তাদের অযোগ্যতার সুযোগ নিয়ে দক্ষিণের এক হিন্দু রাজা মারাঠাবাসীদেরকে বিদ্রোহ করার আহবান জানায়। শিখরা তো আগে থেকেই সশস্ত্র অবস্থায়ই ছিল। আর নওয়াব ও অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্নররাও সম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে আসা কোনো হুকুম মানছিল না। তারা সকলেই স্বতন্ত্র হিসেবে কাজ করতে শুরু করল। ফলে ভারতবর্ষ অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল এবং বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ও মুসলমানরা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল। ফলে এই অঞ্চলের গন্তব্য এক ধরনের অনিশ্চয়তায় পড়ে গেল।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই ইউরোপিয়ান বিভিন্ন জাতি বিশেষ করে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজরা এই এলাকার বিভিন্ন স্থানে বিশেষত উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যবসা করে বেশ ভালো অবস্থানে পৌছে গিয়েছিল। প্রথমদিকে ভারতবর্ষের ব্যবসা বাণিজ্যে পর্তুগিজরাই বেশি প্রভাবশালী ছিল। সেই জায়গা দখল করে নেয় ওলন্দাজরা। তারা সেই সময়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এবং পারস্যেরও কিছু জায়গায় ব্যবসায়িক কেন্দ্রের পাশাপাশি কিছু দুর্গও নির্মাণ করে। ওলন্দাজরা পর্তুগিজদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করে। কারণ, তাদের হাতে ভালো মানের জাহাজ ও উন্নত অস্ত্রের মজুদ ছিল। ফরাসি এবং ইংরেজরা এসেও শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে নেয়। ইংরেজরা ১৬৩৯ সালে মাদ্রাজে দুর্গ নির্মাণ করে। একসময় তারা বোম্বের (আজকের মুম্বাই) নিয়ন্ত্রণও নিয়ে নেয়। বোম্বেটা ইংরেজরা পায় যৌতুক হিসেবে। ইংরেজদের এক রাজকুমার পর্তুগিজ এক রাজকুমারীকে বিয়ে করলে উপঢৌকন বা অনেকটা যৌতুক হিসেবে এই বোম্বে শহরটি লাভ করে। এরপরই ইংরেজরা বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেষে উপনিবেশ স্থাপনে মনোনিবেশ করে। তারা তাদের প্রথম ঘাটি স্থাপন করে কলকাতায়।

তৎকালীন সময়ে যে ইউরোপিয়রা পূর্ব এশিয়ায় পা রেখেছিলেন, তারা আসলে বিশ্ব ইতিহাসে কিছু অনন্য নজির স্থাপন করেন। তারা কেউই জেনারেল বা সেনা ছিল না, রাজার দূত হিসেবেও এই এলাকায় আসেননি, কোনো সরকারেরও প্রতিনিধি ছিলেন না; তারা ছিলেন কিছু প্রাণভেট প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত কর্মচারী। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিটি কোনো সাধারণ কোম্পানি ছিল না। এটা ছিল অনেকটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানির মতো। যেগুলোকে আমরা আজকের সময়ে এসে কর্পোরেশন্স নামে অভিহিত করি।

এই ধরনের প্রথম কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫৫৩ সালে, যখন ৪০ জন ইংরেজ বণিক ঐকমত্যে এসে প্রত্যেকে ২৫ পাউন্ড করে জমা দিয়ে একটি তহবিল গঠনের মাধ্যমে ভারতবর্ষে নৌ অভিযান চালনার সিদ্ধান্ত নেয়। যখন ভারতবর্ষে এই অভিযান চালনার পরিকল্পনাটি জানাজানি হয়ে যায় তখন

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অনেকেই মুনাফার আশায় এই কোম্পানিতে বিনিয়োগ করার জন্য এগিয়ে আসে। যারা সাবস্ক্রিপশন ফি জমা দেয় তাদেরকেই কোম্পানির পক্ষ থেকে একটি স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে বলা হয়, কোম্পানি যদি এই অভিযান থেকে লাভ করে তাহলে তাদেরকে আনুপাতিক হারে মুনাফা দেয়া হবে। আর এই স্লিপটি তারা বাইরের কাউকেও ইচ্ছে হলে বিক্রি করে দিতে পারবেন। আর এভাবেই প্রথম স্টক মার্কেটের মতো চিন্তা নিয়ে এই কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬০০ সালে এসে গোটা ইউরোপে একই ধরনের ভাবনা নিয়ে একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেখানে ইংরেজ ছিল, ওলন্দাজ ছিল, ফরাসিও ছিল। কোম্পানিটির নাম দেয়া হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। প্রতিটি দেশের পক্ষেই সেই দেশের কিছু বিনিয়োগকারী এই কোম্পানিতে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রত্যেকেই এখানে অংশ নিয়েছিল, ভারতবর্ষে কাঙ্ক্ষিত অভিযান করে সেখান থেকে কিছু লাভ করার খায়েশ নিয়ে। প্রতি দেশের পক্ষ থেকেই কোম্পানির পরিচালনা পরিষদে কিছু পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছিল, যারা নিজের দেশের স্বার্থরক্ষার বিষয়টা তদারকি করতেন।

পরবর্তী ২০০ বছরে এই কোম্পানিটি ভারতবর্ষের প্রচলিত অর্থনীতির সকল সিস্টেমকে ওলট পালট করে দেয়, যেমনটা হয়েছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও। বঙ্গভূমিতে সকল ইউরোপিয়ানদেরকে সরিয়ে ইংরেজরা একাই তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ইস্ট ইন্ডিয়া নামের এই কোম্পানিটি বাংলার চিরায়ত হস্ত ও কারুশিল্পকে ধ্বংস করে দেয়। আর এটা তারা করেছিল ভিন্ন কৌশলে। প্রথমে এই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাঁচামাল তারা বেশ ভালো দাম দিয়েই কিনে নিয়েছিল। স্থানীয় মানুষও টাকার লোভে পড়ে গেল। তাই তারা নিজেরা উৎপাদন করার কথা না ভেবে সব কাঁচামাল ইংরেজদের কাছে বিক্রি করে দিল। এভাবে একসময় স্থানীয় অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গেল এবং আদিবাসী বাঙালিরা প্রাথমিকভাবে ইংরেজদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে গেল। আরও কিছু পরে গিয়ে পুরোপুরিই অধীনস্ত হয়ে পড়ল।

যখন কর্পোরেশনের লোকেরা প্রথমবারের মতো ভারতবর্ষে আসে। তারা মোঘল সম্রাটদের আস্থা অর্জনের জন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন অ তারা সেই সম্রাটদের পেছনে সময় দেয়া বন্ধ করে দেয়। কারণ, তারা বুঝে গিয়েছিল এই সম্রাটের কথায় বা সিদ্ধান্তে এখন আর খুব বেশি গুরুত্ব নেই। তারা বরং স্থানীয় বিভিন্ন জমিদার ও আঞ্চলিক শাসকদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। তবে সব আঞ্চলিক রাজাই এক মানসিকতার ছিল না। আর এখানে প্রতিটি রাজাকে গিরে কূটকৌশল

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রও ছিল অনেক। ইংরেজরা বুঝে গিয়েছিল যে তারা যদি এই ষড়যন্ত্রের চক্করে পড়ে যায় তাহলে কোম্পানিরই বরং লোকসান হবে। তাই তারা এগুলোর মধ্যে সরাসরি জড়িত না হয়ে নানা মহলকে উস্কানি দিত এবং যা ঘটতো সেখান থেকেই ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করত। এক পর্যায়ে ইংরেজদেরকে যারা পৃষ্ঠপোষকতা করছিল তাদেরই সহায়তা করার নামে ইংরেজরা একসময় এই এলাকায় সৈন্য নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। পারস্যতেও তাই হয়েছিল। সেখানেও সেনাবাহিনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে ইউরোপিয়ানরা ঢুকে গিয়েছিল যে, প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে যুদ্ধ করত তা আসলে আর পারস্যবাসীর যুদ্ধ ছিল না। কারণ, তাতেও ইউরোপিয়ানরাই যেন আরেক ইউরোপিয়ান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। ভারতবর্ষেও ইংরেজরা তাই করেছিল। তবে এখানে তারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ না নিয়ে বরং একে অন্যেও বিরুদ্ধে এক ধরনের পরোক্ষ যুদ্ধে (প্রক্সি ওয়ার) থাকার কৌশল অবলম্বন করে। পর্তুগিজরা প্রথমেই হেরে যায়, এরপরই পরাজিত হয় ওলন্দাজেরা। তারা ভারতবর্ষের মূল এলাকায় টিকতে না পেরে কোনোমতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্য কিছু এলাকায় গিয়ে ঠিকানা গড়ে। আর ভারতবর্ষের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য নিয়ে যে প্রতিযোগিতা সেখানে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ আর ফরাসিরাই টিকে থাকে।

এর আগে উত্তর আমেরিকাতেও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এই ইংরেজ ও ফরাসিরাই টিকে ছিল। ফলে বলা যায়, পৃথিবীর অর্ধেকটা জুড়েই এই দুই জাতি নিজেদের মধ্যে নানা ধরনের কলহ ও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। যাহোক, ক্ষমতা নিয়ে লড়াইয়ের মাঝেই একনাগাড়ে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে। যার ফলে একটা সময়ে গিয়ে পুরো ভারতটাই একটি ব্রিটিশ কলোনি বা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার আওতায় চলে আসে।

এটা শুরু হয় ১৭৫৪ সালে। যখন জর্জ ওয়াশিংটন নামের একজন ব্যক্তি ওহাইয়ো নদীতে ফরাসি একটি বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে। গোলাগুলি শুরু হয় এবং সেই গোলাগুলিতে একজন ভার্জিনিয়ান এবং ১০ জন ফরাসি নাগরিক নিহত হয়। তখন থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। উত্তর আমেরিকায় এই দুইপক্ষ ফ্রেঞ্চ ও ইন্ডিয়ান ওয়ারে লিপ্ত হয়। ইউরোপে তারা সেভেন ইয়ার্স ওয়ারে জড়িত ছিল আর ভারতেও এই দুই পক্ষ যুদ্ধ করছিল। ইতিহাসে যা 'থার্ড কারনেটিক ওয়ার' নামে অভিহিত হয়।

অর্থাৎ ভারতে ইউরোপিয়ান এই দুই প্রতিপক্ষ আগে থেকেই আধুনিক মাদ্রাজের উত্তরে কার্নেটিক অঞ্চলে প্রক্সি ওয়ারে লিপ্ত ছিল। তারা চাইছিল তাদের আস্থাভাজন শক্তিগুলোকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে। যুদ্ধটি মূলত হচ্ছিল ব্রিটেনের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ফ্রান্সের মধ্যে। ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতায় থাকা ব্রিটিশ দুর্গটি কজায় নিয়ে নেন। জুন মাসের কোনো এক রাতে এই নবাবকে না জানিয়েই তার ঘনিষ্ঠ কোনো একজন ব্যক্তি ৬৪ জন ব্রিটিশ নাগরিককে একটি ভূগর্ভস্থ বাতাসহীন রুমে বন্দি করে। কোনো একজনের সেই রাতে এই ব্রিটিশ নাগরিকদেরকে বের করে নিরাপদে দেশে পাঠিয়ে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সময়মতো সিগন্যাল না আসায় ঐ বন্দিরা সারা রাত ঐ অন্ধকার ঘরেই আটকা পড়ে থাকে। আর সকাল হতে না হতেই বন্দিদের মধ্যে ৪৩ জন মারা যায়।

এই সংবাদটি জলদি ইংল্যান্ডে পৌঁছে যায়। সকল সংবাদপত্র খবরটি পেয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। নবাবের সেই ভূগর্ভস্থ ঘরকে নিয়ে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম দেয়া হয় 'দ্য ব্ল্যাক হোল অব কলকাতা'। প্রতিটি খবরে সেই ভূগর্ভস্থ ঘর সম্বন্ধে বিবরণীর ভয়াবহতা যেমন বাড়ছিল, ঠিক তেমনি নিহতের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১২৩ এ গিয়ে পৌঁছায়। অথচ এতজন লোককে বন্দিও করা হয়নি, তো নিহত হবে কোথা থেকে? যাহোক অতিরঞ্জিত এই খবরটি পেয়ে ব্রিটিশ জনগণও উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একসময়কার কেরানি লর্ড ক্লাইভ, তিনি তখন কোম্পানির সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ নাগরিক হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কলকাতায় রওয়ানা দেন। তিনি নবাবকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নবাবের চাচাকে সিংহাসনে বসান। সেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধ হয়। ক্লাইভ নবাবের আস্থাভাজন লোকদেরকে ঘুষের বিনিময়ে কিনে নেন এবং তাদেরকে দিয়েই নবাবকে গ্রেফতার ও হত্যা করেন।

কিন্তু এরপরও ব্রিটিশরা নিজেদেরকে ভারতবর্ষের শাসক হিসেবে দাবি করেনি। এমনকি তারা বাংলার শাসনভারও হাতে তুলে নেয়নি। প্রশাসনিকভাবে বাংলা তখনো মোঘল সাম্রাজ্যের আওতায় ছিল এবং একজন বাঙালিই সেই প্রদেশ শাসন করত। ক্লাইভ নিজেকে প্রাদেশিক সরকারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয় এবং সেই পদে থাকার জন্য তিনি সে বছরে ৩০ হাজার পাউন্ড পরিমাণ অর্থ বেতন হিসেবে নিতে শুরু করেন। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসকদের উপদেষ্টা হিসেবেই দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখে, এর বেশি কিছু নয়। কোম্পানিটি সে সময়ে মোঘল শাসকদের পক্ষে রাজস্ব আদায় করতে শুরু করে এবং নিজেদের মতো করে সেই অর্থ খরচ করাও শুরু করে। কোম্পানির নিজস্ব সেনাবাহিনী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত হয়। কিন্তু এরপরও কোম্পানি দাবি করে যে তারা বাংলা শাসন করছে না বরং টাকার বিনিময়ে তাদেরকে সেবা দিচ্ছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্রথম কয়েক বছরে ব্রিটিশরা বাঙালিদের জন্য তেমন কিছুই করেনি। কোম্পানি প্রশাসনিক কার্যক্রমগুলো স্থানীয়দের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা মূলত অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোই দেখতে শুরু করে। বাস্তবে বিষয়টা এমন ছিল যে, ক্ষমতাহীন সরকার জনগণের ভোগান্তি ও সমস্যা সমাধান করার জন্য দায়ী। আর যারা ক্ষমতাবান অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তারা সব ফায়দা ঠিকই বুঝে নিত। কিন্তু জনগণের কল্যাণে কিছু করত না। কারণ, তাদের যুক্তিমতে তারা তো আসলে কখনোই সরকারে ছিল না। কোম্পানির-কর্মকর্তা- কর্মচারীরা শোষণ করতে করতে বাংলাকে প্রায় শুকিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু যখনই তাদের অন্যায়ের কারণে সৃষ্ট কোনো সমস্যা নিয়ে কথা ওঠত, তখনই তারা সব দায় সরকারের ঘাড়ে ফেলে দিত। বাংলার অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, এক সময়ের সমৃদ্ধ বাংলায় মারাত্মক ধরনের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাতে মাত্র দুই বছরের মাথায় জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মারা যায়। ধারণা করা হয়, সেই সময়ে এক কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা যায়। এই ভয়ংকর দুর্গতির জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার কিছুটা সক্রিয় হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতবর্ষের জন্য একজন গভর্নর জেনারেল নিয়োগ দেয়। তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিজেদের আওতায় নিয়ে আসে এবং উপমহাদেশের জন্য আলাদা সৈন্য প্রেরণ করে। পরবর্তী ১০০ বছরে ভারতবর্ষে দুই ধরনের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কার্যক্রম দেখা যায়। এর একটি ছিল 'জন্' কোম্পানি যারা কর্পোরেশনের পক্ষে কাজ করত আর আরেকটি হলো 'কুইন্স কোম্পানি' যারা ব্রিটিশ রাজ পরিবারের পক্ষে কাজ করত। এখানে উল্লেখ্য যে, এসব বাহিনীর শুধু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারাই ছিল ইউরোপিয়ান। আর মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করত বা ভারি বন্দুক নিয়ে চলাফেরা করত তারা সবাই ছিল স্থানীয় নাগরিক।

বাংলায় ক্লাইভ নতুন কিছু পদক্ষেপ নেন যা কালক্রমে অন্যান্য প্রদেশেও গ্রহণ করা হয়। তিনি নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেন যার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে, ভারতবর্ষের যেকোনো জায়গায় শাসক নিয়োগ বা উৎখাতের ক্ষমতা ব্রিটেনের হাতে থাকবে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করেই সেই পদক্ষেপগুলো নেয়া হবে। ১৭৬৩ সালের পরে গোটা ভারত জুড়েই এই নীতিমালার প্রয়োগ শুরু হয়ে যায়। কারণ, সে বছরই ব্রিটিশদের একমাত্র গলার কাঁটা হয়ে ঝুঁলে থাকা ফরাসিদের সর্বশেষ গ্রুপটিও সেভেন ইয়ার্স ওয়ারে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যায়।

ব্রিটেন কয়েক দিনের মধ্যেই আরেকটি নতুন আইন প্রণয়ন করে। যদি কোনো ভারতীয় শাসক তার কোনো পুত্র উত্তরাধিকারী না রেখেই মারা যায়, তাহলে সেই

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

রাজ্যটি ব্রিটিশ রাজপরিবারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। এই প্রক্রিয়াতে ভারতবর্ষের অনেকগুলো প্রদেশের দায়িত্ব গ্রেট ব্রিটেন নিয়ে নেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা এমন কিছু অনুগত স্থানীয় ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়, যারা প্রকারান্তরে ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা এবং স্বার্থকেই প্রাধান্য দিত। শেষমেশ ভারতবর্ষটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্রিটেনের আওতায়ই চলে যায়। আর এভাবেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের শীর্ষ ক্ষমতাধর হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং তারা মোঘলদের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে।

মজার ব্যাপার হলো, গ্রেট ব্রিটেন যখন ভারতবর্ষে ক্রমশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছিল, ঠিক একই সময়ে তারা আবার উত্তর আমেরিকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিল। জেনারেল কর্ন ওয়ালিশ যাকে জর্জ ওয়াশিংটন ইয়র্কটাউনে পরাজিত করেছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষে তিনি ভালোভাবেই ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। আমেরিকার ইতিহাসে যদিও কর্নওয়ালিশ একজন পরাজিত ব্যক্তিই ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে যান তখন অনেক বেশি সম্মান পেয়েই গত হন। কারণ, তার নেতৃত্ব ও যোগ্য প্রশাসনিক দৃঢ়তার কারণেই ভারতবর্ষ সেই সময়ে ব্রিটিশ উপনিবেশের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন হিসেবে পরিগণিত হয়। যাকে ভিত্তি করে ব্রিটিশরা বিশ্বজুড়ে আধিপত্যমূলক কার্যক্রমও বিকশিত করে।

ভারতবর্ষ যেহেতু প্রাকৃতিক সম্পদের আধার ছিল, তাই এখান থেকে সম্পদ লুট করে নিয়ে সেই টাকা দিয়ে ব্রিটিশরা আফ্রিকা ও বিশ্বের আরও অনেক জায়গাতেই অভিযান পরিচালনা করে। ভারতবর্ষই যেহেতু তাদের সেই সম্প্রসারণবাদের মূল ভিত্তি ছিল, তাই তারা ভারতবর্ষের জন্য কোনো হুমকি সামনে আসলে সেটাকে খুব শক্তভাবে মোকাবেলা করত। এ রকমই একটি হুমকি হয়ে আসে রাশিয়া। সময়টা ছিল ১৮ শতকের শেষ থেকে শুরু হয়ে ১৯ শতকের গোড়া পর্যন্ত।

রাশিয়ার হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার ঘটনাটি অনেকটা এ রকম-তুর্কিরা কন্সট্যানটিপোল জয় করায় কট্টরপন্থী খ্রিষ্টানেরা সংকটে পড়ে। কারণ, রোমের পর কন্সট্যানটিপোলই খ্রিষ্টানদের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত শহর ছিল। এটা ছিল তাদের কাছে দ্বিতীয় রোমের সমতুল্য। কিন্তু একটা ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহলে বিশ্বাসটি কি করে বাঁচবে? সেই পরিস্থিতি থেকে উত্তরন করার জন্য মস্কোর গ্র্যান্ড ডিউক এগিয়ে আসেন। তৃতীয় ইভান নামের এই ব্যক্তি তার নিজ শহরকে তৃতীয় রোম হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে তার শহরটি মৌলবাদী খ্রিষ্টানদের ঘাটিতে পরিণত হয়। তার নাতি ইতিহাসে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পরিচিত ইভান দ্য টেরিবল হিসেবে তিনি সিজারের উপাধি ধারণ করেন এবং প্রাচীন রোমের রাজকীয় ধারাটি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। ১৬৮২ সাল থেকে ১৭২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সিজারদের মধ্যে একজন, পিটার দ্য গ্রেট একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করে মস্কোর পূর্বে নতুন একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৬২ সালে রোমানফ রাজবংশের প্রতিনিধি ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট ক্ষমতায় আসেন, তখন সেই সাম্রাজ্যটিকে তিনি কাস্পিয়ান সাগরের আরেক পাড়ে নিয়ে যান, একেবারে উরাল পর্বতমালা পর্যন্ত। যা কিনা সাইবেরিয়ারও গভীরে, সেখান থেকে সাম্রাজ্যের আরেক প্রান্ত চলে আসে ভারতবর্ষের উত্তরে, পারস্য, মেসোপোটামিয়া এবং এশিয়া মাইনর পর্যন্ত।

ক্যাথেরিন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই ইঙ্গিতটিও দিয়ে দেন যে রাশিয়া শুধু পূর্বেই নয়, দক্ষিণেও সাম্রাজ্য বাড়াতে সক্ষম। ক্যাথেরিনের সৈন্যরা সেই সময়ে অটোম্যানদের সাথেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য ছিল অটোম্যানদের কাছ থেকে কৃষ্ণসাগরীয় উপকূলীয় এলাকার নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিয়ে তুর্কিকে চূড়ান্তভাবে ইউরোপ থেকে বের করে দেয়া। কিন্তু ব্রিটিশরা কখনোই চাইছিল না যে রাশিয়া দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পারস্য পর্যন্ত আসুক। কিংবা আরও দক্ষিণের পর্বতমালাগুলোও গ্রাস করুক, যেগুলোতে বিভিন্ন আফগান উপজাতিরা বসবাস করত। তারা চাইছিল যেকোনো মূল্যে রাশিয়াকে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে দূরে রাখতে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে হিন্দু কুশ পর্বতমালা এবং পারস্যের উঁচু ভূমি ভারতীয় উপমহাদেশ জয়ের ক্ষেত্রে একটা মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল। ব্রিটিশ নেতারা তাই সিদ্ধান্ত নিলেন তারা এই এলাকার কাছেই রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে যেভাবে পারেন আটকে ফেলবেন। আর এভাবেই শুরু হয়ে যায় আসল খেলা- যাকে ইতিহাসে 'দ্য গ্রেট গেম' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক রুডিয়ার্ড কিপলিং প্রথম এই গ্রেট গেম কথাটির প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত ক্ষমতা ও আধিপত্যের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্বটি শুরু হয় তাকে বুঝানোর জন্যই এই শব্দ প্রয়োগ করেন। যে এলাকাটি ইতঃপূর্বে সাফাভিদ পারসিয়ার হাতে ছিল, অর্থাৎ যেখানে এখন আফগানিস্তান ও পাকিস্তান রয়েছে সেই এলাকা এবং এরই সঙ্গে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজিস্তান এবং তাজিকিস্তানসহ বিরাট এলাকা জুড়েই এই গ্রেট গেমটি অনুষ্ঠিত হয়।

এটা কোনো খেলা ছিল না। আবার এটা কোনো প্রথাগত যুদ্ধও ছিল না। দু-একটি সময় একটু সংঘাত বা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা হয়তো ঘটেছে, তবে সেটাই মুখ্য নয়। গ্রেট গেম বলতে মূলত ষড়যন্ত্র, ঘুষ এবং মানুষকে দুর্নীতির মাধ্যমে গ্রাস করা, কূটকৌশল, বানোয়াট তথ্য উপস্থাপনকেই বুঝানো হতো।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মূলত লড়াইটি হচ্ছিল দুটো ইউরোপিয়ান শক্তির মধ্যে। অথচ যারা এই বিরাট অঞ্চলে বসবাস করত সেই স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশ ছিল মুসলিম। তারা স্রেফ দাবার গুটির মতো ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছিল।

অন্যদিকে, ইরানে কাজার রাজা ইউরোপিয়ান প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার দেশকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তারা কার কাছ থেকে এই প্রযুক্তি পাবে?

দ্যা গ্রেট গেম

রাশিয়ানরা অনেক দিন ধরেই ইরানের কার্যক্রমে প্রবেশ করতে চাইছিল। ব্রিটিশ উদ্যোক্তা আর দূতেরাও নানা কাজে সম্পৃক্ত হতে চাইছিল। একই চেষ্টা ছিল ফরাসি, জার্মান, সুইস এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান জাতিদেরও। কাজারের এই ইউরোপিয়ানদেরকে মোকাবেলা করার মতো অবস্থা ছিল না। কাজার রাজা হয়তো কৌশলে এক ইউরোপিয়ানকে আরেক ইউরোপিয়ানের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে, সেই সুযোগে কিছুটা স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে ইরানের রাজা তৎকালীন পরিস্থিতিতে নতুন করে সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। তার কাছে মনে হলো ইউরোপিয়ানদের কাছে মনোপলি বিক্রি করলে, তারা বেশ ভালো পরিমাণ অর্থ হাতে পাবেন। সেই প্রত্যাশায় তিনি তার গোটা অর্থনীতিকে বিদেশিদের জন্য নিলামে তুলে দিলেন।

এই ক্ষেত্রে ভাগ্যক্রমে বিশেষ সুবিধা পেলেন জার্মান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ব্যারন জুলিয়াস ডে রয়টার্স। তিনি গোটা ইরানে রেললাইন তৈরি করার কাজটি পেলেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দেশটির সকল খনি অনুসন্ধান করার দায়িত্ব, দেশটির বনাঞ্চলকে কাজে লাগানোর একচেটিয়া অনুমতি এবং সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হলো তিনি ইরানের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক পরিচালনারও দায়িত্ব পেলেন। এত সব অবিশ্বাস্য সুবিধা তিনি শাহকে কিছু নগদ অর্থ ঘুষ দেয়ার বিনিময়ে বাগিয়ে নিলেন। তিনি অবশ্য এটাও বলেছিলেন, তিনি ভবিষ্যতে যেসব প্রকল্প চালু করবেন তার মুনাফার একটি অংশও তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেবেন। তবে শাহ'র এই সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। বিশেষ করে রাশিয়া এই বিষয়ে শক্তিশালী অবস্থান নেয়ায় শাহ তার পূর্বের চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু চুক্তি বাতিলের জন্য ইরানকে ব্যারনের নিকট ৪০ হাজার পাউন্ড জরিমানা গুনতে হয়। যদিও টাকাটা শাহ'র ব্যক্তিগত পকেট থেকে যায়নি। গেছে ইরানের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে। কিন্তু যেখান থেকেই যাক, কোনো কারণ ছাড়াই ব্রিটিশের হাতে এতো বিশাল পরিমাণ অর্থ চলে গেল । আর অন্য চুক্তিগুলো বাতিল হলেও রাষ্ট্রীয় ব্যাংকটি ঠিকই ব্যারনের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

এই ধরনের ঘটনাগুলো একবার দুবার নয় প্রায়শই ঘটতে থাকে। আর প্রতিবারই বিরাট অঙ্কের কালো টাকা চলে যেত দুর্নীতিবাজ রাজার এবং তার নিকটাত্মীয়দের পকেটে। আর মাঝখান দিয়ে ইরানের অর্থনীতির আরেকটি অংশের নিয়ন্ত্রণ চলে যেত ইউরোপিয়ান কোম্পানির কাছে। কোনো কারণে বিদেশিদের সাথে করা কোনো চুক্তি বাতিল হলে, সেটার খেসারত হিসেবে সাধারণ জনগণকে বাড়তি রাজস্ব দিতে হতো। ইরানিয়ান নাগরিকেরা বুঝতে পারছিল যে কি হচ্ছে, কিন্তু তাদের করার কিছুই ছিল না। তারা ছিল ক্ষমতাহীন, আর প্রকারান্তরে কাজার রাজার হাতে ছিল অসম্ভব ক্ষমতা। তার নিজস্ব বাহিনীও ছিল যারা কোনো নাগরিককে প্রতিবাদ করতে দেখলেই কারাবন্দি করত। অত্যাচার করত এমনকি ফাঁসিও দিত।

ইউরোপিয়ানদের কাছে বিষয়টা ভিন্ন রকম ছিল। তারা মনে করত এই দেশটির অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে, এটা এখন দুর্নীতির আখড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই অবস্থায় যে প্রশ্নটি ইউরোপিয়ানদের সামনে এল, তা হলো ইউরোপিয়ানদের মধ্যে কোনো জাতি আসলে এই সমস্যাগ্রস্ত দেশটিকে নিয়ে কাজ করবে? আর কোন কৌশলে আগালে এই প্যাঁচায় পড়ে থাকা দেশ থেকে সে লাভজনক কিছু অর্জন করে নিতে পারবে? যেহেতু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আগাগোড়াই ব্রিটিশ আর ফরাসিদের মধ্যে চলছিল, সেই একই দ্বন্দ্ব ইরানের ব্যাপারেও দেখা দিল। ফলে তারা এক ধরনের আপোষে এল। রাশিয়া ইরানের উত্তরাঞ্চলটিকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করার সুযোগ পেল। আর ইংরেজরা দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে পড়ে থাকল। এই বিভাজনটি দেশটির ভেতরেও আরেক ধরনের অদৃশ্য সীমানা তৈরি করল যা কালানুক্রমে ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী সীমান্ত হিসেবে প্রকাশিত হলো।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

গ্রেট গেম কিন্তু সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে হিন্দু কুশ পর্বতমালা এবং আরও উত্তরাঞ্চলের এলাকাগুলো নিয়েও চলছিল। ১৮ শতকের গোড়ার দিকে একটি উপজাতীয় গোত্র প্রধান আহমদ শাহ বাবা আফগান অঞ্চলের সব জাতিগোষ্ঠীকে একত্রিত করে নতুন একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। তবে আহমদের মৃত্যুর পরেই এই রাজ্যের চিত্র পাল্টে যায়। পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা বিরাট সংকটে পড়ে কারণ, তারা দুই দিক থেকে দুই পরাশক্তির চাপের মুখে পড়ে। দুই ইউরোপিয়ান পরাশক্তি উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে তাদের ওপর হুমকি হয়ে আসে। রাশিয়া দুটো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আফগানিস্তানে তাদের গুপ্তচর পাঠায়। হয় তারা রাজার সাথে আপোষের কোনো উপায় বের করবে অথবা বিভিন্ন গোত্র প্রধানদের সাথেও নানামুখী যোগাযোগ করার মাধ্যমে তাদের কাউকে দিয়ে রাজাকে উৎখাত করবে। ইংরেজরাও একই কৌশল অবলম্বন করল।

ইংরেজরা দুই দফায় আফগানিস্তানে প্রবেশ করে দেশটি দখল করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রতিবারই আফগানরা ব্রিটিশদেরকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। ১৮৪১ সালে প্রথম এ্যাংলো-আফগান যুদ্ধ হয় যেখানে বিপুল সংখ্যক ব্রিটিশ সেনা নিহত হয় এবং তারা আফগান ছেড়ে পালিয়ে যায়। যদিও এই ঘটনার কিছু দিন পর ব্রিটিশ সেনার একটি দল এসে কাবুলে থাকা গ্র্যান্ড বাজারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি করার মাধ্যমে সেই পরাজয়ের সামান্য প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়।

ব্রিটিশরা তখনো আফগানিস্তানে তাদের প্রথম আক্রমণের ব্যর্থতার জ্বালা ভুলতে পারেনি। এর মধ্যেই তারা ভারতবর্ষে প্রথম মারাত্মক ধরনের সংকটের মুখে পড়ে। এটা শুরু হয় ১৮৫৭ সালে, যখন সাধারণ সিপাহীরা বিদ্রোহ শুরু করে। ঝামেলাটি শুরু হয় যখন ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তারা এই সাধারণ সেনাদেরকে তাদের বন্দুকের বুলেটে গরু ও শুয়োরের চর্বি মিশ্রণ করতে আদেশ দেয়। এই আদেশটা সাধারণ সৈন্যরা মেনে নিতে পারেনি। কারণ, সেনাদের অধিকাংশই ছিল হয় মুসলমান না হয় হিন্দু। হিন্দুদের কাছে গরু হলো দেবতার মতো, তাই গরুর চর্বি বুলেটে মেশানোর কাজটি তাদের কাছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অবমাননাকর মনে হয়েছে। অন্যদিকে, মুসলমানরা শুয়োরকে অপবিত্র ও নাপাক মনে করে। তাই শুয়োরের চর্বি দিয়ে কাজ করাটাও তাদের কাছে অগ্রহণযোগ্যই মনে হয়েছে।

ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সৈন্যদের একটি রেজিমেন্ট একদিন তাদের বন্দুক ব্যবহার করল না। সেই সময়ে যিনি উজির ছিলেন তিনি এই পরিস্থিতি দমনে মারাত্মক কঠিন হয়ে গেলেন। যে সৈন্যরা আদেশ অমান্য করল তাদের অধিকাংশকেই তিনি কারাবন্দি করলেন। আর সেটাকে কেন্দ্র করে গোটা শহরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। আসলে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা কখনো ভাবতেই পারেনি যে তাদের বুলেটে গরু বা শুয়োরের চর্বি ব্যবহারের এই সিদ্ধান্তে এতটা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু এই আদেশটি ব্রিটিশ কর্মকর্তাবৃন্দ আর সাধারণ সেনাদের মধ্যে যোজন যোজন ব্যবধান সৃষ্টি করে দিল। ইউরোপিয়ানরা ভারতবর্ষে আসার আগে এই ধরনের সেনা বিভাজন কখনো দেখা যায়নি। এমনকি যখন হিন্দু সামন্তরা সেনাবাহিনী পরিচালনা করত, তখনো হিন্দুদের অনেক গোত্র, এমনকি অনেক মুসলমানরাও সেখানে কাজ করত। কিন্তু কোনোদিন এই ধরনের বিভাজন বিভেদ দেখা যায়নি। মুসলিম তুর্কিরা আর পারস্য মুসলিমরা মিলে হিন্দুদের সাথে প্রচুর যুদ্ধ করেছে। তারা নিজেরাও একে অপরের সাথে বিবাদে জড়িয়েছে। কিন্তু এত কিছুর পরও তারা একে অপরকে খুব ভালো মতো চিনত, একে অপরের ঐতিহাসিক অবস্থান ও ইতিহাস জানত এবং নিজেরা মতবিনিময় করত। মোঘল আমলের সেনাবাহিনীর মূল ভাষা ছিল হিন্দু। বিভিন্ন ভাষার লোকেরা এই বাহিনীতে থাকলেও তারা কাজের প্রয়োজনে উর্দুতেই কথা বলত। কিন্তু ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনীতে এই ধরনের কোনো ভাষার প্রয়োগ দেখা যায় না। ব্রিটিশ সেনাকর্মকর্তারা এই কাজটি কখনোই পারেননি। কারণ, তারা ভিন্ন জায়গা থেকে এই জায়গায় এসেছিলেন, তাই তাদের এই অঞ্চলের মানুষের মানসিকতা নিয়ে খুব স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না।

এই বুলেটে পশুর চর্বি ব্যবহারের ইস্যুটা ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদেরকে কাছাকাছি নিয়ে আসলো। সাধারণ সিপাহীদের বিদ্রোহটাই একটা সময়ে গিয়ে ভারতীয় বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। ১৮৫৭-৫৮ সালে হিন্দু ও মুসলমানরা এক হয়ে গোটা ভারতজুড়ে ব্রিটিশদের সব স্থাপনায় হামলা চালায়। মুসলমানরা এই বিদ্রোহকে জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে। আর বুলেট ইস্যুটিকে কেন্দ্র করে যেভাবে তারা সংগঠিত হয়ে এই বিদ্রোহে অংশ নেয় তাতে বুঝাই যায় যে, মুসলমানরা বহু দিন আগে থেকেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রস্তুতি নিয়েছিল।

বেশ ভালোমতো প্রস্তুতি নিলেও আসলে সেই প্রস্তুতি মোটেও যথেষ্ট ছিল না। কারণ, এত তোড়জোড় করে যেই বিদ্রোহের আয়োজন করা হলো, ব্রিটিশ সেনারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা দমনও করে ফেলল। শুধু তাই নয় তারা ভারতবর্ষের শহরগুলোতে ব্যাপক নিপীড়ন চালাল। মানুষদেরকে ভয় দেখাল, রাস্তায় প্রকাশ্যে অসংখ্য হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত করল। তারা অসংখ্য স্থানে স্থানীয় নাগরিকদেরকে দিয়ে গর্ত খুঁড়ে তারপরে সেই মানুষগুলোকে গর্তের কিনারে দাঁড় করিয়ে একাধারে হত্যা করে। সেই হতভাগা মানুষগুলো এভাবে নিজেদের খোঁড়া গর্তেই পড়ে যায় এবং সেখানেই সমাধিস্থ হয়। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ স্যার চার্লস ক্রসথোয়েইট এই ঘটনার জন্য ব্রিটিশ প্রশাসনের তীব্র প্রশংসা করে বিদ্রোহ দমনের এই বিজয়গাঁথাকে ব্রিটিশ ইলিয়াড হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি এই বিজয়ের নাম দেন 'এপিক অব দ্য রেস'।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিদ্রোহটি ভালোভাবে দমন করার পর ব্রিটিশরা এবার পূর্বাপর সব নমনীয়তা ঝেরে ফেলে। এবার তারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা সর্বশেষ মোঘল সম্রাটকে নির্বাসনে পাঠায় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে একটি সাধারণ কোম্পানির মর্যাদা দিয়ে নিজেরাই সরাসরি ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। পরবর্তী ৯০ বছর ব্রিটিশ রাজবংশ সরাসরি ভারতবর্ষ শাসন করে। তারা তাদের সময়কালের এই শাসনটাকে 'দ্য রাজ' নামে অভিহিত করে।

ব্রিটিশ নেতারা ভারতকে কুইন ভিক্টোরিয়ার মুকুটের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন হিসেবে বিবেচনা করতেন। ১৮৫৭ সালের এই বিদ্রোহের পর থেকে তারা ভারতের ব্যাপারে আরও বেশি স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। ১৮৭৮ সালে আফগানিস্তানের ব্যাপারে রাশিয়ার তীব্র আগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করে ব্রিটিশরা আবার কাবুল দখলের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা আবারও এই পর্বতেঘেরা এই জায়গাটিকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়। আফগানিস্তানকে দখল করা কারও পক্ষেই খুব সহজ কাজ নয়। কারণ, গোটা এলাকাটি উঁচু ও দুর্গম পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত এবং সেখানে আবার নানা ধরনের গোত্র বসবাস করত। যাদের নিজেদের মধ্যেই মারাত্মক ধরনের শত্রুতা ও কুটিলতা রয়েছে। এমনটা নয় যে এই জমিটা জয় অসাধ্য। ব্রিটিশরা এর আগে খুব সহজেই আফগান রাজধানী কাবুলে পৌঁছে গিয়েছিল। তারপর তারা তাদের পছন্দের একজনকে সিংহাসনে বসায় এবং তাকে তারা ব্রিটিশ শাসকের প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে গেল, আফগান নেতারা অন্য অঞ্চলের নেতাদের মতো নয়। এই নেতাদেরকে ইচ্ছামতো কাজে লাগিয়ে খুব একটা লাভ হবে না। কারণ, ব্রিটিশের অনুগত এই নেতারা দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই তাদের হাতের লাঠিগুলোকে নষ্ট করে ফেলে এবং ব্রিটিশদের অনুগত শক্তি হিসেবে আর কাজ না করে। বরং নিজেরাই আত্মনির্ভরশীল হয়ে যায়। আর অন্য যেসব গোত্রগুলো ছিল তাদের নেতারা পাহাড়ে সরে গিয়ে অনেকটা গেরিলা বাহিনীর রূপ ধারণ করে। দ্বিতীয় আফগান-এ্যাংলো যুদ্ধটিও তাই এক পর্যায়ে একটি বাজে দিকে চলে যায়। যখন আফগানিস্তানের ব্রিটিশ শাসনের প্রতিনিধি ক্যাভাগনারিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর পরপরই শহরে শহরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে। আফগানিস্তানকে বাদ দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের বাকি অংশ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় এ্যাংলো-আফগান যুদ্ধের পর রাশিয়া ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একমত হয়, আফগান গোত্রগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকা এই ভূখণ্ডটি দখল করতে গেলে অনেক সম্পদ ও লোকবল হারাতে হবে। তাই তারা আফগানিস্তানকে তাদের উভয়ের শাসিত এলাকার বাইরে বাফার জোন হিসেবে রাখার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছায়। এরপর থেকে আফগানরা স্থানীয় ব্যক্তিকেই রাজা হিসেবে পেতে শুরু করে। আর এই নতুন

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

রাজা যখন বুঝতে পারলেন যে ব্রিটিশ ও রাশিয়ারা আফগানিস্তানের ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে, তখন তিনি একটু নিশ্চিন্ত মনে নিজ ভূখণ্ডকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নতুন কোনো ভূখণ্ড জয় করা নয় বরং তিনি প্রতিটি গোত্রের ওপর, প্রতিটি পাহাড়ী উপত্যকার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চেষ্টা শুরু করেন।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, রাশিয়া কখনোই ভারত সাগরের ওপর এক খন্ড জয় করার আশাবাদটুকু ছাড়তে পারেনি। আর ব্রিটিশরাও কখনো রাশিয়ানদের কার্যক্রম ও সততা নিয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি। ফলে শতাব্দী আগে যে গ্রেট গেম শুরু হয়েছিল তা কিন্তু অব্যাহতই থেকে যায়।

যেই অঞ্চলটিকে নিয়ে এই গ্রেট গেমটি চলছিল, ১৯ শতকে এসে সেই অঞ্চলের পশ্চিমে নতুন আরেকটা ঘটনা ঘটে। মুসলিম বিশ্বে ইউরোপিয়ান রাজনীতির আরেক রূপ দেখা যায়। নতুন এই গেমের খেলোয়াড় হলো ব্রিটিশ ও ফরাসিরা। আর তাদের কুটকৌশলের বিষয় ছিল পতনোম্মুখ অটোম্যান সাম্রাজ্য। ইউরোপিয়ানদের কাছে এই গেমটি ছিল ইউরোপের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যকার ক্ষমতার লড়াই।

বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের পর ইউরোপের চালচিত্র অনেকটাই পাল্টে যায়। এই বিপ্লবটি ইউরোপের অন্য সব রাজবংশকেই আতঙ্কিত করে ফেলে। কারণ, ফরাসি বিপ্লব সকল রাজবংশের বৈধতাকে অস্বীকার করে। তাই ইউরোপিয়ান সব রাজপরিবারগুলো একজোট হয়ে বিপ্লবীদেরকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা মনে করেছিল বিপ্লব পরবর্তী ফ্রান্স বেশ টালমাটাল অবস্থায় থাকায় সেখানে বিপ্লবীদেরকে দমন করা সহজ হবে। কিন্তু তা আসলে ভুল প্রমাণীত হয়েছিল।

বিপ্লবের ফলেই ফ্রান্সে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মতো একজন নেতার আবির্ভাব হয়েছিল, যার জন্য ফ্রান্স খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর ও যুদ্ধজয়ী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। গ্রেট ব্রিটেন নেপোলিয়ানকে শায়েস্তা করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেছিল। দুই পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধ হয়েছিল, যা সংগঠিত হয়েছিল আজকের মিসরে।

পশ্চিমা ইতিহাস থেকে জানা যায়, নেপোলিয়ান ১৭৯৮ সালে মিসরে যান। তার সাথে ছিল ৩৪ হাজার সৈন্যের একটি দল। তার পিছু পিছু সেখানে যান ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা লর্ড নেলসন। ফরাসিরা নীল নদের ওপরে অনুষ্ঠিত একটি নৌ যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়। নেপোলিয়ান তার বাহিনীকে পরিত্যক্ত করে দেশে ফিরে আসেন এবং সেখানে একটি ক্যু করে ফ্রান্সের একক ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হন। এর মাধ্যমে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে পৌছে যান। যুদ্ধ কিন্তু তখনো চলছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিন্তু মিসরের লোকদের এই যুদ্ধকালীন ভূমিকা কী ছিল? তারা ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যকার এই যুদ্ধে কার পক্ষ নিয়েছিল? ইউরোপিয়ানরা এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কি হয়েছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে পশ্চিমা ইতিহাস থেকে খুব একটা ভালো জবাব পাওয়া যায় না। আশেপাশের সব বিষয়কে অগ্রাহ্য করে পশ্চিমা ইতিহাস, একপেশেভাবে শুধু ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যুদ্ধের কথাই বলে গেছে।। পশ্চিমা ইতিহাসের বর্ণনার ধরনটি এমন যে, যদিও যুদ্ধটি মিসরে হয়েছে, তথাপি সেখানে মিসরের কোনো লোকই ছিল না।

কিন্তু আসলে তো তারা সেখানে ছিল। নেপোলিয়ান যখন সেখানে পৌছান, মিসর তখন অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা একটি অঙ্গরাজ্য। নেপোলিয়ান মিসরের মূল সেনাবাহিনীর সাথে পিরামিডের পাদদেশে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং এক দিনেরও কম সময়ে মিসরীয় বাহিনীকে পরাজিত করেন। এরপর ব্রিটিশ সৈন্যরা ঐ এলাকায় এসে পৌছলে আসল যুদ্ধ শুরু হয়। আর সেই যুদ্ধটি ছিল ইউরোপিয়ানদের মধ্যেই। ব্রিটিশ নৌবহর নেপোলিয়ানের প্রায় সব জাহাজই নীল নদে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। নেপোলিয়ান আরও বছর খানেক মিসরের কর্তৃত্ব ধরে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু এর পরে তাকে ক্ষান্ত দিতে হয়। কারণ, তার সেনারা প্লাগ নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, ব্রিটিশরা আরও নানা দিকে অভিযান শুরু করে। তারা তুর্ককেও মিসরে আক্রমণ করার জন্য উস্কানি দেয়। নেপোলিয়ান মিসর থেকে সিরিয়ায় সরে পড়েন। সেখানে জাফা নামক শহরে তিনি অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেন। অবশেষে তিনি আবার ইউরোপে ফিরে যান, কিন্তু ততদিনে মিসর একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। সে সময়ে একজন তুর্কি সেনা কর্মকর্তা মিসরের গোলযোগের সুযোগ নিয়ে দেশটি দখল করে নেন। তার নাম মোহাম্মাদ আলি, তিনি তুর্কি বংশোদ্ভূত একজন আলবেনিয়ান। আলি নিজেকে মিসরের গভর্নর ঘোষণা করেন। তিনি বাহ্যিকভাবে প্রদর্শন করছিলেন, তিনি ইস্তানবুলের সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবেই গভর্নরের দায়িত্বটি নিয়েছেন। কিন্তু আসলে সবাই বুঝত প্রকৃত পক্ষে তিনি কারও অধীনেই নেই। তিনি স্বাধীন ভাবেইই শাসন করছেন।

মোহাম্মাদ আলি অনুধাবন করলেন যে, কত অবলীলায় নেপোলিয়ান মিসরে প্রবেশ করে এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এমন কিছু করবেন যাতে কোনো নেপোলিয়ান বা লর্ড নেলসন অথবা অন্য কেউ মিসরে এসে মিসরকে খেলার মাঠ বানিয়ে নিয়ে নিজেরা স্বার্থের জন্য আর যুদ্ধ করতে না পারে। মিসর যেন আর কারও দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে ধ্বংসের মুখে না পড়ে ।

কিন্তু নেপোলিয়ান ফ্রান্সে কীভাবে মতো ক্ষমতাধর হয়ে ওঠলেন। মোহাম্মাদ আলি জানতে পারলেন, নেপোলিয়ান ফ্রান্সে ধর্মীয় নেতাদের সব ক্ষমতাকে নিজের উপরে নিয়ে নিয়েছেন। নেপোলিয়ান ফ্রান্সে সকল গির্জা নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলোকে বন্ধ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

করে দিয়েছেন এবং তদস্থলে একটি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছেন। মোহাম্মাদ আলিও মিসরে একই ধরনের কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আলেমদের জন্য রাষ্ট্রীয় সকল অর্থায়ন বন্ধ করে দিলেন। তিনি সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় স্কুল এবং মাদরাসায়ও সরকারি অনুদান বন্ধ করলেন। তিনি সকল ধর্মীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিগুলোকে দখল করে নিলেন। মিসরে তখনো অভিজাত মামলুক সম্প্রদায় রাজস্ব আদায়ের কাজ করত। মোহাম্মাদ আলি খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, ইউরোপে রাষ্ট্রই এই রাজস্ব সরাসরি পায়। তাই তিনি একদিন তার প্রাসাদে মামলুক কর আদায়কারীদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তাদের সবাইকে হত্যা করলেন। তারপর তিনি আধুনিক সড়ক, আধুনিক স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ নিলেন। পরবর্তী শতাব্দীতেও এই মোহাম্মাদ আলির মতো ধর্মনিরপেক্ষ উন্নয়নের এই কৌশল আরও অনেকেই অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন।

ধর্মকে উচ্ছন্নে পাঠিয়ে তথাকথিত এই উন্নয়নের ধারা মিসরকে দেউলিয়া করে দিল। তাই সরকারকে সচল রাখার জন্য মোহাম্মাদ আলিকে টাকা ধার নিতে হলো। আর তিনি সেই ধারটি ইউরোপীয় ব্যাংকগুলো থেকেই নিলেন। আর তারাও অবধারিতভাবে শর্ত আরোপ করল, তারা টাকা দিতে পারে যদি মিসরের সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বিভিন্ন ইউরোপিয়ান অর্থনৈতিক পরামর্শককে তত্ত্বাবধান করার সুযোগ দেয়া হয়। তারা শুধু দেখবে যাতে তাদের দেয়া অর্থের কোনো অপব্যবহার না হয়।

অন্যদিকে, মোহাম্মাদ আলির এসব কার্যক্রমে অটোম্যান প্রশাসনও বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু মোহাম্মাদ আলিকে কাবু করার মতো একক শক্তি সেই সময়ে অটোম্যানদের ছিল না। তাই তারা ব্রিটিশদের কাছে সাহায্য চাইল। ব্রিটিশরা বলল তারা অটোম্যানদেরকে সাহায্য করতে পারে, যদি অটোম্যান প্রশাসন তুর্কিতে ইউরোপিয়ানদেরকে কিছু সুনির্দিষ্ট সুযোগ সুবিধা দিতে রাজি হয়। অটোম্যানদের সাথে এই ধরনের একটি চুক্তি করার জন্য ব্রিটিশরা সকল ইউরোপিয়ান জাতির সমন্বয়ে একটি কনসোর্টিয়ামও চালু করল। সব কিছু তাদের মনমতো হওয়ার পর তারা অটোম্যান ও মোহাম্মাদ আলি উভয়ের সাথেই গেম খেলতে শুরু করল। মোহাম্মাদ আলিকে কেবলই মিসরের চার দেয়ালে আটকে রাখা হলো। ইউরোপিয়ানরা গোটা লেভান্ট অঞ্চলে তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। এবার ইউরোপিয়ানদের মধ্যে শুধু যে প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে আসতে শুরু করল তা হলো, এই ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার কোনো স্থানটি ইউরোপিয়ান কোন জাতি নিয়ন্ত্রণ করবে?

ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার মধ্যে মিসরকে সবাই একটি ভিন্ন মর্যাদা দিত, তাই ফ্রান্স ও ব্রিটেন উভয়েই মিসরের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠল। তত দিনে মোহাম্মাদ আলি তার পরিবারকে বৈধভাবে মিসরীয় রাজবংশীয় পরিবার হিসেবে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। অর্থাৎ তার মৃত্যুর পরে তার সন্তান, তারপরে তার নাতি এভাবে বংশানুক্রমে তারা মিসর শাসন করবে। মোহাম্মাদ আলির এই রাজবংশকে স্থানীয়ভাবে খেদিভস বলা হতো। এই খেদিভরাই ব্রিটেনকে মিসরে রেললাইন প্রকল্পের দায়িত্বটি দিয়ে দেয়। আর ফ্রান্সের সাথে সুয়েজ খাল নির্মানের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরও পরে ব্রিটিশকেই মিসরের কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি গঠন করার জন্য দায়িত্ব দেয়।

মোহাম্মাদ আলির বংশধরেরা মিসরের ভবিষ্যৎটি পোশাক শিল্পের উন্নয়নের মধ্যেই নিশ্চিত করতে চায়। ইউরোপিয়ান শিল্প বিপ্লবের পর পোশাক শিল্পের চাহিদা ও বাজার অনেক বেড়ে যায়। তাই এই দিকেই তাদের আগ্রহ বেশি ছিল। তা ছাড়া নীলনদীয় উপত্যাকা থেকে উৎপাদিত সুতার ও তুলার পোশাকের মান ও কদরও অনেক বেশি ছিল। ১৮৬০ সালের দিকে এসে বিশ্ববাজারে তুলোর দাম হঠাৎ করে খুব বেড়ে যায়। খেদিভদের মধ্যে একজন, যার নাম ছিল ইসমাইল তুলোর। তুলোর এই চড়া দামকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগতভাবে নিজে এবং তার দেশকে ধনী বানিয়ে ফেলার স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়। সে মিসরের পোশাক শিল্পকে আধুনিকায়ন করার জন্য ইউরোপিয়ান ব্যাংকগুলো থেকে বিশাল পরিমাণ অর্থ ধার নেয়। তিনি তুলোর কাঁচামাল ও বেশ কিছু যন্ত্রপাতি অত্যন্ত চড়া দামে কিনে নিয়ে আসেন। তার ধারণা ছিল উৎপাদিত পোশাক বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে তিনি সব ধার দেনা শোধ করে দেবেন।

কিন্তু তুলোর এই দাম বৃদ্ধিটি আসলে ছিল সাময়িক এবং এটা বেড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল ওয়ার বা গৃহযুদ্ধের জন্য। ইংরেজরা যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রদেশগুলো থেকে তুলো বা তুলোর পোশাক আমদানি করত, সেই দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো এই সিভিল ওয়ারে জড়িয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে সেই সময়ে ব্রিটিশদেরকে পোশাক সংকটে পড়তে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সেই সিভিল ওয়ারটি শেষ হওয়া মাত্রই তুলোর দাম আবারও হুট করে পড়ে যায় এবং ফলে মিসর পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর সেই সুযোগ নিয়ে ব্যাংকার আর অর্থনৈতিক উপদেষ্টারা দলে দলে মিসরে প্রবেশ করতে শুরু করে। সেই সময়টাতে অবস্থাটি এমন হয়ে যায়, প্রতি একজন মিসরীয় সরকারি কর্মকর্তার জন্যেও যেন একজন উপদেষ্টা কাজ করছিল। আর সেই দূরাবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ আর ফ্রান্স তখনো মিসরের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণটি নিজের হাতে নেয়ার জন্য তাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখছিল।

কখনো ব্রিটিশরা একটু সুবিধাজনক অবস্থানে পৌছায় আবার কখনোবা ফ্রান্স পশ্চিমের দিকে তাদের আধিপত্য আরও একটু বৃদ্ধি করছিল। এভাবেই পার হচ্ছিল সময়টা। এদিকে ফরাসি বিপ্লবের সময় যে গোলযোগ দেখা দেয়, তাকে সামাল দেয়ার প্রয়োজনে আলজেরিয়ান বংশোদ্ভূত দুটি ইহুদি পরিবার প্রায় ৮ মিলিয়ন ফ্রাঁ সমমূল্যের খাদ্যশস্য ধার হিসেবে ফ্রান্স সরকারকে দিয়েছিল,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যাতে তারা সেনাবাহিনীকে চালাতে পারে। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর যখন ফ্রান্স আবার রাজতন্ত্রে ফিরে যায় তখন ফ্রান্স প্রশাসন সেই দেনার কথা অস্বীকার করে। আলজেরিয়াতে যিনি সেই সময়ে অটোম্যান গভর্নর ছিলেন, তিনি এই বিষয়ে ফরাসি কনসাল পিয়েরে ডুভালের কাছে ব্যাখ্যা জানতে চান। ডুভাল তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তারা কোনো আরবের সাথে অর্থনৈতিক লেনদেন নিয়ে কথা বলবেন না। গভর্নর ফরাসি কর্মকর্তার এই কথা শুনে এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, তিনি সাথে সাথেই তাকে চড় মেরে বসেন। এই ঘটনাটা গোটা ফরাসি জাতির জন্য অপমানের এবং লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। 'লা এফেয়ার ডে মোওচে সোয়েটার' (দ্য এফেয়ার অফ দ্য ফ্লাই সোয়াটার) শিরোনামে খবরটি ফ্রান্সের সকল মিডিয়ায় চলে আসে। উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। এই ঘটনাগুলো যখন ঘটছিল তখন ফরাসি রাজ পরিবারের সাথে লিবারেলদের (উদারমনা) মধ্যে একটু টানাপোড়েন চলছিল। সেই টানা পোড়েনে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করার জন্য রাজ পরিবারের লোকেরা এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর কথা ভাবছিল। তারা মনে করলেন, নেপোলিয়ান যদি কয়েক বছর আগেই মতো সহজে মিসরে ঢুকে যেতে পারে, তাহলে কেন তারা সেই পরিস্থিতিতে আলজেরিয়াতে আক্রমণ করতে পারবেন না?

তারা তাই করলেন এবং আলজেরিয়া অভিযান ফরাসিদের জন্য প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি সফলতা পেল। গভর্নর তার সকল সঙ্গী ও ফেলে আসা অতীতকে আলজেরিয়াতে ফেলে রেখে নেপলিতে পালিয়ে যান। ফ্রান্স আলজেরিয়া থেকে ১০০ মিলিয়ন ফ্রাঁ তুলে নিল যার অর্ধেক সরাসরি চলে গেল ফরাসি রাজ কোষাগারে। আর বাকি অর্ধেক গেল আলজেরিয়ায় সামরিক অভিযানে অংশ নেয়া সকল সৈনিকের পকেটে।

সেই সময়ে কোনো সরকার না থাকায় আলজেরিয়ার ক্ষমতায় বিরাট এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আর এই ধরনের পরিস্থিতিতে অনেক কিছুই হয়ে যায়। নতুন করে কোনো পুতুলকে ক্ষমতায় না বসিয়ে ফ্রান্স আলজেরিয়াকে ৩টি প্রদেশে ভাগ করে নিজস্ব সীমানার ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যভাবে বলা যায়, ফ্রান্স আলজেরিয়াকে উপনিবেশ হিসেবে নয় বরং ফ্রান্সের একটি অংশ হিসেবেই বিবেচনা করতে শুরু করে। ফরাসি নাগরিকদের মধ্যে যারা আলজেরিয়াতে জমি কিনে সেখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে চান, তাদেরকে সহায়তা করার জন্য একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানিও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আলজেরিয়াতে ফ্রান্স অনুপ্রবেশ করলেও বিদেশি অভিবাসীরা কোনোভাবেই স্থানীয় জনগণের সাথে যুদ্ধে জড়াতে চায়নি। তারা জমি কিনতে কিনতে একসময় আলজেরিয়ার ৮০ ভাগ জমি কিনে নেয়। এভাবে তারা নতুন ধরনের এক অর্থনীতি চালু করে যা স্থানীয় অর্থনীতির সাথে খুব একটা সাংঘর্ষিক ছিল না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আলজেরিয়ানরা চাইলে যেকোনো জায়গায় যেকোনো গাছ লাগাতে পারত। তারা যেকোনো বন্দর থেকে জাহাজও নিয়ে আসতে পারত, যদি তারা সেই দাম শোধ করতে পারত। তারা ক্রেতা পেলে তাদের পণ্য বিশ্ববাজারে বিক্রিও করতে পারত। তবে বাস্তবতা হলো তারা এ রকম কিছুই করতে পারেনি। তাই সাধারণ আলজেরিয়ান আরবেরা কোথাও যেতে না পেরে নিজেদের মাঝেই সেকেলে পদ্ধতিতে বেচা বিক্রি করত যদিও ফরাসি নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি আবার আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বেশ ভালোর দিকেই যাচ্ছিল।

পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে আলজেরিয়ার ফ্রেঞ্চ সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা ৭ লাখে পৌঁছে যায়। তারা আলজেরিয়ার অধিকাংশ জমি দখল করে নেয়। তারা অবশ্য সেই সময় নিজেদেরকে আলজেরিয়ান বলেই দাবি করত। কারণ, মাঝখানে ১০০ বছর পার হয়ে যাওয়ায় দেখা যায় যে, এই বিরাট সংখ্যক ফরাসি থেকে নব্য আলজেরিয়ান হয়ে যাওয়া অনেকেই হয়তো এই আলজেরিয়াতেই জন্ম নিয়েছে এবং বড় হয়েছে। যদিও সেখানে ৫০ লাখ আরবও থাকত। তবে এই ১০০ বছরে পরিস্থিতিটা তাদের এতটাই প্রতিকূলে চলে যায় যে, তারা একসময় নিজেদেরকে অপাংক্তেয় মনে করতে শুরু করে। কারণ, তারা নিজেরাই যেন ভুলে গিয়েছিল কবে তারা এই ভূমিতে এসেছে, আর তারা সেখানে এখনো কি করছে? তাদের সেই অর্থে তেমন কোনো কাজকর্মও ছিল না। তাদের মধ্যে ছোট পরিসরে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করত, তার সাথে ফরাসি থেকে আলজেরিয়ান হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কোনো মিলই ছিল না।

এভাবে চলতে চলতে ১৮৫০ সালের দিকে এসে দেখা যায়, বিশ্বের যে জায়গাগুলো একসময় দার-আল-ইসলাম নামে পরিচিত ছিল তার প্রতিটি জায়গাতেই ইউরোপিয়ানরা তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। ইউরোপিয়ানরা এই দেশগুলোতে অভিজাত শ্রেণি হিসেবেই বসবাস করতে শুরু করে। তারা হয় নিজেরাই দেশগুলোকে শাসন করত অথবা তারাই শাসক নির্ধারন করে দিত। তারা (ইউরোপিয়ানরা) এই মুসলিম দেশগুলোর সকল সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করত, নীতিমালা প্রণয়ন করত এবং তারাই স্থানীয় জনগণের নিত্যদিনের জীবনের অবয়ব গড়ে দিত। এর মধ্যে মিসরে, ইরানে এবং ভারতে তারা এমন কিছু অভিজাত ক্লাব গঠন করে যেখানে স্থানীয় নাগরিকদের কোনো প্রবেশাধিকারণ ছিল না। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কোনো ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই ইউরোপিয়ানরা এই নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইউরোপিয়ানরা যেমন বুঝত যে তারা বিনা যুদ্ধেই অনেক কিছু জিতে গেছে, তৎকালীন মুসলমানরা সেটা আরও হাড়ে হাড়ে বুঝতো। কারণ, আপনি পাহাড়ের ওপরে চড়ার চেয়ে সেই পাহাড়ের নিচে চাপা পড়লে কষ্ট আরও বেশি পাবেন, সেই কষ্টটাই ঐ সময়ের মুসলমানরা পাচ্ছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১৩. সংস্কার আন্দোলন
(১১৫০-১৩৩৬ হিজরি) ১৭৩৭-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ

সেই সময়গুলোতে একদিকে যেমন রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা ধরনের উত্থান পতন ঘটছিল, ঠিক একইভাবে সেই একই সময়ে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। বুদ্ধিবৃত্তিক এই বিবর্তনের সূত্রপাত হয় ১৮০০ সালের একটু আগ দিয়ে। আর সেই বিবর্তনটা বেশ লম্বা সময় ধরেই অব্যাহত থাকে, যার ধারাবাহিকতা আজও অবধি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর ব্যাপারটি শুধু এমনও ছিল না যে কেবল মুসলিম জগতেই সেই সময়ে চিন্তাভাবনার নয়া উত্থান ও সংস্কারের ঘটনা ঘটেছিল, বরং একইভাবে ইউরোপিয়ানদের নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন এলাকাতেও একই গতিতে এসব সংস্কারমুখী চিন্তা দর্শনের ধাক্কা লাগে।

মুসলিম ও ইউরোপিয়- উভয় জগতের এই চিন্তার বিবর্তন ও বিকাশ ঘটার পেছনে এক ধরনের যোগাযোগসূত্রও পাওয়া যায়। এই সময়টা এমন ছিল যখন মুসলিম সমাজে অনেক দিন ধরে বড় কোনো পরিবর্তন না আসায়, এক ধরনের স্থবিরতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। এই স্থবিরতা সৃষ্টির জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ানদেরকে জড়িত করা যায়, আবার পুরোপুরি তাদেরকেও দোষ দেয়া যায় না। ১৭০০ সালের আগেই মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধ্যাত্মিকতাকে এমনভাবে আমলাতান্ত্রিক বানিয়ে ফেলা হয়, ঠিক যেভাবে ক্যাথোলিক চার্চগুলোও মধ্যযুগে খ্রিষ্টান ধর্মীয় বিষয়গুলোকে আমলাতান্ত্রিক করে ফেলেছিল।

মুসলিম আইনগুলো তখন এতটাই স্থির ও পরিপূর্ণ অবস্থায় ছিল, নতুন করে কোনো ধর্মবিশেষজ্ঞের আর কিছুই করার ছিল না। ব্যাপারটি এমন ছিল, যেকোনো ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামষ্টিক বিষয়ে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা যেন সকলেই জানত। ওলামাদের ক্ষমতা ও অবস্থান সুদৃঢ় ছিল। সুফি ধারারও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়ে গিয়েছিল। সকল মতের সকল বিজ্ঞ লোকই ভাবতে শুরু

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

করে দিয়েছিলেন, 'সবই ঠিক আছে এবং নতুন করে কোনো কিছু নিয়ে ইজতিহাদের আর কোনো অবকাশ নেই।'

গ্রহণযোগ্য যুক্তির উপর নির্ভর করে স্বাধীনমতা ও খোলামনে ভাবার সুযোগটিকে ইজতিহাদ বলা হয়। এটা ওহির থেকে বিপরীত বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। বরং ওহিকে নিয়ে একটু সৃষ্টিশীলভাবে কাজ করারই একটা প্রক্রিয়া। মুসলমান পণ্ডিতেরা একটা সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ইজতিহাদ শুধু সেই বিষয়গুলো নিয়েই করা যাবে যেগুলোকে স্পষ্টভাবে কুরআন শরীফে বর্ণনা করা হয়নি। পরে বলা হলো, কুরআনে ও হাদিসে যা পরিষ্কার ও বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় না, তা নিয়ে ইজতিহাদ করা যাবে। এর সাথে পরবর্তীকালে ইজমা অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইসলামিক বিশেষজ্ঞদের কাজগুলোকেও উৎস হিসেবে গণ্য করা শুরু হলো। অর্থাৎ কুরআন, হাদিস এবং পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষিদের কার্যক্রমে যেসব বিষয় পাওয়া যেতনা সেগুলো নিয়েই শুধু ইজতিহাদ করা যাবে। তাই ১৮ শতকের দিকে এসে সকল মুসলিম বিশেষজ্ঞরাই একমত হয়ে যান, এমন কোনো বড় আর কোনো অমীমাংসিত অবস্থায় নেই যা নিয়ে কোনো ধরনের ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে। সকল বিষয় নিয়েই কাজ ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। এখন আর নতুন কোনো ইস্যুতে কাজ করার কিছু নেই, কেবল পূর্বসূরিদের কাজগুলোকে অনুসরণ করলেই হবে।

ধর্মীয় বিধি বিধান অন্ধের মতো অনুসরণ করলে মানুষ ধর্ম থেকে কাঙ্ক্ষিত আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি অর্জন করতে পারে না। খ্রিষ্টান ধর্মের ক্যাথোলিকদের নানা অনিয়ম করার পরিপ্রেক্ষিতে যেমন প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনটি সূচিত হয়, ঠিক তেমনি ইসলামের মাত্রাতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিকীকরণও নানা ধরনের সংকট তৈরি করে। আর সেখান থেকে উত্তরন পাওয়ার জন্যই ১৮ শতকের মাঝামাঝি এসে গোটা মুসলিম জগতে এক ধরনের সংস্কার আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে।

কিন্তু ইউরোপে যে প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল, তার কোনো ইসলামিক সংস্করণ ইতিহাসে দেখা যায় না। আর ইউরোপীয় সংস্কার আন্দোলনের পরিণতিতে যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তারও কোনো উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ইসলামি সংস্কার আন্দোলনের ফলাফলও ভিন্ন ছিল। প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের মতো ইসলামি সংস্কার আন্দোলনে ব্যক্তিবাদের উত্থান হয়নি। ধর্মীয় সংস্কার থেকে জাতীয়তাবাদেরও উদ্ভব হয়নি। চার্চ বা রাষ্ট্রের মধ্যে যেরকম বিভাজন ঘটেছিল তেমন কিছুও ঘটেনি। ধর্মনিরপেক্ষ আর ধর্মীয় চর্চার মতো পৃথক ধারা সৃষ্টি হয়নি। এনলাইটমেন্ট স্টাইলে কোনো বিবর্তন ঘটেনি আর সেই কারণে কোনো গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানভিত্তিক বা শিল্পকেন্দ্রিক বিপ্লবও সংঘটিত হয়নি।

কেন হয়নি?

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এর একটা কারণ বোধ হয় এটাই, যেসব ইস্যুর কারণে খ্রিষ্টানদের প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলনটি হয়েছিল, ইসলামে তেমন কিছুর অস্তিত্বই ছিল না। প্রোটেস্ট্যান্টরা চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, ইসলামে চার্চ বলতে কিছু নেই। প্রোটেস্ট্যান্টরা পোপের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, ইসলামে পোপের কোনো অস্তিত্ব নেই। প্রোটেস্ট্যান্টরা দাবি করছিল যে, মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার মাঝে যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার কোনো ক্ষমতা পাদ্রিদের নেই, আর ইসলামে পাদ্রির মতো কোনো অবস্থানই কারো নেই। ক্যাথোলিকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে এসে প্রোটেস্ট্যান্টরা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কথা বলে। আর ইসলামিক ধর্মীয় বিধিবিধান বা আচার আচরণগুলো শুরু থেকেই আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি যোগাযোগের কথাই বলছে।

তবে মুসলমানদের মধ্যে যে সংস্কার আন্দোলনটি নতুন করে শুরু হলো সেখানে ইউরোপিয়ানদের ভূমিকা অবশ্যই ছিল। মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে ইউরোপিয়ানরা না থাকলে হয়তো সংস্কার আন্দোলনটা ভিন্ন কোনো আদলে হতো। ইউরোপে যে ধর্মীয় সংস্কারটি হয়েছিল, তা হয়েছিল পুরোপুরি ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে। যখন প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারকরা ক্যাথোলিকদের কার্যক্রম ও চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ করল, তারা মূলত তাদের বিদ্যমান ইউরোপিয়ান সমাজের আভ্যন্তরীণ ইস্যুগুলোকেই বিবেচনায় নিয়েছিল। খ্রিষ্টান ধর্ম সেই সময়ে বা আগে পরে কখনোই সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আগ্রাসনের মুখে পড়েনি, ফলে তাদেরকে এসব নিয়ে ভাবতেও হয়নি। ১৫১৭ সালে কিছু সংখ্যক পশ্চিমা খ্রিষ্টান অবশ্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। কারণ, তাদের মনে হচ্ছিল, মুসলমানদের ধর্মীয় বার্তাগুলো খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বার্তার তুলনায় বেশি আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য। তাই খ্রিষ্টান যুবকেরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু করতে পারে। এটা ঠিক, তুর্কিরা সেই সময়ে ইউরোপের দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছিল। তবে তারা কখনোই তাদের লিভিং রুমে প্রবেশ করতে পারেনি। তুর্কিরা বাহ্যিকভাবে কিছু সময়ের জন্য খ্রিষ্টানদের জন্য হুমকি হয়ে ওঠেছিল। তবে তারা কখনোই খ্রিষ্টান ধর্মীয় আধ্যাতিকতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি।

কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা ছিল পুরোই ভিন্ন। ইতিহাসের শুরু থেকেই ইসলামি মতাদর্শটি রাজনৈতিক ও সামরিক সফলতা অর্জনের মাধ্যমে নিজের দার্শনিক শুদ্ধতা এবং একই সঙ্গে ওহির সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয় বদর ও উহুদের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। কারণ এই যুদ্ধগুলোর পরিণতিগুলোর একটি ধর্মীয় ব্যাখায় পাওয়া গিয়েছিল। ইসলামের সম্প্রসারণবাদ, একের পর এক সাম্রাজ্য জয় ইসলামের সত্যতার প্রমাণ দিয়ে গেছে বছরের পর বছর।

তারপর এল মঙ্গলদের সেই করুন ও ভয়াবহ বর্বরতার ঘটনা। মঙ্গল হেলোকাস্টের এই ঘটনা মুসলমান ধর্মতাত্ত্বিকদেরকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তখন একটি সংস্কারও হলো যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইবনে তাইমিয়া। মঙ্গলদের আক্রমনের ইস্যুটি ছাড়াও মুসলমানদের নিজেদেরও বেশ কিছু দুর্বলতা সেই সময়ে পরিষ্কার হয়েছিল। মঙ্গলদের মানুষ হত্যা করার ক্ষমতা থাকলেও তাদের কোনো আদর্শ ছিল না। যখন তাদের হত্যাকাণ্ড শেষ হয়ে গেল এবং তাদের চাহিদাগুলো একে একে পূরণ হয়ে গেল এরপর থেকে মঙ্গলদের হাতে দেয়ার মতো আর কিছুই ছিল না। এমনকি একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা নিজেরাই ইসলাম ধর্ম কবুল করতে শুরু করে। ইসলাম অবশেষে মঙ্গলদেরকে নিজ ছায়াতলে নিয়ে আসার মাধ্যমে বিজয়ী হয়, যেমনটা এর আগে তুর্কিদের ক্ষেত্রে এবং তারও আগে পারস্যদের ক্ষেত্রেও হয়েছিল।

ইসলাম ধর্ম কবুল হওয়ার পরম মঙ্গলদের বর্বরতা যে কমে গিয়েছিল তা নয় (তৈমুর লং তার অন্যতম প্রমাণ) তবে তাদের মধ্যে, ইসলামকে বিশ্ব জয়ের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে একটি বিশ্বজনীন উম্মাহ্ প্রতিষ্ঠার একটি সাধ জন্ম নিয়েছিল।

তবে মুসলিম ভূখণ্ডে দখল করার মানসিকতা নিয়ে পরবর্তী সময়ে যে ইউরোপিয়ানরা আসে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা বাস্তবতাটি মোটেই মঙ্গলদের মতো ছিল না। বরং ইউরোপিয়ানরা খুব দাম্ভিক মানসিকতা নিয়ে এই ভূখণ্ডগুলোতে এসেছিল যেখানে তারা মনে করত যে তাদের জীবনযাপন এবং ভাবনা দর্শনই হলো একমাত্র গ্রহণযোগ্য সত্য। তারা ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করে নি আবার অস্বীকারও করেনি। যত দিন তারা মিশনারী হিসেবে ছিল তত দিন তারা নীরবে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তকরণেরই চেষ্টা করে গেছে। তারা কোনো বিতর্কে কখনোই সরাসরি জড়ায়নি। তবে মুসলমানদের নানা ধরনের উত্থান পতনের ঘটনাগুলোকে তারা সব সময় খুবই সচেতনভাবে লক্ষ্য করে গেছে।

যদিও মুসলমান এবং খ্রিষ্টান পণ্ডিতেরা এমন বেশ কিছু ফোরামে একসাথে ছিল যেখানে তারা বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করতে পারত কিন্তু তারা সেই সময়ে মুসলমানদের সাথে বিতর্ক জড়ানোটাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করত কারণ তারা মনে করত এটা মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর উনবিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলাম যতটা না খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের থেকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লো তার থেকে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লো, একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী দর্শনের পক্ষ থেকে। ধর্মনিরপেক্ষ বা মানবতাবাদী এই দর্শনটি এসেছিল নব্য ধারার সংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই।

ইউরোপিয়ানদের শক্তি আর মুসলমানদের দুর্বলতার কারণগুলো কখনোই স্পষ্ট ছিল না। এটাকে কোনো সামরিক কৌশলজনিত বিষয় হিসেবেও দেখার সুযোগ নেই। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে যে বিদেশিরা বসবাস

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

করত তারা তেমন একটা নির্যাতন-নিপীড়ন করত না বা প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে কোনো ধরনের হত্যাকাণ্ডও পরিচালনা করত না। ইউরোপিয়ানরা সরাসরি শাসক হিসেবেও আবির্ভূত হতো না বরং প্রশাসনিকভাবে দেখলে দেখা যাবে অধিকাংশ মুসলিম দেশেই শাসক ছিল তাদেরই স্বগোত্রীয় মুসলমানরাই। সরকারি ভবন ও প্রতিষ্ঠানগুলোতেও মুসলমানরাই কাজ করত। মুসলিম দেশগুলোর রাজধানী বলতে সেই পুরোনো মুসলিম আমলে প্রতিষ্ঠিত শহরগুলোই ছিল। আর যারা মুসলিম ভূখণ্ডগুলো শাসন করত তারাও ইসলামের ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সেই উপাধিগুলোই ব্যবহার করত যেমন শাহ, সুলতান, নওয়াব, খান, খেদিভ ইত্যাদি। আর এই শাসকেরা দেশ পরিচালনাও করত পূর্বসূরি মুসলমান শাসকদের স্টাইলেই।

ইরানে বিদেশিরা রাষ্ট্রক্ষমতার কাছাকাছি এসেছিল পরামর্শক হিসেবে। তুরস্কে তারা পরামর্শক হিসেবে বেতন পেত। মিসর ও লেভান্ট অঞ্চলে এই বিদেশিরা রক্ষাকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিল। ভারতে যদিও ব্রিটিশ পার্লামেন্টই শাসনকর্তা হিসেবে গভর্নর জেনারেলকে নিয়োগ দিত। তথাপি ভারতবর্ষেরও সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী গঠিত হয়েছিল মুসলমান, হিন্দু, শিখদেরকে দিয়েই। তাই মুসলমানদের এই কথা প্রশাসনিকভাবে বলার সুযোগ ছিল না যে, তারা অন্য কারও দ্বারা শাসিত হচ্ছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে মুসলমানরা চারিদিকে যখন তাকানোর সুযোগ পেল, তখন তারা গভীর আতঙ্কের সাথে লক্ষ্য করল, তারা পরাধীন হয়ে পড়েছে। বঙ্গভূমি থেকে ইস্তাম্বুল থেকে পুরোটা ভূখণ্ড শুধু নয় এমনকি তাদের প্রাত্যহিক জীবনটাও বিদেশিদের হাতেই জিম্মি হয়ে পড়েছে। আর বিদেশি বলতে ঘরের কাছের কোনো নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্র নয়, বরং ভিন্ন একটা মহাদেশ থেকে আসা কিছু মানুষ যারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, ভিন্ন ধর্ম চর্চা করে এবং ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি লালন করে। এই বিদেশিরা শুকর খায়, মদ খায়, নারীদেরকে নিয়ে সব জায়গায় যায়। নারীদেরকে উন্মুক্তভাবে প্রদর্শন করে। ভিন্ন কিছুতে বিনোদন পায়, ভিন্ন খাবার খায় এবং অবসর সময়গুলো ক্রিকেট বা তাস খেলে নষ্ট করে।

মঙ্গল হোলোকাস্টের সময় যে প্রশ্নটি একবার উঠেছিল ইউরোপিয়ানদের আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রশ্নটি আবারও সামনে চলে এল। তা হলো যদি একের পর এক রাষ্ট্র জয়ের মধ্য দিয়েই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও ওহির সত্যতা প্রমাণ হয়, তাহলে এই ইউরোপিয়দের আগ্রাসনে মুসলমানরা যে নাকানি চুবানি খেল, তাতে কি প্রমাণ হয়? মুসলমানদের ইমানের সেই শক্তি কোথায় হারিয়ে গেল? ইমানের শক্তি ও কার্যকারিতা কি তাহলে নষ্ট হয়ে গেল?

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই প্রশ্নটি তখন সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই বেশ বড় হয়ে দেখা দিল। তাই সময়ের প্রয়োজনে ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং সংস্কারের প্রশ্নটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠল। যারা এই দফায় সংস্কারের পক্ষে অবস্থান নিলেন তারা যে ধর্মীয় অনুশীলনের বিশুদ্ধতা আনার জন্যই এই সংস্কার প্রস্তাব দিলেন তা নয়। বরঞ্চ তারা যে বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন তা হলো, কীভাবে মুসলমানদেরকে ইতিহাসের সোনালি ধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়। কীভাবে তাদের সংস্কারমুখী চিন্তাগুলোকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম উম্মাহ্ তার হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে। কীভাবে তারা মুসলমান সমাজে সেই মদিনার মতো ন্যায় বিচার ও মানবিক মূল্যবোধগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবে।

এই পরিস্থিতিতে মুসলিম দেশগুলোতে অনেক ধরনের সংস্কারক ও অনেক ধরনের সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব দেখা গেল। তবে মূলত তিনটি সংস্কার আন্দোলনই ইতিহাসের পাতায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে স্থান পেয়েছিল। যারা আসলে তিনটি ভিন্ন ধারা নিয়ে মানুষের সামনে এসেছিলেন।

প্রথম যে ধারার সংস্কারকদের পাওয়া গেল তাদের অনেকেই বলতে শুরু করলেন, ইসলামের আদৌ আর কোনো পরিবর্তনের দরকার নেই। পরিবর্তন করতে হলে মুসলমানদেরকে করতে হবে। সব সময় নতুনত্ব আর বিকল্প খোঁজার মানসিকতা ইমানকে দুর্বল করে দেয়। মুসলমানদের সত্যিকারার্থে যা প্রয়োজন তা হলো, যেকোনো মুল্যে সকল ধরনের পশ্চিমা প্রভাব ও আগ্রাসনকে বন্ধ করা এবং ইসলামকে তার মৌলিক রূপে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

দ্বিতীয় যেই প্রতিক্রিয়াটি পাওয়া গেল সেটি হলো, অনেকেই বললেন যে পশ্চিমারাই সঠিক। মুসলমানরাই বরং নানা ধরনের সেকেলে ভাবনার মধ্যে জড়িয়ে আছে। আর যারা মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা তারাও সময়ের পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে পারছে না। তাদেরকে তাদের ইমানকে পশ্চিমা চিন্তাধারার আলোকে আধুনিকায়ন করতে হবে, কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, আর ইসলামকে বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার আলোকে একটি ধর্মীয় ও নৈতিক দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আর তৃতীয় ধারার সংস্কারকদের যে চিন্তাভাবনা ছিল তা হলো, ইসলামকে সত্য ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা কিন্তু একই সঙ্গে এটাও মেনে নেয়া যে, মুসলমানদেরকে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে অনেক কিছুই শিখতে হবে। এই ধারার লোকেরা বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের আলোকে মৌলিক চেতনাগুলো পুনরুদ্ধার করতে হবে। ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে পশ্চিমাদের কাছ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়েও জানতে হবে। এই চিন্তাধারার মানুষগুলো আরও মনে করতেন, মুসলমানদেরকে আধুনিক হতে হবে, তবে সেটা ইসলামিক উপায়েই। কারণ তাদের মতে বিজ্ঞান সব সময়ই মুসলমানদের ইমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আর আধুনিকায়ন মানেই পশ্চিমাকরণ নয়।

আধুনিকায়নের মোকাবেলায় এই যে তিনটি সংস্কারমুখী ধারা পাওয়া গেল, তা ১৮শ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল। আর এই ৩টি ধারা মূলত তিন অঞ্চলের সংস্কারকরা ধারণ করতেন। যেমন আরব উপদ্বীপে ছিলেন সংস্কারক আব্দুল ওয়াহাব, ভারতে ছিলেন আলিগড়ের সৈয়দ আহমেদ আর তৃতীয় সংস্কার ধারাটি বহন করতেন সাইয়েদ জামালউদ্দিন আফগানি। তাঁরা মূলত প্রচলিত ধারার সংস্কারক ছিলেন না। তারা যে খুব বেশি নতুনত্ব কিছু আনয়ন করেছিলেন, তাও কিন্তু নয়। তাদের সমসাময়িক ব্যক্তিরা এমনকি তাদের ছাত্ররাও একে অন্যের চিন্তাধারা থেকে ভালো কিছু গ্রহণ করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এতদস্বত্বেও বলতে হয়, এই তিন ধারার সংস্কারমুখী আন্দোলন, সব সময়ই ইসলামের পুনর্জাগরণের তিনটি ভিন্নধারাকে প্রতিনিধিত্ব করে গেছে।

ওয়াহাবিজম

আব্দুল ওয়াহাব নেজদ নামক অঞ্চলে ১৭০৩ সালে জন্ম নেন।। আমরা আরবদেশ শুনলেই যেভাবে সোনালি বালুকনাময় এক মরুভূমির কথা দৃশ্যপটে ভেবে নিই, নেজদ অনেকটা সে রকমই ছিল। তিনি ছিলেন একজন বিচারকের সন্তান। ছোট একটি শহরে তিনি বেড়ে ওঠেন। শৈশবেই কুরআনের উপর তাঁর পারদর্শিতা দেখানোর কারণে, আরও ভালো ইসলামিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তাঁর একজন শিক্ষক, তাঁকে প্রখ্যাত ধর্মীয় সংস্কারক ইবনে তাইমিয়ার কাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ইবনে তাইমিয়া হলেন সেই মুসলিম সংস্কারক, যার উত্থান হয়েছিল মোঙ্গল হোলোকাস্ট পরবর্তী সময়ে এবং তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ মুসলমানদেরকে আর সাহায্য করছেন না। মুসলমানদেরকে তাই নিজেদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য, অবশ্যই প্রকৃত ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে। ইবনে তাইমিয়ার এই শিক্ষাগুলো যুবক আব্দুল ওয়াহাবকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত করে।

মদিনা থেকে আব্দুল ওয়াহাব চলে যান বসরায়। সেখানে গিয়ে তিনি অনেক ধরনের মতামত ও চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হন। বসরা শহরের নানা ভাবনাদর্শন,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ওহির ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা, একই সঙ্গে শহরের ভিড়, শোরগোল সবকিছুই আব্দুল ওয়াহাবকে আশাহত করে। তিনি বুঝতে পারলেন, এত মত এত পথের জন্যই প্রকারান্তরে ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বসরায় ভালো লাগেনি, আব্দুল ওয়াহাবের। তাই তিনি পুনরায় সেই মরুভূমিতে ঘেরা তাঁর ছোট্ট শহরে ফিরে আসেন এবং ইসলামকে তার মৌলিক রূপে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রচার করেন, আল্লাহ একমাত্র একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। প্রত্যেকেরই আল্লাহর সেভাবেই ইবাদত করা উচিত, যেভাবে পবিত্র কুরআনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ওহির মাধ্যমে যেই বিধিবিধানগুলো প্রবর্তিত হয়েছে, সেগুলোকেই সেভাবেই সবার মান্য করা উচিত। প্রতিটি মুসলমানের সেভাবেই জীবনযাপন করা উচিত, যেভাবে মদিনায় রাসূলুল্লাহর ﷺ সময়ে মুসলমানরা জীবনযাপন করতেন। তিনি এও বলেন, 'আর যারাই ইসলামের এই সত্যিকারের পুনরুত্থানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাদেরকে অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।'

ইতিহাসের একটি বাস্তবতা ছিল এমন যে, অটোম্যানরা সমগ্র আরবকেই তাদের সম্পত্তি মনে করত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কখনোই মুরুভূমির দূরে দূরে থাকা বেদুইন বা আরবের বিভিন্ন গোত্রের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। আব্দুল ওয়াহাব এই সুযোগটাই নেন। তিনি এই বেদুইনদের মধ্যে তার কিছু অনুসারী খুঁজে পান। তাদেরকে নিয়েই তিনি একটু দূরের দিকে থাকা বেশ কিছু মাজার ধ্বংস করেন। কারণ সেই মাজারগুলোকে কেন্দ্র করে সেই সময়গুলোতে কিছু ইবাদতও হচ্ছিল। আব্দুল ওয়াহাব প্রচার করেন আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে কিছু চাওয়া বা কারো সামনে নত হওয়াটা শিরক।

পরবর্তীকালে জীবনের একটা পর্যায়ে এসে আব্দুল ওয়াহাব বিচারকের দায়িত্ব পান এবং হানবালি আইনের প্রয়োগ শুরু করেন। সেই সময়ের একটি ঘটনা। একদিন তিনি এক রায়ে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে এক মহিলাকে পাথর মেরে হত্যা করার রায় প্রদান করেন। স্থানীয় জনগণ এই রায়ে ক্ষেপে গেল এবং তারা আব্দুল ওয়াহাবের পদত্যাগ দাবি করল। উত্তেজিত জনতা তাকে হত্যা করারও পরিকল্পনা করেছিল। এই অবস্থায় আব্দুল ওয়াহাব সেই শহরটি ত্যাগ করেন এবং দারিয়াহ নামক অন্য একটি শহরে গমন করেন।

সেখানকার (দারিয়াহ) স্থানীয় শাসক মোহাম্মাদ ইবনে সৌদ তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ইবনে সৌদ ছোট একটি গোত্রের প্রধান হলেও, তার ভেতরে সমগ্র আরবকে একই ছায়াতলে নিয়ে আসার স্বপ্ন বরাবরই ছিল। আর ছায়াতলে নিয়ে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ভাষায় বলতে তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে গোটা আরবকে জয় করাকেই বুঝাতেন। আব্দুল ওয়াহাবকে দেখেই তিনি বুঝলেন, ঠিক এ রকম একজন লোককেই তার দরকার। অন্যদিকে, আব্দুল ওয়াহাবও বুঝলেন, তার চিন্তাধারা প্রচার ও প্রসারের জন্য ইবনে সাউদের মতো একজন সঙ্গীর বড্ড প্রয়োজন। দুজনেই তাদের নিজ নিজ প্রয়োজনীয়তার জায়গা থেকেই একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। ইবনে সৌদ আব্দুল ওয়াহাবকে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার অবস্থান দিতে রাজি হলেন। আর আব্দুল ওয়াহাবও ইবনে সৌদকে মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। একই সঙ্গে আব্দুল ওয়াহাব তার সকল অনুসারীকে ইবনে সৌদের পক্ষে লড়াই করারও নির্দেশ দিলেন।

এই চুক্তিতে বেশ ভালো কাজ হলো। পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে এই দুই ব্যক্তি আরব্য উপদ্বীপের সকল বেদুইন গোত্রকে সৌদি-ওয়াহাবি জোটের আওতায় একত্রিত করতে সক্ষম হলেন। যখনই তারা ভিন্ন চিন্তাধারার কোনো গোত্রকে পেতেন, তারা ৩ বার বলতেন, ধর্মান্তরিত হও, ধর্মান্তরিত হও, ধর্মান্তরিত হও। তিনবার বলার পরও যদি ঐ গোত্র তাদের আহবানকে অগ্রাহ্য করত, তাহলে আব্দুল ওয়াহাব তার বাহিনীকে সেই গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করার আদেশ দিতেন। কারণ, ওয়াহাবের মতে, এই অমান্যকারী গোত্রগুলো নাস্তিক হওয়ায় তাদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

ধর্মান্তরিতকরণের এই আহবানটি অনেকগুলো গোত্রকেই বেশ সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। কারণ, তারা সকলেই নিজেদেরকে মুসলমানই দাবি করত। কিন্তু যখনই আব্দুল ওয়াহাব বলতে শুরু করলেন, ধর্মান্তরিত হও! তার মানে আসলে এর মাঝে নতুন কোনো চেতনার বার্তা রয়েছে। আব্দুল ওয়াহাব অবশ্য তার ভাবনাদর্শনকে ওয়াহাবিজম বলতেন না। কারণ, তিনি তার পূর্বসূরি ইবনে তাইমিয়ার মতোই দাবি করতেন, তিনি নতুন কিছুই বলছেন না। বরং মুসলমানদেরকে প্রকৃত ও আদি ইসলামের কাছেই ফিরে যাওয়ার কথা বলছেন। সব ধরনের নতুনত্ব ও দুর্নীতিকে বাদ দিয়ে তিনি মুসলমানদেরকে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য আহবান জানাচ্ছেন। তিনি নতুন কোনো ধারণা দেয়ার দাবিকে সব সময়ই অস্বীকার করেছেন। বরং তিনি দাবি করতেন যে, তিনি নতুন কিছু প্রবর্তন করার ঘোর বিরোধী।

সাধারণ জনগণ তার কথায় খুব একটা সন্তুষ্ট ছিল না। তারা তার কথাবার্তাকে ইসলামিক চেতনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করত না। বরং ইসলামের আরেকটি অংশ বলেই মনে করত। তাই তারা আব্দুল ওয়াহাবের ভাবনাদর্শনকে ওয়াহাবিজম হিসেবেই অভিহিত করতে শুরু করে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১৭৬৬ সালে ইবনে সৌদ আততায়ীদের হাতে নিহত হন। এরপর তার ছেলে আব্দুল আজীজ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনিও আব্দুল ওয়াহাবের ভাবাদর্শের ভিত্তিতে আরব জাতিকে একত্রিত রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ১৭৯২ সালে আব্দুল ওয়াহাব ইন্তেকাল করেন। সেই সময়ে তার ২০ জন স্ত্রী এবং অসংখ্য সন্তানাদি ছিল। তিনি ১৮ শতকের প্রায় পুরোটা সময়ই বেঁচে ছিলেন। তিনি এমন একটি সময়ে আরবে আদি ইসলাম পুনপ্রবর্তনের চেষ্টা করছিলেন, যে সময়টায় ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড গ্রেট ব্রিটেনের অংশ হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়। ফরাসি বিপ্লব নাগরিকদের অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষণা দেয়। মোজার্ট তার ঐতিহাসিক সব সুর সৃষ্টি করেন আর জেমস ওয়াট বাষ্প ইঞ্জিন তৈরি করেন।

আব্দুল ওয়াহাবের মৃত্যুর পর আজীজ ইবনে সৌদ নিজেকে উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ঘোষণা দেয়। আগে তো শুধু রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেনই, ওয়াহাবের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসেবেও দাবি করেন। ১৮০২ সালে আজীজ বিন সৌদ কারবালায় আক্রমণ করেন। কারবালা হলো সেই শহর যেখানে রাসূল ﷺ-এর নাতি ইমাম হুসাইন (রা.) শাহাদাত বরণ করেছিলেন। এই শহরটি শিয়া অধ্যুষিত। আর যখন আজীজ বিন সৌদ আক্রমণ করেন, তখন অসংখ্য শিয়া ইমামরা হুসাইনের শাহাদাতে বিলোপ করার জন্য সেখানে একত্রিত হয়েছিলেন। আব্দুল ওয়াহাব বিচ্যুত মুসলমানদের যে তালিকা করে গিয়েছিলেন, সেখানে শিয়াদের অবস্থান ছিল শীর্ষে। তাই কারবালাটি জয় করেই আজীজ বিন সৌদ প্রায় দুই হাজার শিয়া অধিবাসীকে হত্যা করেন।

১৮০৪ সালে আজীজ বিন সৌদ মদিনা জয় করেন। সেখানে তার সৈন্যরা অসংখ্য সাহাবির কবর ধ্বংস করেন। মদিনা থেকে এই সেনাদল মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে তারা হযরত মোহাম্মাদ ﷺ জন্মস্মৃতি বিজড়িত স্থানটিও ধ্বংস করেন। যাতে করে কেউ কখনো নবির এসব স্মৃতিময় জায়গাকে শিরকের স্থান বানিয়ে না ফেলে, সেজন্যই তারা এই কাজটি করেছিলেন। তবে যতক্ষণ আজীজ ইবনে সৌদ মক্কায় ছিলেন, তিনি অসংখ্যবার পবিত্র কাবা শরিফ তাওয়াফ করেছেন এবং সেখানে ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুযায়ী সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছেন।

তারপর ১৮১১ সালে সৌদি-ওয়াহাবি জোট নতুন আরেকটি কার্যক্রম শুরু করে। এবার তাদের কাজের ক্ষেত্র ছিল এশিয়া মাইনর। যা কিনা ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের একেবারে মূল কেন্দ্রবিন্দু। পরিস্থিতি এই পর্যায়ে চলে আসার পর

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অটোম্যান সুলতান ওয়াহাবি আন্দোলনকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হন। আব্দুল ওয়াহাব ও তার বেদুইন দলকে দমন করার জন্য, অটোম্যান সুলতান মিসরের তৎকালীন খেদিভ মোহাম্মাদ আলির সহযোগিতা চান। মোহাম্মাদ আলি সেই ডাকে সাড়া দেন এবং তার সুসংগঠিত সেনাবাহিনী নিয়ে আরব্য উপদ্বীপে হাজির হন। ১৮১৫ সালে যখন নেপোলিয়ান ওয়াটারলুতে যুদ্ধ করছিলেন, মোহাম্মাদ আলি সেই একই বছরেই ইবনে সৌদ ও তার বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং মক্কা ও মদিনায় অটোম্যান সাম্রাজ্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। একই সাথে পবিত্র শহরগুলো পুনরায় সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তারপর তিনি আজীজ ইবনে সাউদের সন্তান ও তার উত্তরাধিকারীকে ইস্তানবুলে নিয়ে যান এবং সেখানে জনসম্মুখে হত্যা করেন।

এর পরবর্তী একশ বছরে সৌদি-ওয়াহাবি জোট নিয়ে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে এই জোট তখনো অকার্যকর হয়নি। যে আরব গোত্রপ্রধানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, তারই একজন সন্তান ছিল যিনি পুনরায় বিপর্যস্ত সৌদি মৈত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রাথমিকভাবে তিনি ছিলেন কেবলই একজন ছোট গোত্র প্রধান। তবে তিনিও কিন্তু ওয়াহাবি ছিলেন। যেখানে এবং যে বিষয়েই তিনি আইন প্রয়োগ করতেন, সেটা মূলত ওয়াহাবি আলেমরাই উত্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ করতেন। আব্দুল ওয়াহাব তখন জীবিত ছিল না। কিন্তু তার ভাবনাদর্শন যা ওয়াহাবিজম বা ওয়াহাবি দর্শন নামে পরিচিত। তা তখনো জীবিত ছিল।

তার মতাদর্শটি আসলে কী ছিল?

কেউ যদি আব্দুল ওয়াহাবের নিজের লেখা বইগুলো পড়েন তাহলে দেখবেন, প্রচলিত ধারায় আমরা এখন যাকে ওয়াহাবিজম বলছি, তার সাথে আব্দুল ওয়াহাবের লেখা বইগুলোর কোনো মিলই নেই। এর একটা বড় কারণ হলো, আব্দুল ওয়াহাব কখনোই রাজনৈতিক ইস্যুতে কিছু লেখেননি। তিনি মূলত কুরআনের তাফসির লিখেছেন এবং সেগুলোকে তার ভাবাদর্শের আলোকে উপস্থাপন করেছেন। তার লেখা বই কিতাব-আল-তাওহিদে (দ্য বুক অব ইউনিটি) মোট ৬৬টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়েই কুরআনের কোনো-না-কোনো আয়াত সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি আয়াতেই অসংখ্য জিনিস আছে যা শেখার মতো। আর তারপর তিনি ওয়াহাবের মূল চিন্তাভাবনার সাথে সেই আয়াতগুলোর প্রাসঙ্গিকতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তার বইতে কখনোই প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যকে কেন্দ্র করে কিছু বলেননি। পশ্চিমা আগ্রাসন বা মুসলমানদের দুর্বলতা নিয়েও কিছু বলেননি। অর্থাৎ রাজনীতির সাথে দূরতম সম্পর্ক আছে তিনি তেমন কোনো বিষয়ই নিয়েই কাজ করতে চাননি। আব্দুল ওয়াহাবের বইগুলো

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পড়লে অনুধাবন করা যায় যে, তিনি বিশ্বকে বা বৈশ্বিক সব বিষয়কেই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করতেন। তার ভাষ্যমতে, তিনি মূলত, দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। প্রথমত, তিনি তাওহিদকে গুরুত্ব দিতেন অর্থাৎ একক খোদার কাছে আত্মসমর্পণ করার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। আর দু নম্বরটা হলো, শিরক। কেউ যদি কোনো বিষয়ে খোদার অসীম ক্ষমতার সাথে কাউকে তুলনা করে তাহলেই সেটা শিরক।

কার্ল মার্কস একবার বলেছিলেন, আমি মার্কসবাদী নই। আব্দুল ওয়াহাব জীবিত থাকলেও হয়তো বলতেন, আমি ওয়াহাবি নই। যাহোক, বাস্তবতা হলো ওয়াহাবিজম টিকে আছে। ওয়াহাবের মূল চিন্তাধারা থেকে অসংখ্য ধারা উপধারা বের হয়েছে যা মূলত ঘটেছে সৌদি শাসকদের যত্রতত্র প্রয়োগ ও অনুশীলনের জন্য। এই সম্প্রসারিত ও বিকশিত ওয়াহাবিজম বলছে, আইনই হচ্ছে ইসলাম আবার অন্যদিকে ইসলামই হচ্ছে আইনি বিধি বিধান। এই আইনকে সঠিকভাবে পাওয়া, তাকে সঠিকভাবে জানা ও মানা এবং একে সততার সাথে অনুসরণ করাটাই হলো ইমানের দাবি।

ওয়াহাবিদের মতে সমস্ত আইনই কুরআনে বর্ণিত আছে আর নবির জীবন হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত বিধানের একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। কুরআন এমন কিছু কার্যক্রমের কথা বলে, যা মানুষকে অবশ্যই পালন করতে হবে। কুরআন শুধু মানুষের জীবনের কাঠামোগত রূপ নয় বরং মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় নিয়েই কথা বলেছে আর রাসূলের জীবনই হলো প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য উত্তম আদর্শ।

ওয়াহাবিদের চিন্তামতে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং খেলাফতে রাশেদার প্রথম তিন খলিফার শাসনকাল পর্যন্ত মদিনায় মুসলমানরা ছিল একটি আদর্শ জাতি। কোনো নতুন আইন প্রবর্তিত হলে সবাই একই সাথে খবর পেত, আইনটি জেনে যেত এবং তা মেনে নিত। আর এই কারণেই মুসলিম জাতি সেই সময় অলৌকিকভাবে বিকশিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছিল।

ওয়াহাবি দর্শন আরও দাবি করে যে, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হলো আইনকে সঠিকভাবে মেনে চলা। আর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি জাতি তৈরি করা যেখানে আইনগুলো সঠিকভাবে অনুসৃত হবে। যারা মুসলমানদেরকে আদর্শ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনো রূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তারাই ইসলামের শত্রু। আর মুসলমানদের অন্যতম মৌলিক কর্তব্য হলো ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নেয়া। জিহাদ শুধু যুদ্ধ করেই নয় বরং নামাজ ও ইবাদত, রোজা, হজ এবং আল্লাহর একক সত্তাকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমেও জিহাদ করা যায়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তাহলে ইসলামের শত্রু কারা?

ওয়াহাবি ভাবনাদর্শন অনুযায়ী যারা ইসলামে বিশ্বাস করে না তারা অবশ্যই ইসলামের শত্রু, তবে তারাই সবচেয়ে বড় ক্ষতিকারক শত্রু নয়। যদি অমুসলিমরা মুসলিম আইনের আওতায় শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে চায়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ওয়াহাবি মতবাদ অনুযায়ী ইসলামের বড় শত্রু হলো কথায় ও কাজে মিল নেই এমন মুসলিম, ধর্মত্যাগী, মুনাফিক এবং নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তনকারীরা। কথায় ও কাজে মিল নেই বলতে বুঝানো হয়েছে সেই মুসলমানদের কথা, যারা সব সময়ই মুসলমানদেরকে নিয়ে কথা বলে। নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করে কিন্তু আমল করে না। দেখা যায় আজানের পর নামাজের সময় চলে যাচ্ছে, অথচ তারা হয় গল্প করছে, না হয় তাস খেলছে।

ধর্মত্যাগী বলতে সেসব মানুষকে বুঝানো হয়েছে যারা হয় মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছে বা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে, কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে আবার ইসলামকে অস্বীকার করেছে। এই জাতীয় লোকদেরকে হত্যা করার বিধানও দেয়া হয়েছে। আর মুনাফিক হলো সেই ব্যক্তিরা, যারা মুখে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে দাবি করলেও আসলে তারা মুসলমান নয়। তারা মুখে ইমানের কথা বললেও অন্তরে ভিন্ন বিশ্বাস লালন করে। তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং মুসলমানরা কোনো সংকটে পড়লে আস্তে করে কেটে পড়ে। মুনাফিকদের শঠতা প্রমাণ হওয়ার পর তাকেও হত্যা করার আইন রয়েছে। তবে ওয়াহাবিদের মতে, সবচেয়ে বেশি অন্যায় করেছে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবনকারীরা। ইসলামের আদি বিধানের সাথে যারাই নতুন করে কিছু যোগ করেছে, তারা মূলত ইসলামকে দূষিত করেছে। মানুষের মধ্যে যাদের ইবাদত করার প্রক্রিয়া মূল বিশ্বাসী বা ইমানদারদের থেকে আলাদা, কিংবা কেউ যদি এমনভাবে ইবাদত করে যেভাবে রাসূল ﷺ বা তার সাহাবিরা কখনোই করেননি, কিংবা এমন কোনো চিন্তার সূত্রপাত ঘটান যা কুরআনে সরাসরি পাওয়া যায় না তাহলে তাদেরকেই নতুনত্ব আবিষ্কারকারী বলা যায়। শিয়া ও সুফি উভয় সম্প্রদায়কেই এই তালিকার মধ্যে ফেলা হয়েছে। তাই ওয়াহাবিদের মতে এই দুই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করা শুধু বৈধই নয় বরং অবশ্যই করণীয় ।

ওয়াহাবি দর্শন ও চিন্তাধারা একটা সময়ে গিয়ে আরব অঞ্চলের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরবের তুলনায় ভারতীয় উপমহাদেশে ওয়াহাবিজম আরও বেশি শক্ত অবস্থান লাভ করে। কিন্তু যারা নিজেদেরকে ওয়াহাবি বলে দাবি করে এমন ধরনের লোকেরা আবার সৌদি প্রতিষ্ঠিত ওয়াহাবিজমের সবটুকুকে নয়, বরং নিজেদের পছন্দমতো বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতে ওয়াহাবিরা জিহাদ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

করাকে অবশ্যকরণীয় হিসেবে মনে করে না। আবার কেউ কেউ মনে করে যে যুদ্ধে ফায়সালা না করে ধর্মত্যাগীদের বিষয়টা গঠনমূলক বিতর্ক আলোচনার মাধ্যমেও সমাধান করা যায়। একইভাবে কথায় ও কাজে মিল না থাকা মুসলমান কিংবা মুনাফিকদের ব্যাপারেও কারও কারও মধ্যে নমনীয় অবস্থান দেখা যায়। কিন্তু এরপরও তারা নিজেদেরকে ওয়াহাবি বলেই মনে করে এবং ইসলামি আইনকেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আর এরা সকলেই ইসলামের মৌলিকত্ব ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে মদিনার প্রথমদিকের সেই ইসলামি সমাজ ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ইসলামি বিশ্বের বাইরে সৌদি-ওয়াহাবি জোটটি একটু সমস্যায় পড়লেও, আরবের মরু অঞ্চলে তাদের অবস্থান ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছিল। ফলে বিংশ শতাব্দীতে এসে গোটা বিশ্বের সচেতন মানুষের কাছেই এই জোটের কার্যক্রম চোখে পড়তে শুরু করে। আর তার পরপরই ব্রিটিশ কর্মকর্তা লরেন্স অব আরাবিয়া এই সৌদি-ওয়াহাবি জোটের হাত ধরেই মরু অঞ্চলে প্রবেশের পরিকল্পনা করতে শুরু করে।

দ্য আলিগড় আন্দোলন: ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতা

সৈয়দ আহমদ কিংবা আলিগড়ের সৈয়দ আহমদ। যেভাবেই আপনি তাকে অভিহিত করুন না কেন মূলত, এই মানুষটি একটি নতুন ধরনের ভাবনা দর্শন দিয়ে গিয়েছিলেন; যা ১৯ শতকে মুসলিম বিশ্বের অনেক জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাথমিকভাবে তিনি এবং তার সঙ্গীরা ইসলামকে নিয়ে একটু ভিন্নভাবে ভাবতে শুরু করেন। তারা মনে করতেন ইসলাম একটি নৈতিক ব্যবস্থা এবং ইসলাম তার পুরোনো ঐতিহ্যেই অনেক বেশি সত্য ও সঠিক। তথাপি ইউরোপিয়ানদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ধর্মনিরপেক্ষ পৃথিবীতে টিকতে হলে ইসলামকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুগোপোযোগী করতে হবে।

সৈয়দ আহমদ জন্ম নেন ১৮১৭ সালে, দিল্লির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। মোঘল আমলে তার বংশধরেরা গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে কাজ করত। তবে সৈয়দ আহমদ যখন জন্ম নেন তারও বহু আগে থেকেই এই অঞ্চলে ব্রিটিশদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর অন্য অনেক পরিবারের মতো সাইদ আহমদের পরিবারও সেই বাস্তবতায় অভ্যস্তও হয়ে পড়েছিল। সাইদ আহমদের দাদা ব্রিটিশদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করতেন। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্কুল পরিচালনা করতেন এবং একবার ইরানে ব্রিটিশ দূত হিসেবে সফরও করেছিলেন। দুবার তিনি মোঘল সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন। তবে সেই সময়ে সম্রাট নিজেও ব্রিটিশদের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর কাজ ছিল সম্রাটের জন্য নিয়মিত মাসিক সম্মানীটির বন্দোবস্ত করা। সৈয়দ আহমদের বাবাও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্যই কাজ করতেন। আর সৈয়দ আহমদের ভাই ভারতের প্রথম উর্দু পত্রিকা চালু করেছিলেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে সৈয়দ আহমদ একটি অভিজাত, আধুনিক, পশ্চিমাভাবধারার শিক্ষিত পরিবারে জন্ম নিয়েছিলেন। ব্রিটিশদের জীবনযাপন নিয়েও তার ভালো ধারণা ছিল।

তার মা অবশ্য খুবই ধার্মিক মহিলা ছিলেন। চেতনার সেই জায়গা থেকেই তিনি তার ছেলেকে মাদ্‌রাসায় পাঠিয়েছিলেন। একই সঙ্গে দাদার প্রভাবও সৈয়দ আহমদের ওপর ছিল ব্যাপক। তাই সৈয়দ আহমদ এমন একটি দ্বৈত চেতনা নিয়ে বড় হন যেখানে একদিকে মুসলিম উম্মাহ্ ও ইসলামি ঐতিহ্যের প্রতি তার দরদ ছিল ঠিকই, অন্যদিকে ব্রিটিশ সংস্কৃতি ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশের জন্যও তার হৃদয়ে আলাদা একটি সম্মান সঞ্চিত ছিল।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তার পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর গোটা পরিবারটি প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে পড়ে যায়। সৈয়দ আহমদকে তাই স্কুলে পড়াশোনা বাদ দিয়ে কাজে যোগ দিতে হয়। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কেরানি হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং এক সময় সাব-জজ হিসেবে পদোন্নতি পান। এই পদটি কোম্পানির বিচারিক পদ্ধতিতে অত্যন্ত ছোট একটা পদ ছিল। কেরানির থেকে আহামরি বড় কিছু ছিল না। তিনি বেশি ভালো পদে যেতে পারছিলেন না। কারণ, তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা কম ছিল। তিনি মূলত স্বশিক্ষিত একজন ব্যক্তি ছিলেন।

তবে সৈয়দ আহমদের পড়াশোনার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। হাতের কাছে বিজ্ঞান ভিত্তিক বই হোক, বা ইংরেজি সাহিত্যের কোনো বই- তিনি পেলেই পড়তে শুরু করতেন। তিনি তার মুসলিম সহচর ও বন্ধুদেরকে নিয়ে পাঠচক্র ও আলোচনার জন্য ক্লাব গঠন করতেন এবং তাদেরকে নিয়ে প্রায়ই বিজ্ঞান ভিত্তিক নানা আলোচনা ও বিতর্কের আয়োজন করতেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের সময় তিনি ব্রিটিশদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে বিদ্রোহটি দমন হওয়ার পর তিনি একটি প্যামপ্লেট রচনা করেন যার নাম দেন 'দ্য কসেজ অব দ্য ইন্ডিয়ান রিভল্ট'। এই প্যামপ্লেটে (ছোট পুস্তিকা বা বুলেটিন) তিনি ব্রিটিশ প্রশাসকদের নানা ধরনের ভুল ও অন্যায় কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরে সেগুলোর তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি সেই প্যামপ্লেটটি কলকাতা ও লন্ডনের ব্রিটিশ নীতিনির্ধারকদের কাছেও প্রেরণ করেন। এরপরে তিনি যে রচনাটি লিখেন তার নাম 'অ্যান একাউন্ট অব দ্য লয়াল মোহামেডানস অব ইন্ডিয়া'। তার এই বইটি একজন ব্রিটিশ কর্নেল ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই ছোট বইটিতে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। তিনি ব্রিটিশদের চোখ দিয়ে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ভারতবর্ষের মুসলিমদেরকে দেখার চেষ্টা করেন এবং সেখানে এই অঞ্চলের মুসলমানদেরকে রানিমাতার সবচেয়ে অনুগত হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি আরও দেখানোর চেষ্টা করেন যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কোনো জিহাদী চেতনা নেই। তিনি বেশ কিছু ভালো বিশেষজ্ঞদের মতামত তুলে ধরার মাধ্যমে এটা প্রমাণ করেন যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাটি সঠিক হবে না। কারণ, ব্রিটিশরা কখনোই মুসলমানদের ধর্মীয় কার্যক্রমে কোনো বাধা দেয়নি।

অবশেষে ১৮৭৪ সালে সৈয়দ আহমদ প্রথমবার স্বচোখে ইংল্যান্ড দেখার সিদ্ধান্ত নেন। এটা ছিল নিজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে সৈয়দ আহমদের প্রথম কোনো বিদেশ সফর। তার লেখার সাথে ইংল্যান্ডের কিছু মানুষ আগেই পরিচিত ছিল, তাই তারা তাকে বেশ খাতিরও করেন। ফলে সৈয়দ আহমদ তার লন্ডনে থাকা সময়টিতে অসংখ্য জমকালো পার্টিতে যাওয়ার সুযোগ পান এবং সেখানে অনেক নামকরা বুদ্ধিজীবী, চিত্রশিল্পী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে তার দেখা সাক্ষাৎ হয়। তার পরনের পোশাকটি ছিল একেবারে মুসলিম ঘরানার, মুখে ছিল দাড়ি আর মাথায় ছিল টুপি। তাকে দেখলে যে কারও মোঘল আমলের সম্ভ্রান্ত মুসলিম কোনো মুসলিম ব্যক্তিত্বের কথাই মনে পড়ে যেত। তৎকালীন রানি তাকে একটা রিবন উপহার দেন এবং তাকে ভারতের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে স্বীকৃতি দেন। আর সেই প্রাপ্তি থেকেই তার নামের আগে স্যার উপাধিটি যুক্ত হয়। ফলে এরপর থেকে তার নাম হয় স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

এরপর একদিন লন্ডন দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তিনি একজন ইংরেজের লেখা নবি মোহাম্মাদ ﷺ-এর একটি জীবনী দেখতে পান। যে জীবনটি আসলে নবিজির ﷺ সম্মানের সাথে অবমাননাকর ছিল। এটা দেখে সৈয়দ আহমদ পুরোপুরি ভেঙে পড়েন। তিনি সেই মুহূর্ত থেকে অন্য সব কাজ বাদ দিয়ে প্রিয়নবির ﷺ জীবনী লেখার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি উর্দুতে এই জীবনীটি রচনা করেন। কারণ, তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু তিনি চাইছিলেন, বইটি ইউরোপিয়ানরাও পড়ুক। তাই তিনি বইটির প্রতিটি অধ্যায় লেখার পর নিজে পয়সা খরচ করে সেটা ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ও ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করাতেন। কাজটি আসলে তার সামর্থ্য ও বাস্তবতার তুলনায় অনেক বেশি বড় ও ব্যাপক ছিল। তাই সেই পথে না হেঁটে তিনি নবিজির ﷺ ওপর বিভিন্ন লেখকের লেখা রচনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। কিন্তু এই কাজটিও শুরু করার পর শেষ হওয়ার আগেই তাঁর টাকা ফুরিয়ে যায়। ভারত ছাড়ার ১৭ মাস পর অনেকটা সর্বস্বান্ত ও বিপর্যস্ত অবস্থায়ই তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন।

কিন্তু ইংল্যান্ড আসলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে মারাত্মকভাবে আবিষ্ট ও প্রভাবিত করে ফেলেছিল। ইংল্যান্ড ঘুরে আসার পর তিনি বুঝতে পারলেন,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তার দেশটি আসলে কতটা পিছিয়ে আছে। তিনি এই বিষয়ে তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'আমি গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি, ভারতের নাগরিকেরা তারা বড় লোক হোক বা গরিব, ব্যবসায়ী হোক বা ক্ষুদ্র দোকানদার, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত; যখন এই মানুষগুলোকে ইংরেজদের শিক্ষা, আচার ব্যবহার বা আভিজাত্যের সাথে তুলনা করা হয় তখন বিষয়টা এমন মনে হয় যে, একটা নোংরা প্রাণীকে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য মানুষে পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

কিন্তু মুসলমানদেরকে কোনো বিষয়টা এতটা পশ্চাতপদ অবস্থায় রেখে দিল? তিনি তার পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের অবস্থান কীভাবে উন্নত করবেন? সৈয়দ আহমদ মনে করলেন এই পশ্চাতপদতার মূল কারণ হলো ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন না করা। তার মতে, অধিকাংশ মুসলমান কিছু যাদুকরী চেতনা এবং কুসংস্কারের মধ্যে ডুবে আছে এবং সেটাকেই ইসলাম বলে দাবি করছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সৈয়দ আহমদ একটা নতুন চিন্তাদর্শনের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেন যা সমসাময়িক অনেক আলেম ওলামাই ভালোভাবে নেননি। সৈয়দ আহমদের মতে, ধর্ম হলো মানুষের অনুসন্ধান ও অর্জনের একটি প্রাকৃতিক ক্ষেত্র। এটা ওতপ্রোতভাবে মানুষের জীবনের সাথে জড়িত। মানুষের জীবনের একটি স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই ধর্ম এগিয়ে যায়। ঠিক যেমন কৃষি, শিল্প সংস্কৃতি যত উন্নত হয় মানুষও তত বেশি সভ্য ও মার্জিত হয়ে ওঠে।

সৈয়দ আহমদের মতে, ইসলামের প্রথম দিকের মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়গুলো বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে বিবেচনা করার খুব একটা সামর্থ্য ছিল না। তাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য তাদের রিভিলড রিলিজিয়ন বা উন্মোচিত ধর্মীয় দর্শনের (ওহির মাধ্যমে নাযিলকৃতও বলা যায়) প্রয়োজন পড়ত। আর প্রিয়নবি ﷺ তার অসাধারণ উপস্থাপনাশৈলীর মাধ্যমে সেই ওহির জ্ঞানগুলো সবাইকে পৌছে দিতেন। তবে সত্যিকারের এই ধর্মীয় বিষয়গুলো মোটেও অপ্রাসঙ্গিক বা অবাস্তব কিছু নয়। এই বিষয়গুলো খুবই যৌক্তিক। যুক্তি দিয়েই এই বিষয়গুলোকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। কিন্তু সেই মানের পর্যালোচনা তখনই করা সম্ভব, যখন মানুষ কাঙ্ক্ষিত মানের বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

সেই কারণেই নবি মোহাম্মাদ ﷺ বলে গেছেন যে তার পরে আর কোনো নবি আসবে না। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, তিনি সেই সময়ে যেসব কথা বলে গেছেন বা বিধি বিধান দিয়ে গেছেন, সারা জীবন সেই একইভাবে মানুষকে ভাবতে হবে বা জ্ঞান ও বিজ্ঞান সেই পূর্বাপর অবস্থান থেকে আগাতে পারবে না। ইসলাম হলো সর্বশেষ উদঘাটিত ধর্ম যা ওহির মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। যারা যুক্তি বোঝেন তারা মৌলিক নীতিমালাগুলোকে যৌক্তিকভাবে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিচার বিশ্লেষণ করে নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জন করতে পারবেন। ইসলাম মূলত আমাদেরকে কিছু মৌলিক নীতিমালা দিয়েছে। এই ধরনের নীতিমালা খ্রিষ্টানবাদও দিয়েছে। তবে ইসলামের উত্তম দিক হলো, একমাত্র ইসলামই মানুষকে অন্ধ বিশ্বাস, আনুগত্য ও কুসংস্কারের থেকে মুক্তি দিয়েছে।

সৈয়দ আহমদ বলেন মুসলমানরা জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে যা জেনেছে, বা আল্লাহর পক্ষ থেকে ধর্মীয় আদেশ নিষেধের যে নীতিমালাগুলো পেয়েছে, তা মূলত একটি নৈতিক প্রক্রিয়া। সৈয়দ আহমদের এই চিন্তাধারা অনুযায়ী ভালো মুসলমান সে নয় যে দিনের ভেতরে কয়েক ঘন্টা আরবি ভাষায় কুরআন তেলাওয়াত করে কিংবা একটি নির্দিষ্ট স্টাইলেই পোশাক পড়ে। ভালো মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যে মিথ্যা কথা বলে না, প্রতারণা করে না, চুরি করে না, খুন রাহাজানি করে না। যে কিনা মানুষের সাথে সদাচরন করে, দায়িত্বশীল ব্যবহার করে এবং সমাজের অন্য সবার সাথে দয়া, মায়া, সহানুভুতির সাথে মিশে এবং দরিদ্রদের জন্য দান-সদকা বেশি করে।

ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে সৈয়দ আহমদ ভারতের আলিগড়ে সাইন্টিফিক সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেকচার প্রণীত হতো। একই সঙ্গে ইউরোপিয়ানদের জ্ঞানগুলোকে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সহজবোধ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে পশ্চিমা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিখ্যাত বইগুলোকে উর্দু ও ফারসিতে অনুবাদ করা হতো। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার পর সৈয়দ আহমদ তার সাইন্টিফিক সোসাইটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। যার নাম দেয়া হয় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি আশা করেছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়টি মুসলিম বিশ্বের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কাজ করবে। ধর্মবিজ্ঞান ও অন্যান্য ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞ্যান, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান এবং অন্যান্য আধুনিক বিষয়াদি সম্পর্কেও পাঠদান করা হতো।

যদিও ভারতবর্ষের অনেক আলেমই সৈয়দ আহমদের চিন্তাধারার সাথে একমত ছিল না। তথাপি তার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশ উন্নতিই করছিল এবং অসংখ্য ছাত্রই সেখানে আগ্রহভরে পড়তে আসত। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকেরা মিলে একটি ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের বীজ বোপন করে। যা পরবর্তী সময়ে বিংশ শতাব্দীতে এসে মুসলমানদেরকে ভারত থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পক্ষে একটি ক্যাম্পেইনের সূত্রপাত ঘটায় এবং মুসলমানদের নিজেদের পৃথক ভূমির অত্যাবশ্যকীয়তা সৃষ্টি করে। এই আন্দোলন থেকেই পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সৈয়দ আহমদের এই চিন্তাধারা অবশ্য তার নামের সাথে জড়িয়ে পৃথক কোনো সফল আন্দোলন হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তথাপি অন্যান্য দেশে থাকা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আধুনিক অনেক বুদ্ধিজীবীই পরবর্তী সময়ে তার কাছাকাছি চিন্তা নিয়ে সামনে আসেন এবং তাদের মতামত ও পর্যবেক্ষণও ছিল অনেকটা একই রকম। যেমন ইরানে, কাজার শাহ'র অধীনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী একজন ব্যক্তি দার-আল-ফুনুন নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে বিজ্ঞানের সকল শাখা, চিত্রকলা, সাহিত্য এবং পশ্চিমা দর্শন বিষয়ে পাঠদান করা হতো। এই স্কুল থেকে পরবর্তী সময়ে যে ছাত্ররা বেরিয়েছে তারাই ইরানিয়ান সমাজটিকে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির আদলে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেক জোরদার ভূমিকা পালন করেছে।

একই ধরনের আধুনিক চিন্তাধারার আরও কিছু মানুষকে অটোম্যান সাম্রাজ্যেও পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে, অটোম্যান সরকারের মধ্যে একটি আধুনিক মানসিকতার প্রজন্ম জেগে ওঠে। তারা তানজিমাত বা সংস্কার নামে একটি নীতিমালাও প্রণয়ন করে। এই ধারার মানসিকতার লোকেরা ইউরোপিয়ান স্টাইলের স্কুল চালু, সরকারি প্রশাসন পরিচালনায় ইউরোপীয় কৌশলের প্রয়োগ ও ব্যবহার, সেনাবাহিনীকে ইউরোপীয় মতাদর্শে তৈরি করা, সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে ইউরোপীয় স্টাইলে পোশাক পরিধান করানো এবং সরকারি কর্মকর্তাদেরকেও ইউরোপীয় পোশাক পড়ানোর ব্যাপারে জনমত তৈরি করে।

ইসলামিক আধুনিকতা

এবার আমরা কথা বলব উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শীর্ষ সংস্কারক সাইয়্যেদ জামালউদ্দীন আফগানিকে নিয়ে। আফগানরা বিশ্বাস করে যে তিনি ১৮৩৬ সালে আফগানিস্তানে, রাজধানী কাবুল থেকে ৫০ মাইল পূর্বে, আসাদাবাদ নামক একটি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আসাদাবাদ ছিল কুনার প্রদেশের রাজধানী। তার পরিবারটি আফগানিস্তানের শাসক পরিবারের সাথে বিবাহসূত্রে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কিন্তু একটা পর্যায়ে তারা শাসক গোষ্ঠীর সাথে একটা বৈরী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়ে, ফলে তাদেরকে তাড়াহুড়ো করে ইরানে চলে যেতে হয়; জামালউদ্দিন তখন অল্পবয়সী এক বালক।

জন্মপরিচয়টি নিয়ে যে কারণে সংশয় তৈরি হয় তা হলো, ইরানে চলে যাওয়ার পর তার পরিবারটি যে শহরে বসতি গড়ে তার নামও ছিল আসাদাবাদ। আফগানিস্তান নাকি ইরান- কোথায় তিনি জন্মেছেন সেই নিয়ে বিতর্ক থাকায় ইরান ও আফগানিস্তান উভয়েই তাকে নিজেদের সন্তান বলে দাবি করে। আফগানিস্তানরা দাবি করেন যে তার জামালউদ্দিনের নামের সাথে যেহেতু আফগানি উপাধিটি সংযুক্ত আছে, সুতরাং বুঝাই যায় যে তিনি আফগানিস্তানেরই মানুষ। কিন্তু ইরানিরা দাবি করে যে তিনি তার কাজের কৌশলের সুবিধার্থে নামের সাথে সচেতনভাবে আফগানি উপাধিটি ব্যবহার করেছেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যেখানেই তিনি জন্ম নেন বা বড় হন না কেন বা এই বিষয়ে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন, এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে তিনি ১৮ বছর বয়সে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই জামালউদ্দিন এমন কিছু মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ পান, যারা সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। যখন ভারতবর্ষে সিপাহী বিপ্লবটি সংঘঠিত হয়, তখন তার মক্কায় থাকার কথা। কিন্তু ব্রিটিশরা বিদ্রোহ পরবর্তী পরিস্থিতি খুব দ্রুততার সাথে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়ার খবর পেয়ে তিনি জলদি ফিরে আসেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে তার প্রথম সফরেই জামালউদ্দিনের ভেতরে প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতার জন্ম হয়। তিনি ব্রিটিশদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করেন এবং ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিকতার প্রতিও তার বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। যাহোক, পরে ভারত থেকে তিনি চলে যান আফগানিস্তানে।

আফগানিস্তান: আফগানিস্তানে তিনি তৎকালীন রাজার আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। এই রাজাকে ব্রিটিশরা অনেকবার উৎখাত করতে চেয়েও পারেনি। রাজা তার বড় ছেলে আজমকে পড়ানোর জন্য জামালউদ্দিনকে নিয়োগ দেন। ইতোমধ্যেই জামালউদ্দিন ইসলামের সংস্কার ও আধুনিকায়ন নিয়ে অনেক ধরনের চিন্তা শুরু করে দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি মনে করেছিলেন, ইসলামের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার এটাই একমাত্র উপায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির পরবর্তী উত্তরাধিকারী শাসককে পড়ানোর কাজটিকে তিনি তার উদ্দেশ্য পূরণের পথে বিরাট একটি সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি যুবরাজ আজমকে সংস্কারমুখী নানা শিক্ষা প্রদান করেন এবং আফগানিস্তানকে আধুনিক যুগে শাসন করার বিষয়েও তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজম তার পিতার উত্তরাধিকারী শাসক হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পর বেশি দিন কাজ করার সুযোগ পাননি। ব্রিটিশদের সহায়তা নিয়ে তারই এক চাচাতো ভাই তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করেন। ব্রিটিশরা আজমকে উৎখাত করতে চেয়েছিল এর কারণ হলো, আফগানিস্তানের শাসকের চেয়ারে জামালউদ্দিনের কোনো ছায়া দেখতে চায়নি। যাহোক, ক্ষমতা হারিয়ে আজম চলে যান ইরানে এবং সেখানে নির্বাসনে থাকা অবস্থাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। জামালউদ্দিনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

এশিয়া মাইনর: সেখানে তিনি কনস্ট্যানটিপোল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দিতে শুরু করেন। তিনি বলেন মুসলমানদেরকে সব ধরনের আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এবং একই সময়ে তাদেরকে আরও দৃঢ়তার সাথে ইসলামিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসও জানতে হবে। তার মতে আধুনিকায়ন মানেই পশ্চিমাকরণ নয়। মুসলমানরা ইসলাম থেকেও আধুনিকতার সকল উপাদান সংগ্রহ করতে ও কাজে লাগাতে পারবে। তার এই দর্শনটি

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সাধারণ আমজনতা ও অভিজাত শ্রেণি-উভয়কেই আকর্ষণ করল। ফলে জামালউদ্দিন, অটোম্যান সাম্রাজ্যে বেশ শক্ত একটি অবস্থান নিয়ে ইসলামের একজন সম্মানীত প্রচারক হিসেবে জীবন কাটানোর সুযোগ পেয়ে গেলেন।

কিন্তু সেই পথে না গিয়ে তিনি প্রচার করতে শুরু করলেন যে, মানুষের আসলে নিজের মতো করে কুরআনকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে এবং আলেমদের শোষণমূলক নির্দেশনা ছাড়াই যে কেউ এই কাজটি করতে পারেন। তিনি আলেমদের সমালোচনা করলেন কারণ, তার মতে ওলামাদের সংকীর্ণতার কারণেই মুসলিম সভ্যতার যুগেও বিজ্ঞানভিত্তিক পড়াশোনা কমে যায়। তার এসব কথাবার্তায় স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় নেতারা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেন ফলে তারা জামালউদ্দিনকে বহিষ্কার করেন। তাই ১৮৭১ সালে তিনি চলে যান মিসরে।

মিসরে তিনি বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়ার সুযোগ পান। তিনি এই সুযোগে ইসলামিক বিভিন্ন ইস্যুতে তার চিন্তাধারার আলোকে আধুনিকায়নের কাজও শুরু করেন। একই সময়ে তিনি আফগানিস্তানের ইতিহাস রচনায়ও হাত দেন। মিসরে তত দিনে মোহাম্মাদ আলির প্রতিষ্ঠিত রাজবংশটি ব্রিটিশ ও ফরাসিদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি দুর্নীতিগ্রস্থ অভিজাত শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। জামালউদ্দিন এই পরিপ্রেক্ষিতে ধনী ও ক্ষমতাবানদের দুর্নীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। তিনি দাবি করেন, যেকোনো দেশের শাসক শ্রেণিকে অবশ্যই মানুষের সাথে মিশে যেতে হবে এবং তাদেরকে সাধারণ মনের জীবনযাপন করতে হবে। ঠিক যেভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগের শাসকেরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। একই সঙ্গে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষেও কাজ শুরু করেন। তিনি আবারও জোর দিয়ে বলেন যে গণতান্ত্রিকরণ মানেই পশ্চিমাকরণ নয়। তিনি শুরা ও ইজমা নামক দুটি কাঠামোর আলোকে ইসলামিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিও রচনা করেন।

শুরা বলতে বুঝায় পরামর্শ সভা। এই শুরার মাধ্যমেই আলোচনা করে ইসলামের প্রাথমিক যুগের নেতারা উম্মাহ্‌র মঙ্গলের অভিপ্রায়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতেন। প্রথমে যে শুরাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আকারে ছিল বেশ ছোট। খলিফা উমর (রা.) তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করার জন্য সেই শুরাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুরা তাদের মতো করে সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর তালিকা তৈরি করে মদিনাবাসীর অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। অবশ্যই সেই সময়ে জনগণের সংখ্যা কয়েক হাজার ছিল এবং তাদের যারা শীর্ষ নেতা তারা সকলেই মসজিদের উঠোনেই বসতে পারতেন। তাই শুরা গণতন্ত্রটি হলো অনেকটা টাউন হল মিটিং-এর মতো। কিন্তু কীভাবে এই মডেলটি মিসরের মতো একটি বড় দেশ বা অন্য যেকোনো দেশে বাস্তবায়িত হবে সেটা ছিল একটা মৌলিক প্রশ্ন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অন্যদিকে, ইজমা শব্দের মানে হলো ঐকমত্য। এই ধারণাটি জন্ম নেয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি হাদিসের উপর ভিত্তি করে। সেখানে, তিনি বলেছিলেন, আমার উম্মতেরা কখনো ভুল কোনো বিষয়ে একমত হবে না। আলেমরা যেকোনো ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা এবং তাতে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে এই হাদিসকে প্রয়োগ করেন। জামালউদ্দিন অবশ্য শুরা ও ইজমা দুটো ধারণাকেই ভিন্নভাবে ব্যাখা করেন। তিনি বলেন ইসলামের শরিয়তের দৃষ্টিতে, জনসমর্থন না থাকলে কোনো শাসকেরই কোনো বৈধতা থাকে না।

গণতন্ত্র বিষয়ক তার ভাবনাগুলো তৎকালীন মিসরিয় শাসককে বেশ উদ্বিগ্ন করে তোলে। একই সঙ্গে সমাজের অভিজাত শ্রেণিও বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। কারণ, তখন মিসর যেভাবে চলছিল তাতে তারা বেশ সুবিধাজনক অবস্থায়ই ছিল। ১৮৭৯ সালে জামালউদ্দিনকে মিসর থেকে বের করে দেয়া হয় এবং তিনি পুনরায় ভারতে ফিরে যান।

ভারত: ভারতে তখন স্যার সৈয়দ আহমদের উদারপন্থী আলিগড় আন্দোলন বেশ ভালো অবস্থায় ছিল। জামালউদ্দিন সৈয়দ আহমদকে ব্রিটিশের পোষা কুকুর মনে করতেন। জামালউদ্দিন তাঁর বিখ্যাত বই 'রেফুউটেশন অব দ্য ম্যাটেরিয়ালিস্টস' নামক বইতেও সৈয়দ আহমদ প্রসঙ্গে সেভাবেই লিখে গেছেন। ব্রিটিশরা অবশ্য বরাবরই সৈয়দ আহমদের চিন্তাধারাকে পছন্দ করত। যখন মিসরে বিদ্রোহ দেখা দিল ব্রিটিশরা অভিযোগ করল যে জামালউদ্দিনই বিদ্রোহটিকে উস্কে দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তারা তাকে বেশ কয়েক মাস কারাগারে বন্দি রাখল। যখন বিদ্রোহটি দমন হলো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিল ঠিকই কিন্তু ভারত থেকে বহিষ্কারও করল। তাই ১৮৮২ সালে তিনি চলে যান প্যারিসে।

প্যারিসে বসে জামালউদ্দিন ইংরেজিতে, ফারসিতে, আরবিতে, উর্দু এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় অসংখ্য লেখা রচনা করেন। তিনি এতসব ভাষায় পারদর্শী না হলেও কাজ চালিয়ে নেয়ার মতো করে জানতেন। এসব লেখায় জামালউদ্দিন দাবি করেন, ইসলাম মূলত একটি যুক্তিভিত্তিক ধর্ম এবং সব ধরনের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পুরোধা। তিনি বার বার দাবি করেন, ওলামারা অতীতে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, যেভাবে খ্রিষ্টানবাদ এবং অন্যান্য ধর্মেও তাদের ধর্মীয় নেতারা ইতঃপূর্বে এই সংকটগুলো সৃষ্টি করেছে। তিনি যখন এসব লিখছেন ঠিক সেই সময়েই ফ্রান্সে আরনেস্ট রেনন নামের একজন দার্শনিক লিখেছিলেন, মুসলমানরা জন্মগতভাবেই বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবনা ও পর্যালোচনা করতে অক্ষম। জামালউদ্দিন সেই সময়ে রেনানকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং সরবর্ন নামক একটি এলাকায় একটি বিতর্কে লিপ্ত হন। সেখানে তিনি ইসলামকে খ্রিষ্টানবাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর প্রমাণের চেষ্টা করেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্যারিসে বসেই জামালউদ্দিন তার একসময়ের মিসরীয় শিষ্য মোহাম্মাদ আবদুহুর দেখা পান এবং তারা দুজনে মিলে 'দ্য ফারমেস্ট বন্ড' নামে একটি জার্নাল প্রকাশনা শুরু করেন। মাত্র ১৮টি সংখ্যা বের করার পরই তারা প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে পড়ে যান এবং ফলে জার্নালটি তাদেরকে বন্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু ওই ১৮টি সংখ্যাতেই জামালউদ্দিন প্যান-ইসলামিজমের নির্যাসটি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি ঘোষণা করেন, মুসলমান ও ইউরোপিয়ানদের মধ্যে বাহ্যিকভাবে যে ইস্যুগুলোকে নিয়ে বিতর্ক হয় যেমন আজারবাইজান নিয়ে রাশিয়া ও ইরানের দ্বন্দ্ব, ক্রিমিয়া নিয়ে অটোম্যান ও রাশিয়ার দ্বন্দ্ব, ব্যাংক লোন নিয়ে ব্রিটিশ ও মিসরীয়দের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, খাদ্যশস্য বিক্রি নিয়ে ফ্রান্স ও আলজেরিয়ার মধ্যকার দ্বন্দ্ব, কিংবা সীমানা নিয়ে ভারত, ব্রিটিশ ও আফগানিস্তানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব- এসবই আসলে মূলত বিশ্বের দুটি শক্তিধর জাতি- মুসলিম ও পাশ্চাত্যের মধ্যেকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ। তিনিই প্রথম এই দুই শক্তির মধ্যকার সংঘাতপূর্ণ অবস্থানকে এভাবে ব্যাখ্যা ও চিত্রিত করেন। এরপর জামালউদ্দিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন তবে, সেখানে তিনি কী কী কাজ করেছেন তা খুব একটা ভালোভাবে জানা যায় না।

এরপর জামালউদ্দিন চলে আসেন লন্ডনে। সেখানে তিনি উইনস্টন চার্চিলের পিতা রাডলফ চার্চিলের সাথে বিতর্কযুদ্ধে লিপ্ত হন। সেই সঙ্গে মিসরে ব্রিটেনের কৌশল নিয়েও তিনি অনেকবার ব্রিটিশ নীতিনির্ধারকদের সাথে আলোচনায় বসেন। তিনি জার্মানিতেও ভ্রমণ করেন। রাশিয়ার তৎকালীন রাজধানী সেইন্ট পিটার্সবার্গেও বেশ কিছু সময় কাটান। তার জার্নালটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি আসলে ইউরোপে পড়ে থাকার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি চলে আসেন উজবেকিস্তানে।

উজবেকিস্তানে জামালউদ্দিন সিজার কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনায় বসেন এবং সিজারের ভূখণ্ডে বসবাসরত মুসলমানদের জন্য কুরআন শরিফ প্রকাশনা এবং বিলি বিতরণের অনুমতি চান। এ ছাড়া মধ্য এশিয়ায় ইসলামের সাহিত্যগুলো তখন পাওয়া যেত না। তাই তিনি এই সাহিত্যগুলো অনুবাদ, প্রকাশনা ও বিতরণের জন্যেও অনুমতি প্রার্থনা করেন। এখানে জামালউদ্দিন আরেকটি চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হন। তিনি মনে করেন মুসলিম দেশগুলোর উচিত ইউরোপিয়ান দেশগুলোর বিবাদমান প্রতিপক্ষদের মধ্যকার দূরত্ব ও বিভেদকে কাজে লাগিয়ে নিজেরাই স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করা। যেমন তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাশিয়ার সাথে জোট করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে। আবার জার্মানিকে কাজে লাগিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিছু করার চেষ্টা করতে পারে। তার এই চিন্তাকে ভিত্তি করেই বিংশ শতাব্দীতে নন-এলাইনড মুভমেন্ট বা জোটমুক্ত আন্দোলনটি বিকশিত হয়। ১৮৮৪ সালে তিনি চলে যান ইরানে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইরানে গিয়ে জামালউদ্দিন বিচারিক কাঠামোতে সংস্কার আনার চেষ্টা করেন। এটা করতে গিয়ে তার সাথে স্থানীয় আলেমদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাকে তাড়াহুড়ো করে আবার মধ্য এশিয়ায় ফিরে আসতে হয়। ১৮৮৮ সালে ইরানের তৎকালীন রাজা নাসিরুদ্দীন তাকে ইরানে আমন্ত্রণ জানান এবং তাকে ইরানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ করেন। নাসিরুদ্দীন সেই সময়ে নিজ দেশের আলেমদের সাথে এক ধরনের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ছিলেন, তাই তিনি জামালউদ্দিনের আধুনিক চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা হাসিলের চিন্তা করেছিলেন। জামালউদ্দিন সেই দাওয়াত কবুল করে ইরানে গমন করেন। তবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, বরং রাজার উপদেষ্টা হিসেবে।

তবে জামালউদ্দিন রাজার কথামতো আলেমদের বিরুদ্ধে না বলে বরং রাজার বিরুদ্ধেই বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর কাছে রাজা যেভাবে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছিলেন, তার সমালোচনা করতে শুরু করেন। মূলত তিনি এই অবস্থানটি নেন কারণ রাজা ব্রিটিশ কিছু কোম্পানিকে কোনো নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে তামাক চাষের ও বিপণনের একচেটিয়া সুবিধা দিয়ে দিয়েছিলেন। জামালউদ্দিন ব্রিটিশ কোম্পানিকে বেকায়দায় ফেলার জন্য তামাক বয়কট আন্দোলনের ডাক দেন। যা পরবর্তী সময়ে আরও অনেকগুলো মুসলিম দেশেই বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাও অনুসরণ করেছিলেন। তার এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করেই ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীও ব্রিটিশকে বয়কট করার ডাক দিয়েছিলেন। জামালউদ্দিনের এই আন্দোলনটি ইরানে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং একটা সময়ে গিয়ে ইরানের রাজা বুঝতে পারেন তিনি আসলে জামালউদ্দিনকে চিনতে ভুল করেছিলেন। এই সংস্কারক যে কখনোই তার স্বার্থ দেখবে না- এটা তিনি আগে অনুধাবন করেননি। জামালউদ্দিন অবশ্য শুধু বয়কট করাতেই থেমে থাকেননি বরং একজন আয়াতুল্লাহর সাথে জোট করে ধূমপান করাকে অনৈসলামিক হিসেবেও ঘোষণা দেন এবং সেদিকেই আন্দোলনকে টেনে নিয়ে যান। এবার শাহ'র ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে যায়। তিনি জামালউদ্দিনকে গ্রেফতার করার জন্য সেনা প্রেরণ করেন। সৈন্যরা গিয়ে জামালউদ্দিনকে তার বাসা থেকে বের করে ঘেরাও করে সীমান্তে নিয়ে যায় এবং তাকে ইরান থেকে বের করে দেয়। এভাবে ১৮৯১ সালে জামালউদ্দিন আফগানি পুনরায় ইস্তানবুলে ফিরে যান।

ইস্তানবুলে তৎকালীন অটোম্যান শাসক সুলতান হামিদ জামালউদ্দিনকে একটি বাড়ি এবং অনুদানের ব্যবস্থা করে দেন। সুলতান ভেবেছিলেন যে জামালউদ্দিনের প্যান-ইসলামিক চিন্তাধারা তাকে কিছু রাজনৈতিক সুবিধা দিতে পারবে। জামালউদ্দিন ইস্তানবুলেও তার শিক্ষকতা, লেখালেখি এবং বক্তব্য প্রদান অব্যাহত রাখেন। মুসলিম বিশ্বের সকল জায়গা থেকে সেই সময়ে অনেক বুদ্ধিজীবী ও সক্রিয় কর্মীরা তার সাথে নিয়মিত দেখা করতে আসত। ইসলামের এই সংস্কারক

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তাদেরকে বলতেন, ইজতিহাদ বা মুক্ত চিন্তা ইসলামের একটি প্রাথমিক ভিত্তি। কিন্তু এই মুক্ত চিন্তাটি অবশ্যই শুরু হতে হবে কুরআন ও হাদিসলব্ধ জ্ঞান থেকে। কুরআনকে যেকোনো মুসলিম তাফসীর করে পড়তে পারে, কিন্তু কুরআন শরিফের আয়াতসমূহের যে ঐশ্বরিক বার্তা, তা গোটা উম্মাহ্'র সকলকেই অনুধাবন করতে হবে। মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় ভুল হলো তারা পশ্চিমা শিক্ষাকে গ্রহণ করতে গিয়ে পশ্চিমা বিজ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অথচ হওয়া উচিত ছিল উল্টোটা। তাদের উচিত ছিল পশ্চিমাদের বৈজ্ঞানিক সব অর্জনকে গ্রহণ করা এবং একই সাথে পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে অগ্রাহ্য করা।

১৮৯৫ সালে দুর্ভাগ্যজনকভাবে একজন ইরানি ছাত্র রাজা নাসিরুদ্দীনকে হত্যা করে। ইরানের সরকার এই ঘটনার জন্য জামালউদ্দিনকে দায়ী করে এবং তাকে অভিযোগে ইরানের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ইস্তাম্বুল শাসকদের কাছে দাবি জানায়। অটোম্যান রাজা সুলতান হামিদ অবশ্য সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তিনি এই জটিল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে জামালউদ্দিনকে গৃহবন্দি করে রাখেন। সেই বছরেরই শেষের দিকে, জামালউদ্দিনের মুখে ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য তাকে ভিয়েনা যাওয়ার অনুমতি দেবার জন্য, অটোম্যান সুলতানের প্রতি অনুরোধ জানান। কিন্তু তার সেই অনুরোধ প্রত্যাখান করে সুলতান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসককে জামালউদ্দিনের কাছে প্রেরণ করেন। সেই চিকিৎসক ক্যান্সারের চিকিৎসা করতে গিয়ে জামালউদ্দিনের নিচের দিকের পুরো চোয়ালটাই ফেলে দেন। পরিণতিতে সেই বছরই জামালউদ্দিন ইন্তেকাল করেন এবং তাকে এশিয়া মাইনরেই দাফন করা হয়। পরে অবশ্য তার মরদেহ তুলে এনে আফগানিস্তানে নিয়ে এসে পুনরায় সেখানে দাফন করা হয়। তার জন্মস্থান নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন তার জীবনের অন্তিম ঠিকানা যে আফগানিস্তান-তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। তার কবরটি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত; যে কেউ চাইলে তা গিয়ে দেখতে পারেন।

এটা খুবই বিস্ময়কর তথাপি আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সাইয়েদ জামালউদ্দিন আফগানি কোনো নেতা বা রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো পদে ছিলেন না। তিনি কখনো কোনো দেশ শাসন করেননি। তার নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী ছিল না। কোনো সরকারি পদে তিনি কখনো ছিলেন না। তিনি কখনো কোনো রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেননি কিংবা কখনো কোনো আন্দোলনকে নেতৃত্বও দেননি। তার কোনো কর্মচারী ছিল না, অধীনস্তও কেউ ছিল না, কিংবা এমন কেউও ছিল না যার কথামত তিনি চলতেন। এমন নয় যে তিনি অনেক বই লিখে গেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে তিনি নতুন কোনো দর্শনের জন্ম দিয়েছেন। মানুষটি আগাগোড়াই ছিলেন একটু বিদ্রোহী গোছের, সহজে কারও কাছে তিনি মাথা নত করেননি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিন্তু এসব কোনো কিছু তার না থাকলেও মুসলিম বিশ্বের ওপর তার প্রভাব অনেক। কীভাবে এটা সম্ভব হলো? এটা সম্ভব হয়েছে কেবল তার শিষ্যদের জন্য। তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তার যাদুকরী প্রভাব এক পবিত্র আলোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। তার ঘনিষ্ঠ শিষ্য মোহাম্মাদ আবদুহ পরবর্তী সময়ে মিসরের বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আবদুহ মিসরের শীর্ষ আলেম হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এই মোহাম্মাদ আবদুহই পরের দিকে জামালউদ্দিনের আধুনিক চিন্তাধারাকে বিস্তারিতভাবে সুবিন্যাস্ত করেছেন।

জামালউদ্দিনের আরেকজন শিষ্য ছিলেন জঘলুল। যিনি ওয়াফদ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন, যা মিসরের স্বাধীনতার দাবিতে একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা করেছিল। তার আরেকজন শিষ্য সুদানের শীর্ষ ধর্মীয় নেতার সম্মান পেয়েছিলেন যিনি 'মাহদী' হিসেবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি ইরানে যে তামাক বয়কট আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন সেটাই পরবর্তীকালে অসংখ্য প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। যা তাদেরকে বিংশ শতাব্দীতে একটি সাংবিধানিক আন্দোলন পরিচালনা করতেও সাহায্য করে।

জামালউদ্দিন তারজি নামক আফগান বংশোদ্ভূত একজন বুদ্ধিজীবীকেও অনুপ্রাণিত করেন, যিনি তখন তুরস্কে থাকতেন। তিনি সেখান থেকে আফগানিস্তানে ফিরে এসে জামালউদ্দিনের পথই অনুসরণ করেন। তারজি আফগানদের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী প্রিন্স আমানুল্লাহকে পাঠ দান করেন। তিনি যুবরাজকে একজন আধুনিক রাজা হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেন, যার ফলেই আফগানিস্তান ব্রিটিশদের হাত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। তিনি আফগানিস্তানকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন, আর এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে জামালউদ্দিনের মৃত্যুর মাত্র ২২ বছর পরেই।

তার ছাত্রদেরও অনেক ছাত্র ছিল। ফলে তার চিন্তাধারাকে ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে আরও অনেক নতুন নতুন ভাবনা চিন্তার প্রচলন ও বিকাশ ঘটে। কেউ হয়তো তার চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী সময়ে নিজের মতো করে জাতীয়তাবাদী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, কেউ হয়তো হয়েছেন উন্নয়নশীল। মোহাম্মাদ আবদুহুর একজন ছাত্র হলেন সিরিয়ান ধর্মতত্ত্ববিদ রাশিদ রিদা, যিনি ইসলামকে একটি সফল রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করে গেছেন। জামালউদ্দিনের চিন্তাধারার আরেক বুদ্ধিবৃত্তিক ফসল হলেন হাসানুল বান্না- যিনি মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা। এক কথায় বলতে গেলে জামালউদ্দিনের প্রভাব এত বেশি যে মুসলিম বিশ্বের কোথাও না কোথাও তার চিন্তাধারায় দীক্ষিত লোক পাওয়া যায়ই। সেই কারণেই জামালউদ্দিন আজও মুসলমানদের মধ্যে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়েই টিকে আছেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১৪. শিল্প, সংবিধান এবং জাতীয়তাবাদ
(১১৬৩-১৩৩৬ হিজরি) ১৭৫০-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ

মুসলিম বিশ্বের সংকটটা কোথায় এবং কীভাবে তার থেকে উত্তরন পাওয়া যায়- মূলত এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আব্দুল ওয়াহাব, সাইয়েদ জামালউদ্দিন আফগানি এবং স্যার সৈয়দ আহমদ তাদের মতামতগুলো দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে তাদের সেই চিন্তাধারাগুলো অসংখ্য পর্যালোচনা ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে অনেকভাবে বিকশিত ও বিন্যাস্ত হয়। উপরোক্ত ৩টি ধারার মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ প্রণীত ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতাবাদটিই রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সফলতার সাথে ব্যবহৃত হয়। এই কথা ঠিক যে সৈয়দ আহমদ নিজে কোনো আন্দোলনের সূচনা করেননি। তিনি মুসলিম বিশ্বের আরও অনেক সংস্কারকের মতোই একজন সংস্কারক ছিলেন, যিনি সমস্যা সমাধানে কিছু নতুন ধরনের ভাবনা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তাহলে কেন তার চিন্তাধারাগুলোই এতটা গ্রহণযোগ্যতা পেল? এর কারণটি ছিল- ঠিক সেই সময়েই ৩টি বিষয় বা ৩টি বাস্তবতা ইউরোপীয় মহাদেশ থেকে ইসলামিক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। যা গোটা মুসলিম বিশ্বের উপর অনিবার্যভাবেই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই তিনটি বাস্তবতা ছিল শিল্পায়ন, সাংবিধানিকতা এবং জাতীয়তাবাদ।

এই তিনটি বাস্তবতার মধ্যে আবার সবচেয়ে প্রভাববিস্তারকারী বিষয় ছিল শিল্পায়ন। কারণ, শিল্পায়ন পৃথিবীর প্রতিটি জায়গাকে, প্রতিটি মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। ইউরোপে ১৮০০ সালে বাষ্প ইঞ্জিন আবিষ্কার হয়। আর তারপর থেকেই একের পর এক বৈপ্লবিক সব আবিষ্কারও হতে থাকে। মূলত তারই পরিণতিতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবটি শুরু হয়। আমরা কোনো জিনিসের আবিষ্কারটাকে সাধারণত অনেক বড় করেই দেখি। সাময়িকভাবে চিন্তা করলে হয়তো সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যখন কালের পরিক্রমায় বিষয়টা বিবেচনা

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

করবেন তখন দেখবেন, নতুন কিছুর আবিষ্কার আসলে বড় ব্যাপার নয়। বরং নতুন কিছু আবিষ্কার হলে সমাজে এর যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পড়ে সেটাই হলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এই বিষয়টা অনুধাবন করতে হলে আপনাকে সময় দিতে হবে। তাৎক্ষণিকভাবেই সব কিছু বুঝা যাবে না।

যেমন ধরা যাক বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কথা। এটা তো নিছক একটি আবিষ্কার। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে এই বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার হয়েছে পাশ্চাত্যে আবিষ্কার হওয়ার প্রায় তিনশ বছর আগে। অথচ তারপরও এটা দিয়ে মুসলিম জগতে সেই মানের কোনো প্রভাব পড়েনি। তেমন কোনো পরিবর্তনও আনতে পারেনি। সেখানে এই বাষ্পীয় ইঞ্জিনটি হয়তো কোনো ধর্ণাঢ্য ব্যক্তির বাড়ির দাওয়াতে দুম্বা পোড়ানোর কাজেই ব্যবহৃত হতো। এ রকমই একটি বিবরণও পাওয়া যায়, তুর্কি প্রকৌশলী তকি আল দীনের লেখা বইতে যা ১৫৫১ সালে প্রকাশিত হয়। মোদ্দা কথা মুসলিম বিশ্বে এই বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের অন্য কোনো প্রভাব সম্পর্কে তেমন একটা তথ্য পাওয়া যায় না। একসময় এটা যেন কালের গহবরেই হারিয়ে যায়।

আরেকটা বিষয়ও বিবেচনা করা দরকার। পণ্য উৎপাদনের জন্য যেসব প্রযুক্তি লাগে সেগুলো চায়নিজরা অনেক আগেই, (ইতিহাসমতে ১০ শতাব্দীর আগেই) নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তারা এই প্রযুক্তিগুলোকে সেইভাবে ব্যবহার করেনি। তারা এসব উন্নত প্রযুক্তিকে খেলনা বানানোর কাজেই বেশিরভাগ ব্যবহার করত। তারা পানি চালিত একটি টার্বাইনও আবিষ্কার করে যা দিয়ে একটি সাধারণ ঘড়ি চালাত। যদি তারা এসব অপ্রয়োজনীয় কাজ না করে তাদের আবিষ্কৃত প্রযুক্তিগুলোকে শ্রমবান্ধব যন্ত্র উৎপাদনে কাজে লাগাত, তাহলে হয়তো ইউরোপের অনেক আগেই চীনে শিল্প বিপ্লবটি সংঘঠিত হতো। কারণ, এই একই প্রযুক্তিই ইউরোপিয়ানরা উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন কলকারখানায় ব্যবহার করেছিল যা ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পথটিকে উন্মুক্ত করে দেয়।

কিন্তু এই প্রযুক্তিগুলো এত সময় আগে চীনে এবং মুসলিম বিশ্বে আবিষ্কার হওয়ার পরও, সেই মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করতে পারলোনা কেন? এর কারণ একটাই- যন্ত্রগুলো বা প্রযুক্তিগুলো সেই সময়ে আবিষ্কার হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেগুলোকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বা উৎপাদনমুখী খাতে কখনোই সেইভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়নি।

যখন চীনারা প্রথমবারের মতো যান্ত্রিক প্রযুক্তি আবিষ্কার করে তখন সেখানে একটি রাজকীয় পরিবার ক্ষমতায় ছিল, যারা গোটা সমাজটাকেই নিয়ন্ত্রণ করত। এই রাজকীয় পরিবারটিই সব তথ্যকে সংরক্ষণ করা আর প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনসম্পৃক্ত কাজগুলো পরিচালনা করত। তারা বিভিন্ন স্থাপনাও

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

নির্মাণ করত আর এই কাজে প্রয়োজনীয় লোকের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক শ্রমিক ব্যবহার করত। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রথম সম্রাট চীনের প্রাচীর তৈরি করতে প্রায় ১০ লাখ শ্রমিককে কাজে লাগিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আরেকজন সম্রাট ১০ লাখেরও বেশি শ্রমিক ব্যবহার করে গ্র্যান্ড ক্যানালটির খনন কার্যক্রমটি সম্পাদন করেন। এই খালটি খনন করার মাধ্যমে আসলে চীনের মূল দুটি বৃহৎ নদীকে সংযুক্ত করা হয়। এটা ঠিক যে চীনাদের কাছে এমন প্রযুক্তি ছিল, যা দিয়ে তারা শ্রমবান্ধব যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে পারত। কিন্তু তা করবেটা কে? এই কাজটি করার একমাত্র সুযোগ ছিল রাজ পরিবারের। কিন্তু তারা কেন সেটা করবে যেখানে তারা কাজ করানোর জন্য চাইলেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি শ্রমিক পেয়ে যাচ্ছে। চীন সব সময় ছিল জনসংখ্যার দিক দিয়ে আধিক্যে থাকা একটি দেশ। আর সেই কারণেই চীনে শ্রমের মূল্যও ছিল অনেক কম। যদি এমন কোনো যন্ত্র আবিষ্কার হয় যাতে অনেক শ্রমিকের বেকার হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেটাকে কেন্দ্র করে সমাজে আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। আর সেই কারণেই সুযোগ ও ক্ষমতা থাকার পরও চীনা রাজপরিবারগুলো এই কাজটিতে হাত দেয়নি।

একইভাবে মুসলিম আবিষ্কারকরাও বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর সেটাকে ব্যবহার করে উৎপাদনমুখী কোনো কাজে লাগানোর কথা ভাবেনি। কারণ, সেই সময়ের মুসলিম সমাজটি এমন ছিল, তাতে এমনিতেই অনেক পণ্যের ছড়াছড়ি। কিছু পণ্য ছিল যা হস্তশিল্পীরা নিয়মিতভাবে হাতেই বানিয়ে নিতে পারত, আর বাকি পণ্যগুলো বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে চলে আসত। আর যারা আবিষ্কারক ছিলেন তারা মূলত শাসকশ্রেণিকে খুশি রাখতেন আর অন্যদিকে এই শাসকশ্রেণি ছিল খুবই অলস প্রকৃতির। সেই সময়ে তাদের হাতে প্রচুর টাকা থাকায় তারা যখন যা প্রয়োজন অনুভব করত তা কোনো না কোনো ভাবেই সংগ্রহ করতে পারত। তাই আলাদা করে পণ্য উৎপাদনের কোনো প্রয়োজনীয়তা তারা কখনোই অনুভব করেনি। আসলে মানুষ যখনই কোনো কিছুর অভাব বা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে তখনই তার মধ্যে আবিষ্কারের তাড়না জন্ম নিয়েছে। সব জিনিস যারা খুব সহজে পেয়ে যায়, তারা আর কষ্ট করে সেটা কেন পেতে চাইবে?

কিন্তু ১৮ শতকে ইউরোপে বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। মুসলিম ও চাইনিজ সমাজে কষ্ট করে আবিষ্কার বা আবিষ্কৃত পণ্যকে কাজে লাগানোর কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা না দিলেও, ইউরোপে এই ধরনের অপরিহার্যতা খুবই প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিল। তাই আবিষ্কৃত জিনিসগুলোকে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাজে লাগিয়ে সেখান থেকে ফায়দা হাসিলের মানসিকতা তৎকালীন ইউরোপিয়ানদের মধ্যে প্রবলভাবেই বিদ্যমান হয়ে ওঠে- যা শুধু নিত্য নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার নয়, বরং সেখানে একটি সামগ্রিক শিল্প বিপ্লবের উপযোগিতাই সৃষ্টি করে দেয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইউরোপের খনি মালিকেরা বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে ব্যবহার করে বাষ্প চালিত পাম্প তৈরি করে, যাতে করে তাদের খনিগুলোকে শুষ্ক রাখা যায়। এই খনি মালিকদের সেই সময়ে আরেকটি সংকটও ছিল। তাদেরকে ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য খনি থেকে আকরিক পাথরগুলো দ্রুত উত্তোলন করে নিকটস্থ নদী বা সমুদ্রবন্দরে নেয়ার প্রয়োজন পড়ত। এর আগে তারা উত্তোলিত আকরিক পাথরগুলো ঘোড়ার গাড়িতে বা ট্রামসদৃশ গাড়িতে করে বন্দর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেত। একদিন জর্জ স্টিফেনসন নামের একজন ইংরেজ খনি ব্যবস্থাপক আবিষ্কার করেন, বাষ্পীয় পাম্প দিয়েও গাড়ির চাকাগুলো ঘোরানো যাচ্ছে। সেখান থেকে লোকোমোটিভ বা গতি সম্পন্ন ইঞ্জিনের জন্ম হয়।

অন্যদিকে, ঠিক এই সময়টাতেই এসে, কে কার আগে পণ্য উৎপাদন করবে এবং বাজার দখল করবে- এমন একটা প্রতিযোগিতা ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের মধ্যেও দেখা যায়। এমনকি কেউ যদি রেললাইন ব্যবহার করে কিছু করতে পারত, তাহলেও সে এগিয়ে যেত। কারণ, সে অন্যদের তুলনায় জলদি বাজার দখল করতে পারছে। কিন্তু দেখা গেল যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সবাই রেললাইন ব্যবহার করে পণ্য আনা নেয়া ও বিক্রি বিপণনের কাজটি শুরু করে দিয়েছে।

১৮ শতকের শেষ দিকে জেমস ওয়েঠ বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করার সাথে সাথেই ইউরোপিয়ান আবিষ্কারকরা চিন্তা করলেন, কীভাবে এই ইঞ্জিন ব্যবহার করে তাঁত বোনা যায়। যারাই এভাবে তাঁত বোনার কাজে যন্ত্র ব্যবহার করত তারাই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে গেল এবং অনেক মুনাফা করতে লাগল। একচেটিয়া কারও হাতে বাজার যেন চলে না যায় তা নিশ্চিত করার জন্য তখন অন্য ব্যবসায়ীরাও তাঁত বোনার কাজে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করে দিল।

শহরে কারও যদি একাধিক, দশটি, বা শতটি তাঁত বোনার যন্ত্র থাকে, তাহলে সে অন্য সব প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে এগিয়ে যেত এবং দ্রুততার সাথে অনেক টাকার মালিকও হয়ে যেত। যখন এভাবে পোশাক শিল্পকে ব্যবহার করে কিছু লোক বেশ এগিয়ে গেল তখন অন্য ব্যবসায়ীরা আর একই পথে না হেঁটে বরং অন্য শিল্পগুলোতেও প্রযুক্তির ব্যবহার করে ভালো ফলাফল পাওয়ার চেষ্টা করল। আসবাবপত্র, চামচ শিল্প থেকে শুরু করে প্রতিটি শিল্পে যন্ত্রের কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করে সকলেই ভালো পরিমাণ লাভ করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে গেল।

অবশ্যই যন্ত্রের এ রকম ব্যবহারে অনেক শিল্পী ও কারিগর বেকার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তথাপি এই অগ্রগতি থামছিল না। ১৯ শতাব্দীতে যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে যে বেকারত্বের সূচনা হলো ইউরোপ তাতে পাত্তা দেয়নি। শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় চীনারা ১০ম শতকে যন্ত্রের ব্যবহার করতে চায়নি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তবে ইউরোপিয়ানরা ১৮ শতকে এসে আর সেই ভুল করেনি। ইউরোপে যারা বিনিয়োগ করে নতুন নতুন যন্ত্র ও প্রযুক্তি চালু করছিল তারা এসব আধুনিক প্রযুক্তির ফলে সম্ভাব্য বেকার হয়ে যাওয়া লোকদের পরিণতির কথা একবারের জন্যেও ভাবেনি। এগুলো অন্য কারও মাথাব্যথা, তাদের নয়-এ রকমই মনে করতেন এই উঠতি ব্যবসায়ীরা। শিল্পায়নের প্রভাবে সমাজে যেসব সংকট তৈরি হচ্ছিল এসব নিয়েও তারা অহেতুক ভেবে সময় নষ্ট করতে চায়নি।

শিল্প বিপ্লবটি সেসব জায়গাতেই হয়েছে যেখানে বেশ কিছু সামাজিক উপযোগিতা ও শর্ত পূরণ হয়েছে। আর তৎকালীন ইউরোপে এর সব কিছুই ছিল। শিল্প বিপ্লবের কারণে তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় আমূল প্রভাব পড়ে এবং সমাজের অনেক কাঠামোই পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন:

- গ্রামীণ এলাকাগুলো ক্রমশ খালি হয়ে আসছিল কারণ সবাই নতুন নতুন তৈরি হওয়া শহরগুলোতে ঠিকানা গড়ে নিতে চাইছিল।
- অধিকাংশ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন থেকে পশুপাখি লালন করার বা গৃহপালিত পশু রাখার ঐতিহ্যটি হারিয়ে যায়।
- চন্দ্র ও সূর্য দেখে প্রাকৃতিক উপায়ে সময় নির্ধারনের চেয়ে ক্যালেন্ডার ও ঘড়ি দেখে সময় নির্ণয় করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।
- বড় বড় পরিবারগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে ছোট ছোট নিউক্লিয়ার পরিবারের প্রচলন শুরু হয়।
- মানুষ বা বিশেষ কোনো জায়গার সাথে মানুষের যে শিকড়সদৃশ সম্পর্ক ছিল, তা ক্রমশ ম্লান হতে শুরু করে। কারণ, অর্থনীতির চাহিদা এমন তৈরি হয় যে, মানুষকে তার চেনা জগৎ ছেড়ে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে যেতে হবে। অন্য কোথাও, অন্য কোনো স্থানে।
- এক প্রজন্মের সাথে অন্য প্রজন্মের যে বন্ধন তাও ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ, নবীন প্রজন্ম তাদের সামনে গড়ে উঠা নতুন সব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আগের প্রজন্ম থেকে নেয়ার মতো কিছুই আর পায় না। আগের প্রজন্মের এমন কোনো কর্মদক্ষতা বা অভিজ্ঞতা ছিল না যা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। এর আগে নবীনেরা বয়স্কদের কাছ থেকে গল্প শোনার মাধ্যমে শিখত। কিন্তু এই সময়টাতে এসে মানুষ অধ্যয়ন, লেখালেখি এবং গাণিতিক হিসেব নিকেশের মাধ্যমেই শিখতে শুরু করে।
- আর সর্বশেষটি হলো মানসিকভাবে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি। এটা এমন একটা জরুরি বাস্তবতা ছিল, যে মানুষকে ক্রমাগতভাবে পুরোনো মূল্যবোধকে ছেড়ে নতুন নতুন মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণাকে বরণ করে নিতে হচ্ছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই সকল পরিবর্তনের কারণে আসলে এক ধরনের অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতাও তৈরি হয়। কিন্তু এটা কখনোই বিপর্যয়মূলক অস্থিরতা ছিল না। কারণ, তত দিনে ইউরোপিয়ানরা সব পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিদ্যাটি ভালোই শিখে ফেলেছে। আর এই সব নতুন বাস্তবতার এবং নতুন নতুন সব পরিবর্তনের মূলে ছিল ব্যক্তিবাদ সংক্রান্ত ভাবনার বিকাশ। অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের ভালোটাই চিন্তা করবে, এর বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে সে খুব একটা মাথা খাটাবে না।

ইউরোপিয়ানরা এর আগে যখন মুসলিম সাম্রাজ্যে এসেছিল, তখন তারা নানা ধরনের পণ্যসামগ্রী আনলেও সুকৌশলে এই পণ্য বানানোর প্রযুক্তিগুলো কখনোই নিয়ে আসেনি। কারণ, তারা মুসলমানদেরকে তা শেখাতে চায়নি। মুসলমানরাও তখন ভোগে ব্যস্ত ছিল। তাদের দরকার ছিল সস্তায় কাপড়, মেশিনে বানানো জুতো, প্যাকেটজাত শুষ্ক দ্রব্য। আর ইউরোপিয়ানদের থেকে তাই তারা পাচ্ছিল। এগুলো কীভাবে বানানো হয় সেটা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যাথা ছিল না। যদি তাদের মানসিকতা সে রকম থাকত তাহলে সেই সময়ে মুসলমানদের হাতে যে পরিমাণ টাকা ছিল, তা দিয়ে তারা ইচ্ছে করলে পাশ্চাত্যে নির্মিত যেকোনো মেশিন ক্রয় করতে পারত বা মেশিনের যন্ত্রগুলো কিনে নিজেরাই একটি মেশিন বানিয়ে নিতে পারত। কিন্তু কোনো কিছু বানানোর কোনো মানসিকতা আসলে তাদের ছিল না। তারা চাইত কতটা আরামে ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনটা উপভোগ করা যায়।

কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টা আসলে ভিন্ন রকম। যে কয়টা জিনিস থাকলে একটি সমাজে শিল্প বিপ্লব হয়, আপনি তা হুট করে আমদানি করতে পারবেন না। এটাকে সমাজে লালন করতে হয়, বিকশিত করতে হয়। আর বলাই বাহুল্য, সেই সময়ের মুসলমান সমাজের কাঠামো পশ্চিমা ইউরোপের তুলনায় একেবারেই আলাদা ছিল।

যেমন অটোম্যান সাম্রাজ্যের কথা যদি বলি, সেখানে নির্মানের এই প্রক্রিয়াটি দেখভাল করত গিল্ডশ্রেণি যারা আবার সুফি দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। সেই সুফিবাদীরা আবার সম্পৃক্ত ছিল অটোম্যান প্রশাসন ও সমাজের নীতিনির্ধারকদের সাথে। আবার এই মানুষগুলোর প্রত্যেকেই অসংখ্য নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আর এই সকল মহলেই একটা চেতনা খুব প্রকটভাবে বিদ্যমান ছিল আর তা হলো, বাইরের যে জগত সেখানে শুধু পুরুষেরাই কাজ করতে পারবে, নারীরা থাকবে অন্দরমহলে; সব ধরনের রাজনীতি ও উৎপাদনশীল কার্যক্রম থেকে দূরে।

অন্যদিকে, শিল্প বিপ্লবের আগ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীতে, এমনকি ইউরোপ ও মুসলিম বিশ্বে সব ধরনের নির্মাণ শিল্পের সাথে আসলে নারীরাই জড়িত ছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কারণ, সকল পণ্যের মূল্যমানটা নির্ধারিত হতো ঘরের ভেতরেই। যেহেতু তখনো কারখানার ধারণাটি সেইভাবে বিকশিত হয়নি। নারীরাই সেই সময়ে কাপড় সেলাই করত, পোশাক বানাত। নারীরা একটি অকার্যকর কাঁচামালকেও দরকারী পণ্য বানিয়ে ফেলতে পারত। তারা সেই সময়ে নানা ধরনের হস্তশিল্প তৈরি করত। আর সে কারণেই শিল্প বিপ্লবের ফলে যখন যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়ে গেল তখন অসংখ্য নারীই বেকার হয়ে পড়ল।

ইউরোপে সমস্যাটি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলো। কারণ, অসংখ্য নারী তখন নব্য নির্মিত কারখানায়, দোকানে এবং অফিসে যাওয়া শুরু করল। ইউরোপিয়ান সামাজিক সংস্কৃতিতে তা সম্ভবও ছিল। যদিও এর ফলে সমাজে কিছু নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তথাপি নারীরা শেষ পর্যন্ত সেখানে জনসম্মুখে যাওয়ার ও কাজ করার সুযোগ পায়। আর নারীদের এই কর্মমুখর পরিস্থিতিটি শেষপর্যন্ত সমাজে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। সমাজে নারীদের ভিন্ন মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্নটি সামনে চলে আসে- যেখান থেকেই মূলত ফেমিনিজম বা নারীবাদের উত্থান ঘটে। আর এই নারীবাদটাও আসে ব্যাক্তিবাদ থেকেই। কারণ, যখন কেউ ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলবে তখনই এই দাবিটিও সামনে আসবে যে, নারীরা সেই অধিকারণ ভোগ করবে যা একজন পুরুষ করে থাকে। কারণ, তারা দুজনেই ব্যক্তির সংজ্ঞার ভেতরে পড়ে।

কিন্তু মুসলিম সমাজ এই পরিস্থিতিটি খুব সহজে অতিক্রম করতে পারল না। যেহেতু নারীকে তারা দীর্ঘদিন অন্দরে রেখেছিল, কাজ কর্মে তাদেরকে কখনোই সেভাবে জড়িত হতে দেয়নি। তাই কটেজ শিল্প থেকে যখন গোটা শিল্পে একটা বিপ্লব সংঘঠিত হয়ে গেল, তখন মুসলিম সমাজে নানা ধরনের সমস্যা, সংকট ও অস্থিরতাও তৈরি হলো। এটার সমাধান ছিল একটাই, আর তা হলো নারী ও পুরুষের কাজের জগতকে যেভাবে আলাদা করে রাখা হয়েছিল তা ধ্বংস করে দেয়া। কিন্তু তা করতে গেলে পরিবারের কাঠামোগুলো ভাঙনের মুখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটা মানসিকতা নিয়ে একটি সমাজ গড়ে ওঠার পর, সেটার কাঠামোতে পরিবর্তন করলে সমাজটি আর দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। তা ছাড়া শুধু তাই নয়, নারীর ব্যাপারে পুরুষের যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তাও মুসলমান সমাজের পরিবর্তনের পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। যা বিংশ শতকের শেষের দিকে এসে আরও ভালোভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

তৎকালীন মুসলিম সমাজে আরেকটি সংকটও খুব ব্যাপকতর ছিল। যেমনটা আগে বলা হলো, নির্মাণ শিল্পসংক্রান্ত এই কাজগুলো একচেটিয়াভাবে গিল্ড শ্রেণি বা বিভিন্ন সমবায় সংঘরাই পরিচালনা করত; যারা আবার সুফিবাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এখন যদি এই গিল্ডদেরকে সরিয়ে উৎপাদনের কাজটা কারখানার

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মাধ্যমে করা হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সুফিদের সাথে এই উৎপাদনক্ষম সেক্টরটির আর সম্পর্ক থাকে না, সম্পর্কটি ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ সুফিবাদকে উৎপাদনমুখী কর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা হয়। কারণ, কারখানায় যে ব্যক্তিরা কাজ করবে তাদেরকে ঘড়ির হিসেবে চলতে হয়। আবার মুসলমানদের যে প্রাত্যাহিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ, সেটা আবার প্রাকৃতিক নিয়মে অর্থাৎ সূর্যের গতি প্রকৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করেও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাথে শিল্পায়নের দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়া শিল্পায়নটিতে আরও বেশ কিছু সমস্যাও তৈরি করে। হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গিগত বিভাজন ছিল, যে বৈষম্য ছিল, যে আনুগত্যের প্রচলন ছিল, শিল্পায়ন এসে ব্যক্তিবাদের বিকাশ ঘটানোর কারণে তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। শিল্পায়নের হিসেবে মানুষ কর্মক্ষম হলেই সে কাজ করার উপযোগী। সে কোন গোত্রের বা কোন জাতের তা হিসেব করার কিছু নেই। আরেকটি বিষয় হলো, একজন মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ আরও নানা সব জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়ে, আগে অন্য কারও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হতো। শিল্পায়ন এসে সেই পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো ভেঙে দেয়। যেহেতু শিল্পায়নের ফলে নতুন নিউক্লিয়ার পরিবারের জন্ম হয়, তাই প্রতিটি মানুষেরই তার নিজের পরিবারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ তৈরি হয়। ফলে নীতিনির্ধারকদের ক্ষমতাও অনেকটা হ্রাস পায়; সেই ৭০০ শতাব্দী থেকে মুসলিম সমাজ যেভাবে চলে আসছিল সেই ধারাটি রীতিমতো হুমকির মুখে পড়ে যায়। যে সামাজিক শর্তগুলো ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল মুসলমানদের উচিত ছিল, তাদের সমাজে সেগুলোর প্রচলন হওয়া পর্যন্ত সময় নেয়া। কিন্তু তা হয়নি। সেদিকে না গিয়ে তারা শিল্পায়ন উৎপাদিত পণ্য এবং প্রযুক্তিগুলো সংগ্রহের চিন্তা শুরু করে। তাদের কাছে মনে হলো, সামনে যখন গাড়ির চাকা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় দেখতেই পাচ্ছি, তাহলে কেন শুধু শুধু চাকাটি কীভাবে ঘুরছে তা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করব।

কিন্তু আসলে এটা সঠিক চিন্তা নয়। তাদেরকে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পরিস্থিতিটি পর্যালোচনা করা উচিত ছিল তাহলে পরে এসে মুসলিম সমাজ ভাঙনের মুখে পড়ত না। কারণ, সেইভাবে পর্যালোচনা করলে তারা বুঝতে পারত, কীভাবে ইউরোপে ব্যক্তিবাদের জন্ম হলো। কীভাবে যুক্তির চর্চা এসে দীর্ঘদিনের লালিত বিশ্বাসকে গ্রাস করল। কীভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের পথ সুগম করার জন্য যুক্তিগুলোকে বিকশিত হতে দিল এবং কীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভেতরে প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে গোটা অর্থনৈতিক পদ্ধতি দাঁড়িয়ে গেল। এভাবে সময়ের ধারাবাহিকতায় সমাজের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পরিবর্তনগুলোকে নিয়ে নির্মোহ বিশ্লেষণ করলে মুসলমানরা যেমন শিল্পায়নের উৎপাদিত পণ্যগুলো ব্যবহার করতে পারত, ঠিক তেমনিভাবে সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলোকেও সফলভাবে মোকাবেলা করতে পারত।

মার্কস এবং এঙ্গেলরা দাবি করেন যে, শিল্পায়নের ফলে পশ্চিমে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে মুসলমান সমাজে এর প্রভাব নেতিবাচক এবং ধ্বংসাত্মক। শিল্পায়নের ফলে উৎপাদিত পণ্যগুলো মুসলিম বিশ্বে কিছু ভিন্ন বার্তা নিয়ে যায়, যা কোনো বই বা পুস্তিকা অথবা প্রচারপত্র দিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি পণ্য যেন মুসলমানদের কাছে গিয়ে বলছে, 'আমাকে নাও, ব্যবহার কর, দেখো আমি কতটা সুন্দর, কতটা আরামদায়ক।' এই শিল্পায়িত পণ্যগুলোর মান এতটাই আকর্ষণীয় ছিল যে আরব থেকে শুরু করে এশিয়া মাইনর, মিসর, ইরান কিংবা মরক্কো- সকল দেশের মানুষই পশ্চিমা এই পণ্যগুলোর ভক্ত হয়ে ওঠল এবং তাদের অগোচরে পশ্চিমা সমাজের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব কমবেশি সকলের উপর পড়ল। আর সেই সুযোগে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনাগুলো বেশ শক্তভাবেই মুসলিম সমাজে প্রবেশ করল।

১৮৪০ সালের পর ইরানে খুবই কর্মক্ষম একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। তার নাম মির্জা তাকি যাকে স্থানীয়ভাবে আমির কবির বা দ্য গ্রেট লিডার হিসেবেও আখ্যায়িত করা হতো। তিনি দায়িত্ব নিয়েই তার দেশকে আধুনিকায়ন করার জন্য বিশাল সব প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেন। আধুনিকায়ন বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন শিল্পায়ন। যদিও তিনি জানতেন যে বিষয়টি খুবই জটিল প্রক্রিয়া। তিনি জানতেন যে, ইরানিরা কেবল শিল্পপণ্যগুলোকে গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হবে না। যদি তার দেশকে পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর সাথে খাপ খাওয়াতে হয়, তাহলে ইরানিদেরকে পশ্চিমা সংস্কৃতির কিছু বিশেষ রূপও ধারণ করতে হবে। বিশেষ রূপ বলতে তিনি মূলত বুঝাতেন পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই।

তিনি সেই মোতাবেক গোটা দেশজুড়ে ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজধানী তেহরানের বাইরে দার-আল-ফুনুন বা জ্ঞানের বাড়ি শিরোনামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও চালু করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিদেশি ভাষা, বিজ্ঞান, কারিগরি জ্ঞান এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির ইতিহাস বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারত। ইরান সেই একই সময়ে জার্মানি ও ফ্রান্স থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন দেশে তাদের ছাত্রদেরকেও উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠানো শুরু করে। খুব স্বাভাবিকভাবেই যে ছাত্ররা বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষার এই সুযোগ পেত, তাদের অধিকাংশই বনেদি ঘরের, সরকারের নীতিনির্ধারকদের কিংবা সিনিয়র আমলাদের পরিবারের সদস্য ছিল। গ্রামের কৃষকদের সন্তান, সাধারণ ব্যবসায়ীদের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সন্তান এমন কি সম্ভ্রান্ত ধর্মীয় পরিবারের সন্তানেরাও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাই মির্জা তাকির চালু করা নব্য শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের ভেতরে বিদ্যমান বিভেদ বিভাজনকে আরও অনেক গুণ বাড়িয়ে দিল।

এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা গ্রাজুয়েট হিসেবে বের হতো, তাদেরকেই আধুনিক সরকারি আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হতো। সেই সময়ে আধুনিক বলতে এখানে ইউরোপীয় ঘরানাকেই বুঝানো হতো। অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের ফলে ইরানে একটি নতুন অভিজাত শ্রেণির উত্থান হয়। এই শ্রেণিতে শিক্ষিত সরকারি কর্মচারী, সেনাকর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদ, পেশাজীবী, দার-আল-ফুনুন থেকে পাস করা ছাত্র বা ইউরোপ থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে আসা ছাত্ররাই অন্তর্ভুক্ত হতো। নব্য এই বুর্জোয়া শ্রেণি আরও বেশি ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা লালন করে। তাদের কাছে ইসলাম ছিল নৈতিক কিছু মূল্যবোধের সমন্বয়। ইসলামকে তারা কখনোই বেহেশতে যাওয়ার পাথেয় বা ওহি ভিত্তিক ঐশ্বরিক বিধান হিসেবে বিবেচনা করেনি।

ইউরোপে দ্বিতীয় যে ধারার উত্থান ঘটেছিল, তা ছিল সাংবিধানিকীকরণ। ইরানে নব্য অভিজাত শ্রেণির উত্থানের পর সাংবিধানিকীকরণের প্রভাবও পড়তে শুরু করে। সাংবিধানিকতা বলতে গণতান্ত্রিক কোনো আদর্শকে বুঝানো হতো না। কারণ, স্বৈরাচারী শাসকের হাতেও সংবিধান থাকতে পারে। কিন্তু একথা সত্য যে, সংবিধান হলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। সংবিধান মূলত নিশ্চিত করে সমাজ এমন একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থায় পরিচালিত হবে, যেখানে শাসক ও শাসিত উভয়ই আইনি কাঠামোর অধীনে থাকবে। মুসলমান দেশগুলোতে সে সময়ে বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। এই রাজতন্ত্র ব্যবস্থাটি যেকোনো শাসককে যেকোনো সময় যেকোনো বিধান প্রণয়নের অগাধ সুবিধা দিত। কিন্তু সংবিধান যদি চালু হয়, তাহলে কেবল রাজা বা বাদশাহই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তা নয়। বরং গোটা সমাজেরই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। অর্থাৎ রাজার অধীনে যারা আছে তাদেরও কিছু অধিকার আছে সিদ্ধান্ত নেয়ার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার ।

এই সাংবিধানিকতা ইরানে আংশিকভাবে চালু করা সম্ভব হয়। কারণ, সেখানে শিক্ষিত ধর্মনিরপেক্ষ অভিজাত সম্প্রদায়ের বাইরে ইত্যবসরে একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণিরও জন্ম হয়, যারা ঘোষণা করেছিল, তাদের কাছে আধুনিকতা মানে কিছু নতুন চিন্তাধারা নয়। বরং আধুনিকতার সংজ্ঞার মধ্যে সে ভাষ্যটিও পড়ে, যার মাধ্যমে তারা তাদের চিন্তাভাবনাগুলোকে প্রকাশ করতে পারে। সে মোতাবেক নতুন একদল লেখকের জন্ম হয়, যারা আবারও পুরোনো সেই ফার্সি সাহিত্য ও ভাষার নানা শব্দের ব্যবহার শুরু করে। ফার্সি ভাষা সাহিত্যিক

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিচারে খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধ। তারা এই ভাষা (ফার্সি) দিয়েই সাহিত্যের সকল শাখা অর্থাৎ গান, কবিতা, ব্যাঙ্গাত্মক গল্প, রাজনৈতিক উপন্যাস থেকে শুরু করে সবকিছু রচনা করতে শুরু করে।

বিখ্যাত সাহিত্যিক হামিদ দাবাসি এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইংরেজি ভাষায় রচিত উপন্যাস 'দ্য এডভেঞ্চার অব হাজিবাবা অব ইস্ফাহান'-এর উদাহরণ টানেন। এই উপন্যাসটি লিখেছেন জেমস মরিয়ার নামের একজন পর্যটক। তিনি দাবি করেন, জেমস আসলে একটি পারস্য উপন্যাসকেই ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এই উপন্যাসটিতে ইরানি নাগরিকদেরকে খুবই ছোট করা হয়েছে এবং নানা ধরনের নেতিবাচক বিশেষণ ব্যবহার করে ইরানিদেরকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

এরপর ১৮৮০ সালে একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। ইরানিয়ান ভাষাবিদ মির্জা হাবিব 'হাজিবাবা' কে ফার্সিতে অনুবাদ করেন। মজার ব্যাপার হলো ইংরেজিতে বইটি খুবই সাম্প্রদায়িক ভাষায় লেখা হলেও ফার্সি অনুবাদে এটা একটা অসাধারণ সাহিত্যকর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়। যা আধুনিক ফার্সি সাহিত্যের ভীত তৈরি করে দেয় এবং একই সঙ্গে নতুন করে সাংবিধানিকতা সংক্রান্ত আন্দোলনের একটি উপযোগিতা তৈরি করে। জেমস মরিয়ার তার উপন্যাসে প্রাচ্যের ভঙ্গিমায় ইরানিদেরকে সমালোচনা করলেও অনুবাদকৃত উপন্যাসে অনুবাদক ইরানের সরকারি আমলা ও ধর্মীয় নেতাদের দুর্নীতিকে অতি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'হাজিবাবা' নামের বইটি তাই একই সঙ্গে একটি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ হিসেবেও স্বীকৃতি পায়।

ইরানে তখন আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উত্থান হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আদি ফার্সি সাহিত্য বিশেষ করে রুমি, সাদি ও হাফিজের কাজগুলোর পাশাপাশি নতুন ইরানি লেখকদের সাহিত্যকর্ম, এমনকি চার্লস মন্টেসকু এবং অগাস্ত কমতের মতো ইউরোপিয়ান দার্শনিকদের রচনাবলীও ভালো পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। এই দার্শনিকদ্বয় মূলত সমাজের উপর মহলের নীতিনির্ধারকদের মাধ্যমে সমাজের বিবর্তনের কথা বলেছিলেন। 'মন্টেস্কু' আসলে সমাজে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে ধারণা দেন এবং ঘোষণা করেন যে প্রচলিত রাজতন্ত্রের পর রিপাবলিক বা গণপ্রজাতন্ত্রই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। অন্যদিকে, 'কমতে' বলেন, 'মানুষ যত বেশি সভ্য হচ্ছে, তত বেশি ধার্মিকতা থেকে বিবর্তিত হয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে সচেতন হয়ে উঠছে'।

ইরানের আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা সিদ্ধান্ত নিলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের দেশেরও পরিবর্তন দরকার। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণির এহেন অসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দু

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ছিল কাজার রাজতন্ত্র। তারা প্রায় দুই শত বছর ধরে ইরানকে শাসন করছে। এই বংশের রাজারা এতদিন ইরানকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো করে পরিচালনা করেছে। প্রতিটি কাজার রাজাই দেশের অর্থনীতির মূল ফ্যাক্টরগুলোকে ক্রমান্বয়ে শুধু বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। আর দেশবিরোধী এই কাজগুলো তারা করেছে শুধু নিজেদের আরাম আয়েশ আর বিলাসিতার জন্য। এমনকি তারা প্রায়শই ইউরোপে বেড়াতে যেত।

বুদ্ধিজীবীদের এই অসন্তোষ আগে থেকে চলে আসা ইরানের তামাক বয়কট আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করল। নিশ্চয়ই মনে আছে, এই তামাক বিরোধী আন্দোলনটি শুরু করেছিলেন জামালউদ্দিন আফগানি। বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পেয়ে উজ্জীবিত জামালউদ্দিন এই আন্দোলনের সাথে শিয়া কর্তৃপক্ষকেও সম্পৃক্ত করেছিলেন। ফলে সব মিলিয়ে তৎকালীন কাজার সম্রাট শাহ'র বিরুদ্ধে বিশাল এক জোট গড়ে ওঠে, যার ফলে শাহ পিছু হটেন। তিনি ইরানে তামাক বিক্রিতে ব্রিটিশদের একচ্ছত্র ক্ষমতা বা মনোপলি বাতিল করে দেন। তার এই পদক্ষেপে আন্দোলনরত ধর্মীয় নেতারা মনে করেন, তারা সফল হয়ে গেছেন আর তাই তারা মাঠ ছেড়ে দেন।

অবশিষ্ট যারা তখনও মাঠে ছিলেন, তারা নতুন দাবি উত্থাপন শুরু করে। তারা দেশে একটি সংবিধান চালু করার কথা বলে, যা রাজাদের অসীম ক্ষমতাকে সীমিত করবে এবং জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। জামালউদ্দিন আফগানির পৃষ্ঠপোষকতায় (তিনি অবশ্য তখন এশিয়া মাইনরে ছিলেন) এই ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক মানুষগুলো একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করেন। ধর্মীয় নেতারা নতুন এই দাবির বিরোধিতা করেন। তারা বলেন, সংবিধানের ধারণাটি মোটেও ইসলামসম্মত নয়। কারণ, তাদের মতে ইরানে আগে থেকেই একটি সংবিধান আছে এবং তা হলো শরিয়াত। তারা পশ্চিমা গণতন্ত্রের ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করেন। ইরানের সম্রাটের সাথে ধর্মীয় নেতাদের দীর্ঘদিন ধরে যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছিল, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এসে তা আরেকটু ভিন্ন আকার ধারণ করল। কারণ, আগে দুটি পক্ষ থাকলেও নতুন আরেকটি পক্ষ এসে এবার এই টানাপোড়েনে যুক্ত হলো। তারা হলো নব্য ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকমনা বুদ্ধিজীবী। এখানে দুই পক্ষ মিলে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে কাজ করার প্রবল সম্ভাবনা ছিল; হলোও তাই। সংবিধান প্রশ্নে কাজার সম্রাট, ধর্মীয় নেতারা এক হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের বিপক্ষেই অবস্থান নিলেন।

কিন্তু এরপরও আধুনিকমনাদের পক্ষে জোয়ার ক্রমশ যেন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯০৬ সালে তৎকালীন কাজার সম্রাট মুজাফফার আল দীন, শেষমেষ আত্মসমর্পণ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

করতে বাধ্য হলেন। তিনি এমন একটি সংবিধান মেনে নিলেন, যা তার ক্ষমতাকে হ্রাস করবে এবং সংসদ প্রতিষ্ঠা করবে। ইরানে এই সংসদকে মজলিস নামে অভিহিত করা হয়। মজলিসের প্রথম অধিবেশন ডাকার এক সপ্তাহ পরই সম্রাট ইন্তেকাল করেন। তার ছেলে মোহাম্মাদ আলি শাহ এরপর ক্ষমতাভার গ্রহণ করেন। সংসদের হাতে আদৌত কতটুকু ক্ষমতা থাকবে, সে সময়ে অবশ্য তা বুঝা যাচ্ছিল না। সংসদের হাতে কোনো সেনাবাহিনী ছিল না। সংসদ পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে চালাতেও পারত না, তথাপি মজলিস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম দুই বছরের মধ্যেই অসংখ্য আইন প্রণীত হয়ে গেল যার মাধ্যমে ইরানে বাক স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য নাগরিক অধিকারগুলো নিশ্চিত হলো।

তৃতীয় বছরে গিয়ে তৎকালীন সম্রাট কামানোর গোলা ছুড়ে গোটা সংসদ ভবনটিকেই গুঁড়িয়ে দিলেন। আর বললেন, পুরোনো শাসন পদ্ধতিকে আরেকটি সুযোগ দিয়ে দেখার জন্যই তিনি এই কাজটি করেছেন। দেশের আলেম ওলামা এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়গুলো তার এই কাজকে সাধুবাদ জানালেন। আর এই ঘটনাগুলো ইরানে যখন ঘটছে ঠিক তখনই ি বিশ্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামাও বাজতে শুরু করেছে।

এরই মধ্যে ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে আসা তৃতীয় আরেকটি চেতনাও মুসলিম বিশ্বে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সেটা হলো জাতীয়তাবাদ। ইরানে জাতীয়তাবাদের বিকাশের তেমন একটা সুযোগ ছিল না। কারণ, ইরান ততদিনে নিজেরাই একক একটি জাতির কাঠামোতে দাঁড়িয়ে গেছে। বা এভাবেও বলা যায় জাতিগত কাঠামো নির্মানে ইরান সেই সময়ে অন্য যেকোনো মুসলিম এলাকার চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে থাকায়, জাতীয়তাবাদের এই ঢেউ তাদেরকে তেমন একটা স্পর্শ করেনি। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জাতীয়তাবাদের চেতনায় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আলিগড় আন্দোলন ভিন্ন একটি মাত্রা পায়, যা একটা সময়ে গিয়ে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। তবে জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে বড় শিকারে পরিণত হয় তৎকালীন অটোম্যান সাম্রাজ্য এবং এর অধীনে থাকা এলাকাগুলো।

যখন আমরা জাতীয়তাবাদের কথা বলি, কেবল তখনই কোনো জাতিরাষ্ট্রের ধারণাকে বুঝানো হয়না। জাতিরাষ্ট্রটি পুরোপুরিভাবেই ভৌগোলিক একটা বিষয়। জাতিরাষ্ট্র বলতে একটি জায়গা বুঝায়, যার চারিপাশে সীমানা প্রাচীর থাকবে। একটি কেন্দ্র শাসিত সরকার থাকবে। একক মুদ্রা প্রচলিত থাকবে। সরকার এককভাবে আইন কার্যকরী করবে। সরকারের হাতে সেনাবাহিনী থাকবে, পুলিশ থাকবে ইত্যাদি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফ্রান্স বা ইংল্যান্ড

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

খুবই স্বাভাবিকভাবে, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই জাতিরাষ্ট্র হিসেবে ইউরোপে আবির্ভূত হয়েছে। এমনটা নয় যে জাতীয়তাবাদের ধারক বাহক এক দল লোক এই দেশদুটোকে আদায় করে নিয়েছে বা জাতিরাষ্ট্র হিসেবে এই ভূখণ্ডকে তৈরি করে নিয়েছে।

জাতীয়তাবাদ বলতে মূলত একটা ধারণাকে, একটি মতবাদকে বুঝানো হয়। যেখানে জাতিরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে, সেখানে এই ধারণাটি কাজ করবে না। যেখানে এখনও জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেখানেই জাতীয়তাবাদের মূল কার্যকারিতা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৯ শতকে অনেকগুলো রাজ্য থেকে নানা ধরনের মন মানসিকতায় বড় হওয়া জার্মানভাষী লোক পাওয়া যায়। ইতালিকেও সেভাবে ভাগ করা যেত। একই চিত্র ছিল ইউরোপের অনেক জায়গায়। বিশেষ করে বর্তমান জার্মানির পূর্বদিকের একটি বিরাট অঞ্চল জুড়ে। জাতীয়তাবাদের আসল প্রভাবটি পড়ে এই এলাকাগুলোতেই।

জাতীয়তাবাদের এই ধারণাটির জন্ম হয় ১৮ শতকের প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক জোহান হার্ডারের মাধ্যমে। তিনি এনলাইটমেন্ট যুগের দার্শনিকদেরকে বিশেষ করে ইমানুয়েল কান্টের মতো দার্শনিকদের খুব সমালোচনা করেছিলেন। কারণ, এনলাইটমেন্ট যুগের দার্শনিকরা বলতেন, মানুষ মাত্রই একটি বিবেচনাবোধ সম্পন্ন প্রাণী, আর মানুষের জন্য যে নৈতিক মূল্যবোধগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোকেও যুক্তিভিত্তিকই হতে হবে। যেহেতু যুক্তির বিধানগুলো সকলের জন্য সকল সময়ই, সকল স্থানে একই রকম। তাই সভ্য মানুষেরা যারা কিনা নিজেদের আবেগকে সংযত করে যুক্তির দ্বারা প্ররোচিত হন, তাদেরকে অবশ্যই একটি একক সার্বজনীন আইন ও মূল্যবোধের দিকেই অগ্রসর হতে হবে।

হার্ডার এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে বলেন, সার্বজনীন মূল্যবোধ বলতে আসলে কিছুই নেই। তিনি আরও বলেন, পৃথিবীটা আসলে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক স্বত্তারই সমন্বয়। প্রতিটি স্বত্তাই আবার এর আওতাধীন মানুষগুলোর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লালন করে। যেমন প্রতিটি সাংস্কৃতিক আবহেরই তার মতো করে ভাষা, ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও ইতিহাস রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে সেই মানুষগুলোর সবাই আবার একে অন্যের সাথে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত থাকে। হার্ডার এই সত্তাগুলোকে বলতেন 'ভোলকস'। আর এর আওতাধীন বিষয়গুলোকে বলতেন ভলকেজিস্ট। তার ভাষায় জাতি হলো সেই জিনিস, যার আলোকে এই সত্ত্বগুলো চমৎকারভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে।

মূল্যবোধ সার্বজনীন হতে পারে না, মর্মে হার্ডার যে মতামতটি দিয়েছেন তা অনেকটাই সঠিক। নান্দনিকভাবে দুটি ভিন্ন পরিচয়ের মানুষ এক হতে পারে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আবার ভিন্নও হতে পারে। ধরা যাক, দুজন মানুষ একজন জার্মান আর আরেকজন ভারতীয়। কোনো একটি জিনিস তাদের দুজনের কাছে একই রকম সুন্দর লাগবে এমনটা নাও হতে পারে। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে, এদের মধ্যকার একজন ভুল আর আরেকজন সঠিক।

হার্ডার কখনোই বলেননি, একটি জাতি আরেকটি জাতি থেকে শ্রেষ্ঠতর। তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন তা হলো, প্রতিটি জাতি আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। আর কোনো জাতিকে অপর জাতির মূল্যবোধের মানদণ্ডে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। হার্ডারের পরে আরেকজন দার্শনিক যার নাম জোহান গোটলিব ফিচটে- তিনি এসে হার্ডারের দর্শনচিন্তার আরও পরিণত ভাষ্য প্রদান করেন। ফিচটেই প্রথম বলেন, ভিন্ন ভিন্ন জাতি সত্তার কারণেই মানবতা মহান হয়েছে। আর প্রতিটি জাতিই শত ভিন্নতার মাঝেও কিছু সাধারণ মানবিক চেতনা ধারণ করে। তবে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যেকোনো জাতি অপর কোনো জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ হতেও পারে। যেমন উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন, জার্মান জনগোষ্ঠী অন্য অনেক জাতির তুলনায় একটু বেশিই স্বাধীনতাপ্রিয়। তার মতে ফরাসি ভাষার চেয়েও অনেক উন্নত ভাষা রয়েছে। কারণ, তার মতে ফরাসি ভাষা ইতোমধ্যেই গত হয়ে গিয়েছে। যদিও ফরাসিরা কখনোই তার এই চিন্তার সাথে একমত হতে পারেনি, হওয়াটাও স্বাভাবিক নয়।

ফিচটে মারা যান ১৮১৪ সালে। তার ক্যারিয়ারটি তখনই স্বর্ণচূড়ায় পৌছায় যখন নেপোলিয়ান ইউরোপ জয় করেন এবং জার্মানের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ফিচটের মতে বেশি প্রভাব সৃষ্টি হওয়ার পেছনে এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। ফরাসিদের দ্বারা শাসিত অনেক জার্মানি তখন ভাবতে শুরু করে, হ্যাঁ, আরাও তো কথা বলতে পারে। ঐতিহাসিকভাবেই ফ্রান্স ও জার্মানি দুটি ভিন্ন চেতনা ও মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠেছে। তাই তাদের মধ্যে সব সময়ই একটা অদৃশ্য রেষারেষিও ছিল। যদিও ফরাসিরা ছিল মূল আধিপত্য নিয়ন্ত্রণের জায়গায়। তথাপি জার্মানিরাও সব সময়ই নিজেদেরকে কোনো না কোনোভাবে উঁচু অবস্থানে প্রমাণ করতে চাইত।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পতনের পর পরবর্তী ৫টি যুগ থেকে শুরু করে ১৮৭০ পর্যন্ত সেভাবেই চলে গেল। ১৮৭০ সালে প্রুসিয়ান চ্যান্সেলর অটো ভন বিসমার্ক, অনেকগুলো জার্মান রাজ্যকে মিলিয়ে একটি একক জাতি প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রান্সে তখন শাসক হলেন নেপোলিয়ানের গোবরগনেশ ভাতিজা তৃতীয় নেপোলিয়ান। এই তৃতীয় নেপোলিয়ান প্রথম নেপোলিয়ানের তুলনায় অর্ধেক বুদ্ধিও মাথায় রাখতেন না। যাহোক, বিসমার্ক তাকে (তৃতীয় নেপোলিয়ান)

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

উত্তেজিত করে একটি যুদ্ধে অবতীর্ণ করেন এবং তারপর খুব সহজেই ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। কয়েকমাসের মধ্যেই বিসমার্ক প্যারিস জয় করেন। আর এর পরপরই তিনি ফ্রান্সের বাসিন্দাদের ওপর অবমাননাকর নানা বিষয় চাপিয়ে দেয়া শুরু করেন। একই সঙ্গে তিনি ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী দুটি বিরাট প্রদেশও জোরপূর্বক দখলে নিয়ে নেন।

জার্মান জাতীয়তাবাদটির জন্ম হয় এক ধরনের হতাশা আর অসন্তোষের জায়গা থেকে। কিন্তু এই সময়টায় এসে জার্মান জাতীয়তাবাদের যেন এক ধরনের বিজয় ঘটে। জার্মান জাতি যেন ক্রমশ চালকের আসনে পৌঁছে যাচ্ছিল। সেই সময়ে এসেই ওয়াগনার জার্মানদের জাতীয়তাবাদী আবেগকে, নাটকের মঞ্চে জমকালোভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। ইতিহাসবিদরাও গবেষণা করে বের করেন, জার্মানদের আদি ঠিকানা হলো আর্যজাতির মধ্যে; যারা কিনা অনেককাল আগে ককেশাস পর্বতাঞ্চলে বসবাস করত।

তৎকালীন সময়ে জার্মানিতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় জায়গা ছিল জিমনেশিয়াম নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এই জিমনেশিয়ামের অনেক অধ্যাপকই জার্মান জাতীয়তাবাদের আদর্শের মূল ধারক ও বাহক ছিলেন। এই জিমনেশিয়ামে প্রথম হেইনরিচ ভন ট্রেইস্কের মতো দার্শনিকরা বলতে শুরু করেন, জাতিস্বত্বা হলো বিশ্বের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যার মাধ্যমেই মানবজীবন সবচেয়ে সুন্দর উপায়ে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত হয়। একই সময়ে তারা প্রবল উৎসাহের সঙ্গে একটি পৃথক জার্মান জাতিস্বত্বার বিষয়টিও সামনে নিয়ে আসেন। কারণ, এই জাতিসত্তার কাঠামো দিয়েই, যেসব জায়গায় জার্মানভাষী লোকজন বসবাস করে, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাদের এসব বক্তব্যে জার্মানভাষী বিভিন্ন পেশার লোকজন বিশেষ করে প্রকৌশলী, ব্যাংকার, শিক্ষক প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং তারাও সাধারণ জার্মান নাগরিকদের কাছে পৃথক একটি জাতিস্বত্বার গুরুত্বকে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

একই সময়ে ইতালীতেও জাতীয়তাবাদের আন্দোলনটি শুরু হয়। একে আরও অগ্রসর অবস্থানে নিয়ে যান প্রখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক জোসেফ মাজিনি। তিনি প্রথম জাতীয়তাবাদকে একটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মাজিনি মূলত চেয়েছিলেন ইতালীয় নাগরিকদেরকে বিদেশি শাসক, বিশেষত অস্ট্রিয়ার শাসকদের হাত থেকে রক্ষা করতে। আর সেই উদ্দেশ্যপূরণে তিনি জাতীয়তাবাদকেই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তার চিন্তাধারা অনুযায়ী একজন ব্যক্তি তখনই নিজেকে সবচেয়ে সফলভাবে উপস্থাপন করতে পারে, যখন তিনি একটি সামষ্টিক কাঠামোর মাধ্যমে আবির্ভূত হন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিশেষ করে জাতি হিসেবে যখন মানুষ কাজ করতে শুরু করে, তখন কাজের গতি, প্রকৃতি অনেকটাই ইতিবাচক হয় এবং সফলতার হারও অনেক বেশি থাকে। তিনি তার বিখ্যাত প্যামফ্লেট 'অন দ্য ডিউটিস অব ম্যান' এ 'আমি' শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে 'আমরা' ব্যবহার করার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করেন। যার যার লোকালয়ে যত মানুষ আছে তারা যেন সবাই দেশকে এগিয়ে নেয়ার পথে নিজ নিজ জায়গা থেকে কাজ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার কথাও তিনি বলেন। মাজিনি সম্মিলিত অধিকারের উপর ভিত্তি করে জাতীয়তাবাদের একটি নতুন তত্ত্ব দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। যেমন, প্রতিটি জাতিরই তার ভূখণ্ডের উপর পূর্ণ অধিকার আছে। একই সঙ্গে শাসক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের উপরই তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার রয়েছে। একইভাবে নিজেদের সীমান্তকে অক্ষত রাখার অধিকারও একটি জাতির রয়েছে। আর জাতি বলতে যে মানুষগুলোকে বুঝায়, তারা যদি সীমানার বাইরে থাকে তাহলে তাদেরকে স্বীয় ভূখণ্ডের আওতায় নিয়ে আসার জন্য, সীমানাকে সম্প্রসারণ করার অধিকারও একটি জাতির রয়েছে। একই সঙ্গে সীমানাটি নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার আওতাধীন এলাকায় সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার অধিকারও রয়েছে।

উনবিংশ শতকের শেষ ৫০ বছরে জাতীয়তাবাদের আন্দোলনটি জার্মানি ও ইতালিতে বিকশিত হলেও, এই চেতনাটি দ্রুত পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে সেই সময়ে অসংখ্য ভাষাভাষী, নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী বসবাস করত। তারা নিজেদের শিকড়কে কোনো না কোনোভাবে, হয় অটোম্যান না হয় অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান সাম্রাজ্যের সাথে মেলাতে চেষ্টা করত। জাতীয়তাবাদের এই চেতনাটি পরবর্তী সময়ে পূর্ব ইউরোপ হয়ে একসময় ইসলামিক সাম্রাজ্যেও প্রবেশ করে।

ইউরোপের গল্প থেকে ইসলামিক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে যাওয়ার আগে আমি পশ্চিমে ঘটে যাওয়া আরও দুটি উল্লেখযোগ্য জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের কথাও উল্লেখ করতে চাই। একটা ছিল সরাসরি অটোম্যান সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর অন্যটি অবশ্য আরও বেশ পরে এসে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছেছিল। পরবর্তী আন্দোলনের কথা বলতে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বুঝাতে চাইছি তা সংগঠিত হয়েছিল, উত্তর আমেরিকায়। সেখানে একটি নতুন দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আসলে এই দেশটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন যখন ১৩টি ছোট ছোট ঔপনিবেশিক এলাকা ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে, নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চালায়। যদিও এই ১৩টি ঔপনিবেশিক এলাকা মিলে একটি কনফেডারেশন গড়তে চেয়েছিল, তথাপি বাস্তবতা হলো ১৮৬১ সালের গৃহযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তা কোনোভাবেই সম্ভব হয়নি। ১৮৬১ সালের যুদ্ধের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা মানুষেরা নিজেদের দেশকে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বলতো 'দিজ ইউনাইটেড স্টেটস' আর যুদ্ধের পরে এসে তারা বলতে শুরু করে 'দ্য ইউনাইটেড স্টেটস।' মূলত এই গৃহযুদ্ধটি শুরু হয়েছিল দাসত্বকে কেন্দ্র করে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট লিংকন এই যুদ্ধের অপরিহার্যতাকে ইতিবাচকভাবে স্বীকার করে বলেন, এই যুদ্ধের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যুদ্ধের পরে ঐতিহাসিক গেটিসবার্গ ভাষণে তিনি বলেন, 'যুদ্ধটি একটি পরীক্ষা ছিল, সেটা হলো জাতি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আদৌ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবে কিনা। সেই সাথে আদৌ জনগণের সরকার টিকে থাকতে পারবে কিনা'। তিনিসহ আরও যেসব পেশাজীবী মানুষেরা মিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারা বলতেন, ইউরোপিয়ানদের জাতীয়তাবাদের তুলনায় তাদের জাতীয়তাবাদের ধারণা পুরোই আলাদা। একই ভাষা, ধর্ম বা ইতিহাস ও ঐতিহ্যের লোকেরা মিলে একটি জাতি হয়, ইউরোপিয়দের এই দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে তারা বলেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা বিভিন্ন মত, পথ, ভাষা ও ধর্মের লোকেরা মিলেও একটি জাতি গঠন করতে পারে। মার্কিন এসব বোদ্ধাদের কাছে জাতীয়তাবাদ মূলত একটি ধারণা বা চেতনার উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়। এই ধরনের ব্যক্তিদের জাতীয়তাবাদ তাত্ত্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জাতীয়তাবাদ যেকোনো সময় যে কাউকে আপন করে নিতে পারে। কে এই জাতিরাষ্ট্রের সদস্য বা কার জন্ম কোথায়, সেসব বিষয় জাতি গঠনের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই গৃহযুদ্ধের সময়ই নতুন উত্থিত জাতি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইঙ্গিত দিতে শুরু করে। মার্কিন সেই গৃহযুদ্ধই বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম কোনো যুদ্ধ, যেখানে একটা জায়গা থেকে একজন ব্যক্তি আদেশ দিয়ে লাখ দশেক সদস্যের বিশাল সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রায় আড়াই লাখ লোক একই সেনাপতির নির্দেশে মাঠে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহন করে। এটাই প্রথম যুদ্ধ যেখানে রেলরোড থেকে সাবমেরিন এবং বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধাস্ত্রসহ সকল কিছুতে শিল্পপ্রযুক্তি সফলতার সাথে ব্যবহৃত হয়। এটা ঠিক, এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ নিজেরাই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল। তাই কেউই বহিঃকোনো সামরিক হুমকির মুখে পড়েনি। তবে নিজেদের মধ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বল করেনি বরং জাতি হিসেবে আরও শক্তিশালী হতে সাহায্য করে।

বিশ্ব ইতিহাসে এর পরে যে জাতীয়তাবাদের আন্দোলনটি শুরু হয়, যা কিনা মুসলিম বিশ্বকে ভীষণ রকম আন্দোলিত করেছিল, তা হলো জিওনিজম বা ইহুদিবাদ। এই চিন্তা দর্শনটি যুক্তি ও তর্কের বিচারে উনবিংশ শতকের অন্য যেকোনো ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী দর্শনের মতোই ছিল। ইহুদিবাদ দার্শনিক

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

হার্ডারের পুরোনো সেই ধারণাকে সমর্থন করে যেখানে তিনি বলেছিলেন, যে জনগোষ্ঠীর মানুষ একই ভাষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস লালন করে তারাই একটি একক জাতিসত্তা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জিওনিজম মাজিনির তত্ত্বকেও সমর্থন করে। তা হলো একটি জাতির অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধীনে তার মতো করে দেশ পরিচালনা করার অধিকার রয়েছে। জিওনিজম একই সঙ্গে এই কথাও মানে যে, একটি জাতিসত্তা তার সীমানার ভেতরে একই ধরনের মানুষগুলোকে রাখার যেমন অধিকার রয়েছে, ঠিক তেমনি সেই সীমানার ভেতরে ভিন্ন ধারার যারা আছে তাদেরকেও বের করে দেয়ার ক্ষমতা বা অধিকারও রয়েছে। এই জিওনিজম তত্ত্বের পুরোধা ব্যক্তিত্বরা দাবি করেন, এসব যুক্তিতে যদি জার্মানি একটি জাতি হতে পারে, ইতালি বা ফ্রান্স একটি জাতি হতে পারে, তাহলে শুধু ইহুদি ধর্মাবলম্বীদেরকে নিয়েও একটি জাতি গঠিত হতে পারে।

তবে জিওনিজমের সাথে উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোর মাঝে একটি বড় পার্থক্য ছিল। সেই সময়ে ইতালিয়ান, জার্মান, সার্বিয়ানসহ যেসব জাতি গঠিত হয়েছিল তারা তাদের ঐ ভূখণ্ডের উপর একটি জাতীয়তাবাদী অধিকার থাকারও দাবি করে। অর্থাৎ জাতি মাত্রই তার একটি নিজস্ব ভূখণ্ড থাকবে। কিন্তু ইহুদিদের এ রকম কোনো ভূখণ্ড ছিল না। ইহুদিরা তখনো বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। যদিও প্রায় দুই হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে ইহুদিরা উদ্বাস্তু হিসেবে ছিল, কিন্তু এরপরও যে যেখানেই থাকুক না কেন জুদাইজমকে ভিত্তি করে তাদের মধ্যে বরাবরই একটি ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। তাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশীলনের দিক থেকে যেমন মিল ছিল, ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবেও অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। সারা বিশ্বজুড়ে থাকা এসব ইহুদিরা তখনো বিশ্বাস করত, যদি তারা কেবল ঈশ্বরের আদেশ নিষেধ মেনে চলতে পারে তাহলে, ঈশ্বর 'ল্যান্ড অব ক্যাননকে' আদি হিব্রুদের জন্য অর্থাৎ অব্রাহাম ও তার বংশধরদের জন্য বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহুদিরা সব সময়ই প্যালেস্টাইনকে তাদের নিজেদের ভূখণ্ড হিসেবে মনে করে এবং সেটাকে নিয়ন্ত্রণে পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। যদিও যখনকার কথা বলছি, সে সময়ে প্যালেস্টাইন ছিল অটোম্যানদের নিয়ন্ত্রণে। আর তারও আগে ছিল আরবদের নিয়ন্ত্রণে। যদিও উনবিংশ শতকে অনেক ইহুদি দার্শনিকই ধর্মনিরপেক্ষ ঘরানার ছিলেন। তথাপি নিজ ভূমিতে ফিরে যাওয়ার অদম্য তাগিদ সেই সময়ে ইহুদিদের মধ্যে নতুন করে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেয়। তারা নিজেদের একটি পৃথক জাতিরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

জিওনিজম বা ইহুদিবাদের ধারণাটি ১৮০০ সালে পাওয়া গেলেও একে রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে একটি কাঠামো

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্রদান করেন অস্ট্রিয়ান সাংবাদিক থেওডর হারজেল। তিনি ১৮৯৭ সালে ওয়ার্ল্ড জিওনিস্ট কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় ইউরোপে জাতীয়তাবাদের নানা চিন্তাধারা নিয়ে যখন কথাবার্তা শুরু হয় ঠিক একই সময়ে, ইউরোপের ইহুদি বুদ্ধিজীবীরাও ফিলিস্তিনে চলে আসার বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেন। সেই সময়ে কিছু জার্মান জাতীয়তাবাদী এই জিওনিজমের সুরকে সমর্থন করেন। তবে সেটা বন্ধুবৎসল হিসেবে নয় বরং নিজেদের ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে। যেমন উদাহরণ হিসেবে ফিচটের কথা বলা যায়। তিনি প্রথম বলতে শুরু করেন, ইহুদিরা কখনোই জার্মান সংস্কৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে না। এমনকি তারা যদি এখানে জন্ম থেকে বসবাসও করে তাও সম্ভব নয়। জার্মানির ভেতরে থাকলেও তারা নিজেদের আরেকটি জগৎ বানিয়ে থাকে। তাই তাদের জন্য ফিলিস্তিনই হয়তোবা সত্যিকারের সমাধান।

অন্যদিকে, ফিলিস্তিন কখনোই পুরোপুরি ইহুদিমুক্ত ছিল না। সেখানে সব সময়ই কিছু না কিছু ইহুদি বসবাস করত। তবে ১৮০০ সালে এসে সেই ইহুদিদের সংখ্যা মোটামুটি একটি বড় পর্যায়ে পৌঁছায়। তখন ইহুদিদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২.৫ শতাংশ আর অবশিষ্ট ৯৭ শতাংশই ছিল আরব। ১৮৮০ সালে যখন ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের অভিবাসনের হার প্রবলভাবে বাড়তে শুরু করে, তখন হঠাৎ করেই ইহুদিদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশে পৌছে যায়। প্রথম আলিয়াতে (ইহুদিরা ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে যাওয়ার এই বিষয়টিকে অভিবাসন বা স্থানান্তর নয় বরং আলিয়াহ হিসেবে অভিহিত করত) প্রায় ৩০ হাজার ইহুদি ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে পৌছায়। প্রথম আলিয়াতে যারা গিয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল শহুরে বুদ্ধিজীবী। তারা নিজেদের সত্যিকারের পরিচয় লুকিয়ে নিজেদেরকে ফিলিস্তিনী কৃষক হিসেবে দাবি করে। যদিও তারা কৃষিকাজের 'ক'ও জানত না। পরবর্তী সময়ে তাদের অধিকাংশই ফিরে আসে। ফলে বলা যায়, প্রথম আলিয়াতে যারা ঢুকেছিল তারা আবার বেরিয়েও গেল। পরিস্থিতি যখন এ রকম তখনই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

ইউরোপ থেকে এই তিনটি মতবাদ অর্থাৎ সাংবিধানিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং শিল্পায়ন অটোম্যান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন সেখানে খুবই ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর একটা কারণ ছিল, ১৯ শতকে এসে অটোম্যান সাম্রাজ্য নিজেই তখন অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল। আর সে কারণে তারা নিজেরাই তাদের অস্তিত্ব নিয়ে এক ধরনের উদ্বিগ্নতায় ডুবে ছিল। সঙ্কুচিত হয়ে পড়ার কারণ ছিল, তত দিনে আলজেরিয়াকে ফ্রান্স গিলে ফেলেছে। ব্রিটেনও প্রায় পুরোপুরি মিসরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। মিসরের পূর্বদিকের একটা অংশ (যেটা আসলে আজকের ইরাক) তখনো অটোম্যানদের হাতে ছিল। যদিও অটোম্যান

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

শাসকেরা বুঝতে পারছিলেন, এই এলাকাতেও ক্রমশ ইউরোপিয়ানদের আধিপত্য সৃষ্টি হচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে, বিশাল এই সাম্রাজ্য, যা কিনা একসময় বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য। তার সেই শৌর্য বীর্য একেবারে তলানীতে এসে পৌঁছেছিল; শরীরে পচন ধরেছিল, কোনোমতে শ্বাস প্রশ্বাসটা তখনো টিকেছিল।

অটোম্যান সাম্রাজ্য তখনো বেঁচে ছিল, কিন্তু পশ্চিমা ব্যবসায়ীরা তখন তাদের সরকারদের মদদে ইচ্ছেমতো চলাফেরা করত, কাজকর্ম করত। যদিও ১৯ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের সাথে অটোম্যান নীতিনির্ধারকদের মধ্যকার সম্পর্কে যদি এক কথায় বলা যায়, তাহলে তা ছিল শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ।

শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পনের এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়, যখন অটোম্যান সাম্রাজ্যটি তার সোনালী সময়ে অবস্থান করছিল। সে সময়ে অটোম্যান সাম্রাজ্যের শক্তিশালী সুলতানেরা কিছু শর্তসাপেক্ষে ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীদের তাদের সাম্রাজ্যে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই ব্যবসায়ীরা সাম্রাজ্যের ভেতরে থাকা অবস্থায় কি কি করতে পারবে তার একটি তালিকা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল এবং এর বাইরে কিছু করা সম্পূর্ণ বেআইনি ছিল।

যেহেতু বড় কোনো যুদ্ধের মাধ্যমে অটোম্যান এবং ইউরোপিয়ানদের মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্য হয়নি। কিংবা এমন কোনো সময়ও আসেনি যে হুট করে ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে জারি করা সকল শর্ত প্রত্যাহার হয়ে গিয়েছে। অথবা অটোম্যানরাও ইউরোপিয়ানদের ছাড়া চলতে পারার মতো শক্তি অর্জন করতে পারেনি তাই পরবর্তী সময়ে উভয় জাতির মধ্যে সম্পর্কটি এগিয়েছে অদৃশ্য গতিতে এবং অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াতে। ইউরোপিয়ানরা খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা নিভৃতে অটোম্যানদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এক্ষেত্রে প্রথম যে বড় ঘটনা তা ঘটে ১৮৩৮ সালে। যখন অটোম্যানরা ইউরোপিয়ানদের একটি কনসোর্টিয়ামের সাথে বালটা লিমান চুক্তিটি স্বাক্ষর করে। প্রকৃতপক্ষে অটোম্যানরা এই চুক্তিটি করেছিল মিসরের নেতা মোহাম্মাদ আলির বিরুদ্ধে, ইউরোপিয়ানদের সহযোগিতা পাওয়ার লোভে।

সে যাহোক, এই চুক্তিটি অটোম্যান সাম্রাজ্যে ইউরোপিয়ানদেরকে অনেকগুলো সুবিধা প্রদান করে। যেমন, অটোম্যান সাম্রাজ্যে ইউরোপিয়ান যেসব পণ্য ঢুকবে সেগুলোকে কর কম প্রদান করতে হবে। কিন্তু অটোম্যান থেকে যেসব পণ্য ইউরোপে যাবে সেগুলোকে অনেক বেশি কর গুনতে হবে। এই চুক্তির মাধ্যমে অটোম্যানদের মনোপলি নস্যাৎ হয় এবং তদুস্থলে ইউরোপিয়ানদের মনোপলি বিস্তার করার সুযোগটি বিকশিত হয়। ফলে অটোম্যান ব্যবসায়ীরা নিজেদের মাটিতেই ইউরোপিয়ানদের সাথে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি পিছিয়ে পড়ে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বালটা লিমান চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক দশকের মধ্যে অটোম্যান শাসকেরা নিজেদের ভগ্নপ্রায় শরীরকে ঝাঁকুনি দেয়ার জন্য কয়েক দফা সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন করেন। এসব করার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের সমকক্ষ হওয়া। কিন্তু আসলে এর মধ্য দিয়ে অটোম্যানদের স্বকীয় সক্ষমতার কবর রচনা হয়। অটোম্যানরা এই সময়ে এসে যে আধুনিকায়নের কর্মকৌশল হাতে নেয়, তাকে তারা তানজিমাত হিসেবে অভিহিত করত। এর প্রথম ধাপটি দেখা যায় ১৮৩৯ সালে যখন 'দ্য নোবেল এডিক্ট অব দ্য রোজ চেম্বার' নামক একটি ঘোষণা দেয়া হয়। ১৮৫৬ সালে 'দ্য ইম্পেরিয়াল এডিক্ট' নামে আরেক দফা সংস্কারের ঘোষণা আসে। এরপর ১৮৬০ সালে তৃতীয় দফা সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তানজিমাতের মাধ্যমে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

- ফ্রান্সের আদলে একটি নতুন জাতীয় সরকারি প্রশাসন কাঠামো তৈরি করা হবে।
- ধর্মনিরপেক্ষ আদালতগুলো শরিয়ত ভিত্তিক আদালতের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হবে।
- ফ্রান্সের নেপোলিয়নের দর্শনের ভিত্তিতে নতুন ধারার একটি ক্রিমিনাল জাস্টিস (ফৌজদারি দণ্ডবিধি) পদ্ধতি চালু করা হবে।
- মুক্ত বাণিজ্যকে সহায়তা করার নিমিত্তে নতুন কিছু বাণিজ্যিক আইন প্রণয়ন করা হবে। এর ফলে ইউরোপিয়ানরা স্বাধীনভাবে অটোম্যান সাম্রাজ্যে ব্যবসা করার সুযোগ পাবে।
- দেভশ্রিমকে হটিয়ে প্রুসিয়ান কাঠামোর আদলে নয়া সেনাবাহিনী গঠন করা হবে।
- স্কুলগুলোকে ব্রিটিশ স্কুলসমূহের আদলে ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোতে রূপান্তরিত করা হবে। মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর সুযোগ সুবিধা বন্ধ করা হবে।
- গোটা দেশের কর আদায়ের কাজটি করবে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান; যেমনটি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইআরএস করে থাকে। অটোম্যান ট্যাক্স ফার্মারদেরকে এই কর আদায়ের কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে।
- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অটোম্যান নাগরিকদের মালিকানাধীন সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

কাগজে কলমে এই প্রস্তাবগুলো দেখতে ভালোই লাগে। বিশেষ করে শেষের প্রস্তাবটি। কারণ, এর মাধ্যমে সব ধরনের বিভাজন ও বৈষম্যের নিরসন ঘটিয়ে, সকল অটোম্যান নাগরিকদের জান ও মাল নিরাপদ রাখার কথা বলা হয়েছে। এই চিন্তাধারাটিও কিন্তু ইউরোপ দ্বারাই প্রভাবিত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিন্তু সেই ১৯ শতকের একজন সাধারণ তুর্কি মুসলিমের দৃষ্টিতে চিন্তা করলে এসব সংস্কার প্রস্তাব তার জন্য আরও অসহনীয়। কারণ, এতে বুঝা যাচ্ছে, শাসন ক্ষমতায় যদিও তারই স্বজাতীয় অটোম্যানরা বসে আছে কিন্তু তাদেরকে পরিচালনা করছে ইউরোপিয়ানরা। ইতিহাসবিদ জেমস এল গেলভিনের মতে ১৮৫৬ সালে 'দ্য ইম্পেরিয়াল এডিক্ট' নামে যে সংস্কারের ঘোষণা আসে তা লিখে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ এম্বাসেডর স্ট্যাটফোর্ড ক্যানিং। তিনি এই ঘোষণাটি জনসম্মুখে প্রকাশ করার শর্তেই অটোম্যান শাসকদেরকে লিখে দিয়েছিলেন। অধিকাংশ সাধারণ অটোম্যান নাগরিকদের কাছে এসব সংস্কার প্রস্তাব আর কিছুই নয় বরং তাদের জীবনের উপর অচেনা কারও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠারই আগামবার্তা।

সকল অটোম্যান মুসলমানই যে এই একই রকম অনুভূতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল বিষয়টা ঠিক তেমনও নয়। আর সে কারণেই তুরস্কে যে ধরনের সংস্কার হলো, সেই একই ধরনের সংস্কার আন্দোলন হলো ভারতবর্ষে, আফগানিস্তানে এবং ইরানে। তারা সকলেই তুরস্ক প্রণীত সংস্কার প্রস্তাবনা, তানজিমাতকে গ্রহণ করে নিল। তারা ভাবলেন, ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিকতাকে পরাভূত করার একমাত্র উপায় হলো তাদের কৌশলেই তাদেরকে বিপর্যস্ত করা। সে কারণেই তারা সেসব ইউরোপীয় ধারণাকে অবলম্বন করতে শুরু করল, যেগুলোকে ভিত্তি করেই ইউরোপিয়রা বিশ্ব পরিচালনার শক্তি অর্জন করেছে।

কিন্তু আলেম সমাজ এই প্রক্রিয়াগুলোকে কোনোভাবেই বরদাশত করতে পারছিল না। তানজিমাতের সকল প্রস্তাবনাই তাদের চিন্তাভাবনার বিপরীতে চলে গিয়েছিল। তানজিমাতের প্রস্তাবনা অনুযায়ী শিক্ষার প্রক্রিয়াটি ধর্মীয় নেতাদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, শরিয়া আদালতকে দুর্বল করে ধর্মনিরপেক্ষ আদালতকে শক্তিশালী করণ, ইসলামিক আইনকে হটিয়ে দিয়ে ফরাসি আইনকে কার্যকরী করাসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ শুধু যে আলেম সমাজকে ক্ষমতাহীন করে দিয়েছিল তাই নয়, বরং তাদের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল। তাই তারা শক্তভাবেই তানজিমাতের প্রতিবাদ করেছিল। আর এই কথাও ঠিক যে সাধারণ মানুষদের মধ্যে তখনো আলেমদের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি ছিল।

অটোম্যান সুলতানরাও তখন এই বিভেদের মাঝখানে পড়ে বেশ কোণঠাসা অবস্থায় চলে গেলেন। একদিকে ছিল ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক চিন্তার মানুষেরা আর অন্যদিকে আলেম সমাজ। ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক মনস্করা দৃঢ়ভাবে চাইছিল ইউরোপীয় ধারায় সমাজের সংস্কার করতে, আর সনাতনবাদী আলেমরা ছিল এর তীব্র বিরোধী।

একটা সময়ে গিয়ে আধুনিকতাবাদীরাই একটু ভালো অবস্থানে চলে গেলেন। তারা ১৮৭৬ সালে তৎকালীন সুলতানকে একটি সংবিধান প্রণয়ন করার ব্যাপারে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

রাজি করালেন। এই ঘটনাটিকে তাদের একটি বড় বিজয় হিসেবে দেখা যায়। ইতিহাসে অটোম্যান সুলতানের এই সংবিধান তৈরির ঘটনাটিকে 'ফ্রেঞ্চ রিভোলিউশন অব দ্য ইস্ট' বা পূর্বপ্রান্তের ফরাসি বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করা হয়। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে অটোম্যান সাম্রাজ্যে ব্রিটেনের মতো সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চালু হয়ে যায়। এই সময়টাতে আধুনিকমনা সকল পেশার মানুষ, সকল মতের মানুষ খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। কারণ, তারা চতুর্দিকের সব পরিবর্তিত ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে নিজেদের বিজয়টাই যেন অনুভব করছিল। আধুনিকমনা তুর্কি মুসলমান, আরব মুসলমান, ইহুদি, কট্টরপন্থী খ্রিষ্টান, আর্মেনিয়ানস সকলেই তখন যেন নতুন একটি পৃথিবী গড়ার স্বপ্নে বিভোর ছিল।

কিন্তু সনাতনপন্থী সম্প্রদায়গুলোও হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। তারা সুকৌশলে আধুনিকমনাদেরকে শায়েস্তা করে। সে লক্ষ্যে তারা সুলতানকে পুনরায় ক্ষমতাশালী করে, যাতে তিনি নিজ ক্ষমতাবলে প্রণীত সংবিধানটিকে বাতিল করে, আবারও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। পরিবর্তনের গতি যেন একটু থমকে যায়, কারণ সংস্কারমূলক কার্যক্রমগুলো সেভাবে আর কাজ করছিল না। এশিয়া মাইনরস্থ তুর্কি মুসলমানরা অনুধাবন করল যে, তাদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশই দুর্বল হচ্ছে এবং তাদের স্বায়ত্বশাসনও নাজুক হয়ে পড়ছে। সংস্কার করতে যেয়ে তারা যেন আরও বেশি করে অনুভব করল, ইউরোপিয়ানদের অপ্রতিরোধ্য শক্তির কাছে তারা আসলে কতটা অসহায়।

কিন্তু তারা কখনোই ভাবেনি, তাদেরই সীমানার আওতায় থাকা কেউ বহির্জগতের শক্তির ন্যায় আচরণ করবে। আর ঠিক এটাই করতে শুরু করে তুর্কির প্রতিবেশী আর্মেনিয়ানরা। জাতি হিসেবে আর্মেনিয়ানরা কখনোই তুর্কিদের মতো ইউরোপ ঘেষা ছিল না। তারা যেখানে বাস করত, সেখানে তাদের পূর্ব পুরুষরা অনেক আগে থেকেই বসবাস করেছে। তাদের ছিল ইউরোপিয়ানদের প্রভাবমুক্ত ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। তারা কোথাও থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। তারা তুর্কিদের তুলনায় সেই অঞ্চলের অনেক পুরোনো বাসিন্দা।

তুর্কিদের সিংহভাগ মুসলমান হলেও তাদেরই রাজত্বের ভেতরে আর্মেনিয়ানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। যখন অটোম্যান প্রশাসন শর্তসাপেক্ষে পশ্চিম ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীদেরকে তাদের সাম্রাজ্যে ব্যবসা করার অনুমতি দেয়, তখন ইউরোপিয়ানরা খুব ভালো করছিল। আর সেই ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় তুর্কি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে চলে যায় এই আর্মেনিয়ানরাই। ইউরোপিয়ানদের সফল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের কারণে গোটা তুর্কি জাতি অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সে সময়ে টিকে থাকার একমাত্র উপায় ছিল, ইউরোপীয় বণিকদের সাথে অংশীদারত্বমূলক ব্যবসা শুরু করা।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যখন ইউরোপিয়ানরা অটোম্যান সাম্রাজ্যে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদার খোঁজা শুরু করল, তখন স্বাভাবিকভাবেই আর্মেনিয়ানদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হলো। কারণ, আর্মেনিয়ানরা ছিল খ্রিষ্টান। আর তাই তাদেরকে বাদ দিয়ে মুসলমানদেরকে সুবিধা দেয়ার কোনো কারণও ছিল না। কারণ, ইউরোপিয়ানরা মনে-প্রাণে চাইছিল অর্থনৈতিকভাবে তুর্কি মুসলমানদেরকে যেকোনো উপায়ে বিপর্যস্ত করে তোলা।

জন্মগতভাবে তুর্কি না হলেও এসব ঘটনাবলি ঘটার আগ পর্যন্ত আর্মেনিয়ানরা অটোম্যান সাম্রাজ্যে বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই অবস্থান করছিল। যদিও তারা সামরিক বাহিনীর মূল অভিজাত শ্রেণিতে কখনোই অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়নি। একই সঙ্গে তারা কর আদায় কার্যক্রম এবং ভূমির মালিকানার অধিকার থেকেও কিছু কিছু সময় বঞ্চিত হয়েছিল।

বৈধ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অনেক আর্মেনিয়ানরাই টাকা পাচার বা সুদের কারবারীর মতো কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। ঋণের ওপর সুদ আদায় করাটাকে ইসলাম কোনোভাবেই সমর্থন করে না। সাধারণভাবে দরিদ্র মানুষকে ঋণ প্রদান করাটাকে ব্যবসা হিসেবে নয় বরং দান হিসেবেই দেখা বাঞ্ছনীয়। কারণ, মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখনই সে ঋণ চায়। ইসলাম তাই ঋনের উপর সুদ নেয়াটাকে সঠিক মনে করে না। যেহেতু এখানে অর্থদাতা দরিদ্র ব্যক্তির দূরাবস্থাকে পুঁজি করে বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করে। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে থাকলেও যে কারও, যখন তখন ঋণ নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ এমন সমস্যায় পড়ে যেগুলোর উপর তার কোনো হাত নেই। যেমন একটা মানুষের হঠাৎ দোকান পুড়ে গিয়ে সে বিপদে পড়ে যেতে পারে, কিংবা একজন ধর্মীয় নেতা হঠাৎ করে মারা গেলে তার পরিবার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যেতে পারে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে ইত্যাদি। মানুষ তখনই ঋণদাতার কাছে সাহায্য নেয়ার জন্য যায় যখন তার হাতে বিকল্প আর কোনো পথ খোলা থাকে না। ঋণগ্রহীতা মনে মনে প্রত্যাশা করে ঋণদাতা কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়াই তাকে ঋণ প্রদান করবেন। ঋণদাতা ও গ্রহীতা যদি একই গোত্রের মানুষ হয় তাহলে অন্য কোনো নতুন পক্ষের মানুষ এই লেনদেন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু যদি মানুষকে ভিনগোত্রীয় কারও কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়, তাহলে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক শত্রুতা পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে। ইউরোপে এই টাকা পয়সা লেনদেন করতে গিয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ইহুদিরা। আর অটোম্যান সাম্রাজ্যে ঋণ নিতে গিয়ে বৈষম্যের শিকার হয় আর্মেনিয়ানরা।

সেই আর্মেনিয়ানরা যখন ইউরোপিয়ানদের বদান্যতায় অনেকটাই এগিয়ে গেল তখন বেশ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। অবস্থাদৃষ্টে মনেই হচ্ছিল না যে,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই তুর্কি আর আর্মেনিয়ানরা কয়েকদিন আগ পর্যন্ত সুখে শান্তিতে অবস্থান করছিল। অটোম্যান শাসকেরা সব সময় জনসংখ্যাকে তাদের জাতিগোষ্ঠীর আলোকে বিভক্ত করে, স্বগোত্রীয় লোকদেরকে দিয়েই প্রতিটি সম্প্রদায়কে শাসন করার নীতি অনুসরণ করত। এটা সমাজে সহনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখে। কিন্তু বিভাজনের এই নীতিটি একটা সময় পর্যন্ত ভালো কাজ করলেও, পরবর্তী সময়ে এটাই অটোম্যানদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এই নীতির কারণেই আর্মেনিয়ানরা নিজেদেরকে তুর্কিদের থেকে আলাদা ভাবতে শুরু করে।

১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব আনাতোলিয়াতে তুর্কি কিছু গ্রামবাসী আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে একটি গণহত্যা চালায়। পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়াতেও অনেক ইহুদি গণহত্যার শিকার হয়। ধারণা করা হয়, সেই গণহত্যায় প্রায় তিন লাখ আর্মেনিয়ানকে হত্যা করা হয়। আর এই গণহত্যাটি তখনই বন্ধ হয়, যখন ইউরোপিয়ানরা এই গণহত্যা রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অটোম্যান শাসকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। যেহেতু ইউরোপিয়ানদের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব থাকার কারণে তাদের অসন্তোষ বা ক্ষোভকে সেই সময়ে অটোম্যান শাসকরা খুবই গুরুত্ব দিত, তাই তারা গণহত্যাটিকে বন্ধ করল ঠিকই, তবে এই গণহত্যার পেছনে মূল যে মানসিক কারণগুলো ছিল সেগুলোর কোনো সুরাহা করল না। ব্যাপারটি এমন যে, একটি বাচ্চা বাসার পাশের কোনো বিপজ্জনক জায়গায় চলে গিয়েছিল বলে বাবা-মা বাচ্চাটিকে শাসন করে বাসায় নিয়ে এল। কিন্তু এর পরপরই বাবা-মা দুজনেই নিজেদের কাজে চলে গেল। ফলে বাচ্চাটি আবার সেই বিপজ্জনক জায়গায় চলে গেল কিন্তু এবার তার ঝুঁকি আরও বেশি। কারণ, বাচ্চাটি পুরো একা, কোনো ধরনের বিপদে পড়লে বাবা-মা কেউই তাকে উদ্ধারও করতে আসবে না।

অটোম্যান সুলতান একটা পর্যায়ে সংবিধানকে কাঁটাছেঁড়া করতে বাধ্য হলেন। ক্ষমতা দুইভাগ হয়ে সনাতনপন্থী ও আধুনিকমনা- উভয়ের মাঝেই চলে গেল। তবে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমিত হলো না বরং তা বাড়তে লাগল। আর সেই রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির পূর্ণ সুবিধা পেল আধুনিকতামনস্করাই। ইরানের মতো অটোম্যান সাম্রাজ্যেও একটা পর্যায়ে গিয়ে আধুনিকতার জোয়ার উঠে গেল। ১৯০০ সালে আবার সংবিধান পুনর্বহালের দাবিতে বড় করে নতুন একটি আন্দোলনেরই সূত্রপাত হলো।

ব্যাপারটি এ রকম ছিল না যে, আন্দোলনকারীদের একটি গ্রুপ ছিল জাতীয়তাবাদী মানসিকতার। একটি গ্রুপ সংবিধানপন্থী আর আরেকটি গ্রুপ ধর্মনিরপেক্ষ- এবং তারা প্রত্যেকেই তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বরং বিষয়টা অনেকটাই জটিল ও দুর্বোধ্য অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। প্রতিটি দল, প্রতিটি আন্দোলন কিংবা প্রতিটি মতাদর্শ আসলে একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্তও হয়ে পড়েছিল। প্রতিটি নাগরিক কিছুটা এই মতবাদ সমর্থন করত আবার কিছুটা অন্য মতবাদের- এমন অবস্থায় ছিল। কোনো দর্শনটা আসলে বেশি কার্যকরী বা কোনটা আসলে প্রয়োগযোগ্য- এটা নিয়ে ভাবার মতো সময় বা সুযোগ ছিল না। অবশ্য যারা সনাতনবাদীদের বিরুদ্ধে ছিল তাদের মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক সাদৃশ্য ছিল। কারণ, তারা মনে করত তারা অটোম্যান সাম্রাজ্যকে নতুন একটি জায়গায় নিতে চাচ্ছে।

১৯০০ সালে যারা এই নতুন ধারার এই আন্দোলনের সূত্রপাত করল তারা নিজেদেরকে ইয়ং তুর্ক বা যুব তুর্কি হিসেবে আখ্যায়িত করত। নিজেদেরকে যুবক বলে দাবি করার কারণ ছিল তাদের অধিকাংশের বয়সই ছিল ২০-এর মধ্যে। তা ছাড়া আরেকটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ও ছিল। তৎকালীন সময়ের আদি চিন্তাধারার যে মুসলমানরা ছিল, তারা একটু প্রবীণ হওয়ায় নিজেদেরকে খুব সম্মানীত মনে করত। সাধারণ জনগণের অনেকেই তাদেরকে শায়খ বা পীর হিসেবে সম্মান করত। বয়স্ক লোকদের প্রতি এই সম্মান দেখানোর যে চর্চাটি ছিল মূলত তার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই নব্যধারার আন্দোলনকারী নিজেদেরকে 'যুবক' হিসেবে পরিচয় দিতে সম্মানীত ও সাচ্ছন্দ্যবোধ করত। কারণ, তাদের মূল লড়াইটা ছিল এই বয়স্ক আলেমদের বিরুদ্ধেই।

এই যুবকদের মধ্যেও অনেক বিষয়েই দ্বিমত ছিল। কিন্তু তারপরও তারা সকলে মিলে সংবিধান প্রশ্নে ঐকমত্যে পৌঁছায় এবং তারা ১৯০৮ সালে তৎকালীন অটোম্যান সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে, তাকে দিয়েই আবারও সংবিধান পুনর্বহাল করাতে সক্ষম হয়। এর ফলে আব্দুল হামিদ একজন নামকাওয়াস্তে শাসকে পরিণত হন।

সুলতানকে দিয়ে কাজটি করিয়ে নেয়ার পরই, যুবকেরা বুঝতে পারে যে তাদের মধ্যে চিন্তার জায়গাতে আসলে অনেক বিভক্তি ও বিভাজন রয়েছে। এদের মধ্যে একটি অংশ চায় সাম্রাজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ, সংখ্যালঘুদের অধিকার, এবং সরকারের কার্যক্রমে সাধারণ মানুষের অধিকতর অংশগ্রহন। আর অন্য অংশটি চায় তুর্কি জাতীয়তাবাদ। ১৯০২ সালে ছয়জন মেডিকেল ছাত্র মিলে এই তুর্কি জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রণয়ন করে এবং একটি ক্যাডারভিত্তিক সামরিক ধারার দল গঠন করে। যার নাম দেয়া হয় 'কমিটি ফর ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস (সিইউপি)'।

সিইউপি জনগণের মাঝে বেশ ভালোই সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। তৎকালীন সময়ের অসংখ্য রাজতন্ত্র বিরোধী তুর্কি যুবক, সাধারণ যুবক, শিক্ষিত সরকারি কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বুদ্ধিজীবী মহল যারা তাদের ছাত্রজীবনে জাতীয়তাবাদী

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিভিন্ন ধারণা নিয়ে পড়াশোনা করেছে, ইউরোপীয় দার্শনিকদের এই সংক্রান্ত মতবাদগুলো পড়েছে, এবং যারা জার্মানি ও ইতালীয়দের জাতীয়তাবাদের স্বার্থক অভিযাত্রা সম্পর্কে অবগত- তারা সবাই অনুভব করলেন যে সম্ভবত জাতীয়তাবাদের চেতনাই তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে রক্ষা করবে। পুরোনো, সেকেলে, বহু নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সম্বলিত চিন্তাধারার অটোম্যান সাম্রাজ্যকে হটিয়ে একটি স্বচ্ছ তুর্কি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে আরবীয় যে প্রদেশগুলো ছিল তারা সেগুলোকেও বাদ দেয়ার পক্ষে ছিল। কারণ, তাদের সাথে মানসিকতাগত ভাবে মিল হচ্ছিলো না। এর পরিবর্তে তারা তাদের সাম্রাজ্যের মধ্য এশিয়ার আওতাধীন এলাকার সাথে আনাতোলিয়াকেও অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। কারণ, সেটাই ছিল তুর্কি জাতির আদি আবাসভূমি। তারা বসফোরাস থেকে কাজাখস্তান পর্যন্ত বিশাল এলাকা নিয়েই একটি বড় তুর্কি জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে।

তুর্কি জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা আরও বলেন, সাম্রাজ্যের ভেতরে যে সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানেরা আছে বিশেষ করে আর্মেনিয়ানরা, তারা এত দিন বেশ অভিজাত জীবনযাপন করার সুযোগ পেয়েছে। কারণ, অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকেও আর্মেনিয়ানরা তাদের সাথে শত্রুতাভাবাপন্ন আচরণ করেছে, আর প্রকারান্তরে রাশিয়ান, পশ্চিম ইউরোপ এবং পূর্ব ইউরোপের শ্লেভিকদের সাথে সখ্যতা বজায় রেখেছে। তুর্কি জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক এই প্রজন্ম অনেকটা জার্মান দার্শনিকদের সুরেই বলতে শুরু করল যে, একমাত্র স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্র গঠন হলেই ছোট ছোট সকল নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে একটি একক পরিচয়ের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। তুর্কি লেখক জিয়া গোলাপ এই আলোচনায় যেন বারুদ ঢেলে দিলেন। তিনি বললেন, 'এত দিন যে কাঠামো ছিল, তাতে শুধু বীরেরা আর মহান ব্যক্তিরাই গুরুত্ব পেতেন, সাধারণ মানুষদের কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদের কোনো অধিকারও ছিল না। সাধারণ মানুষগুলোকে শুধু দায়িত্ব পালন করে যেতে হতো, জাতির শীর্ষ ক্ষমতাসীনদের হুকুম তামিল করতে হতো।'

কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কারণে অটোম্যান সাম্রাজ্য বিরাট সংকটে পড়ে যায়। সমস্যা যেন ক্রমশই আরও বেড়ে যাচ্ছিল। বুলগেরিয়া ইতোমধ্যেই স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনাও অটোম্যান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই পরিবর্তনগুলোর কারণে প্রায় ১০ লাখ মানুষকে জোরপূর্বক যেন নির্বাসনে চলে যেতে হয়। তারা আনাতোলিয়াতে চলে যায়। সেখানে তারা নতুন ঠিকানা প্রত্যাশা করে। কিন্তু সেগুলো ব্যবস্থা করার মতো কোনো অবস্থায় অটোম্যান সাম্রাজ্য তখন ছিল না। তখন তারা মোটামুটি বিপর্যস্ত অবস্থায়; সাম্রাজ্যটি পুরোই ভেঙে পড়ে, যখন অধিকাংশ মুসলমানই অভিবাসন করে পূর্বের দিকে চলে যায়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এবার সমাজের অন্যান্য মহলেও জাতীয়তাবাদের প্রভাব পড়তে শুরু করে। আর্মেনিয়ানরাও তুর্কিদের দ্বারা অমানবিক নিপীড়নের শিকার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে আর্মেনিয়া নামক পৃথক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তোলে। একই সময়ে পূর্ব ইউরোপের অনেক জায়গাতেই এ রকম স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়।

১৯১২ সালে মেসেডোনিয়ার আলবেনিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়। ইস্তানবুলের বাইরে এই ইউরোপীয় অঞ্চলটির ওপর তখনো অটোম্যান সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধেও অটোম্যানরা পরাজিত হওয়ায়, অটোম্যান সাম্রাজ্যের ক্ষমতার মূল কেন্দ্র অর্থাৎ গোটা এশিয়া মাইনর অঞ্চলে উদ্বেগ, অসন্তোষ এবং সংশয় ছড়িয়ে পড়ে। আলবেনিয়াতে মূলত একটি সংগঠিত আন্দোলনই অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দেয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়াতেও বলশেভিকরা এই ধরনের আন্দোলনেরই সূত্রপাত করে। আবার ইস্তানবুলের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

সেই সময়ে ইস্তানবুলে অবশ্য সবচেয়ে সক্রিয় ও সংগঠিত সংগঠন ছিল 'কমিটি ফর ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস সিইউপি'। এই সিইউপি নামক সংগঠনটিই ১৯১৩ সালের ২৩ জানুয়ারি একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (উজির)কে হত্যা করে এবং সর্বশেষ অটোম্যান সুলতানকে উৎখাত করে। সরকার থেকে সকল দায়িত্বশীলকে হটিয়ে দেয় এবং অন্য সব রাজনৈতিক দলকে অবৈধ ঘোষণা করে সিইউপির নেতৃত্বে তুরস্কে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করে। আর একদল লোক এই নতুন ক্ষমতাবান দলটির নেতৃত্বে চলে আসে। যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তালাত পাশা, এনভের পাশা এবং জেমেল পাশা। এই তিন পাশা মিলেই অটোম্যান সাম্রাজ্যের পরিশিষ্ট অংশটি পরিচালনা করতে শুরু করেন। সেই অবস্থায় ১৯১৪ সালে ইউরোপিয়ান গৃহযুদ্ধটির সূত্রপাত হয়।

ইউরোপে এই যুদ্ধটিকে বলা হয় গ্রেট ওয়ার বা মহাযুদ্ধ। তবে মধ্যপৃথিবীর লোকেরা প্রাথমিকভাবে এই যুদ্ধটিকে ইউরোপিয়ানদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধই মনে করেছিল। মূলত এই যুদ্ধে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া লড়াই করেছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে। আর অন্য জাতিগুলো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে যায়।

মুসলমানদের এই যুদ্ধে কোনো স্বার্থ ছিল না। কিন্তু সিইউপি নেতারা ভাবলেন তারা বাড়তি ফায়দা হাসিল করার জন্য যুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে বিজয়ী পক্ষের সাথে যোগ দিবেন। অন্য সবার মতো সিইউপি নেতারাও ভেবেছিলেন, যুদ্ধটি খুব বেশি সময় স্থায়ী হবে না। হয়তো মাসখানেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কারণ, তত দিনে প্রতিটি ইউরোপিয়ান জাতির কাছেই

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সর্বশেষ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ উন্নত অস্ত্র চলে গেছে। তাই যারা বেশি উন্নত অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে তারাই জিতে যাবে কিংবা কারও যদি অস্ত্র ভান্ডার ফুরিয়ে যায় তাহলেও জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে।

সিইউপি নীতি-নির্ধারকরা ধারণা করেছিলেন, যুদ্ধে জার্মানি জয়ী হবে। কারণ, তৎকালীন সময়ে জার্মানি ছিল সবচেয়ে বড় শিল্প উন্নত দেশ। তাছাড়া ইতঃপূর্বে বিভিন্ন ইস্যুতে তারা বেশ কয়েকবার ফ্রান্সকে ধরাশায়ীও করেছে। আর জার্মানির ভৌগোলিক অবস্থান হলো মধ্য ইউরোপে। তাই তারা যুদ্ধের ময়দানে নিজ ভূখণ্ডের ভেতর দিয়ে খুব সহজেই সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রগুলো পরিবহন করতে পারবে। তা ছাড়া জার্মানির প্রতি সমর্থন করার আরেকটি কারণ ছিল, তুর্কির সাথে রাশিয়া এবং যুক্তরাজ্যের দীর্ঘদিন ধরেই নানা ইস্যুতে টানাপোড়েন ছিল। তাই জার্মানিকে দিয়ে এই দুই শক্তিকে পরাস্ত করার একটি সাধও তুর্কি নেতাদের ভেতরে ছিল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার ৮ মাস পরের ঘটনা। রাশিয়ান সেনারা তখন অটোম্যান সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের কাছাকাছি চলে এসেছে। ঠিক এ রকমই একটি মুহূর্তে সিইউপি নেতারা বহুল আলোচিত ও সমালোচিত ডিপোর্টেশন এ্যাক্ট বা বহিষ্কারাদেশটি প্রণয়ন করে। বাহ্যিকভাবে এই আদেশটি ছিল রাশিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি বসবাসরত আর্মেনিয়ানদেরকে অটোম্যান সাম্রাজ্যের আরও ভেতরের দিকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে, যাতে তারা রাশিয়াকে কোনোভাবে সহায়তা করতে না পারে। আজ অবধি তুরস্ক সব সময়ই দাবি করে, এই আদেশটি সেই সময়ে তাদের নীতিনির্ধারকরা যুদ্ধকৌশলের অংশ হিসেবেই দিয়েছিলেন। তুরস্ক স্বীকার করে, এই আদেশকে কেন্দ্র করে কিছু হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে তারা এটাও দাবি করে, যখন একটি দেশ গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতির মুখে পড়ে যায়, তখন বাধ্য হয়েই সেই দেশের সরকারকে এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

বাস্তবতা সেই সময়ে এমন ছিল যে, যুদ্ধটি অব্যাহত আছে, রাশিয়ানরাও ক্রমশ সাম্রাজ্যের কাছাকাছি চলে আসছে। এই সময়েই কিছু আর্মেনিয়ান নাগরিক রাশিয়ানদেরকে সাহায্য করেছে, আবার আর্মেনিয়ানদের কেউ কেউ কিছু তুর্কি নাগরিককেও হত্যা করেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছিল যে, ১৮৯০ সালে তুর্কি ও আর্মেনিয়ানদের মধ্যে যে ঘৃনার জন্ম হয়েছিল, ১৯১৫ সালে এসে দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার সহিংসতা আসলে সেই ঘৃনাবোধেরই একটি ধারাবাহিকতা। বরং এই সময়ে এসে একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে পুরোপুরি নিধন করার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তুরস্কের বাইরে অনেক ইতিহাসবিদ ও গবেষকই মনে করেন, ১৯১৫ সালে যা ঘটেছিল তা জাতিগত উচ্ছেদ বা নিপীড়নের চেয়েও অনেক বেশি কিছু ছিল। ডিপোর্টেশন এ্যাক্টটি ছিল তালাত পাশা, এনভার পাশা এবং সিইউপির অন্য নীতিনির্ধারকদের একটি গোপন অভিলাষ। যার মাধ্যমে তারা আর্মেনিয়ান জাতিগোষ্ঠীকে শুধু এশিয়া মাইনর অঞ্চল থেকে নয় বরং গোটা পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত করে দিতে চেয়েছিল। আর যাদেরকে তথাকথিত স্থানান্তর করা হয়েছিল প্রকৃতার্থে তাদেরকে পাশবিকভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সেই সময়ে কত মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে অধিকাংশ মতানুযায়ী তা ১০ লাখের কম নয়। তালাত পাশা তুর্কি সাম্রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এই হত্যাকাণ্ডটি পরিচালনা করেছিলেন। তার পুরস্কার হিসেবে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উন্নীত হন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেন।

এই গণহত্যা প্রসঙ্গে তুরস্কের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ তানের আককাম তৎকালীন সিইউপির সাথে সম্পৃক্ত একজন চিকিৎসকের বরাত দিয়ে বলেন, 'আপনার জাতীয়তাবাদের বিষয়টি অন্য সকল ইস্যুর চেয়ে আগে আসবে। পূর্বে যে আর্মেনিয়ানরা ছিল, তারা আমাদের ব্যাপারে এতটাই ক্ষীপ্ত ছিল, তাদেরকে তাদের এলাকায় থাকতে দিতে হলে, সেখানে আর কোনো তুর্কি নাগরিক বসবাস করতে পারত না। একজন মুসলমানও জীবিত থাকত না। তাই সেই সময়ে দুটো পথই খোলা ছিল; হয় আর্মেনিয়ানরা তুর্কিদেরকে নিধন করে দেবে অথবা তাদেরকেই আগে নিধন করতে হবে। তাই তাদের দ্বারা বিলুপ্ত না হয়ে তুর্কিরাই তাদেরকে বিলুপ্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কিন্তু সিইউপি আসলে সে সময় অনেকগুলো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রথমত যুদ্ধটা মোটেও স্বল্পমেয়াদী হয়নি। বড় কোনো একটি বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে, পশ্চিম ইউরোপিয়ানরা লক্ষাধিক সেনার বাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য বেশ দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গ্রহণ করে। তারা বিশাল একটা এলাকার নিচে বোমা পুঁতে রাখে এবং মাটির নিচ দিয়ে বিস্ফোরক তার টেনে নিয়ে যায়। হয়তো এভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়েক ঘণ্টায় অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা যেত। কিন্তু তার মাধ্যমে যুদ্ধে কে জিতেছে বা হেরেছে তা পরিমাপ করা সম্ভব ছিল না।

এই অচলাবস্থা দেখার জন্য ব্রিটিশ নীতিনির্ধারকরা অক্সিস শক্তিকে এশিয়া মাইনর এলাকার ভেতর দিয়ে এসে, পেছন থেকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর এটা করার জন্য তাদেরকে প্রথম যেটা করার দরকার পড়ে তা হলো, অটোম্যানদেরকে দুর্বল করা। সেই মোতাবেক ব্রিটিশ সেনারা গালিপোলি উপদ্বীপে অবতরণ করে। সেখান থেকে এই সেনাদের ইস্তানবুলের দিকে যাওয়ার চিন্তা ছিল। কিন্তু তাদের সেই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং সকল সেনাই নিহত হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইতোমধ্যেই অবশ্য ব্রিটিশরা অটোম্যানদের আরেকটি দুর্বলতা নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। অটোম্যান সাম্রাজ্যের আওতাধীন আরব প্রদেশগুলোতে এরই মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের পক্ষে আন্দোলনকারীরা তুর্কিদের কাছ থেকে আরব দেশগুলোর স্বাধীনতা প্রত্যাশা করে। আরব আদিবাসীদের গোত্রগুলো অটোম্যান সাম্রাজ্যের ব্যাপারে ত্যক্ত বিরক্ত ছিল। অনেক ক্ষমতাবান আরব পরিবারই নিজেদেরকে রাজবংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠারও স্বপ্ন দেখত। আর এসব অসন্তোষের মধ্যেই ব্রিটিশরা বারুদের গন্ধ পেতে শুরু করল।

আরব গোত্রগুলোর মাঝে যারা নিজেদের বংশের নামে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, তাদের মধ্যে দুটো পরিবার ছিল খুবই শক্তিশালী। একটি হলো ইবনে সৌদের পরিবার যারা ওয়াহাবি চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত, আর অন্যটি হলো হাশিমাইত পরিবার। যারা দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের পুন্যভূমি মক্কা শাসন করছিল।

সৌদি-ওয়াহাবি জোটটি তত দিনে মধ্য আরবে একটি বেদুইন রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছিল, যার নেতৃত্বে ছিল ইবনে সাউদের বংশধর মোহাম্মাদ ইবনে সাউদ। এই মোহাম্মাদ বিন সাউদই ধর্মীয় সংস্কারক ইবনে ওয়াহাবের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। কালের পরিক্রমায় এই দুই ব্যক্তির পরিবার আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। সৌদি শায়খই একসময় ওয়াহাবি স্থাপনা ও চিন্তাধারার ধর্মীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। আর সৌদি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ইবনে ওয়াহাবের বংশধরেরাই আলেম সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা সৌদি প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা অটোম্যানদের ওপর আঘাত হানার জন্য সৌদিদের সহায়তা চাইলেন এবং এর বিনিময়ে বিরাট অঙ্কের টাকারও প্রস্তাব দিলেন। ইবনে সৌদ খুব সতর্কতার সাথে সেই প্রস্তাবে রাজি হলেন। কারণ, ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সাথে দীর্ঘ আলাপে তার মনে হয়েছিল, এই যুদ্ধে যদি তারা তুর্কিদের কোনো ক্ষতি করতে পারেন তাহলে হয়তোবা সৌদি অনেক বেশি লাভবান হবে।

অন্যদিকে, হাশিমাইত গোত্রের তৎকালীন প্রধান ছিলেন, হুসাইন ইবনে আলি। তিনি ছিলেন সেই সময়ে কাবা শরিফের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। তার উপাধি ছিল 'শরিফ'। কারণ, এর মাধ্যমে তিনি বুঝাতেন যে তিনি আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজ গোত্র বনু হাশিমের একজন বংশধর। এখানে মনে রাখা দরকার, নবম শতকে আব্বাসীয়কে যারা ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিলেন তারাও নিজেদেরকে হাশিমাইত বলেই দাবি করত।

যাক আবার ফিরে আসি শরিফ হুসাইনের কথায়। তিনি মক্কায় দায়িত্বে নিযুক্ত থাকলেও এতটুকু দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তিনি মেসোপোটামিয়া থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিশাল এক আরব সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে ব্রিটিশরা তার এই স্বপ্নপূরণে সহায়তা করতে পারে। আর ব্রিটিশরাও তাকে এমন আশ্বাসই দিয়েছিল। তারা শরিফ হুসাইনের সাথে কাজ করার জন্য তাদের একজন চৌকষ সামরিক গোয়েন্দাকে প্রেরণ করে। তার নাম কর্নেল থমাস এডওয়ার্ড লরেন্স। এই ব্রিটিশ গোয়েন্দা খুবই ভালো আরবি বলতে পারতেন। আর তিনি আরব বেদুইনদের পোশাক পড়তেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। সে কারণেই তাকে উপাধি দেয়া হয় 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া।'

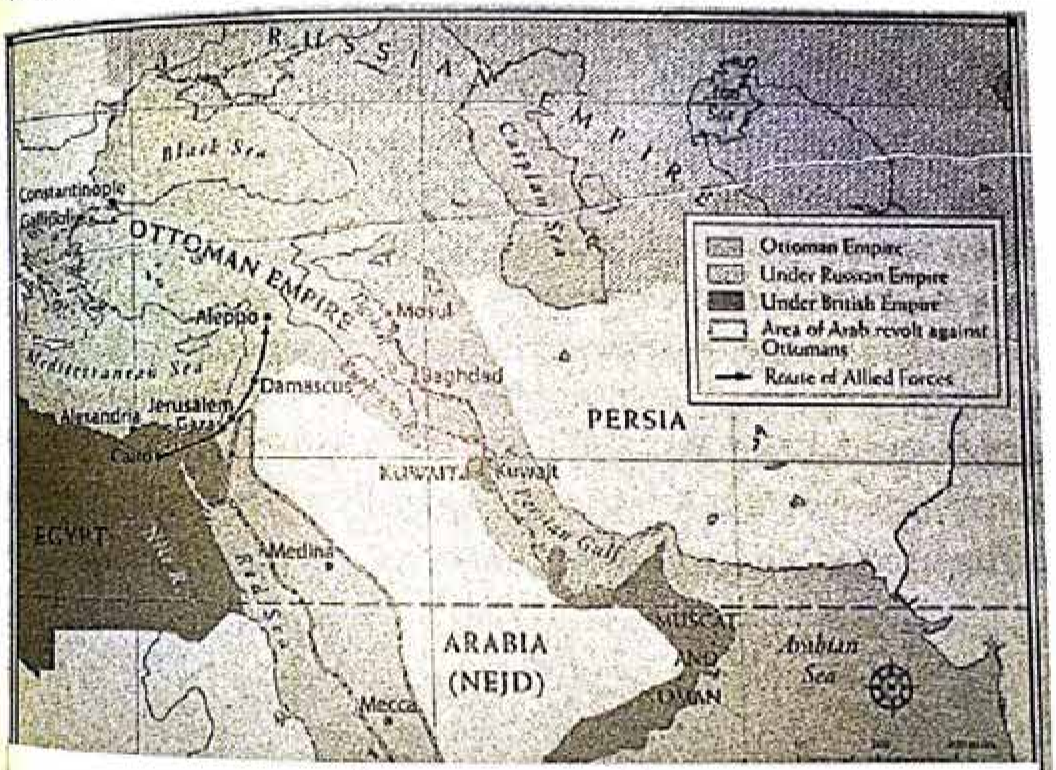

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং আরবদের বিদ্রোহ

পেছনের ইতিহাস জানা থাকলে এটা সহজেই বুঝা যায়, ব্রিটিশরা আরব অঞ্চলকে নিয়ে কী গভীর চাল চেলেছিল। হাশিমাইত আর সৌদিরা ছিল আরব্য উপদ্বীপের সবচেয়ে শক্তিশালী দুই গোত্র। তারা উভয়েই আরব অঞ্চলে অটোম্যানদের প্রভাবমুক্ত করার প্রত্যাশায় ব্রিটিশদেরকে সহযোগিতা করছিল। আবার একই সঙ্গে এই দুই গোত্রের মধ্যে এমনভাবে প্রতিহিংসার বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হলো, এরা উভয়ের চিরস্থায়ী শত্রুতেও পরিণত হলো। ব্রিটিশরা এই উভয় আরব গোত্রের কাছেই গোয়েন্দা পাঠিয়েছিল এবং উভয় পরিবারের কাছে তাদের পছন্দমতো কিছু ওয়াদা করেছিল। আর উভয় গোত্রের সামনেই একই আরব ভূখণ্ডকে মূলার মতো ঝুলিয়ে, তাদেরকে অটোম্যানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আরব অঞ্চলকে কে শাসন করবে তা নিয়ে ব্রিটিশদের কোনো মাথাব্যথাই ছিল না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তারা কেবলই চাইছিল, অনতিবিলম্বে অটোম্যানদেরকে দুর্বল করতে। যাতে করে তারা ইউরোপিয়ান গ্রেট ওয়ারে জার্মানিকে স্বাচ্ছন্দ্যে পরাজিত করতে পারে।

একটা সময়ে গিয়ে হাশিমাইতরা ব্রিটিশদেরকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হলো। তারা আরব অঞ্চলে অটোম্যানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা করল। শরিফ হুসাইনের দুইজন ছেলে সরাসরি ব্রিটিশ গোয়েন্দা লরেন্সের সাথে কাজ করতে শুরু করে। যাতে করে আরব থেকে তুর্কিদেরকে চিরতরে বের করে দেয়া যায় এবং ব্রিটিশরা সহজে বাগদাদ ও দামেস্কে প্রবেশ করতে পারে। কারণ, এই দুই শহরে ব্রিটিশরা যদি নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে পারে, তাহলে সেখান থেকে তারা সহজেই অটোম্যানদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে।

যে মুহূর্তে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা দুই প্রভাবশালী আরব গোত্রকে নানা ধরনের প্রতিজ্ঞা করে তাদের কব্জায় নেয়ার চেষ্টা করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই মার্ক সাইকস এবং ফ্রাঙ্কয়েস জর্জ পিকট নামের দুজন ইউরোপীয় কূটনৈতিক, নীরবে একটি ম্যাপ আর পেন্সিল নিয়ে রাত দিন কাজ করে যাচ্ছিলেন। তারা নির্ধারণ করতে চাইছিলেন, গ্রেটওয়ার শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিজয়ী পক্ষ এই বিশাল অঞ্চলটি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ বা শাসন করবেন। এত বড় অঞ্চলটি মিত্রবাহিনীর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কীভাবে ভাগ করে দেয়া যাবে, সেটা নিয়েও তারা আলোচনা করছিলেন। অর্থাৎ কোন অংশটি ব্রিটিশ, কোনটা ফ্রান্স আর কোন অংশের দায়িত্ব রাশিয়া গ্রহণ করবে, সেটাও তারা ফায়সালা করার চেষ্টা করেন।

এশিয়া মাইনর চুক্তি

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অটোম্যান সাম্রাজ্যভুক্ত আরব প্রদেশগুলোর সংকটটি আরও ঘনীভূত হয়, যখন আরব জাতীয়তাবাদের ধাক্কা ফিলিস্তিন এবং মিসরসহ অন্যান্য আরব বসতিপূর্ণ এলাকায়ও লাগে। এখানে অবশ্য হাশিমাইত বা সৌদিদের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। এ অঞ্চলগুলোতে জাতীয়তাবাদের এই আন্দোলনটি শুরু করে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকমনস্করা। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শহুরে আমলাসহ অনেকেই ছিল। এই মানুষগুলোর উপর সংবিধানতন্ত্র এবং শিল্পায়নের প্রভাবও প্রকটভাবে পড়েছিল। বিশেষ করে ফিলিস্তিন ও সিরিয়াতে আন্দোলনরত এই আরব জাতীয়তাবাদীরা শুধু যে অটোম্যান এবং ইউরোপিয়ানদের কাছ থেকে স্বাধীনতা চেয়েছিল তাও নয়, তারা হাশিমাইত ও সৌদি গোত্রদের হাত থেকেও মুক্তি চেয়েছিল।

সমস্যা আরও একটা ছিল। হয়তো সেটাই সবচেয়ে প্রকট। যদিও সময়মতো অনেকেই তা বুঝতে পারেনি। তা হলো ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের অভিবাসন। ইউরোপিয়ান কিছু দেশের প্রবল ইহুদি বিদ্বেষের প্রতিরোধ করতে গিয়ে, একটা সময়ে ইহুদিবাদ বা ইহুদি রাষ্ট্রতন্ত্রবাদের জন্ম হয়। সমস্ত ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের মধ্যে এ সময়টায়, ইহুদিবাদ চিন্তাধারাটি বিকশিত হতে শুরু করে। আর তারই ফলে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের অভিবাসনের হারও অনেকটাই বেড়ে যায়। ১৮৮৩ সালে যেখানে ফিলিস্তিনে ইহুদি জনসংখ্যার হার ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। সেখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ দিয়ে মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ ইহুদি হিসেবে আবির্ভূত হয়। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন ফিলিস্তিনে ইহুদির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ।

সেই সময়ে এই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সরাসরি অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন, লর্ড লিওনেল রথসচাইল্ড নামক একজন ব্রিটিশ ব্যাংকার। তিনি ছিলেন ইহুদিবাদের কট্টর সমর্থক। ১৯১৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বালফোর এই লর্ড রথসচাইল্ডকে একটি চিঠি লেখেন। সেখানে তিনি জানান, ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদিদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তাকে সমর্থন করে। আর এই স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যত ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন, ব্রিটিশ সরকার তাও করতে প্রস্তুত বলে, সেই চিঠিতে জানানো হয়। বালফোর সেই চিঠিতে আরও বলেন, তাই বলে এমন কিছুও করা যাবে না, যাতে করে ফিলিস্তিনে বসবাসরত ইহুদি ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মাবলম্বীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু কীভাবে আরব জাতীয়তাবাদীরা এবং ইহুদিরা এই ভূখণ্ডে একই সাথে বসবাস করবে, সেই বিষয়ে ব্রিটিশ কোনো পরিকল্পনার কথা বালফোর উক্ত চিঠিতে খোলাসা করেননি।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এক কথায় সে সময়ের গোটা পরিস্থিতিটি যদি আবারও সামনে তুলে ধরতে চাই, তাহলে এভাবে বলা যায়, ব্রিটিশরা আসলে একই ভূখণ্ড হাশিমাইত, সৌদি, ইউরোপের ইহুদি শ্রেণিসহ অনেকের কাছেই বিক্রি করেছে বা আদায় করে দেবে বলে দাবি করেছে। অথচ সেই সময়ে এ ভূখণ্ডে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থানও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু সেই উত্থানকে গুরুত্ব না দিয়ে ব্রিটিশ নীতিনির্ধারকরা তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনেকের সাথে একই ধরনের খেলায় লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এসব ঘটনার আড়ালে তারা ফ্রান্সের সাথে আপোষে এই ভূখণ্ডটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করার প্রক্রিয়াতেও অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ভবিষ্যতের সবচেয়ে ভালো দিক হলো, ভবিষ্যৎ না এলে কেউই তা জানতে পারে না, আসলে কি হতে যাচ্ছে। তৎকালীন সময়ের বর্তমান পরিস্থিতিটি এমন ছিল যে, একটি যুদ্ধ চলছে এবং সেই যুদ্ধের অংশ হিসেবেই ফ্রান্স ও ব্রিটেন স্বল্পমেয়াদে বেশ ভালো পরিমাণ সফলতাও অর্জন করেছে। তখনো, এশিয়া মাইনর অঞ্চলের বাইরে অটোম্যান সাম্রাজ্যের যতটুকু যা নিয়ন্ত্রণে ছিল সিইউপির কারণে শেষমেশ তাও হারাতে হলো। অটোম্যানরা একটা পর্যায়ে এসে ব্রিটিশের হাতে ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং মেসোপোটামিয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।

অন্যদিকে, গ্রেট ওয়ারটি ইউরোপিয়ান জাতিগোষ্ঠীর জন্যও ক্রমশ যেন একটা দুঃসময়ে পরিণত হতে লাগল; ১৯১৮ সালে নিঃশর্তভাবে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। যেহেতু সিইউপির তিন পাশা যুদ্ধে জার্মানিকে সমর্থন দিয়েছিল, তাই জার্মানি হেরে যাওয়ায় তারা বিরাট সংকটে পড়ে গেলেন। তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তালাত পাশা, এনভার পাশা এবং জেমেল পাশা ইস্তাম্বুল থেকে পালিয়ে গেলেন। তালাত চলে গেলেন বার্লিনে। ১৯২১ সালে আর্মেনিয়ানরা সেখানেই তাকে হত্যা করে। জেমেল চলে যান জর্জিয়াতে কিন্তু সেখানেও আর্মেনিয়ানরাই তাকে হত্যা করে। আর সেটা তালাত হত্যার এক বছর পর ১৯২২ সালে। অন্যদিকে, এনভার চলে যান মধ্য এশিয়ায়। সেখানে গিয়ে তিনি বলসেভিকদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেন। সেখানেই আর্মেনিয়ান বলসেভিকদের একটি সেনাদল তাকে ১৯২২ সালে হত্যা করে।

এভাবেই কমিটি ফর ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস বা সিইউপি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। সিইউপি সরকার যে বাজে ছিল সেটা সবাই জানত। কিন্তু সিইউপি পতনের ফলে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি হয় তা হলো, একসময়ের দুর্দান্ত প্রতাপশালী অটোম্যান সাম্রাজ্যে শেষঅবধি সরকার বলতে আর তেমন কিছুই থাকল না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১৫. ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকপন্থীদের উত্থান
(১৩৩৬-১৩৫৭ হিজরি) ১৯১৮-১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ

১৯১৯ সালের দিকে এসে দেখা গেল, এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ফরাসি ও ইটালিয়ান সেনারা দিব্যি বিচরন করছে। অন্যদিকে বৃহৎ একটি গ্রিস রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রিক জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে গ্রিক সেনারাও, অটোম্যান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রবেশ করেছে। ইস্তাম্বুল শহরটিও ব্রিটিশ সেনারা দখল করে নিয়েছে। এই অবস্থায় গোটা আনাতোলিয়াতে ঔপনিবেশ বিরোধী এক ধরনের প্রতিরোধ আন্দোলন জেগে ওঠল। একজন ব্যক্তি এই নব্য চেতনার উত্থানের পেছনে মূল কারিগর হিসেবে কাজ করেছিলেন। তার নাম মুস্তাফা কামাল। পরবর্তী সময়ে তিনি আতাতুর্ক বা তুর্কিদের পিতা হিসেবে আখ্যায়িত হন। তার বাহিনী তুরস্ক থেকে সকল বিদেশি সেনাদেরকে বিতাড়িত করে এবং ১৯২৩ সালে এসে তুরস্ক নামের নতুন একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দেন।

তুরস্কের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে অটোম্যান সাম্রাজ্য যে আবারও ফিরে এল, তা কিন্তু নয়। বরং আতাতুর্ক অটোম্যানদের অতীত ইতিহাস ও গোটা সাম্রাজ্য কাঠামোকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান এবং অস্বীকার করেন। তিনি এশিয়া মাইনরের বাইরে আর কোনো ভূখণ্ডকে নিজের দেশের অংশ হিসেবে দাবি করেননি। কারণ, তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন, তিনি যে চেতনার ভিত্তিতে জাতিটি গড়ার কথা ভাবছেন তা কেবল এশিয়া মাইনরের অধিভুক্ত ভূখণ্ড দিয়েই সম্ভব। আর সেই কারণেই তুরস্ক বলতে নতুন যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা হলো, তার সীমানার ভেতরে থাকা অধিকাংশ মানুষই জাতিগতভাবে তুর্কি ছিল। আর তাদের ভাষাও ছিল তার্কিস। আতাতুর্ক প্রতিষ্ঠিত নতুন এই দেশটির সব ধরনের রাষ্ট্রীয় নীতিমালা থেকে ইসলামকে হটিয়ে দিয়ে, অন্য সব ধর্মের মতোই ইসলামকেও সাধারণ একটি ধর্মের মর্যাদা দেয়া হলো।

www.islamicboipdf.blogspot.com
www.islamicboipdf.blogspot.com

সেই কারণে তুরস্কই হলো বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম কোনো বড় দেশ, যারা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে দাবি করে এবং ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা রাখার সিদ্ধান্তকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। ইসলামকে অবনমিত করায় যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো, তার ফলে জাতিকে একত্রিত রাখার জন্য আতাতুর্ক নতুন একটি আদর্শিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করলেন। যার মাধ্যমে মূলত ৬টি ভিন্ন মতবাদকে ধারণ করা হয়। এগুলো হলোঃ জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সংস্কারবাদ, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ, জনপ্রিয়তাবাদ এবং প্রজাতন্ত্রবাদ। তুর্কিরা আতাতুর্কের এই নতুন চিন্তাধারাকে 'কোমালিজম' বলে অভিহিত করে। আর এই নব্য চিন্তাধারার অনেক কিছুই বিশেষ করে প্রথম চারটি মতবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মুসলিম দেশগুলোতে প্রকট হতে শুরু করে।

আতাতুর্কের যে জাতীয়তাবাদ তা তার পূর্বসূরি কমিটি ফর ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস বা সিইউপির জাতীয়তাবাদের চেয়ে খুব যে আলাদা ছিল তা নয়। কারণ, তাদের উভয়ের উত্থানের পেছনেই নেপথ্যের কারিগর ছিল 'যুব তুর্কিরা'। তবে এই তুর্কি যুবদের যে আন্দোলনটি সে সময়ে শুরু হয়েছিল, তা একটা পর্যায়ে জাতিকে উদার সংবিধানিকতাবাদ থেকে ক্রমশ ফ্যাসিবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। যা আমরা ইতঃপূর্বে তালাত পাশাদের ক্ষেত্রেও দেখেছি। তবে আতাতুর্ক তাদের তুলনায় অনেকটাই উদার ছিলেন। তিনি মূলত জাতীয়তাবাদের একটা সংস্কৃতি চালু করতে সক্ষম হন।

জাতীয়তাবাদের সংস্কৃতি চালুর অংশ হিসেবেই আতাতুর্ক তার দেশে অসংখ্য ভাষার অস্তিত্বকে প্রত্যাখান করেন এবং একটি ভাষাকেই সর্বত্র চালু করার ঘোষণা দেন। আর তা হলো তার্কিস ভাষা। পূর্বের অটোম্যান সাম্রাজ্যে তার্কিস ভাষার অনেকগুলো আঞ্চলিক রূপও ছিল। আতাতুর্ক সেগুলোকে বাদ দিয়ে ভাষার একটি মাত্র কাঠামোকেই স্বীকৃতি দেন। সে ক্ষেত্রে তিনি আগের দিনের রাজ দরবারে ব্যবহৃত তুর্কি ভাষার সাহিত্যিক রূপকে গ্রহণ না করে, বরং আম জনতার সাধারণ কথ্য ভাষাকেই বেছে নেন। তখন তার অনেক সঙ্গীরাই তুর্কি ভাষায় প্রবেশ করা বিভিন্ন বিদেশি শব্দকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। তবে আতাতুর্ক সেই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তুর্কি হলো সকল ভাষার উৎস। তাই অন্য ভাষা থেকে যেসব শব্দ তুর্কি ভাষায় এসেছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তার প্রকৃত ঠিকানাতেই ফিরে এসেছে। আতাতুর্কের আগ পর্যন্ত তুর্কি ভাষাটি আরবি অক্ষরেই লেখা হতো। আতাতুর্ক এসে তা বাতিল করেন এবং ল্যাটিন বর্ণমালায় তুর্কি ভাষা লেখার সিদ্ধান্ত জারি করেন।

আতাতুর্ক নিজেকে কখনো রাজা বা সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেননি। তিনি নতুন একটি সংবিধান রচনা করেন, পার্লামেন্ট কার্যকর করেন এবং তুরস্কে প্রজাতন্ত্রী

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ধরনের সরকার চালু করে নিজেকে তার প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। আতাতুর্ক যে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করেছিলেন তা আজ অবধি বিদ্যমান রয়েছে। তবে একটা কথা এখানে খোলাসা করা দরকার, যতই তিনি গণতন্ত্র চালু করেন না কেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আতাতুর্ক যত দিন জীবিত ছিলেন আর কোনো নেতা ব্যালট বক্সের মাধ্যমে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ, তিনি নিজেকে তুর্কিদের পিতা হিসেবে আবির্ভূত করেছিলেন। জন্য কেউ যে জাতির পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এমন কোন অবস্থা সেখানে ছিল না। তা ছাড়া আতাতুর্কের শাসন প্রক্রিয়াটিও ছিল ভিন্নরকম। তিনি কখনোই সামরিক স্বৈরশাসক হিসেবে আবির্ভূত হননি। তার শাসনকে সামরিক জান্তাও বলা যাবে না। তবে আতাতুর্ক সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করেই ক্ষমতায় এসেছিলেন। তিনি সর্বত্র শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তার জাতির সামনে তিনি এই ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন যে, তিনি যতটুকু কঠোর হচ্ছেন তা দেশের জন্যই, জনগণকে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে রাখার জন্যই।

তার মূল লক্ষ্য আসলে কি ছিল? তার মূল লক্ষ্য যা পরবর্তী সময়ে আরও পরিষ্কার হয়েছে তা হলো, তিনি তুরস্কে আলেমদের ক্ষমতাকে কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। সামাজিক জীবনের সকল পর্যায় থেকে ইসলামকে সরিয়ে সমাজ পরিচালনায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমারা তার এসব কার্যক্রমের জন্য তাকে উদারমনা হিসেবে আখ্যায়িত করলেও, ইসলামপন্থীরা তাকে বরারবই ইসলামবিদ্বেষী একজন উগ্র ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবেই চিত্রায়িত করে।

তার প্রথম মৌলিক কাজটি হল, তিনি বাহিরের জগতকে মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। পরবর্তীকালে তিনি কিছু আইনও প্রণয়ন করেন, যার ফলে মহিলারা ভোট দেয়ার অধিকার পায়, সরকারি চাকরি করার সুযোগ পায় এবং সম্পত্তির মালিকানারও কর্তৃত্ব অর্জন করে। তিনি বহু বিবাহকে রোধ করেন এবং যৌতুককে নিরুৎসাহিত করেন। প্রথাগত বিয়ে পদ্ধতির ব্যাপারে তার সীমাবদ্ধতা ছিল। আর সে কারণেই তিনি তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ সম্বলিত একটি নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করেন। যার ভিত্তি কখনোই কুরআন ও হাদিস ছিল না। বরং সুইস সিভিল কোডের আদলেই তিনি এই নয়া আইনগুলো জারি করেন।

আতাতুর্ক একই সঙ্গে নেকাব ও মাথার স্কার্ফ পরিধান করাকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি নারী ও পুরুষের পোশাককে রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারণ করে দেন। পুরুষদের মাথায় ফেজটুপি পরাটাকেও নিষিদ্ধ করেন। পাগড়ি পড়া এবং দাড়ি রাখাকে ভীষণভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। তবে পশ্চিমাদের মতো ডার্বি টুপি বা বেসবল টুপি পড়াকে অনুমোদন করা হয়। আতাতুর্ক নিজে কোর্ট প্যান্ট পড়তেন এবং তার সহযাত্রীদেরও তিনি এই পোশাকটাই পরিধান করার জন্য উৎসাহ দিতেন।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ধর্মীয় নেতারা বেশ বড় আঘাত পেলেন যখন তারা দেখলেন যে, আতাতুর্ক ক্ষমতায় এসে বলরুমে ড্যান্স পার্টিকে রাষ্ট্রীয় বিনোদন হিসেবে চালু করলেন। কিন্তু তাদের করার কিছুই ছিল না। আতাতুর্ক নিজের দায়িত্ব ও কাজটা খুব ভালো বুঝতেন এবং অত্যন্ত সুচারুভাবে তা সম্পন্ন করারও চেষ্টা করতেন। তিনি যখন সকল উন্মুক্ত স্থানে কুরআনকে আরবি ভাষায় না পড়ে তুর্কি ভাষায় পড়ার আইনটি প্রণয়ন করলেন, তখন সংসদ তাকে একচেটিয়াভাবে সমর্থন দিল। ঠিক একইভাবে যখন তিনি সরকারি সাপ্তাহিক ছুটির দিনটিকে শুক্রবারের বদলে রোববার করার প্রস্তাব দিলেন, তখনো সংসদ তাকে সমর্থন দিল। পার্লামেন্টের এমন আশকারা পেয়ে আতাতুর্ক আরও জোরে শোরে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার কাজে নেমে পড়লেন। তিনি ধর্মীয় স্কুল ও মাদ্‌রাসাগুলো ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে দিলেন। সুফি কার্যক্রমকে স্থগিত করলেন। ওয়াকফ প্রথাকে বিলুপ্ত করলেন এবং রাষ্ট্রের কাঠামোর আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম শুরু করলেন। ১৯২৫ সালে গিয়ে আতাতুর্ক তার ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের পক্ষে চূড়ান্ত আঘাতটি হানলেন। কারণ, সেই বছরই তিনি খেলাফত প্রথাকে মৃত বা বিলুপ্ত বলে ঘোষণা দেন।

যদিও খেলাফতের অবসানের ঘটনাটি তখন তেমন একটা বড় সংবাদ ছিল না। কারণ, বিগত কয়েকটি শতাব্দী ধরে খেলাফতটি আর সেভাবে কাজও করছিল না। কিন্তু এরপরও ইস্তাম্বুল ও ইন্দুসের কিছু এলাকায় সাধারণ মানুষের মনে খেলাফতটি তখনো একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেছিল। কারণ, খেলাফতের কারণেই তারা নিজেদেরকে সার্বজনীন সম্প্রদায় বা উম্মত হিসেবে ভাবার অবকাশ পেত। মুসলমানদের খেলাফত চেতনার মতো পশ্চিমেও আদি রোমান সাম্রাজ্যের চেতনা অনেক দিন ধরেই বিদ্যমান ছিল। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তা বিলীন হতে শুরু করে। এরপর আসলে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের মোড়কে কিছুদিন রোমান সাম্রাজ্যটি বিরাজ করেছিল। এর আগে বিগত কয়েক শতাব্দী রোমান সাম্রাজ্যটি অকার্যকর থাকলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়। ঠিক একই ব্যাপার ঘটল খেলাফত নিয়েও। আতাতুর্ক খেলাফতকে যখন বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন, তখন বাস্তবিত অর্থে সামান্য একটি বায়বীয় ধারণা ও চেতনা ছাড়া খেলাফতের আর কোনো কাঠামোই অবশিষ্ট ছিল না।

কিছু মানুষ বিশেষ করে মৌলিক চেতনার কিছু মানুষকে তখনো খেলাফতীয় চিন্তাধারা আলোড়িত করত। কিন্তু তাদের কথা কেই বা শোনে? তারা তো আর ক্ষমতায় ছিল না। ইতিহাসে বরং দেখা যায়, পরবর্তী ৫০ বছর আতাতুর্কই মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র সফল নেতা হিসেবে টিকে থাকতে পেরেছিলেন। ইরানে অবশ্য আরেক ধরনের পরিস্থিতি ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইরানের সর্বশেষ কাজার সম্রাট মারাত্মকভাবে 'জঙ্গল বিপ্লবের' মুখে পড়েন। জঙ্গল বিপ্লব

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বলতে বুঝায় একটি গেরিলা আন্দোলন, যার সূচনা করেছিলেন সাইয়্যেদ জামালউদ্দিন আফগানি। কাজার সম্রাটের সেনাবাহিনী তখন দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একটি অংশকে নিয়ন্ত্রণ করত সুইডিশ কর্মকর্তারা আর আরেকটিকে রাশিয়ানরা। কাজার সম্রাট অবশ্য বুঝতে পারেননি যে, তার জন্য আসল হুমকি সেই জঙ্গল বিপ্লবীরা নয় বরং তার দেশে গেড়ে বসা বিদেশি শক্তিরাই। যখন বলসেভিকরা জঙ্গল বিপ্লবীদের সাথে হাত মিলায় তখন ব্রিটিশরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তখন লেনিন মাত্র রাশিয়ার ক্ষমতায় বসেছেন, আর ব্রিটিশরা কোনো ভাবেই চাইছিল না লেনিন বা তার চিন্তাদর্শন বেশি দূর ছড়িয়ে পড়ুক। ব্রিটিশরা মনে করল, কাজার সম্রাটকে দিয়ে আসলে বলসেভিকদের দমন করা যাবে না। তাই তারা একদল ইরানি সেনাকর্মকর্তাদেরকে উস্কে দিয়ে কাজার সম্রাটকে উৎখাত করল।

ইরানি এসব সেনাকর্মকর্তাদের মূল ছিলেন রেজা পাহলভী। তিনি মানসিকতায় ছিলেন আতাতুর্কের মতোই ধর্মনিরপেক্ষ। পার্থক্য এটাই যে, রেজা পাহলভী গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। ১৯২৫ সালে কর্নেল রেজা পাহলভী নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দেন। তখন তার নাম হয় রেজা শাহ পাহলভী। তার হাত দিয়েই ইরানে নতুন এক রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। ক্ষমতায় বসেই তিনি আতাতুর্কের মতো একই স্টাইলে হুকুম জারি করতে শুরু করেন। আতাতুর্কের মতো তিনিও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে বাধ্যতামূলক নির্দেশনা জারি করেন। তিনি সাধারণ নাগরিকদের জন্য মাথায় স্কার্ফ, নেকাব, পাগড়ি ও দাড়ি রাখাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তবে ধর্মীয় নেতারা পাগড়ি পরার অনুমতি পেলেও শর্ত হলো, তাদেরকে এমন সার্টিফিকেট নিতে হবে, যেখানে ধর্মীয় নেতা হিসেবে তার স্বীকৃতি থাকবে। আর এই সার্টিফিকেট ছাড়া যদি কাউকে পাগড়ি পড়তে দেখা যায় বা মুখে দাড়ি দেখা যায়, তাহলে তাকে প্রকাশ্যে গণপিটুনি ও কারাদণ্ড দেয়ারও বিধান প্রণয়ন করা হয়।

একই ধরনের ঘটনা ঘটে আফগানিস্তানেও। সেখানে আমানুল্লাহ নামের এক যুবক ১৯১৯ সালে ক্ষমতায় আরোহন করেন। যুব তুর্কিদের ভক্ত এই আমানুল্লাহও আফগানিস্তানে একটি উদার সংবিধান প্রণয়ন করেন। তিনি নারীদেরকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। দেশব্যাপী ধর্মনিরপেক্ষ স্কুল চালু করেন এবং রাষ্ট্রীয় পোশাক চালু করেন। একই সঙ্গে সব ধরনের নেকাব, দাড়ি ও পাগড়িকে নিষিদ্ধ করেন।

এই ড্রেসকোড নীতিমালার ব্যাপারে যা আমার কাছে খুবই অবাক লেগেছে তা হলো, আতাতুর্কের এসব ঘটনার প্রায় ৫০ বছর পরে যখন ইরান ও আফগানিস্তানে কট্টর ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় এসেছে, তারাও ঠিক একইভাবে পোশাকের ব্যাপারটি চাপিয়ে দিয়েছিল। পোশাকের ধরনটি হয়তো পুরোই

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

বিপরীত ছিল, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেকটা একই ছিল। যেমন নারীদেরকে জোর করে মাথায় স্কার্ফ পরানো হতো বা কোনো পুরুষের মুখে দাড়ি না থাকলে তাকে জনসম্মুখে পেটানো হতো। বাস্তবতা এটাই যে, পোশাক পরিধান বা মুখের দাড়ির মতো বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আতাতুর্ক বা সাম্প্রতিক অতীতের এই কট্টর ইসলামপন্থীরা- উভয়েই শারীরিকভাবে আঘাত করা বা কারাগারে পাঠানোর মতো কঠোর নীতিমালাই অনুসরণ করেছে।

একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায়, ইস্তাম্বুল থেকে শুরু করে হিন্দুকুশ পর্যন্ত যে তিনজন শাসক ছিলেন, তারা সকলেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাষ্ট্রীয় শক্তি ও প্রভাবকে ব্যবহার করেন। দার-আল-ইসলামে এরপরও যতটুকু এলাকা অবশিষ্ট ছিল তখনো সেখানে রাজতন্ত্র থাকলেও, স্বাধীনতা আন্দোলনও ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠছিল। এই স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোর পেছনেও সেই ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকমনস্করাই ছিল। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতা আন্দোলনটি শুরু হয়েছিল তার পেছনেও ছিলেন, ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন অ্যার্টনি। তার নাম মোহাম্মাদ আলি জিন্নাহ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ১৯২০ সালের দিকে এসে গোটা মুসলিম বিশ্বেই ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনটি বেশ শক্তিশালী অবস্থানে পৌছে যায়। নতুন এই রাজনীতির টানাপোড়েনে অনেক সমাজ ভেঙে পড়ে। আবার নতুন করে অনেক সমাজ বিনির্মাণও হয়। যদিও এখানে আমি আন্দোলনটাকে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকমনা একটি আন্দোলন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছি, তথাপি বাস্তবতা হলো, ধর্মনিরপেক্ষ-আধুনিক-জাতীয়তাবাদী-উন্নয়নশীল ইত্যাদি অজস্র চেতনা এর মাঝে এমনভাবে মিলেমিশে আছে যে, আলাদা করে শুধু ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করলে পুরো চিত্রটাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা যায় না। তবে এতটুকু বলা যায়, ইতঃপূর্বে আলিগড়ের সৈয়দ আহমদ, ইরানের আমির কবির, ইস্তানবুলের তুর্কি যুবকেরা এবং বিগত এক শতাব্দীতে মধ্যপৃথিবীতে জন্ম নেয়া অসংখ্য বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত মহল, পেশাজীবী, লেখক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসা সম্ভাবনাময় অনেকগুলো প্রজন্ম যে চেতনা ধারণ করছিল, তারই একটি বিকশিত রূপ হলো ২০ শতকের গোড়ার দিকের এই ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকপন্থী আন্দোলন। হঠাৎ করেই যেন মুসলিম জাতিগুলো আবিষ্কার করে, তারা পশ্চিমের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে আছে। আর এইক্ষেত্রে সমাধান একটাই তা হলো, গণতন্ত্রের অবয়বে উন্নয়নের শ্লোগান দেয়া এবং যতটা সম্ভব দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

পরিস্থিতি যখন এমন ছিল ঠিক সেই সময়ে, আফগানিস্তানে ও ইরানের শাসকেরা নাগরিকদের উপর আবারও চড়াও হতে শুরু করে। তবে তারা তা করে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্রগতিশীলতার মোড়কে। এই দুই দেশের রাজতন্ত্রই রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, কলকারখানা ও হাসপাতাল স্থাপন এবং অফিস আদালত ও দালান কোঠা নির্মাণ শুরু করে। উভয় দেশই বিমান পরিবহন প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত দৈনিক পত্রিকা এবং রেডিও স্টেশনও চালু করে। একই সঙ্গে এই দুই দেশেই ধর্মনিরপেক্ষ স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ইরানে আগে থেকেই একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এবার আফগানিস্তানেও একটি নির্মিত হয়। উভয় দেশের সরকারগণ নারীকে মুক্ত করার এবং তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সুযোগ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উভয় দেশই হঠাৎ করে পশ্চিমা ঢংয়ে বিকশিত হওয়ার চেষ্টা শুরু করে। তারা মানুষকে শুধু স্বাধীনতা নয় বরং উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে।

এটা বলা খুব একটা অন্যায় হবে না যে, এই সময়ে এসে ইসলামের বয়ানে ইতিহাসকে পাওয়ার সুযোগটা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, পশ্চিমারা মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে, সমাজের ভেতরে নানা ধরনের সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যেকোনো আধ্যাত্মিকতার সংকটকে পশ্চিমা চেতনার মাধ্যমেই নিরসন করার কথা বলে। যদিও মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের কেউ কেউ তখনো নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করতেন, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তাদের মধ্যে ইসলামিক চেতনার ছিটেফোঁটাও ছিল না। তারা মূলত পশ্চিমাদের হাতের নাগালে যেয়ে, পশ্চিমা চেতনাগুলোই বাস্তবায়ন করতেন। এসব নীতি-নির্ধারকরা মূলত পশ্চিমা আবহ মেনে চলার মাধ্যমেই জাতে উঠার চেষ্টা করতেন। একই সঙ্গে তারা যে সব কাজ করতেন, সেগুলোকে পশ্চিমা কাঠামোর আলোকেই বৈধতা দেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতেন।

এমনটা নয় যে, যারা এভাবে পশ্চিমা মডেল অনুসরণ করে দেশ চালাচ্ছিলেন তাদের একেবারেই জনপ্রিয়তা ছিল না। বরং বেশ ভালোই জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। কারণ, মধ্যপৃথিবীর পরিস্থিতিটি সে সময়ে এমন ছিল যে, ঐতিহ্যবাহী ও মৌলিক চেতনাসমৃদ্ধ ইসলাম তখন অনেকটাই কোণঠাসা। শিক্ষিত প্রজন্ম মুসলিম আলেমদেরকে ভালো চোখে দেখত না। অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে শুরু করল, বিগত অনেক শতাব্দী ধরে যদিও আলেম ওলামারাই দার-আল-ইসলামকে পরিচালনা করেছেন, কিন্তু তাদের অর্জনটা কী? তারা তো একটি গাড়ি বা একটি উড়োজাহাজও নির্মাণ করতে পারেননি। অথচ পশ্চিমারা একই সময়ে কতটা এগিয়ে গেছে। আলেম ওলামাদের এসব ব্যর্থতার কারণেই মানুষ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তদস্থলে সম্ভাবনাময় শক্তির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর এতে করেই ভবিষ্যতের বর্ণিল সময়টা ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকতাবাদীদের হাতেই চলে আসে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তবে ১৯ শতকে মুসলিম দেশগুলোতে শুধু যে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকমনা আন্দোলনটি একমাত্র সংস্কার আন্দোলন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, তা কিন্তু নয়। আরও কিছু চেতনাসমৃদ্ধ আন্দোলনও একই সাথে অব্যাহত ছিল। যেমন আরব উপদ্বীপে তখনো ওয়াহাবিদেরই আধিপত্য ছিল। শুধু আধিপত্যই নয় তারা সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও অধিগ্রহণ করে নেয়। আরব্য এলাকার বাইরে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে এই ওয়াহাবিরা খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। তবে তারা গ্রামাঞ্চলের মসজিদগুলোতে এবং স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়।

এই দরিদ্র ও কম শিক্ষিত শ্রেণির মানুষগুলো ওয়াহাবিদের চিন্তাধারাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করল। বিশেষ করে ভারতবর্ষে যখন ওয়াহাবিপন্থীরা মুসলমানদেরকে প্রথম প্রজন্মের মতো মৌলিক চর্চার দিকে ফিরে যাওয়ার আহবান করতে শুরু করে, তখন তারা বেশ ভালো সাড়া পায়। তারা যখন মানুষের সামনে প্রমাণসহ উপস্থাপন করে, কীভাবে সমাজের অভিজাত মুসলমানরা এবং নীতিনির্ধারকেরা মুসলমানদের নির্ধারিত জীবনধারা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তখন অনেকেই তাদের সাথে একমত হয়। তারা মুসলমানদের এই পরিণতির জন্য মুসলমানদের দুর্বলতাকেই দায়ী করে। সর্বোপরি, ওয়াহাবিপন্থীরা গ্রামের গরিব মানুষগুলোকে এটা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, সমাজের ধনী শ্রেণির জন্যই আজ তাদের এই নাজুক অবস্থা।

১৮৬৭ সালে ভারতবর্ষে কাজ করে এমন একদল ওয়াহাবি মিলে, দেওবন্দ নামক শহরে বিরাট একটি ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করে (এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে-সম্পাদক)। পরবর্তী ৫০ বছর এই স্থান থেকেই লোকজন শিক্ষিত হয়ে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে ভারতীয় ধারার ওয়াহাবিজমের প্রচার করে। ১৯২০ সালের শেষ দিকে এসে দেওবন্দিরা তাদের শক্তির একটি ঝলক আফগানিস্তানেই প্রথম প্রদর্শন করে।

আফগানিস্তানের তৎকালীন রাজা আমানুল্লাহ তার দেশকে মোটামুটি চমকে দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি ব্রিটিশের হাত থেকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সীমান্তে সেনাও প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তিনি জয়ী হন এবং আফগানিস্তানকে স্বাধীন করেন। তিনি নিজেকে কোনো ইউরোপিয়ান শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে বিজয়ী প্রথম মুসলিম হিসেবে আবির্ভূত করেন। তার বিজয়ের পরপরই ভারতবর্ষের ওয়াহাবিরা তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যাক্ত করেন এবং তাকে নতুন খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমানুল্লাহ এই উপাধিটি বরণ করতে রাজি ছিলেন না এবং আগ্রহীও ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি দেওবন্দিদের সাথে পুরোপুরি বেইমানি করেন। কারণ, তিনি সকল প্রত্যাশা ভঙ্গ করে আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষ পথ ধরেই হাঁটতে শুরু করেন। তাই ওয়াহাবিরা তার ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তারা সফলও হয়। কিন্তু নিজেদের শক্তি দিয়ে নয়। তারা এই কাজটি করে ব্রিটিশ পরাশক্তির সহযোগিতা নিয়ে। এই হিসাবটা বেশ অদ্ভুত। কারণ, যে দেওবন্দিদেরকে সহায়তা করার জন্য ব্রিটিশরা আমানুল্লাহকে উৎখাত করল, সেই দেওবন্দিদের তুলনায় আমানুল্লাহ অনেক বেশি ব্রিটিশ মানসিকতা ও চিন্তাধারা লালন করে। ইউরোপিয়দের আদর্শই ছিল আমানুল্লাহর আদর্শ। কিন্তু ব্রিটিশরা আমানুল্লাহকে তাদের জন্য হুমকি মনে করতে শুরু করে। কারণ, তারা জানত তাদের পড়াশোনায় শিক্ষিত হয়ে কেউ যদি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হয়, তাহলে সে কতটা মারাত্মক হতে পারে। সাম্রাজ্যবিরোধিতার উৎকৃষ্ট নমুনা লেনিনকে দিয়েও তারা দেখেছে। তারা দেওবন্দিদেরকে ভালোমত জানতও না। তাই তারা আমানুল্লাহকে উৎখাত করার প্রচেষ্টায় দেওবন্দিদেরকে অস্ত্র ও টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করল। দেওবন্দিরা আফগানের স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সহযোগিতাও পায়। এভাবে একটা পর্যায়ে তারা আফগানিস্তানে সফল অভ্যুত্থান পরিচালনা করে, যার ফলে ১৯২৯ সালে আমানুল্লাহকে নির্বাসনে চলে যেতে হয়।

এই সমস্ত উত্থান-পতনের মধ্যেই একজন সনাতনপন্থী ডাকাত, আফগান রাজধানীকে দখল করে নেয়। তিনি নয় মাস সেখানে শাসন করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে পুরোপুরি ইসলামিক শাসন চালু করেছিলেন তা নয়, তবে আমানুল্লাহ সংস্কারমূলক যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা তিনি বাতিল করে দেন। শহরটিতে বেশ ধ্বংসযজ্ঞ চালান, রাজকোষকে লুণ্ঠন করেন। এই শতকের শেষে এসে তালিবানরা আফগান দখল করার পর যা যা করেছিল, তার সাথে এই সনাতনপন্থী নেতার কাজের অনেক মিল পাওয়া যায়। তার স্বল্প সময়ের শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তানে ব্যাপক পরিমাণ নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। ফলে আফগান নাগরিকেরা আরও শক্তিশালী কোনো নেতার প্রয়োজনীতা ভীষণভাবে অনুভব করে। ব্রিটিশরা আফগান জনগণের এই প্রত্যাশা পূরণে তাদেরই এক আস্থাভাজন ব্যক্তিকে সিংহাসনে নিয়ে আসে। তার নাম নাদির শাহ- যিনি আফগানিস্তানের আদি রাজপরিবারের একজন বংশধর।

নাদির শাহও আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার লোক ছিলেন, তবে তিনি খুব চতুরও ছিলেন। তিনি দেশকে আতাতুর্কের নীতিতেই ক্রমশ ধাবিত করছিলেন। তবে সেটা তিনি করছিলেন খুবই ধীর গতিতে। তিনি ব্রিটিশকেও চটাতে চাননি আবার দেওবন্দিদেরকেও হাত ছাড়া করতে চাননি। তাই খুব ধীর গতিতে আফগানিস্তানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটাতে শুরু করেন।

এটা ঠিক, ওয়াহাবিজমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাইয়েদ জামালউদ্দিন আফগানির সংস্কার আন্দোলনও থেমে যায়নি। জামালউদ্দিনের পর এই আন্দোলনটি বয়ে নিয়ে যান তার অন্যতম শিষ্য, মোহামেদ আবদুহ;

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যিনি মিসরের ঐতিহ্যবাহী আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। আবদুহু বরং জামালউদ্দিনের চিন্তাধারাকে আরও সুসংগঠিত করে, একে ইসলামের সমন্বিত একটি আধুনিক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আবদুহুর পরে তারই অন্যতম শিষ্য এবং বন্ধু রাশিদ রিদা এই বিষয়টি নিয়ে আরও কাজ করেন। কীভাবে একটি আধুনিক রাষ্ট্র ইসলামিক নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, সেই বিষয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যালোচনা করেন।

এর পরই আসেন হাসান আল বান্না। জামালউদ্দিন আফগানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিণতি হিসেবে, হাসান আল বান্নাকেই বিবেচনা করা হয়। মিসরের এই ব্যক্তিটি পেশাগত জীবনে ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি যতটা না দার্শনিক ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী। ১৯২৮ সালে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুড নামের একটি ক্লাব শুরু করেন। এটা ছিল ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। যদিও সেই সময়ে অনেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি।

হাসান আল বান্না মিসরের সুয়েজ খাল এলাকাতে চাকরি এবং বসবাস করতেন। তাই প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের স্বরূপটা তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারতেন। কারণ, ইউরোপের সাথে প্রাচ্যের যত ব্যবসা বাণিজ্য হতো তা এই সুয়েজ খাল দিয়েই হতো। এই খালটি ছিল মিসরের সবচেয়ে আধুনিক একটি সৃষ্টি। যত জাহাজ এই খাল ব্যবহার করত তাদের সবাইকে খাল ব্যবহারের জন্য টোলও দিতে হতো। ব্রিটিশ ও ফ্রান্সদের সমন্বয়ে গড়া একটি কোম্পানি এই খালটি নিয়ন্ত্রণ করত এবং এখান থেকে যা আয় হতো তার ৯৩ শতাংশ অর্থও তারাই নিয়ে যেত। তাই এই খালের আশেপাশে সব সময়ই প্রচুর বিদেশি বসবাস করত। খালের দুই ধারে অনেকগুলো দোকান, রেস্টুরেন্ট, ক্যাফেটেরিয়া, নৃত্যশালা, মদের দোকান চালু ছিল; যার সবগুলোই পরিচালনা করত ইউরোপীয় নাগরিকরাই। মিসরীয়দেরও অল্প কিছু দোকান ও কফি হাউস সেখানে ছিল। তবে উভয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠান একই সাথে থাকলেও, তাদের মানসিকতা ছিল দুটি ভিন গ্রহের মানুষের মতো।

হাসান আল বান্না যে সময়ে কাজ করতেন তখন তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তার সতীর্থ মিসরীয় নাগরিকেরা ইউরোপিয়ান ভাষা ও ব্যবহারিক আচরণ শেখার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেছে। তারা ক্রমশ পশ্চিমা জগতে প্রবেশ করার নিমিত্তে, পশ্চিমা আভিজাত্যে অভ্যস্ত হতে চাইছে। প্রতিটি মিসরীয় নাগরিকেরই একই খায়েশ, এমনকি নিম্ন আয়ের মজুরদেরও পশ্চিমা আদলেই চলার জন্য অসম্ভব রকমের প্রচেষ্টা দৃশ্যমান ছিল। মিসরীয়দের এই ভিন্ন সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হওয়ার প্রবণতা বান্নাকে খুব আহত করল। তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যদেরকে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দায়িত্ব দিলেন, যাতে তারা অন্য মুসলমানদের সাথে আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বলে এবং তাদেরকে যেন ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা দেয়; মুসলমানদের ভেতরে যাতে আত্মসম্মানবোধ জেগে ওঠে।

একটা পর্যায়ে ব্রাদারহুডের এসব সদস্যদের পিতা এবং বাড়ির বয়স্ক সদস্যরা তাদের এসব কার্যক্রমে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে ব্রাদারহুড প্রবীণদের জন্য সান্ধ্যকালীন স্কুলও চালু করে। এই ধরনের উদ্যোগ খুবই জনপ্রিয়তা পায়। ফলে অনেক জায়গাতেই ব্রাদারহুডের এসব কার্যক্রমের শাখা খুলতে হয়। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই ব্রাদারহুড মিসরের বিভিন্ন জায়গায় যুবকদের জন্য একটি ক্লাবসদৃশ শিক্ষাকেন্দ্র আর বয়স্কদের জন্য আরেকটু পরিণত ধরনের প্রতিষ্ঠান চালু করতে সক্ষম হয়।

ধীরে ধীরে সাধারণ একটি ক্লাব থেকে মুসলিম ব্রাদারহুড একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ লাভ করে। তারা ধর্মনিরপেক্ষ ইসলাম এবং মিসরের পশ্চিমা অভিজাত শ্রেণিকে মিসরের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে। মুসলিম ব্রাদারহুড জাতীয়তাবাদেরও বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা সকল মুসলমানদেরকে এক হয়ে একটি বিরাট উম্মাহর আকৃতি নিয়ে কাজ করার আহবান জানায়। জামালউদ্দিন আফগানির মতো তারাও পশ্চিমা আবহে না গিয়ে ভিন্নভাবে ইসলামের আধুনিকায়নের কথা বলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সময়টায় মহা অর্থনৈতিক সংকটকে মোকাবেলা করছিল, ঠিক সেই সময়েই মুসলিম ব্রাদারহুড সংগঠিত হতে শুরু করে। একই সময়ে নাৎসীরাও জার্মানির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। আর স্ট্যালিনও সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সফল হন। মিসরের বাইরে তখন কেউই ব্রাদারহুড সম্পর্কে তেমন কিছু একটা জানতে পারেনি। কারণ, ব্রাদারহুড তখনো খুবই গোপনীয়তার সাথে কাজ করছিল। তা ছাড়া মিসরের অভিজাত শ্রেণির মধ্যে তারা সেইভাবে তখনো কাজ শুরু করেনি। আর বিদেশি সাংবাদিকদেরও তাদের নিয়ে তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। এমনকি মিসরের নিজস্ব দৈনিক পত্রিকাগুলোও তাদের ব্যাপারে খুবই অল্প সংখ্যক সংবাদ পরিবেশন করত। পশ্চিমা সংবাদপত্র তাও করত না। কেনইবা করবে? ব্রাদারহুড তখনো সীমিত সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর যেসব প্রবাসীরা নানা কাজে তখন মিসর আসত, ব্রাদারহুডের কার্যক্রম তাদের চোখে পড়ত না বা পড়ার কোনো কারণ বা সুযোগও ছিল না।

ক্রমশ যখন পশ্চিমাকরণ এবং শিল্পায়ন আরও বিকশিত হয় তখন মিসরের শহরগুলোতে দরিদ্র লোকের সংখ্যা আরও বাড়তে থাকে। এই শ্রেণির লোকদের সংখ্যা বাড়তে থাকায়, ব্রাদারহুডের কাজের পরিধি আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তৈরি হয়। ফলে ধীরে ধীরে ব্রাদারহুড রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং পশ্চিমা প্রভাবের বিরুদ্ধে কথা বলে। নিজ দেশের অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, এমনকি সরকারের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেয়। সব ধরনের জাতীয়তাবাদী সরকারের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেয়, সেইসাথে পশ্চিমের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গণতান্ত্রিক যেসব কাঠামো সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোকেও তারা প্রত্যাখ্যান করে।

৩০ দশকের শেষের দিকে এসে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা, তারা ক্ষমতায় থাকুক বা স্বতন্ত্র আন্দোলনে থাকুক; দুইদিক থেকেই তারা প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে যায়। একদিকে তারা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন মোকাবেলা করছিল, আর অন্যদিকে নিজেদের দেশেই ইসলামিক শক্তিগুলোর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল।

এই ধরনের চাপের মুখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, রাজনীতিবিদরা দেশের ভেতরে বিদ্যমান বিভিন্ন জনপ্রিয় বিষয়কে ইস্যু করে নিজেদেরকে গ্রহনযোগ্য করার চেষ্টা করে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য, ধর্মকে ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হচ্ছিল না। যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে তারা ধর্মকেই সমাজের মূলধারা থেকে আলাদা রাখার কথা বলছিল, তাই ধর্ম নিয়ে এই খেলাটা খুব একটা কার্যকর হয়নি। সেকারণে তারা অন্য দুটি ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসলো। একটি হলো উন্নয়ন এবং উন্নয়নের ফলে বৈষয়িক অগ্রগতি। আর অন্যটি হলো জাতীয়তাবাদ। যেমন উদাহরণ হিসেবে ইরানের কথা বলা যায়। ইরানে পাহলভীর সরকার আদি পারস্য ঘরানার ইসলামের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছিল। অন্যদিকে, আফগানিস্তানে নাদির শাহ পশতুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে- যদিও সেই সময়ে খুব অল্প সংখ্যক লোকই সেখানে পশতু ভাষায় কথা বলত। এভাবে প্রতিটি দেশেই সেই দেশের বা জাতির আদি সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উত্থান শুরু হয়।

অন্যদিকে জাতীয়তাবাদের চেতনাও এই সময়ে মধ্য পৃথিবীতে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। সমস্যা হলো, অধিকাংশ নতুন দেশ যা তখন সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল মূলত কৃত্রিম ঘরানার। অর্থাৎ কোনো না কোনো কারণে বা কারও পরিকল্পনায় হয়তো এই দেশগুলো সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আফগানিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল রাশিয়া ও ব্রিটেনের কারণে। ইরান টিকে ছিল একটি সাম্রাজ্য হিসেবে, সাধারণ কোনো দেশ হিসেবে নয়। তুরস্ক দেশটিও আতাতুর্ক তার মতো করেই গঠন করেছিলেন।

এরপরও এটা ঠিক যে, বিশ্বের অন্য যেকোনো জায়গার তুলনায় আরব বিশ্বেই জাতীয়তাবাদ বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এর কারণটি ছিল :

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিজয়ীরা ফ্রান্সের ভার্সেলেইতে মিলিত হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বকে আবার নতুন করে সাজিয়ে নেয়া। এই সম্মেলনের প্রস্তাবনা দিতে গিয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইড্রো উইলসন মার্কিন কংগ্রেসে এক ভাষণে ১৪টি পয়েন্ট উল্লেখ করেন। যা অধিকাংশ ঔপনিবেশিক জনশক্তিকে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে আরব নাগরিকেরা উইড্রো উইলসনের এই ১৪ দফাকে আত্মস্বীকৃতি ও আত্মমর্যাদার একটা হাতিয়ার বলেই মনে করে। উইলসন একই সঙ্গে একটি 'লিগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠারও কথা বলেন, যেখানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা হবে। ভার্সেলেইতে প্রকৃতপক্ষে এসব তথাকথিত শান্তিকামী মানুষেরা, কেবল একটা কাঠামোই প্রতিষ্ঠা করে, আর কিছু নয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এই কাঠামোতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। যাহোক, অবশেষে যখনই লিগ অব নেশনসটি প্রতিষ্ঠা হয়, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তি একে তাদের ইচ্ছাপূরণের একটি হাতিয়ার বানিয়ে ফেলে। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, লীগ অব নেশনস কাগজে কলমে আরব বিশ্বে স্বায়ত্বশাসনের কথা বলে। কিন্তু বাস্তবতা হলো তারা ক্রমশ স্কাইস-পিকটের সেই পুরোনো ম্যাপটি বাস্তবায়ন করতে শুরু করে। তারা আরব বিশ্বকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন জোনকে (জোনগুলোকে তখন ম্যান্ডেট বলা হতো) ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মাঝেই ভাগ করে দেয়। এর পেছনে তারা যে যুক্তি দেয় তা হলো, এই অঞ্চল বা এখানকার মানুষেরা ততটা যোগ্য নয়। তাই যত দিন না তারা যোগ্য হয়ে উঠবে, তত দিন তারা এই পরাশক্তির অধীনে থাকবে। এর ভাষাটা অনেকটা এমন ছিল, যেমনটা আমরা উত্তরাধিকারের উইল তৈরির সময় নাবালক শিশুদের ভরণপোষণের ক্ষেত্রে বলে থাকি।

ফ্রান্স তার ম্যান্ডেট হিসেবে পায় সিরিয়াকে। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যের বাকি প্রায় সবটুকুই পায় গ্রেট ব্রিটেন। ফ্রান্স তার ম্যান্ডেটের অংশটিকে দুইটি পৃথক দেশে ভাগ করে। একটি হলো সিরিয়া আর অন্যটি হলো লেবানন। লেবানন দেশটি ভৌগোলিক কাঠামোগতভাবে নয়, বরং সীমানা টেনে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়। কারণ, সেখানকার জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। গোটা অঞ্চলের মধ্যে ফ্রান্স এই লেবাননকেই আলাদা করে বিশেষ গুরুত্ব দিত।

এই অঞ্চলে ব্রিটেনেরও কিছু পছন্দের ইস্যু ছিল। যেমন শুরুতে হাশিমাইত গোত্রের সাথে তাদের সখ্যতা ছিল। এই সখ্যতার কারণেই আরব বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে, যার ফলে ব্রিটেনের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং অটোম্যান সাম্রাজ্যের কিছু প্রদেশকে নিয়ে ইরাক নামের নতুন একটি দেশও সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশরা তাদের পছন্দসই হাশিমাইত গোত্রের একজন প্রতিনিধিকেই ইরাকের রাজা বানায়। তার নাম ফয়সাল। তিনি মক্কার শায়খের দ্বিতীয় সন্তান।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ফয়সালের বড় ভাই ছিলেন আব্দুল্লাহ। ছোট ভাই রাজা হয়ে গেল আর বড় ভাই কিছুই পেল না। আর সেই সময়ে এটাও বেশ বড় একটা সংকটের সৃষ্টি করে। তাই তাকে ঠান্ডা করার জন্য ব্রিটিশদের ম্যান্ডেট থেকেই আবার আরেকটি দেশ বানিয়ে, আব্দুল্লাহকে সেই দেশেরও রাজা বানানো হয়। নতুন এই দেশটিই হলো আজকের জর্ডান।

সন্তানেরা রাজত্ব পেলেও তাদের পিতা মক্কায় খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। ১৯২৪ সালে আরেক জন ব্রিটিশ বান্ধব ব্যক্তি আজীজ ইবনে সউদ, একদল ধর্মীয় জজবা সম্পন্ন সেনা নিয়ে মক্কা আক্রমণ করেন এবং মক্কার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তিনি হাশিমাইতদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করেন। ধীরে ধীরে ইবনে সউদ আরব্য উপদ্বীপের প্রায় ৮০ শতাংশ এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। শুধু ইয়েমেন, ওমান এবং আরও অল্প কিছু এলাকা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। ইউরোপিয়ান শক্তিগুলো তাকে থামাতে সে রকম কোনো চেষ্টাই করেনি। ১৯৩২ সালে তিনি সৌদি আরব নামের নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

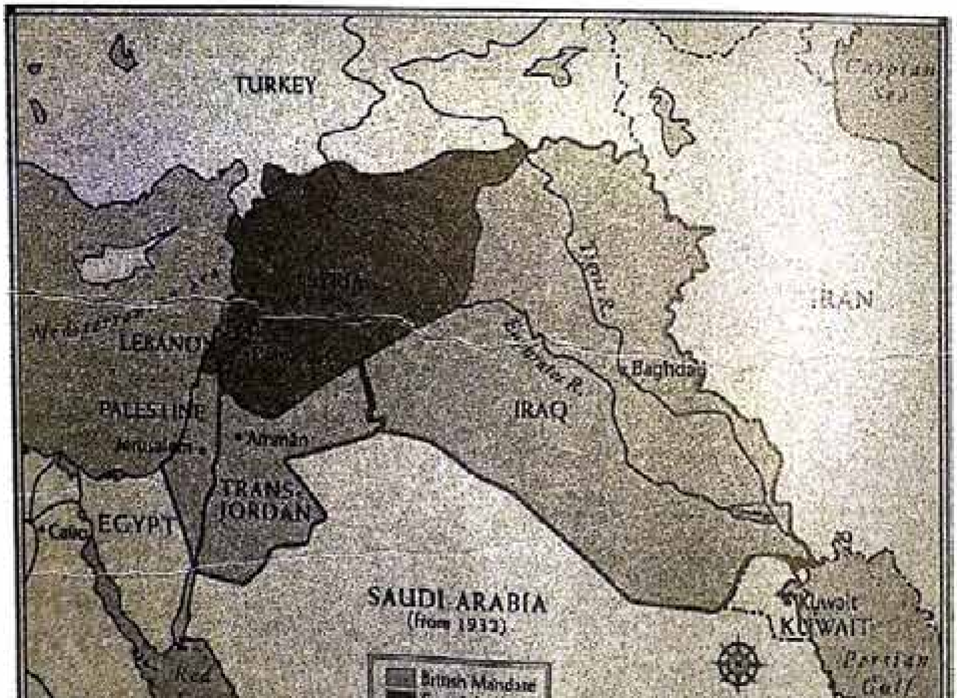

আরব বিশ্বের বিভক্তি

অন্যদিকে, মিসর থেকেও ব্রিটেনরা পিছু হটে এবং মিসরকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও মুক্ত দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু মিসরকে ছেড়ে দিলেও তারা কিছু নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যায়। যেমন, মিসরীয়রা সরকারের ধরন বা প্রকৃতি বদলাতে পারবে না। তারা অবশ্যই একটি রাজতন্ত্র অব্যহত রাখবে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দ্বিতীয়ত মিসরীয়রা তাদের শাসক পাল্টাতে পারবে না, যারা এখন রাজপরিবার হিসেবে আছে তাদেরকেই শাসক হিসেবে বহাল রাখতে হবে। তৃতীয়ত মিসরে ব্রিটিশ সামরিক ঘাটি এবং ব্রিটিশ সেনাদের উপস্থিতি পূর্বের মতোই অব্যাহত রাখতে হবে। চতুর্থত মিসরীয়রা কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ ব্রিটেনের হাতে ছেড়ে দেবে। পঞ্চমত আগে যেভাবে ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের সমন্বয়ে গড়া কোম্পানি সুয়েজ খালের টোল এবং মূল রাজস্ব আদায় করত, সেভাবেই তারা তা অব্যাহত রাখবে ও আয়ের একটি বিরাট অংশ আগের মতোই ইউরোপে পাঠাতে হবে।

মিসরিয়রা এভাবে একটি পার্লামেন্ট পায় ঠিকই, কিন্তু সেই পার্লামেন্টের ক্ষমতাও খুব সীমিত ছিল। কারণ, পার্লামেন্ট যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, সেটাকে আবার কায়রোস্থ ব্রিটিশ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হতো। এতো কিছুর পরও মিসরকে ধরে নিতে হতো যে তারা সার্বভৌম, স্বাধীন ও মুক্ত! এই নামকাওয়াস্তে স্বাধীনতায় মিসরীয়রা মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। ফলে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে মিসরে একটি পরিণত ধর্মনিরপেক্ষ ঘরানার স্বাধীনতা আন্দোলন বিকশিত হলো। একটি স্বাধীন দেশে আবার কেন স্বাধীনতা চেয়ে আন্দোলন? এতেই বুঝা যায় যে সে সময়ে মিসরের অবস্থা কি ছিল।

ব্রিটিশরা ফ্রান্স, সিরিয়াতেও একই ধরনের প্রতিরোধের মুখে পড়ে। সেখানে মাইকেল আফলাক নামক একজন শিক্ষিত খ্রিষ্টান আরব লেখক, নতুন করে একটি আরব জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত মতবাদ প্রণয়ন করেন। তার এই চিন্তাদর্শন অনুযায়ী গোটা আরব অঞ্চল জুড়ে সমস্ত আরবভাষী লোকদের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। কারণ, এরা সবাই একই আরবি ভাষায় কথা বলে এবং তাদের একটি কমন ইতিহাসও রয়েছে- যা তাদেরকে এক আত্মা এক দেহতে পরিণত করেছে। উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় দার্শনিকদের প্রভাবে বিংশ শতকে যত জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহকের জন্ম হয়েছে, তাদের মতো একই চিন্তা ধারণ করতেন এই মাইকেল আফলাক। তিনি একটি আরব জাতি প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, যা শাসন করবে আরবরাই।

যদিও মাইকেল আফলাক একজন খ্রিষ্টান ছিলেন, তথাপি তিনি ইসলামকেই তার আরব জাতীয়তাবাদের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্বীকার করেন। এই বিষয়ে তিনি বলেন, ইসলাম হলো সেই দর্শন যা একটা সময়ে এই আরব অঞ্চলে, গোটা আরব আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে প্রচেষ্টা শুরু হয় তার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তাই আফলাক মনে করতেন, আরব অঞ্চলের প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসী মানুষেরই উচিত

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইসলামকে সম্মানের চোখে দেখা। সেই প্রেক্ষাপট থেকেই তিনি আরবের পুনরুত্থানের কথা বলেন, ইসলামের নয়। তিনি আসলে কট্টরপন্থী একজন ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ায়, তার স্বপ্নের আরব জাতিকে তিনি ইসলাম মুক্ত রাখার কথাই বলে যান। এভাবেই আরবের উত্থানের একটি চেতনা নিয়ে ১৯৪০ সালে তিনি এবং তার বন্ধু মিলে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। তারা এই নতুন রাজনৈতিক দলের নাম দেন 'বা'থ কিংবা রিবার্থ পাটি- বাংলায় যাকে বলা যায় পুনরুত্থান ঘটানোর দল।

এভাবে ইউরোপিয়ান ম্যান্ডেট থেকে চারটি দেশ আবির্ভূত হয়, আর পঞ্চম দেশটি হয় স্বাধীনভাবে। আর মিসর আসলে মুখোশধারী স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু একটা প্রশ্ন বার বার উঠে আসছিল, তা হলো ফিলিস্তিনের পরিণতি কী হবে? যারা স্বদেশিদের দ্বারা দেশ শাসনে বিশ্বাস করে তারা যথারীতি বলছিল যে, ফিলিস্তিন তাদের স্বজাতিদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই স্বজাতি কারা? স্বজাতি বলতে কি সেই আরব, যারা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ। যারা এখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাস করছে? নাকি সেই ইহুদিরা যারা বিগত দুই দশকে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে, ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। যদিও তারা দাবি করে যে তাদের পূর্বপুরুষেরা এই অঞ্চলে দুই হাজার বছর আগেই বসতি স্থাপন করেছিল। আসলেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটা খুব সহজ ছিল না।

আরবদের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। ফিলিস্তিন অবশ্যই একটি আরব দেশ হবে। অন্যদিকে, ইহুদিদের কাছেও উত্তরটি ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তাদের মতে আইনগতভাবে যাই ঘটুক না কেন, ফিলিস্তিনের এই ভূখণ্ডটি হলো ইহুদিদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ আবাসভূমি। কারণ, এই ইহুদি জনগোষ্ঠী বিশ্বের যেখানেই গেছে সেখানেই তারা নিপীড়িত ও নিগৃহীত হয়েছে। একমাত্র ফিলিস্তিনই একটি জায়গা, যেটাকে তারা নিজেদের বলে দাবি করতে পারে। তা ছাড়া ব্রিটেনের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালফোরও এই ভূখণ্ডটিকে তাদের হাতেই দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ব্রিটেন ফিলিস্তিনের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো সরাসরি সিদ্ধান্ত দিলনা। তারা কেবল, পরিস্থিতি কোনোদিকে গড়ায় তা চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল।

কীভাবে এখানে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক নেতারা জাতীয়তাবাদের ইস্যুটিকে ব্যবহার করে এই দোটানায় থাকা জাতিটিকে একত্রিত রাখবে, তা বেশ কঠিন ছিল। কারণ, এই ভূখণ্ডেরই একটা বিরাট জনসংখ্যার অংশ তাদের বর্তমান

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

সীমানাকে অতিক্রম করে একটি বৃহৎ আরব রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মতো দিয়েছিল। অন্যদিকে, ইসলামিক শক্তিগুলো এবং ওয়াহাবিপন্থীরা জাতিরাষ্ট্রের সংজ্ঞা কিংবা অন্য নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে গুরুত্ব না দিয়ে দাবি করে যে, 'এসব বিভাজন বড় কথা নয়। বড় কথা হলো আমরা সকলেই মুসলমান। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে আবার খেলাফত প্রতিষ্ঠা করি।'

সেই পরিবেশে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনটির সফলতাটি মূলত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করছিল। প্রথমত স্যেকুলার আধুনিকমনারা তখনো উন্নয়নের একটি শ্লোগান বেশ জোরে শোরে দিয়ে যাচ্ছিল। তাই তাদেরকে উন্নয়নের কিছু নমুনা নিজেদের স্বার্থেই প্রদর্শন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। আর অন্যদিকে তাদেরকে জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্য দিয়েই বৈধতা আদায় করতে হচ্ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রায় এক দশক চলে গেল। কিন্তু এই আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তাদের উপরোক্ত দুটো লক্ষ্যের কোনোটিই অর্জন করতে পারেনি। তার কারণ হলো উইড্রো উইলসন যতই ১৪ দফা নির্দেশনা দিয়ে যান না কেন, পশ্চিমা শক্তিগুলোর মুসলিম বিশ্বের উপর প্রভাব কমে যাবে সে রকম কোনো লক্ষণই আদৌত দেখা যাচ্ছিলো না।

প্রভাব কমার কোনো কারণও ছিল না। কারণ, পশ্চিমা শক্তিগুলো তখন একে অন্যের চেয়ে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা রত ছিল। বিভিন্ন মতাদর্শের প্রভাবে বিভিন্ন শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠছিল। যেমন সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ, গণতন্ত্র। যেহেতু এত দিক থেকে এতো লড়াই চলছিল, তাই স্বাভাবিকভাবে বিজয়টা নির্ভর করছিল শিল্পায়নের শক্তির ওপর। আর শিল্পায়ন তখন নির্ভর করত পেট্রোলিয়ামের ওপর। আর পৃথিবীতে যত জায়গায় পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়, তার সিংহভাগই এই মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতেই। সেই মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমারা কেন প্রভাব কমাতে চাইবে?

পেট্রোলিয়ামের প্রথম বড় মজুদটি আবিষ্কার হয় ১৯ শতকের শেষ দিকে পেনিসেলভেনিয়া এবং কানাডায়। কিন্তু সে সময়ে এই আবিষ্কার নিয়ে তেমন একটা উত্তেজনা দেখা যায়নি। কারণ, পেট্রোলিয়াম থেকে তখন কেরোসিন ছাড়া আর কিছুই উৎপাদিত হতো না। কেরোসিন ব্যবহৃত হতো বাতি জ্বালাতে, আর অধিকাংশ ক্রেতাই বাতি জ্বালানোর জন্য তিমি মাছের তৈলকেই বেশি পছন্দ করত।

১৯০১ সালে মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম বড় তৈলখনিটি আবিষ্কার হয় ইরানে। ব্রিটিশ নাগরিক উইলিয়াম নক্স ডিআরকি এই খনিটি আবিষ্কার করেন। তিনি তৎকালীন

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

ইরানের কাজার শাহ'র পকেটে নগদ কিছু টাকা দেয়ার বিনিময়ে তাৎক্ষণিকভাবে ইরানের সকল তৈলক্ষেত্রের স্বত্বাধিকার কিনে নেন। সেই সময়ে তাকে শর্ত দেয়া হয় যাতে তিনি কেবল ১৬ শতাংশ রয়ালটি ইরানের রাজকোষে জমা দিয়ে যান। আর এই রয়ালটি নির্ধারিত হবে নেট মুনাফার ওপর। অর্থাৎ নক্স ডিআরক্সি এমনভাবে চুক্তিটি করেন যাতে ইরানের রাজকোষে আসলে কতটা অর্থ যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। তিনি ইচ্ছে করলে কোনো মুনাফা না দেখিয়ে রাজকোষে কোনো রয়ালটি নাও জমা দিতে পারতেন।

আপনাদের অনেকের কাছেই এই ঘটনাগুলো অনেকটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কারণ, এটা কেমন রাজা বা সম্রাট যিনি সামান্য কিছু অর্থের প্রলোভনে পড়ে বিদেশি এক ভবঘুরের কাছে দেশের তাবৎ প্রাকৃতিক সম্পদের খনিকে ছেড়ে দিচ্ছেন। কিংবা যদি কোনো রাজা এমনটা করেও থাকেন, তাহলে তার দেশের জনগণ তাকে কেন উৎখাত করেনি? এর উত্তর হলো: ইতিহাসের ধারাবাহিকতা।

প্রথমত: কাজার সম্রাটেরা এই ধরনের কাজ বিগত কয়েক শতাব্দী ধরেই করে আসছিলেন। দ্বিতীয়ত: সম্রাটকে উচ্ছেদ না করার কারণ ছিল এই যে, তৎকালীন সময়ে ইরানে যেসব রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, তারা অনেক দিন ধরেই তামাকের বাজারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশদের হাতে দিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসার কারণে, রীতিমতো ক্লান্ত অবস্থায় পৌছে গিয়েছিলেন। তাই নতুন করে সম্রাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মতো কোনো অবস্থায় তারা ছিলেন না। তৃতীয় কারণটি ছিল: তেলকে তখনো ইরানের সাধারণ মানুষেরা ততটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে করতনা। তেলের চেয়ে তামাক তখনো পর্যন্ত তাদের কাছে ঢের গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর চতুর্থ কারণটি ছিল, যারা আসলে আন্দোলনটি করবে তাদের কাছে তেল বা তামাক নিয়ে আন্দোলন করার চেয়ে, সংবিধান ও সংসদের জন্য আন্দোলনটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। তাই ব্রিটিশ নাগরিকের সাথে তেলচুক্তিটি মোটামুটি লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যায়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইরান যখন তেল নিয়ে এই চুক্তিটি করল, ততক্ষণে তেলের চাহিদা ও গুরুত্ব মোটামুটি আকাশ ছুঁয়েছে। কারণ, তত দিনে অভ্যন্তরীণ দহনকৃত ইঞ্জিনের আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এর আগে যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ছিল, তা যেকোনো দাহ্য পদার্থ দিয়েই চালানো যেত। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঠ বা কয়লা পুড়িয়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে চালানো হতো। কিন্তু নতুন আবিষ্কৃত অভ্যন্তরীণ দাহ্য ইঞ্জিনের আবিষ্কারের পর তা চালানোর জন্য, পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের কোনো বিকল্পই ছিল না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১৮৮০ সালে একটি ট্রাইসাইকেল চালানোর জন্য একজন জার্মান আবিষ্কারক, এই অভ্যন্তরীণ দাহ্য ইঞ্জিনটি ব্যবহার করেন। পরবর্তী সময়ে এই ট্রাইসাইকেল থেকেই গাড়ি আবিষ্কৃত হয়। ১৯০৪ সালে এসে ইউরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ি অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়। গাড়ি চলাচলের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক রাস্তাঘাটও নির্মাণ করা হয়। এর পরপরই ট্রেনও তেলে চলতে শুরু করে। এরপর ১৯০৩ সালে প্লেন আবিষ্কার হয়। তার জন্যেও তেলের দরকার হয়। এরপর সমুদ্রে ভাসমান জাহাজও তেলেও চলতে শুরু করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই প্রথম ট্যাংক, তেল চালিত নৌযান এবং তেলচালিত যুদ্ধ বিমান ব্যবহৃত হয়। সেই বিমান থেকে আবার বোমাও নিক্ষেপ করা হয়। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সকলেই বুঝে যায়, আগামী দিনগুলোতে তেলচালিত নৌ, বিমান বা স্থলযানটুকুই বেশি ব্যবহৃত হবে। আর সে কারণে যার হাতে বিশ্বের তেলের মজুদ বেশি থাকবে সেই মূলত পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

কিন্তু ইরান এই বাস্তবতাটুকু বুঝেছে অনেক পরে এসে। উইলিয়াম নক্স ডিআরকি তার নিয়ন্ত্রণে থাকা ইরানের তেলগুলো, তত দিনে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত একটি কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। এই কোম্পানিটি পরে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম হিসেবে পরিচিত হয়েছে। উইন্সটন চার্চিলের দাবিমতে ১৯২৩ পর্যন্ত ব্রিটেন ইরানের তেল বিক্রি করে ৪০ মিলিয়ন পাউন্ড আয় করে। অন্যদিকে একই সময়ে ইরানের আয় ছিল মাত্র ২ মিলিয়ন পাউন্ড।

ইতোমধ্যে ব্রিটিশ তেল কোম্পানিটি নেদারল্যান্ডের রাজকীয় প্রতিষ্ঠান রয়াল ডাচ শেল এবং আরও কিছু মার্কিন কোম্পানির সাথে সমন্বয় করে, একটি সুপার কোম্পানি বা বৃহদাকার কোম্পানি গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করে। কোম্পানিটির সম্ভাব্য নাম দেয়া হয় দ্য তুর্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানি। এই কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল শুধু ইরান বা একক কোনো দেশ নয়, বরং পারস্য উপকূলীয় সীমানা জুড়ে মূল অটোম্যান সাম্রাজ্যের সমগ্র এলাকাতে তেলের সন্ধান করা। এই সুপার কোম্পানিটি যখন তেল অনুসন্ধানের জন্য প্রস্তুত হলো, তখন তাদের সামনে প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ম্যান্ডেটগুলোই ছিল। মূলত এই সময়টিতে এসেই ব্রিটিশরা ইরাক নামক দেশটিকে সৃষ্টি করে এবং তাদের অনুগত হাশিমাইত গোত্রের প্রতিনিধি ফয়সালকে শাসন করার দায়িত্ব দেয়। এর পরপরই তেল কোম্পানির নীতিনির্ধারকেরা বাদশাহ ফয়সালের সাথে দেখা করে, তেলের বাজার ও তেলের খনির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কামনা করে। বাদশাহ ফয়সালও তাদের প্রস্তাবে সায় দেন। সমঝোতার সময় ইরাকিরা আশা করেছিল যে,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তারা কোম্পানির ২০ শতাংশ শেয়ার পাবে। কিন্তু বাস্তবে তারা এক শতাংশ শেয়ারও পায়নি। বরং যত টন তেল খনি থেকে উত্তোলন করা হবে সেই প্রতি টন বাবদ ইরাকিরা একটি নির্ধারিত ফি পাবে বলে নির্ধারণ করা হয়। কোম্পানির লাভ বা তেলের বিক্রয়যোগ্য দামের সাথে এই ফি'র কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অর্থাৎ তেল বিক্রি করে সুপার কোম্পানি যতই লাভ করুক না কেন, ইরাকিরা নির্ধারিত ফি'র বাইরে আর কিছুই পাবে না। প্রাথমিকভাবে ২০ বছরের জন্য এই চুক্তিটি হয়েছিল। অন্যদিকে, সুপার কোম্পানির মালিকানাটি সংশ্লিষ্ট ইউরোপিয়ান শক্তি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করা হয়েছিল। যা নিয়ে কিছুটা সমস্যা হয় সেটা হলো, মালিকানার কে কত অংশ পাবে? যাহোক, ১৯২৭ সালে গিয়ে মোটামোটি কোম্পানিটির কাঠামো চূড়ান্ত হয় এবং প্রথম প্রকল্প হিসেবে তারা ইরাকের বিশাল তেলের খনিগুলোতে তেল উত্তোলন শুরু করে।

৯ বছর পরে এসে, আজিজ বিন সাউদ সৌদি আরবেও তেলের খনি আবিষ্কার করেন। বাস্তবতা ছিল সৌদি আরবেই গোটা অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় তেলের মজুদ পাওয়া যায়। নিজেদের খরচে তেল উত্তোলন করা নিয়ে সৌদি বেশ সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। এরই মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং বিশ্বজুড়ে তেলের চাহিদা ও গুরুত্ব অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেড়ে যায়। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট সৌদি বাদশাহ ইবনে সাউদের সাথে বৈঠক করেন। এরপর তারা কিছু ঐকমত্যে পৌছান, যা তখন থেকে শুরু করে আজ অবধি উভয়পক্ষ মেনে চলছে। অথচ এই সমঝোতাটি কোনো চুক্তিই ছিল না। এই সমঝোতার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি তেলের খনি থেকে তেল উত্তোলন করার অবাধ সুযোগ পায়। আর এর বিনিময়ে সৌদি রাজকীয় পরিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ ও প্রশিক্ষণ পাবে। যাতে তারা সম্ভাব্য সকল হুমকি দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে পারে। আসলে এই চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়াহাবিরা একটি অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। সেইসাথে মার্কিন সামরিক শক্তি ওয়াহাবি সংস্কার আন্দোলনের নিরাপত্তাকবচে পরিণত হয়। আর অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন ওয়াহাবিরা এবং দার-আল-ইসলামে থাকা অন্যান্য মুসলমানরা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য শক্তি অর্জন করতে শুরু করেছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১৬. আধুনিকতার সংকট
(১৩৫৭-১৩৮৫ হিজরি) ১৯৩৯-১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ

মানব ইতিহাসের নৃশংসতম রক্তপাত শুরু হয় ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে। আর তা পরবর্তী ৬ বছর ধরে স্থায়ী হয়। জার্মানি আরও একবার, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর এবারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করে অনেকটা সময় পার করে; শেষের মাখনটা খাওয়ার জন্য।

অন্যদিকে, এরই মধ্যে বৈশ্বিক ভৌগোলিক কাঠামোতেও খানিকটা পরিবর্তন এসেছে। রাশিয়া হয়ে গিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। অটোম্যানদেরও অস্তিত্ব তত দিনে বিলীন। জাপান পূর্বের তুলনায় অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠেছে। কিন্তু তারপরও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যে রক্তক্ষরণটা শুরু করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তার একটা পরিসমাপ্তি ঘটল। অতীতে ঔপনিবেশিক যে শক্তিগুলো ছিল তারা এই যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর একইভাবে অতীতে ক্ষমতাধর শক্তিগুলোর মধ্যে যে জোট বা অংশীদারত্বগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর তা অনেকটাই অকার্যকর হয়ে পড়ে। যুদ্ধের পর ব্রিটেনে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। ফ্রান্সও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জার্মানি অনেকটাই ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি জার্মানি দুইভাগ হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষ হলে দেখা যায়, বিশ্বে ক্ষমতাধর হিসেবে আসলে টিকে থাকল, দুটি সুপার পাওয়ার। তাদের হাতে অস্ত্র ও সামরিক প্রযুক্তিও ছিল উন্নতমানের। আর সেই শক্তি আর প্রতিপত্তিকে ব্যবহার করে তারাই পরবর্তী কয়েক বছর বিশ্বজুড়ে ঘটনা ও দুর্ঘটনার মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে কাজ করে। তাই পরবর্তী বছরগুলোতে বিশ্ববাসী, এই দুই সুপার পাওয়ারের ক্ষমতার নোংরা প্রতিযোগিতাই অবলোকন করতে বাধ্য হয়।

তবে অন্যান্য ইস্যুগুলোও এরই মধ্যে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল। যদিও বাহ্যত এই সময়টায় এসে ইসলামিক ইস্যুগুলো অনেকটাই চাপা পড়ে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

গিয়েছিল তথাপি বাস্তবতা এটাই যে, দুই সুপার পাওয়ারের দ্বন্দ্বের আড়ালে ইসলাম তখনো একটা ফ্যাক্টর হয়ে টিকে ছিল। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে মুসলিম বা অমুসলিম অধ্যুষিত সব এলাকাতেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। মিসরে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। চীনে চিয়াং কাই শেকের বিরুদ্ধে মাওবাদীদের উত্থান শুরু হলো। কারণ, মাওপন্থী সমাজতন্ত্রীরা চিয়াংকাই শেককে পশ্চিমাদের পুতুল মনে করত। ভিয়েতনামে, ৩০ বছরের নির্বাসন শেষে দেশে ফেরা হো চি মিন ফরাসিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন। ইন্দোনেশিয়াতে সুকর্ন তার দেশে থাকা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে, ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা দিলেন। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনটি দাঁড়িয়ে গেল। আর মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বরং সেখানে স্বাধীনতার ইস্যুটির সাথে ধর্মীয় আরও কিছু ব্যাখ্যাও জড়িয়ে গেল। ফলে মুসলিম বিশ্বের স্বাধীকার আন্দোলনের বিষয়টা ভিন্নরকম একটি মাত্রা পেলো।

একটা বিষয় এখানে অনস্বীকার্য তা হলো, যেসব জায়গায় স্বাধীনতার এই আন্দোলনটি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, তারা যে সীমানার চৌহদ্দিকে নিজেদের দেশ বলে ভাবতে শুরু করেছিল, সেই ভৌগোলিক সীমানাগুলো ছিল ইউরোপিয়ানদেরই নির্ধারন করা। তাই যদিও তারা ইউরোপিয়ান ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল, তথাপি তারা ইউরোপিয়ান একটি কাঠামো বা ছাঁচের ভেতরে থেকেই এই স্বাধীনতা আন্দোলনটি চালিয়ে যাচ্ছিল। যেমন সাব-সাহারা আফ্রিকায় বেলজিয়ামের রাজা যে অঞ্চলটি জয় করতে সক্ষম হন, সেটাই কঙ্গো হিসেবে পরিচিত হয়। জার্মানি যে জায়গাটি জয় করেছিল, তার নামকরণ করা হয় ক্যামেরুন। অন্যদিকে ব্রিটিশদের অধিকৃত অঞ্চলটির নামকরণ হয় পূর্ব আফ্রিকা ও কেনিয়া। আর নাইজেরিয়া নামে এখন আমরা যে দেশটিকে চিনি, সেখানে আসলে দুইশটিরও বেশি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী বসবাস করত; যারা ৫০০টিরও বেশি ভাষায় কথা বলত। আসলে তাদের অধিকাংশই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে খুব একটা ভালো অবস্থায় ছিল না। তারপরও এরা এখনও দেশ হিসেবে টিকে আছে। যাহোক, আফ্রিকার এই পরিস্থিতি দেখেও বুঝা যায়, এর আগে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে ইউরোপিয়ানরা যে ভৌগোলিক কাঠামোর ভিত্তিতে এই জায়গাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করত, মোটামোটিভাবে সেই একই কাঠামোতে পরবর্তী সময়ে এই দেশগুলোর জন্ম হয়েছে।

অন্যদিকে, উত্তর আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহকেরা আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া এবং লিবিয়াতেও দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল। তাদের এই আন্দোলন সফল হয় ঠিকই, তবে অনেক ত্যাগ তিতীক্ষার বিনিময়ে। ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা চেয়ে আলজেরিয়ানদেরকে ৮ বছর যুদ্ধ করতে হয়। যাতে প্রায় ১০ লাখেরও বেশি আলজেরিয়ান নিহত হয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া সোনালি ইতিহাসের যে আবশ্যিকতা তা অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে তখনো বিভিন্ন জায়গায় থেকেই যাচ্ছিল। বিশেষ করে ভারতবর্ষে এই ইস্যুটি বেশ জোরালোভাবে উঠে আসে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের আগেই ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা চাইছিল। পরে এই আন্দোলনটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়ে যায়। মুসলমানরা পুরোনো সেই ইতিহাসের লালন করার স্বার্থে, নিজেদের মতো করে একটি দেশেরও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম হয়। ভারতবর্ষের এই বিভাজনটি হয় ধর্মভিত্তিক। তাই দেশ দুটি সৃষ্টি হওয়ার পরপরই লক্ষ লক্ষ লোককে তার নিজ ধর্মের লোকদের সাথে বসবাস করার জন্য, সীমানা অতিক্রম করে অন্য রাজত্বে চলে যেতে হয়। এর বাইরে হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হয়। অসংখ্য মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। এতো রক্তপাতের পরও এই পার্টিশন নিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। যেমন কাশ্মীরের পরিণতি। যদিও কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষই মুসলমান, তথাপি তারা শাসিত হচ্ছে হিন্দুরাষ্ট্র ভারতের দ্বারাই। কিন্তু এই প্রশ্নটি ১৯৪৭ সালেই উঠেছিল, কাশ্মীর কার সাথে থাকবে? ব্রিটিশরা এর কোনো সদুত্তর না দিয়ে বিষয়টা সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। আর তার খেসারত হিসেবে আজ অবধি কাশ্মীর ধুকে ধুকে কাঁদছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শুধুই যে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী চেতনার জন্ম হয়েছিল তা নয়, বরং বিভিন্ন স্থানে একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনারও বিকাশ ঘটেছিল। আগের বৈশ্বিক কাঠামোটি যেভাবে ভেঙে বিভিন্ন নতুন নতুন দেশ তৈরি হচ্ছিল, তা অনেক দিন ধরেই অব্যাহত থাকে। ১৯৪ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যেই প্রায় ১০০টি নতুন দেশের জন্ম হয়। পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চি জায়গাই এভাবে কোনো না কোনোভাবে, একেকটি দেশের সীমানার আওতায় চলে আসে।

তবে এতকিছুর পরও জাতীয়তাবাদ আর জাতিসত্তা গঠনের প্রক্রিয়াটি প্রত্যাশানুযায়ী সমন্বিত উপায়ে হয়নি। অনেক দেশই সৃষ্টি হয়েছে যেখানে, একই সীমানার ভেতরে একাধিক দেশের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আবার অনেকক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, সীমানার এপারে ওপারে দুটি দেশের মানুষ নিজেদের মধ্যে ভীষণ রকমের মিল বা সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছে। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সিরিয়া, ইরাক এবং তুরস্কের কথা। এই তিনটি দেশেই এমন এলাকা ছিল যেখানকার মানুষেরা আরবি বা তুর্কিশ- কোনো ভাষাতেই কথা বলত না। বরং তারা কুর্দিশ ভাষায় কথা বলতো, যা ছিল ফারসি ভাষার একটি ধারা। এই কুর্দিশভাষী লোকেরা উপরোক্ত তিনটি দেশের কোনোটাকেই নিজেদের দেশ মনে করতে পারেনি। বরং এই তিন দেশের কুর্দিশরা যখন এক হতো তখন তারা আলাদা আলাদা জাতির লোক হিসেবে সাক্ষাৎ করলেও; নিজেদের মধ্যে ভীষণ রকম আত্মীয়তা ও সৌহার্দ্য অনুভব করত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আবার ইরাক, লেবানন ও জর্দান নিয়ে আরেক সমস্যা দেখা দিল। এই তিনটি পৃথক দেশ হলেও এর অধিবাসীরা কখনোই মানসিকভাবে তিনটি পৃথক দেশের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেনি। যদিও মাঝখানে সীমান্ত ছিল, কিন্তু সেই সীমান্ত তাদেরকে মানসিকভাবে একে অন্যের থেকে দূরে নিতে পারেনি।

যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই আরবাঞ্চলের জন্য ১৪ দফা পয়েন্ট ঘোষণা করেছিলেন, যেখানে প্রতিটি ভূখণ্ডকে তিনি মূলত স্বজাতির লোকদের মাধ্যমেই শাসন করার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তথাপি এই স্বজাতির সংজ্ঞা পশ্চিমারা আরব অঞ্চলের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে প্রয়োগ করে। তারা এখানে স্বজাতি বলতে তেমন ব্যক্তিদেরকেই শাসক হিসেবে বাছাই করে, যারা আসলে পশ্চিমাদের আস্থাভাজন।

জাতীয়তাবাদের চেতনার ভিত্তিতে আরব অঞ্চলকে বিভিন্ন দেশে ভাগ করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যাটির সৃষ্টি হয়, ফিলিস্তিনকে নিয়ে। যার অনেকটুকু অংশ নিয়েই পরবর্তী সময়ে ইসরাইল রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন এবং এর পরপর নাৎসীরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। সেই গণহত্যার আতঙ্কে থেকে বাঁচার জন্য ইহুদিদের জন্য পৃথক একটি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। ইউরোপের মধ্যে কেবল যে নাৎসীরাই শুধু ইহুদিদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তা কিন্তু নয়। ইতালিতেও ইহুদিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক নিপীড়ন চালানো হয়। ফ্রান্সেও জার্মানির যে পুতুল সরকার ছিল, তারাও ইহুদিদের উপর নির্যাতন শুরু করে। ব্রিটেন, স্পেন বা বেলজিয়াম কোনো দেশই ইহুদিদের জন্য স্বস্তিদায়ক পরিবেশ দিতে পারেনি। ফলে চতুর্দিক থেকে নিপীড়নের মুখে লক্ষ লক্ষ ইহুদি ইউরোপের বিভিন্নস্থানে আটকা পড়ে। তারা নিরাপত্তার সন্ধানে যে যেদিকে পারে ছুটে যায়। কেউ কেউ উন্মুক্ত সাগরে নৌকা নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবেও যাত্রা শুরু করে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ইহুদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং সেখানেই বসতি গড়ে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তো নিজস্ব নাগরিক আছে। তারা আর কতজন ইহুদি অভিবাসীকে আশ্রয় দিতে পারবে। ফলে তারা ইহুদি অভিবাসীদের জন্য কোটা নির্ধারণ করে। কিন্তু মার্কিনিদের মধ্যেও সেই সময় ইহুদি বিরোধী চেতনার লক্ষণ পাওয়া যায়।

এই পালিয়ে যাওয়া ইহুদিরা একটিমাত্র জায়গাতেই যেতে পারত, যার নাম ফিলিস্তিন। কারণ, এর আগে যে ইহুদিরা ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে গিয়েছিল, তারা সেখানে বেশ স্বস্তিদায়ক অবস্থায় ছিল। তারা জমি কিনে স্থায়ী ছিল। কিছু অবকাঠামো নির্মাণ করেছিল। তাই নতুনভাবে যারা বিপদে পড়ল তাদের বেশিরভাগই সেই ফিলিস্তিনের পথেই অগ্রসর হলো। তা ছাড়া তারা এটা বিশ্বাস করত যে, ফিলিস্তিনে বহু শতাব্দী আগেও তাদের পূর্বপুরুষেরা বসবাস করত। তাই ফিলিস্তিনের ব্যাপারে তারা ভিন্ন রকম অধিকারও বোধ করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মূলত স্রোতের মতো ইহুদি অভিবাসীরা ফিলিস্তিনে যেতে শুরু করে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিন্তু ইহুদিরা ফিলিস্তিনের ব্যাপারে যে দাবি করেছিল, এটা সেখানকার আরবেরা কখনোই মানতে পারেনি। কিন্তু ফিলিস্তিনের আরবেরা অনেকটা অসহায় ছিল। কারণ, তারা দুই স্তরের বহিঃশত্রুদের আধিপত্যের কারণে কোণঠাসা অবস্থায় ছিল। তাদের প্রথম স্তরের নির্ধারক ছিলেন তুর্কিরা আর দ্বিতীয় স্তরের নির্ধারক ছিলেন ইউরোপীয় কর্তৃত্বশালীরা।

নতুন ইউরোপিয়ান অভিবাসীরা অবশ্য জোর করে কোনো জমি দখল করেনি। তারা যেখানে বসতি গড়লেন, মূলত সেখানে তারা জমি কিনতে শুরু করেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এমন জমিগুলোকে কিনেন, যেগুলোর কোনো মালিক সেই মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন না। তাই এই জমিগুলো নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক সৃষ্টি হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তিনে তাই হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে আলজেরিয়াতে হয়েছিল। আলজেরিয়াতেও ফরাসি অভিবাসীরা জমি কিনেছিল এবং তারা আলজেরিয়ানদের পাশাপাশি নিজেদের মতো করে আরেকটি অর্থনীতিও চালু করেছিল। ফলে একটা সময়ে গিয়ে আলজেরিয়ার সত্যিকারের বাসিন্দারা নিজদেশেই পরবাসী হয়ে যায়। ঠিক একইভাবে ১৯৪৫ সালের দিকে এসে এতো সংখ্যক ইহুদিরা ইউরোপের নানা অঞ্চল থেকে ফিলিস্তিনে এসে জমা হয় যে, তাদের সংখ্যা মূল ফিলিস্তিনি আরবদের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সংখ্যার বিচারে বলা যায় মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে ফিলিস্তিনে প্রায় কোটি খানেক ইহুদি এসে আশ্রয় নেয়। তাহলে তো সমস্যা হবেই। এটা অনেকটা অবধারিতই ছিল।

ইউরোপিয়রা যেভাবে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে, সে অনুযায়ী ইহুদিরা ছিল নিপীড়নের শিকার। অন্যদিকে, আরবদের বর্ণনা অনুযায়ী ইহুদিরা ইউরোপিয়দের মতোই ঔপনিবেশিক মানসিকতা লালন করত। ১৮৬২ সালে জার্মান ইহুদি দার্শনিক মোসেস হাস ইহুদিবাদের সমর্থনে বলেন, 'ইহুদিরা যদি মধ্যপ্রাচ্যের ঠিক মাঝখানে নিজেদের মতো একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাহলে তারা পশ্চিমা রাজকীয় শক্তিগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারবে। একই সঙ্গে তারা পশ্চাৎপদ প্রাচ্যে সমৃদ্ধ পশ্চিমা সভ্যতাকেও নিয়ে যেতে পারবে।' একইভাবে থিওডর হার্জেল নামক আরেকজন ইহুদি দার্শনিক বলেন, 'ফিলিস্তিনে যদি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহলে তা হবে এশিয়ার ভেতরেই আরেকটি ইউরোপের প্রতিচ্ছবি।' অন্যদিকে, ১৯১৪ সালে চেইম ওয়েইটজম্যান একটি চিঠি পাঠান ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে। সেই চিঠিতে তিনি দাবি করেন যে, যদি ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে পরবর্তী ২০ থেকে ৩০ বছরে ১০ লাখ ইহুদিকে সেখানে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে। এতে সেই নতুন দেশটি সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠবে। সেখানে সভ্যতার ছোঁয়া লাগবে, ফলে সঠিকভাবে সুয়েজ খালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে।'

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

যে সকল আরবেরা ইহুদিবাদের প্রসারনকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা হিসেবে মনে করত, তাদের চিন্তা খুব একটা ভুল ছিল না। কারণ, ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনে আবাস গড়তে দেয়ার ছদ্মবেশে ইউরোপিয়রাই সেখানে ঔপনিবেশিক স্থাপন করেছিল। আর ইহুদি নীতিনির্ধারকরা ইউরোপিয়ানদের এই গোপন অভিলাষের কথা জানলেও, তারা প্রকাশ্যে সেই ব্যাপারে কথা বলত না।

১৯৩৬ সালে ফিলিস্তিনস্থ আরবদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দাঙ্গা ফ্যাসাদ শুরু হয়। পরিস্থিতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণের বাইরেই চলে যায়। তখন সেই আরবদেরকে শান্ত করার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশরা একটি আদেশ জারি করে, যার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের অভিবাসনকে সীমিত করা হয়। কিন্তু কাগজে কলমে আদেশটি কার্যকর হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৩৯ সালে। প্রক্রিয়াটি আর তেমন একটা অগ্রসর হয়নি কারণ, সে বছরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং একই সাথে নাৎসীরাও ব্যাপকভাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা শুরু করে। ফলে ইহুদিরা আবার পালিয়ে বেড়াতে শুরু করে। যার কারণে তারা আর ব্রিটিশদের সেই সীমিত অভিবাসনের আদেশটি মানতে পারেনি। একদিকে অভিবাসন বিরোধী আইন আর অন্যদিকে নাৎসীদের অত্যাচার- সব মিলিয়ে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক আকার ধারণ করে। অন্যদিকে, ফিলিস্তিনে থাকা ইহুদিগোত্রগুলোর মধ্যে হঠাৎ করেই জঙ্গি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। ১৯৪৬ সালে ইহুদি সন্ত্রাসী জঙ্গি গোষ্ঠী হাগানাহ জেরুজালেমস্থ কিং ডেভিড হোটেলে বোমা হামলা করে। সেই হামলায় ৯১ জন নিরীহ নাগরিক নিহত হয়। এটাকে আধুনিক সময়ের প্রথম সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটাই ছিল ১৯৮৮ সালের আগ পর্যন্ত একক সন্ত্রাসী ঘটনায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক হতাহত হওয়ার ইতিহাস। কারণ, ১৯৮৮ সালে আরও বড় ঘটনা ঘটে। সেই বছর লেবাননের সন্ত্রাসীরা একটি বেসামরিক বিমানকে স্কটল্যান্ডে নিয়ে ধ্বংস করে, যাতে ২৭০ জন মানুষ নিহত হয়।

মূলত নাৎসীদের বর্বরতম আচরণের কারণেই, ইহুদিদের জন্য অন্য একটি দেশে নিরাপদে আশ্রয় নেয়ার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পায়। তবে ইহুদিরা যারা ফিলিস্তিনে এসেছিল, তারা যে সকলেই আশ্রয় ভিক্ষা চেয়ে এসেছিল, তাও কিন্তু নয়। কারণ, তারা দাবি করত, এই ভূখণ্ডটি তাদের এবং তারা অধিকার নিয়েই এখানে থাকতে এসেছে। তারা আরও দাবি করে, ১৬৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের পূর্বসরিরা এই ভূখণ্ডেই বসবাস করেছে এবং এরপর যারা এই ভূখণ্ড ছেড়ে চলে গিয়েছে, তারাও আসলে এখানে ফিরে আসার আশা সব সময়ই করত। কথাটি একবারে অমূলকও নয়। প্রকৃতপক্ষেই ইহুদিরা ফিলিস্তিনে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুবই আন্তরিক ছিল। তারা মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বর এই বিতর্কিত স্থানটি (ফিলিস্তিন) হিব্রুভাষীদেরকেই দান করেছেন, কারণ আবরাহামের (হযরত ইবরাহিম আ.) সাথে ঈশ্বরের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার মধ্যে একটি ছিল জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা। জাতিসংঘের উপরে প্রাথমিকভাবে মৌলিক যে কয়টি দায়িত্ব অর্পিত হয় তার মধ্যে একটি ছিল, ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান। সেই মোতাবেক ১৯৪৭ সালেই ফিলিস্তিন বিষয়ক বিতর্ক নিরসনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ দুইরাষ্ট্র (ফিলিস্তিন ও ইসরাইল) প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করে। জাতিসংঘ গোটা ভূখণ্ডটিকে ভাগ করে প্রতিটি দেশকে তিনটি করে উপত্যকা প্রদান করে। আর জেরুজালেমকে কারও কাছেই না দিয়ে একে পৃথক একটা আন্তর্জাতিক শহর হিসেবে ঘোষণা করে। জাতিসংঘের প্রস্তাবনামতে ফিলিস্তিন ও ইসরাইল মোটামুটি সমান পরিমাণ এলাকাই লাভ করে। জাতিসংঘ এই প্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করে, এটা আমাদের বিবেচ্য নয় যে, কে ঠিক বলছে আর কে ভুল। আমরা শান্তির জন্য মূল ভূখণ্ডটিকেই উভয় ধর্মের লোকদের মাঝে বন্টন করে দিলাম। আসলে ছোট ছোট বাচ্চারা ঝগড়া করলে অভিভাবকেরা যেমন যেনতেনভাবে একটা বুঝ দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করে, জাতিসংঘও ফিলিস্তিন সংকটকে ঘিরে ঠিক একই ধরনের কাজটাই করেছিল। তারা সমস্যার মূলে যায়নি। ফলে সমাধান তো হয়নি বরং আজও ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে অসন্তোষের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কিন্তু আরবরা এটা কখনোই মানতে পারেনি যে, ফিলিস্তিনের ব্যাপারে উভয়ের দাবি যথার্থ বা উভয়ের দাবির মধ্যে ভারসাম্য করতে গিয়ে, মাঝামাঝি কোনো সমাধান খুঁজে বের করার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে। বরং আরবেরা বরাবরই মনে করত, ইহুদিরা আসলে ইউরোপের একটি সমস্যা এবং ইউরোপিয়ানরা সেই সমস্যার সমাধান করতে না পেরে উটকো ঝামেলাটিকে ফিলিস্তিনিদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কিংবা কেউ কেউ এটাও মনে করত যে, ইউরোপিয়ানরা ইতঃপূর্বে ফিলিস্তিনে এসে যেভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছিল, তার প্রতিশোধ হিসেবে তারা এখানে ইহুদিদেরকে পুনর্বাসন করেছে। আর ইউরোপিয়ানদেরকে মুসলমানরা ইতঃপূর্বে যেভাবে পরাজিত করেছিল, মূলত তার খেসারত হিসেবেই অযাচিতভাবে মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব জমিগুলোকে অন্যদের জন্য ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আশেপাশের বিভিন্ন আরব অঞ্চলের নাগরিকেরা ফিলিস্তিনের আরবদের এই দুঃসহ যন্ত্রণাটি অনুধাবন করত এবং সহানুভূতি দেখাত। কিন্তু তা ছাড়া বিশ্বের অন্য কারও সেই বিষয়ে তেমন একটা মাথাব্যথা ছিল না। আর সে কারণেই পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিন ইস্যুটি যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভোটাভুটির জন্য দেয়া হলো, তখন অধিকাংশ অমুসলিম দেশগুলোই দুটি পৃথক রাষ্ট্র অর্থাৎ ফিলিস্তিন ও ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষেই মতো দিল।

ফিলিস্তিনের বাইরে অন্য আরবদেরকে এই ইস্যুটি তেমন একটা প্রভাবিত করেনি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্মের কারণে ইরাকের

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কোনো মুসলিম কৃষককে জমি হারাতে হয়নি কিংবা মরক্কোর কোনো ব্যবসায়ী তার ব্যবসার প্রসার ঘটাতেও কোনো বেগ পায়নি। অধিকাংশ মুসলমানেরই ফিলিস্তিনের কর্তৃত্ব চলে যাওয়া নিয়ে তেমন একটা উদ্বেগ ছিল না। ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা তৎকালীন আরবদের জন্য একটি প্রতীকি সংকট ছিল। কেননা, ইসরাইলের উত্থানে মুসলমানরা অনুধাবন করল যে, তাদের হাতে আসলে তেমন একটা ক্ষমতা নেই। সাম্রাজ্যবাদীরা চাইলে যখন তখন তাদের যেকোনো এলাকাই নিয়ে যেতে পারে। আর সে রকম অবিচার যদি হয়ই, তাহলে মুসলিম বিশ্বের বাইরে আর কেউই কোনো সহানুভূতি দেখাবে না। ইসরাইলের আবির্ভাব আরব, অনারব কিংবা এশিয়া আফ্রিকাসহ যেকোনো এলাকার মুসলমানদের উপর ইউরোপিয়ানদের মর্জি মাফিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠারই ইঙ্গিত বহন করে।

ইজরাইল এবং ফিলিস্তিন

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

১৯৪৮ সালের ১৫ মে, ইসরাইল আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের অস্তিত্বের ঘোষণা দেয়। সাথে সাথেই আরব সেনাবাহিনী তিনদিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ শুরু করে। তাদের লক্ষ্য ছিল নতুন প্রতিষ্ঠিত ইহুদি রাষ্ট্রটি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগেই, তাকে তারা শেষ করে দিবে। কিন্তু হলো বিপরীত। ইসরাইলই উল্টো আরব সেনাবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে ফেলল। এই যুদ্ধটিকে আরবেরা বিপর্যয় হিসেবে অভিহিত করলেও, ইসরাইল এটাকেই তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে দাবি করে। এই যুদ্ধের ফলে প্রায় ৭০ লাখ আরব পরিবার গৃহহীন ও দেশহীন হয়ে পড়ে এবং শরণার্থী হিসেবে আশেপাশের আরব দেশগুলোতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধের কারণে আরবেরা জমির কর্তৃত্ব হারানোর পাশাপাশি, ভীষণভাবে জনসম্পৃক্ততাও হারাল। সেই সময়ে আরবাঞ্চলে বিখ্যাত যেসব ব্যক্তিরা ছিলেন, তারা ইসরাইলের 'টিকে থাকার অধিকার'টি নিয়ে নিরন্তর বিতর্ক করতেন। তারা ইসরাইলের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করতেন না। তারা মূলত কথা বলতেন জাতীয়তাবাদ বা জাতিসত্তার কাঠামোর ভিত্তিতে। যেমন আরবের অনেক নেতাই তখন বলতেন, 'ইহুদিরা চায় ইসরাইল টিকে থাকুক, আর ফিলিস্তিনের আরবেরা চায় ফিলিস্তিন টিকে থাকুক। কিন্তু যেহেতু তারা দুপক্ষই একই ভূখণ্ডই দাবি করছে, তাই দুটো ভিন্ন নামে তো আর একই জিনিস টিকে থাকতে পারে না। তাই আপনি যদি ইহুদিদের রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখার কথা বলেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আপনাকে ফিলিস্তিনকে টিকিয়ে রাখার বিপক্ষে অবস্থান নিতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়গুলোতে যেহেতু নাৎসিরা ব্যাপকভাবে ইহুদি নিধন করেছে তাই ইহুদি রাষ্ট্রের টিকে থাকার চেয়ে ইহুদি সম্প্রদায়ের টিকে থাকার বিষয়টি সেই সময়ে অনেক বড় ইস্যু হয়ে সকলের সামনে ধরা দেয়।

পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে দেন জেরুজালেমের তৎকালীন মুফতি। তিনি সেই সময়ে ইহুদি বিরোধী একটি চিন্তাধারার প্রচার শুরু করেন। এই মুফতি বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জার্মানিতে ছিলেন। মুফতি হিসেবে জেরুজালেমে আসার পর তিনি প্রকাশ্যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেন। রেডিওতেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একই ধারার বক্তব্য দেন। সেই সময়ের বিশ্ব পরিস্থিতি, মিডিয়ার উস্কানিমূলক পরিবেশনা এবং মুফতির ইহুদিবিরোধী জোরালো বক্তব্য, সব মিলিয়ে পশ্চিমে আরবদের ব্যাপারে একটা ধারণা তৈরি হয়, আরবেরা সকলেই ইহুদি বিদ্বেষী। ফলে অযাচিতভাবেই মুসলমানরা আরও বেকায়দা পরিস্থিতিতে পড়ে যায় এবং তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ড বিষয়ক বিতর্কেও ক্রমশ পরাজিত হতে থাকে।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে আরেকজন ব্যক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তার নাম জামাল আব্দুল নাসের। তিনি ছিলেন মিসরীয় সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। নাসের জন্ম নেন মিসরের দক্ষিণাঞ্চলে। তার পিতা ছিলেন সাধারণ একজন ডাকপিয়ন। যখন তিনি অল্প বয়সী কিশোর ছিলেন,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তখন থেকেই ইউরোপিয়ানদের কাছে মিসরের অসহায় আত্মসমর্পণের বিষয়টি তাকে আহত করত। যে বয়সে কিশোর তরুণরা সুন্দরী মেয়েদের সাথে সময় কাটানোর স্বপ্ন দেখে, নাসের সেই বয়সেই তার জাতির সম্মান ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তবে কীভাবে তিনি সেই পথে এগোবেন, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ করেই মিসরীয় সেনাবাহিনীর অভিজাত স্কুলে নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেদের ঢোকার সুযোগ দেয়া হলে, তার সামনে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে যায়। নাসের সেই সম্ভাবনাটিকে কাজে লাগিয়ে একসময় কর্নেল পর্যন্ত হয়ে যান।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হওয়ায় নাসেরের মনে দুঃখ আর দুর্দশা যেন আরও বেড়ে যায়। তিনি মিসরের রাজাকে এই পরাজয়ের জন্য দায়ী করেন। এরপর তিনি সেনাবাহিনীর চৌকস শ'খানেক কর্মকর্তাকে নিয়ে একটি পরিকল্পনা করেন এবং তার আলোকে রাজাকে উৎখাত করে একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা করেন। সেই মোতাবেক ১৯৫২ সালের গ্রীষ্মের একদিনে একটি অভ্যুত্থান ঘটান। এই অভ্যুত্থানটিকে মোটামুটি রক্তপাতহীনই বলা যায়। কারণ, মাত্র দুজন মানুষ এই ক্যুতে মারা যায় এবং রাজতন্ত্রেরও অবসান ঘটে।

রাজাকে হটানো ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ। কঠিন যেই কাজটি ছিল তা হলো, ব্রিটিশদেরকে মিসর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। আর এই কাজটি করার জন্য নাসেরের বেশ শক্তিশালী ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল। সেই সময় কোল্ড ওয়ার একেবারে চূড়ান্তক্ষণে। প্রতিটি সম্ভাব্য রাষ্ট্রই বড় দুই সুপার পাওয়ারের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ও সামরিক সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করছে। নাসেরও ব্রিটিশদের হটানোর জন্য আমেরিকার সাহায্য চাইলেন। কিন্তু মার্কিনিরা নাসেরের নিয়ত নিয়ে খুব একটা পরিষ্কার ছিল না। আবার একই সঙ্গে তারা মিসরের ভৌগোলিক অবস্থানকে সেই মুহূর্তে তাদের জন্য খুব একটা জরুরিও মনে করেনি। ফলে তারা নাসেরের প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে নাসের সোভিয়েতের কাছে সাহায্য চায়। সোভিয়েত তাকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করে। এই দৃশ্য দেখে আমেরিকার হুঁশ হয় এবং তারা নড়ে চড়ে বসে। তারা তখন মিসরের গুরুত্বও বুঝতে শুরু করে। তারা আবার নাসেরের সাথে যোগাযোগ শুরু করে। নাসেরকে হাতে পাওয়ার জন্য তারা আসওয়ান নামক একটি জায়গায় নীল নদের উপরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ড্যাম (বাঁধ) নির্মানেরও প্রস্তাব দেয়। এই ড্যামটি নির্মিত হলে মিসরের কৃষিজ জমির পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে যাবে এবং একই সঙ্গে মিসর এতো বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে, যা দিয়ে তারা শিল্পায়নের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকেও মোকাবেলা করতে পারবে। এই প্রস্তাবটি আসলে লোভনীয় ছিল। কারণ, এর মাধ্যমে নাসেরের মতো আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের স্বপ্নও পূরণ করা যেত।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

কিন্তু যখন নাসের এই সম্ভাব্য চুক্তির চূড়ান্ত দলিলটি হাতে পেলেন তিনি দেখলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসলে এই বাঁধ নির্মানের বিনিময়ে কিছু বাড়তি সুবিধাও চাইছে। যেমন তারা মিসরের মাটিতে মার্কিন সামরিক ঘাটি প্রতিষ্ঠার সুযোগ এবং মিসরের অর্থনীতির উপর মার্কিন নজরদারি প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে বাঁধ নির্মানের চুক্তির ভেতরে নিয়ে এসেছে। এই বিষয়দুটো দেখে নাসেরের মনে হলো যে মার্কিনিরাও আসলে পরোক্ষভাবে তার দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় নিয়ন্ত্রণ আনতে চাইছে। এটা উপলব্ধি করে তিনি মার্কিন ঐ চুক্তিটিতে আর স্বাক্ষর করেননি। তবে আসওয়ান বাঁধ নিয়ে তার স্বপ্ন তখনো মনে জিইয়ে রেখেছেন। কিন্তু দেশকে কোনো না কোনো সুপার পাওয়ারের কাছে বিক্রি না করলে, মতো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের টাকা তিনি কীভাবে জোগাড় করবেন?

তারপর তিনি নিজেই উত্তর খুঁজে পেলেন। তিনি দেখলেন সুয়েজ খালই হতে পারে টাকা রোজগারের উত্তম উপায়। সুয়েজ খাল থেকে সেই সময়ে বার্ষিক প্রায় ৯০ মিলিয়ন ডলার আয় হতো। মিসরের হাতে আসত মাত্র ৬.৩ মিলিয়ন ডলার। বাকি টাকাটা যদি হাতে আনা যায় তাহলেই আসলে মিসরের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হতে পারে। এটা অনুভব করেই ১৯৫৬ সালে নাসের হঠাৎ করেই সেনাবাহিনী নিয়ে সুয়েজ খাল এলাকায় যান এবং সেখানে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই ঘটনায় ইউরোপে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। বিশেষ করে ব্রিটিশ রাজনীতিবীদেরা নাসেরকে হিটলারের সাথে তুলনা করতে শুরু করেন। ফরাসি পত্র পত্রিকাগুলোতে দাবি করা হয় যে সুয়েজ খালকে এভাবে দখল করে নেয়ায়, বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্য হুমকির মুখে পড়বে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিলে একটা পর্যায়ে ইসরাইলের সাথে আঁতাত করে কায়রোতে বোমা হামলারও পরিকল্পনা করে। তারা নাসেরকে হত্যা করে সুয়েজ খালকে আবারও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট তখন ছিলেন আইসেনহাওয়ার। তিনি ইউরোপের এসব কর্মকাণ্ড খুব সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ইউরোপিয়রা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল যে, তখনো কোল্ড ওয়ারটি চলছে। তারা ভুলেই গিয়েছিল যে, তাদের একটু ভুল হিসেবের কারণে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের একক নিয়ন্ত্রণেও চলে যেতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এটা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি সুয়েজ খালকে মিসরের হাতে ছেড়ে দিয়ে ইউরোপিয়দেরকে বাড়ি ফিরে যাওয়ারও আহবান জানান। আর মার্কিনিদের প্রভাব তখন এতটাই বেশি ছিল যে, তার নির্দেশনা না মেনে ব্রিটিশ, ফ্রান্স বা ইসরাইলের কোনো উপায় ছিল না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আরবরা এই পরিস্থিতিটিকে নাসেরের বিরাট বিজয় হিসেবে বিবেচনা করে। পরবর্তী ১১ বছর নাসের ছিলেন এই অঞ্চলের সবচেয়ে সফল ঔপনিবেশিকতা বিরোধী রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ছিলেন ঐক্যবদ্ধ আরবের মূল কারিগর। অনেকের কাছে তিনি ইসলামিক সমাজতন্ত্রের অবতারও ছিলেন। ইসলামিক সমাজতন্ত্র বলতে তিনি একটি শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার কথাই বুঝাতেন। তবে মার্কসবাদীদের সুরে নয়, কারণ তার কাছে ইসলামিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি বা নীতিমালা ছিল ইসলাম। তার এই চিন্তাধারা ইসলামিক কাঠামোর মধ্যে সেই সময়ে নতুন ধরনের একটি দর্শনের জন্ম দেয়।

শেষ পর্যন্ত নাসের তার স্বপ্নের সেই বাঁধটি নির্মাণ করে, তার দেশকে বিদ্যুতায়িত করতে সক্ষম হন। পাশাপাশি তিনি ভারতের নেহরু, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন এবং শ্রীলঙ্কার বন্দরনায়েকের সাথে মিলে একটি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা করেন। এটা ছিল দুই সুপার পাওয়ারের আগ্রাসনের বিপরীতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা।

নাসেরের এসব কর্মকাণ্ড ও সফলতা তাকে শুধু মিসরে নয়, বরং গোটা আরবাঞ্চলে একটি সফল ও জনপ্রিয় অবস্থান প্রদান করে। বক্তা হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। আরবরা বলত, যখন নাসের কথা বলতেন তখন সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার চোখের দিকে তাকিয়ে গোটা বক্তব্য শুনত। সমগ্র অধিবেসন হলে তখন পিনপতন নীরবতা বিরাজ করত। আর তিনি এমনভাবে কথা বলতেন, যাতে প্রতিটি শ্রোতাই সেখান থেকে খুশি হওয়ার মতো কিছু না কিছু পেত।

এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা নাসেরকে স্বাধীন ও সার্বভৌম মিসরের চেয়ে আরও বড় কোনো স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি একটি আরব জাতি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। এই চিন্তাধারা নিয়েই ইতঃপূর্বে সিরিয়াতে বাথ পার্টির জন্ম হয়েছিল। ইতিহাসে এটাও দেখা যায় যে, ১৯৫৮ সালে মিসর ও সিরিয়া মিলে একটি একক বৃহৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও প্রচেষ্টা শুরু করে। নতুন সম্ভাব্য সেই দেশটার নাম দেয়া হয় ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক। কিন্তু মাত্র ৩ বছরের মাথায় সিরিয়া তার অবস্থান থেকে সরে আসে, যা নাসেরের ভাবমর্যাদা ও সম্মানকে মারাত্মকভাবে আহত করে।

অন্যদিকে, মুসলিম ব্রাদারহুড তখনো সক্রিয় ছিল। ১৯৫২ সালে তৎকালীন রাজাকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টায় তারা নাসেরকে সহযোগিতাও করেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় বসে যখন নাসের ধর্মনিরপেক্ষ স্টাইলে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন,

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তখন তারা নাসেরের বিপক্ষে চলে যায়। ফলে নাসের মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাদেরকে আটক করে, জেলে পাঠায় এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাকমীদের উপর নির্মম নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু করে।

নাসেরের ক্ষমতা গ্রহণের আগেই মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্নাকে হত্যা করা হয়। এর পরে তার জায়গায় দায়িত্বে আসেন মেধাবী বুদ্ধিজীবী সাইয়্যেদ কুতুব। কুতুবকে এর আগে মিসর সরকার মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করেছিল। সেখানে কলারেডোর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দুই বছর পড়াশোনা করেন। সেখানে বস্তুবাদ এবং ব্যক্তিবাদের যে চর্চা সাইয়্যেদ কুতুব দেখতে পান, সেটা তাকে ভীষণরকম আশাহত করে এবং কষ্ট দেয়। একইভাবে সামাজিক স্বাধীনতার নামে যৌনতার অবাধ ছড়াছড়ি তাকে রীতিমত পশ্চিমাদের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করে দেয়।

কুতুব এই পরিস্থিতি সহ্য করতে না পেরে দেশে ফিরে আসেন এবং মানুষকে বুঝাতে শুরু করেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে একটা অপশক্তি এবং এদেরকে ধ্বংস করতে হবে'। এরপর থেকে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও জড়িয়ে পড়েন। তিনি বলেন ইসলাম যে শুধু একটি ধর্ম হিসেবে খ্রিষ্টানধর্ম বা ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, বরং রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবেও অন্যান্য প্রচলিত রাজনৈতিক দর্শন যেমন, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও ইসলামের শক্ত অবস্থান রয়েছে। তিনি একটি সার্বজনীন ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান। তার এসব কথা শুনে অনেকেই মনে করে যে, মুসলিম ব্রাদারহুড আসলে মিসরের রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার জন্যই এসব কথা বলছে।

নাসের এই পরিস্থিতিতে সাইয়্যেদ কুতুবকে জেলবন্দি করলেন। কিন্তু এটা তার বিরাট একটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল এবং এর প্রতিক্রিয়াটাও ভালো হলো না। কারাগারের ভেতরে অন্য সকল বন্দির সাথে সাইয়্যেদ কুতুবের ভালো সম্পর্ক তৈরি হলো। কুতুব সেই কারাগারে বসেই তার জীবনের সবচেয়ে আলোচিত বই 'মাইলস্টোন' রচনা করেন। এই বইটিতে তিনি জামালউদ্দিন আফগানির ইসলামিক আধুনিকতাবাদকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেন। তিনি ইসলামের সেই চিরচেনা দর্শন দার-আল-ইসলাম ও দার-আল-হারবকে পুনরায় আলোচনায় নিয়ে আসেন। সাইয়্যেদ কুতুবের লেখনী ছিল অসাধারণ। তিনি শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করতে জানতেন। অত্যন্ত সাবলীল ও চমৎকার ভাষায় তিনি প্রতিটি মুসলমানকে জিহাদের অনুশীলন করার জন্য আহবান জানান।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

তিনি শুধু অমুসলিমদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলেছিলেন তা নয় বরং মুসলমানদের মধ্যেও যারা ইসলামের অপব্যাখ্যা করেছে, ইসলামের সাথে প্রতারণা করেছে বা শত্রুদের সাথে সমঝোতা করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদের ডাক দেন। আসলে মিসর, সিরিয়া, ইরাক, জর্দান ও লেবাননসহ আশেপাশের যেসব দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার শাসন করছিল, সাইয়্যেদ কুতুবের নেতৃত্বে মুসলিম ব্রাদারহুড তাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধই ঘোষণা করেছিল।

মিসরে তখনো পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর ছিল না, যার মাধ্যমে ব্রাদারহুডের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ বা দমন করা যেত। এর বদলে নাসেরকে তাই ব্রাদারহুডের মিছিল সমাবেশকে দমন করার জন্য রাষ্ট্রের পুলিশের ওপর এবং নেতাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য গোপন প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল।

নাসের সেই সময়গুলোতে এমনিতেই নানা ধরনের ঝামেলায় ছিলেন। তৎকালীন সিরিয়া, জর্দান এবং ইরাকের শাসকেরা নাসেরের জনপ্রিয়তায় ভীষণ রকম হিংসা করতেন। তাই তারা সব সময় নাসেরকে হেনস্তা করার চেষ্টা করতেন। সেই অবস্থায় সাইয়্যেদ কুতুব এবং তার দলের কার্যক্রম তাই নাসেরের জন্য ভীষণরকম বিব্রতকর ও বিরক্তিকর ছিল। একই সময়ে বাথ পার্টির নেতাকর্মীরাও আরব অঞ্চলে নাসেরের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। এর পাশাপাশি ভিন্নমাত্রার নতুন এক সংকট হয়ে নাসেরের সামনে আসে মিসরের সমাজতন্ত্রীরা। কোল্ড ওয়ারের সেই চরম লগ্নে তারা নগ্নভাবে সোভিয়েতকে সমর্থন করার ঘোষণা দেয়। এর পাশাপাশি আরও ছিল বিপ্লব বিরোধী রাজবংশগুলো এবং গোত্র প্রধানেরা যারা তখনো আরবের বেশ কিছু এলাকাকে নিয়ন্ত্রণ করত। এই আঞ্চলিক প্রধানরাও নাসেরের সব কার্যক্রমকেই প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৯৬৩ সালে নাসের ইয়েমেনের একটি প্রক্সি ওয়ারে জড়িয়ে পড়েন। সেখানে উপজাতীয় গোত্র প্রধানদেরকে সেই সময় উচ্ছেদ করে সোশ্যালিস্ট পার্টি মাত্র ক্ষমতায় বসেছে। নাসের এই সোশ্যালিস্ট পার্টিকে সহায়তা করার অংশ হিসেবেই সেখানে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু যখন মিসরের সেনারা ইয়েমেনে পৌঁছায়, ততক্ষণে আবার সৌদি আরব সেখানকার সেই গোত্রপ্রধানদেরকে অস্ত্র ও টাকা সরবরাহ শুরু করে দিয়েছে। নাসের একসময় বুঝতে পারেন যে, তিনি অজান্তেই একধরনের অপ্রয়োজনীয় এবং অযাচিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। বেশ কয়েক বছর তাকে কোনো ফলাফল ছাড়াই যুদ্ধটি করে যেতে হয় এবং তা একেবারেই অহেতুক।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অন্যদিকে, সাইয়্যেদ কুতুবও মিসরের কারাগারগুলোতে তার দাওয়াতি কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে জোরদার করেন। নাসের তার বহিঃশত্রুদেরকে মোকাবেলা করতে না পারায় সেই সময়ে পুরোই হতাশ ছিলেন। তাই তিনি আর সাইয়্যেদ কুতুবকে সহ্যই করতে পারলেন না। অবশেষে ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে তিনি সাইয়্যেদ কুতুবকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেন। কিন্তু শারীরিকভাবে কুতুবকে হত্যা করা হলেও তাঁর আদর্শকে দমন করা যায়নি। বছরের পর পর, যুগের পর যুগ সাইয়্যেদ কুতুব তার কার্যক্রমের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। বিশ্বের নানা প্রান্তের লোকেরা তাকে শহিদ হিসেবে আজও সম্মান করে, স্বীকৃতি দেয় এবং তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নেয়ার চেষ্টা করে।

এই ঘটনার মাত্র ৩ মাস পর, সিরিয়া এবং ইসরাইল তাদের সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘাত সংঘর্ষ ৬ মাস স্থায়ী হয়। সিরিয়াতে সেই সময়ে বাথ পার্টির যে শাসকেরা ছিল তারা আরব অঞ্চলের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোর মধ্যে নাসেরের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় সিরিয়ার এই শাসকেরা আরব অঞ্চলে বিশেষ করে ফিলিস্তিনের আরবদের মধ্যে খুবই ইতিবাচক মূল্যায়ন পেতে শুরু করে।

এভাবেই আরবাঞ্চলের একসময়ের নায়ক নাসের তারই স্বজাতি আরব মুসলমানদের কারণে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। আরবে নাসেরের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মনিরপেক্ষ শাসকেরা তাকে নির্মূল করার জন্য নেমে পড়ে। ফলে নাসের তারই আরব স্বজাতীয় ভাইদের সাথে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য, তার আসলেই বড় কিছু করার দরকার ছিল। কিন্তু তিনি কিইবা করতে পারতেন? কোনো আরব দেশ বা ইসলামিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নিলে বা দমন পীড়ন চালালে তার উদ্দেশ্য সফল হতো না। আর এ রকম একটি অস্থির পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই ১৯৬৭ সালের এক বসন্তে ইসরাইল তার আরব প্রতিবেশী দেশগুলোর বিরুদ্ধে ৬ দিনব্যাপী ঐতিহাসিক যুদ্ধের সূচনা করে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পরিশিষ্ট

ইতিহাসের যাত্রা তো কখনোই শেষ হয় না। আর নাইন এলিভেনের ঘটনা ইতিহাসকে যেন আরেকদিকে টেনে নিয়ে যায়। ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কস্থ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং ওয়াশিংটনে প্রতিরক্ষা দফতরে হামলার ঘটনার পরপরই তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে নতুন করে সামরিক অভিযান শুরু করেন। তিনি সেই সময় বলেছিলেন, 'সন্ত্রাসীরা গণতন্ত্র আর স্বাধীনতাকে ধ্বংস করতে চায়। তাই আমরা আমাদের রক্ত আর সম্পদ দিয়ে তাদেরকে মোকাবেলা করব।' ৩০-এর দশকেও নাৎসীদের বিরুদ্ধে আর ৫০-এর দশকে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধেও এই একই অভিযোগ তোলা হয়েছিল। বুশের এই ঘোষণার পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্ররা (যাদের অধিকাংশই আসলে বেশ অনীহা নিয়েই এই অভিযানে সম্পৃক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল) ইরাকে যুদ্ধ শুরু করে।

কিন্তু যাদেরকে নাইন-এলিভেনের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে যুক্তরাষ্ট্র প্রচার করছে, তারা কি আসলে গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল? আজও যেসব সশস্ত্র মুসলমান কিংবা তথাকথিত জঙ্গিরা বিশ্বজুড়ে কাজ করছে, তারা কি আসলেই স্বাধীনতাকে ঘৃণা করে? আপনি যদি মুসলমান জিহাদিদের কথা শুনেন তাহলে কিন্তু মোটেও মার্কিনিদের অভিযোগের সত্যতা পাবেন না। তারা স্বাধীনতার বিপক্ষে কথা বলে না, বরং স্বাধীনতার পক্ষে ও স্বাধীন হওয়ার জন্যই কথা বলে। তারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেও অবস্থান নেয় না। বরং তারা মানুষের নৈতিক পতন এবং সেই পতন প্রতিরোধে একটি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। তারা দুর্নীতির সাথে নৈতিকতার অবিরাম ঘটে যাওয়া সংগ্রাম নিয়ে কথা বলে। মুসলমান এই লড়াকু সৈনিকেরা বলে, মুসলমান সমাজে আজ যে অব্যবস্থাপনা, যে দুর্নীতির সয়লাব, তার মূল কারণ হচ্ছে এই দেশগুলোতে পশ্চিমাদের আধিপত্য, মুসলিম পরিবারগুলোতে ভাঙন, ইসলামিক মূল্যবোধের চর্চার অভাব, মদ ও বেহায়াপনার প্রসার, ধর্মের স্থলে বিনোদনের প্রভাব বৃদ্ধি, এবং সর্বোপরি মুসলমান অভিজাত শ্রেণির ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা যা সমাজে ধনী ও গরিবের মধ্যকার ব্যবধানকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

এই যে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দূষছে এবং নিজেদের কার্যক্রমকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে- সেই চর্চা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। ১৯৮০ সালে খোমেনি আমেরিকাকে 'সবচেয়ে বড় শয়তান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। অন্য অনেক মুসলিম নেতারাও একই মানসিকতা লালন করতেন। আর ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জেফরি হার্ফ বলেন যে, 'মৌলবাদী মুসলমানরা হলো নাৎসির সাম্প্রতিক সংস্করণ। তারাও অন্য ধর্ম বিশেষ করে ইহুদিদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ লালন করে, নারীদেরকে অপদস্থ করে।'

জেফরি হার্ফ এবং তারমতো অনেক পশ্চিমাই ইসলাম সম্বন্ধে খুবই বাজে ধারণা রাখেন। তারা মনে করেন যে ইসলামে কেবল মস্তক শিরচ্ছেদ, হাত কাটা বা নারীদেরকে দোররা মারার ঘটনাই ঘটে। এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই যে, কট্টরপন্থী কিছু মুসলমানও এই কাজগুলো বিভিন্ন জায়গায় করেছে বলেই হয়তো এই ধরনের একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এর সাথে ইসলামের মৌলিক চেতনার কোনো সম্পর্ক নাই।

কট্টরপন্থী মুসলমানরা পৃথিবীকে একটি বিভেদ বিভাজনের জায়গা বলে মনে করেন, যেখানে মূল চিন্তার ব্যবধানটি হলো খোদা কি একজন, নাকি কয়েকজন? কে কী বিশ্বাস ধারণ করছে তাই তাদের কাছে মূল সমস্যার কারণ। তারা মনে করে বিশ্বজুড়ে যদি তাওহিদ বা এক আল্লাহর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যদি মোহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা জগৎ ঈশ্বরের সংখ্যা নিয়ে খুব একটা দ্বিমত করে না। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো তাদের কাছে ঈশ্বরের সংখ্যা কোনো জরুরি বিষয়ই নয়। তারা মনে করে যদি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা যায় এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যদি মানুষের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা যায়, তাহলেই শান্তি আসবে। ঈশ্বর একজন, দুইজন নাকি বহুজন এই বিষয় নিয়ে সারা দিন তর্ক করলেও সেটা দিয়ে ক্ষুধা কাটবে না, দরিদ্রতা নিরসন হবে না, যুদ্ধ, অপরাধ, বৈষম্য, বৈশ্বিক উষ্ণতা বা শোষণের মতো যে বিষয়গুলো মানবতাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে সেগুলোর কার্যকর কোনো সমাধান হবে না।

আরেকটা বিষয়ও পরিষ্কার হওয়া দরকার। ধর্মনিরপেক্ষ আর পশ্চিমা জগৎকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। ২০০১ সালে নিউ ইয়র্কের সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জরিপ থেকে জানা যায় ৮১ শতাংশ মার্কিন নাগরিক নিয়মিতভাবে একটি সংঘবদ্ধ ধর্ম অনুসরণ করেন। আর তার মধ্যে ৭৭ শতাংশই খ্রিষ্টান। বাকি যে মানুষগুলো আছেন তারা নিজেদেরকে প্রচলিত ধারার ধার্মিক নন বরং আধ্যাত্মিক ধারার মানুষ হিসেবে দাবি করেন। তাই বিশ্বজুড়ে যাই ঘটুক না কেন, বা যে যত কথাই বলুক না কেন, অমুক ধর্ম মানছে আর অমুক ধর্ম মানছেনা- এটাই সমস্যার একমাত্র কারণ নয়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

মূলত পশ্চিমেও এ রকম বহু ধর্মীয় অনুসারীদেরকে পাওয়া যাবে যারা ঈশ্বরকেই সকল রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্থাপন করতে চান। বিশেষ করে খ্রিষ্টান ইভানজেলিকরা এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭০ সাল থেকেই কাজ করে যাচ্ছেন। নাইন-এলিভেনের পর তারেক আলি 'দ্য ক্ল্যাশ অব ফান্ডামেন্টালিজম' নামে একটি বই রচনা করেছিলেন। যেখানে তিনি বলেন যে, ইসলাম ও পশ্চিমা জগতের মধ্যে যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে, তা মূলত এই দুই সভ্যতার মৌলবাদী শ্রেণির মধ্যে বিরাজমান ধর্মীয় বিতর্কেরই একটি করুন ফলাফল। যদিও এই দুই মৌলবাদী ধারা যে একেবারে বিপরীত কিছু বলছে তাও কিন্তু নয়। পার্থক্য এই জায়গাতেই যে খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা স্রষ্টা কয়জন সেটাকে খুব বড় করে দেখতে রাজি নয়। অন্যদিকে, মুসলমানরা যেমন হযরত মোহাম্মাদ ﷺ-কে মানবতার মুক্তিদূত হিসেবে দাবি করে খ্রিষ্টানেরা সেখানে যীশুখ্রিষ্টকেই ত্রাণকর্তা হিসেবে মনে করে-আর উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটি এখানেই।

প্রকৃত সত্য হলো, পশ্চিমা জগৎ আর ইসলামিক জগৎ মূলত একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যদিও তাদের পথ ও অভিজ্ঞতা ছিল পুরোই আলাদা। ২০০১ সালের পর মার্কিন নীতি-নির্ধারক এবং কর্মপরিকল্পনাকারীরা আধুনিক সময়ের সন্ত্রাসকে বিভিন্ন জাতির মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে চিত্রায়িত করেন। এর আগে ইউরোপিয়ানরাও সন্ত্রাসকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছিল। নাইন-এলিভেনের পরপরই প্রেসিডেন্ট বুশের সরকার তন্ন তন্ন করে সন্ত্রাসীদেরকে খুঁজতে শুরু করেন। তারা ইতিহাসের আলোকে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন এবং সন্ত্রাসীদের পেছনে মদদদাতা সরকারকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। এরই অংশ হিসেবে তারা ব্যক্তি ওসামা বিন লাদেনকে আটক করার জন্য আফগানিস্তানে অভিযান চালান এবং এর পরপরই ইরাকের দিকে মনোনিবেশ করেন। তারা বলেন, পশ্চিমা নাগরিকদের বিরুদ্ধে যেসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটছে তা মূলত ইরাক থেকেই কার্যকর হচ্ছে, আর সাদ্দাম হুসাইনই ইরাকের সকল অপকর্মের হোতা। তারা মৌখিকভাবে বলতে শুরু করেন যে, ইরাক জয় করে সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই এই সংকটের সমাধান হবে। কিন্তু ইরাক দখলের পর যখন সাদ্দাম হুসাইনকে খুঁজে পাওয়া যায়, কিংবা তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যাও করা হয় ঠিকই, কিন্তু তারপরও ইরাকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং সেখান থেকে আইএস-এর মতো নতুন নতুন ধারার সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্ম হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরপর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের জন্য ইরানের দিকে হাত তুলে এবং ইরান নিয়েও একগুচ্ছ অভিযোগ সামনে নিয়ে আসে। তারা একইভাবে সিরিয়া, লিবিয়া, সৌদি আরব কিংবা পাকিস্তানকেও সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দাবি করে। আর তারই পরিণতিতে আজ দেখুন কী অবস্থায় চলে গেছে এই দেশগুলো।

পশ্চিমা ভাবাদর্শকে ভিত্তি করেই মার্কিনিরা এখনও চলছে। তারা তাদের পছন্দসই গণতন্ত্র আর নিজেদের বাছাই করা লোকদেরকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় নিয়ে

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

আসাটিকেই ইরাক বা আফগানিস্তানের সমস্যার সমাধান হিসেবে মনে করে। আর এই ধরনের সিলেকশন মার্কা ইলেকশনের পর দেশগুলো পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে ভালো আছে বলেও তারা প্রচার করে।

কিন্তু তালিবানদের পতনের পর আফগানিস্তানে যে নির্বাচন হলো তার কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সারা দেশ জুড়ে জনগণ তাদের কিছু প্রতিনিধিকে বাছাই করে। এই বাছাইকৃত প্রতিনিধিরা মার্কিনিদের পৃষ্টপোষকতায় একটি সম্মেলনে অংশ নেয়, যেখানে আফগানিস্তানের নতুন গণতান্ত্রিক সরকার গঠন, সংসদ কার্যকর করা, সংবিধান প্রণয়ন এবং মন্ত্রিসভার গঠনসহ নানা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তখন কোনো এক গ্রীষ্মে আমি কাবুলের কাছে পাঘমান নামক একটি শহরে এমন একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলেছিলাম যিনি দাবি করেছিলেন, সেই নির্বাচনে তিনি ভোট দিয়েছেন। যদিও তিনি কোনো বুথে ভোট দিচ্ছেন এমন কোনো ছবি সেই সময়ে আমি জোগাড় করতে পারিনি।

যাহোক, সেই ব্যক্তি তার ভোট দেয়ার অভিজ্ঞতা আমাকে শেয়ার করতে গিয়ে বলছিলেন, 'শহর থেকে বেশ কিছু লোক আমাদের কাছে এসেছিল। তারা আমাদের হাতে কিছু স্লিপ বা পেপার দেয়। তারা আমাদেরকে শিখিয়ে দেয় কীভাবে সেই কাগজে আমাদেরকে সিল দিতে হবে এবং কোথায় দিতে হবে। আমি তাদের কথা ধৈর্য ধরে শুনেছিলাম। তাদেরকে রাগাতে চাইনি যেহেতু তারা অনেক দূর থেকে এসেছিলেন। আমরা তাদেরকেই ভোট দিয়েছিলাম যাদেরকে তারা ভোট দিতে বলেছিল, যদিও আমরা নিশ্চিতভাবেই জানতাম যে সেই লোকগুলো আমাদের জন্য কখনোই ভালো হবে না। আমাদের জন্য ভালো হতো যদি আমাদের নেতা হিসেবে আমরা আঘা-ই-সায়াফকে বেছে নিতে পারতাম।'

আমি প্রশ্ন করলাম আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে আঘা-ই-সায়াফই ভালো হতেন?

তিনি উত্তর দিলেন, 'কী বলছেন আপনি। তার পরিবার এখানে সেই দোস্ত মোহাম্মাদ খানের সময় থেকে বসবাস করছে। সে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। আপনি সামনের ঐ উপত্যাকায় গেলেই তার বাড়ি দেখতে পাবেন। প্রতি বছর ঈদের সময় তিনি এলাকাতে আসেন। বাচ্চাদেরকে চকলেট দেন, আমাদের খোঁজ খবর নেন। যদি কারও আর্থিক কোনো সংকট থাকে তাহলে তাকে তার সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করেন। আর তিনি একজন ভালো মুসলমান।'

এই ভোটদাতা ব্যক্তির কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে পশ্চিমারা আসলে কি ধরনের গণতন্ত্র আফগানিস্তানে কায়েম করতে যাচ্ছে। রাজধানী কাবুলের এত কাছে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে সারা দেশে কী হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

পশ্চিমা জগৎ তাদের পছন্দসই ব্যক্তিদেরকে মুসলিম দেশের নেতা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার পেছনে নানা যুক্তি দেয়। প্রথমত তারা বলে এই ধরনের ব্যক্তিদেরকে সামনে নিয়ে আসার মধ্য দিয়েই তারা পাকিস্তান, জর্ডান, ইরাক, আফগানিস্তান বা মিসরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। যদিও এই দেশগুলোতে তারা মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালুর মাধ্যমে কি বিশাল ফায়দা পেয়েছে সেটা তারা সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। পশ্চিমারা অনেক সময় এটাও দাবি করে যে ইসলামিক মূল্যবোধগুলো আসলে অনেকটাই পশ্চাৎপদ। তাই একে সংশোধন ও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রগতিশীল মানসিকতার লোকজন প্রয়োজন। আর সে জন্য যদি শক্তিও প্রয়োগ করতে হয় তাতেও তারা কোনো সমস্যা দেখেনা।

মুসলমানদের দিক থেকে বিবেচনা করলে অবশ্য বাস্তবতা আরেক রকম। যতবারই মুসলিম দেশগুলো এই ধরনের সামরিক অভিযানের মুখে পড়েছে ততবারই সেখানকার মুসলমানরা লাঞ্ছিত হয়েছে, অপদস্থ হয়েছে। পশ্চিমা আচার আচরণ, আইনি ব্যবস্থা এবং তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণে সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যায়, ছোট ছোট অর্থনৈতিক কাঠামো বিনির্মাণ হয়। ফলে মানুষ নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদের মতো করে নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী নিতে শিখে। এর ফলে সামাজিক সম্প্রীতি ও একতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিটি পুরুষ, প্রতিটি নারী এমনকি প্রতিটি শিশু একে অন্যের পেছনে লাগতে শুরু করে। প্রত্যেকেই তার বস্তুজাগতীয় চাহিদা মেটানোর লড়াইয়ে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে শত্রু হিসেবেও বিবেচনা করতে শুরু করে।

পশ্চিমারা তাদের দিক থেকে এই কাজ করছিল লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য। অন্যদিকে, মুসলমানদের কাছে মনে হচ্ছিল বাইরের কিছু মানুষ এসে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অযাচিত হস্তক্ষেপ করছে। পশ্চিমারা আসলে তাদেরকে দাস বানিয়েই রাখতে চায়। পশ্চিমারা মনে করছিল যে তারা মুসলমানদের ব্যক্তি ক্ষমতায়নের কাজ করছে, অন্যদিকে মুসলমানরা মনে করছিল যে, পশ্চিমারা ব্যক্তি ক্ষমতায়নের নামে আসলে উম্মতের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে, ফলে সার্বিকভাবে উম্মাহ্ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে, আমি প্রায়শই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসী মুসলমানদেরকে বলতে শুনি, জিহাদ মানে হলো ভালো একজন মানুষ হওয়ার চেষ্টা করা। তারা এমনভাবে কথা বলেন যাতে মনে হয় জিহাদের একটি সশস্ত্র রূপের ধারণাটি মুসলমান বিরোধীরা মিথ্যাভাবে ছড়িয়েছে। কিন্তু এসব মুসলমানরা ভুলে যায় যে জিহাদের ধারণাটি এসেছে নবি মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের প্রেক্ষাপট থেকেই। যারা জিহাদের সশস্ত্র রূপকে অস্বীকার করে তারা আসলে ইসলামের প্রথম দিকের মুসলমানদের অবদানকেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করে।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

জিহাদের ব্যাখ্যায় শান্তিপূর্ণ কোনো বয়ানের যে প্রচেষ্টা আসলে দেখা যাচ্ছে, তা একেবারেই আধুনিক সময়ের সংযোজন। যদিও কোনো মুসলমানই নতুন কিছু সৃষ্টির দায় নিতে চায়না। আজ অবধি যত মানুষ সংস্কারের কথা বলেছে, তারা কেউই স্বীকার করেনি যে, তারা নতুন কিছু প্রস্তাব করছে। বরং তারা বলেছে যে তারা ইসলামকে তার মৌলিক চেহারাতেই ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে।

আধুনিক বিশ্বে এই উভয় সভ্যতার মধ্যে যা ঘটছে তাকে অনেকেই ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন বা সভ্যতার দ্বন্দ্ব হিসেবে আখ্যায়িত করছে। ব্যাপারটি দেখে এমন মনে হচ্ছিল যে যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি পক্ষ আরেকটি পক্ষকে পুরোপুরি নিঃশেষ করতে না পারবে বা পুরোপুরি তার মতো বানিয়ে ফেলতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সংঘাত চলতেই থাকবে। আদিকাল থেকেই মুসলমানরা যেমন নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় যেত, তেমনি ইউরোপিয়ানরাও অনেক জায়গায়ই যাতায়াত করত। যখন তাদের উভয়ের পথ একসাথে মিলে যেত তখনই মূলত সংকটের সূত্রপাত হতো।

আমি যখন এই বইটি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম, বইটি লেখার আগে কী কারণে আমি বইটি লিখতে চাচ্ছি, সেটা বর্ণনা করে একটি প্রস্তাব লেখকদের একটি গ্রুপের কাছে জমা দিয়েছিলাম। এর মধ্যে দুইজন আমাকে বলেছিলেন পশ্চিমা এবং ইসলামিক বিশ্বের মধ্যে আসলে যে সংঘাত হচ্ছে, তা অদৃশ্য কোনো কারণে হচ্ছে। বলার মতো কারণই নাকি নেই। কারণ, তারা দাবি করেছিলেন যে, পশ্চিমা আর ইসলামিক বিশ্বের মধ্যে অনেক বিষয়ে নাকি মিলও আছে। তাদের মতে যদি পশ্চিমাদেরকেও বুঝানো যায় যে ইসলাম খ্রিষ্টান ধর্মের মতোই একটি ধর্ম, কিংবা তারা যে আবরাহামকে নবি হিসেবে মানে, ইসলামও তাকে ইবরাহিম নবি হিসেবে মানে- এভাবে ধরে ধরে যদি খ্রিষ্টানদেরকে সাদৃশ্যগুলো বুঝানো যায় তাহলে নাকি অনেক সমস্যার এমনিতেই সমাধান হয়ে যাবে।

তবে সত্যি কথা বলতে এত সরল ব্যাখ্যা দিয়ে বেশি দূর যাওয়া যাবে না।

প্রকৃতপক্ষে এই মৌলিক ইস্যুগুলোর ব্যাপারে পশ্চিমা জগতের সাথে ইসলামের এই দ্বন্দ্বগুলো চিরন্তন। মানবতার গোটা ইতিহাসকে একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায়। কিন্তু একটি ইতিহাস আসলে অনেকগুলো দৃষ্টিভঙ্গিকেই ধারণ করে। একটি ঘটনাকে একটি বয়ানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু একই সঙ্গে আরও কিছু বয়ানের অস্তিত্বও সেখানে পাওয়া যায়। আর সকল দৃষ্টিভঙ্গি আর সকল বয়ানকে কেন্দ্র করেই মানব ইতিহাসটি আবর্তিত হয়। ইতিহাস নিয়ে যতই কাজ করা হোক, যতই ইতিহাসের গল্পগুলোকে গাঁথুনি দিয়ে সংযুক্ত করা হোক, কোনোভাবেই যেন সেই কাজেরও কোনো পরিসমাপ্তি ঘটে না।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

অনুবাদক পরিচিতি

আলী আহমাদ মাবরুর। পেশায় সাংবাদিক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ সক্রিয়। ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স করে ভর্তি হয়েছিলেন মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে। সেখান থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন কৃতিত্বের সাথে। মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে কলা অনুষদের পক্ষে তিনি একমাত্র গোল্ড মেডেলপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনেই যোগ দেন একটি জাতীয় দৈনিকে সাব-এডিটর হিসেবে। পরবর্তী সময়ে আরও বেশ কয়েকটি পত্রিকায় ও নিউজ পোর্টালে কাজ করে যোগ দেন দিগন্ত টেলিভিশনের ইংরেজি সংবাদ বিভাগে। পরবর্তী সময়ে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে অনুবাদ, ভয়েজ ওভার ও চিত্রনাট্য তৈরিসহ নানা কাজ করেছেন। জাতীয় ও সাপ্তাহিক দৈনিকে তাঁর নিয়মিত কলাম প্রকাশিত হয়, যা ইতোমধ্যেই সচেতন পাঠক সমাজে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। 'ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড: ইসলামের চোখে পৃথিবীর ইতিহাস' অনুবাদকের প্রথম অনূদিত গ্রন্থ।

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com

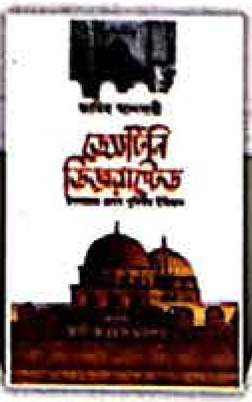

'Destiny Disrupted: History Of The World Through Islamic Eyes' বইটি ২০০৯ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক দিন সর্বাধিক বিক্রিত বই হিসেবে পরিচিত ছিল। ২০১০ সালে বইটি নর্থান ক্যালিফোর্নিয়া বুক অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। মূলত পশ্চিমাদের জানা ইতিহাসের বাইরে এই বইটিতে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের সাল ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ২০০১ সালে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১৪শত বছরের ঘটনাবলীকে এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পশ্চিমা বিকৃত ইতিহাস নয়, বরং ঘটনার শেকড়ে গিয়ে সত্যিকারের ইতিহাসকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই বইটিকে ইসলামি ইতিহাসের এনসাইক্লোপিডিয়া বললেও অত্যুক্তি হবে না। বইটির পাতায় পাতায় আছে তথ্য, আছে শিহরণ জাগানো গল্প, আছে ঘটনার সামনের ও পেছনের প্রেক্ষাপটের চমৎকার পর্যালোচনা। পাঠকেরা বইটি পড়ে আনন্দ পাবেন নিঃসন্দেহে, তবে তার চেয়ে বড় কথা পাঠকবৃন্দ এই বইটি পড়ে আরও পরিণত হবেন, তাদের জ্ঞানের ভান্ডার আরও সমৃদ্ধ হবে। ইসলামের চোখে-তারা ইতিহাসকে নতুন করে আবিষ্কার করবেন।

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
www.guardianpubs.com

ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড
ISBN 978-984-8254-11-0

www.islamicboipdf.blogspot.com www.islamicboipdf.blogspot.com